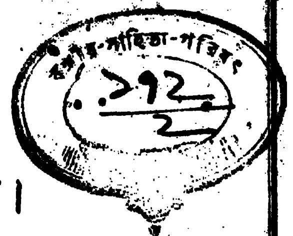
হিন্দুদর্শন



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড | ভাদ্র ১২৮৮। | ১ম সংখ্যা।

প্রণয় ও প্রেম।

এই সুদূর প্রসারিত অনন্ত জগতে যদি প্রণয়ের ছায়া, প্রেমের বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ প্রতিভাসিত না হইত, তাহা হইলে জীবহৃদয় নীরস, মরুময়, সংসার চিরজড়ত্বের মাতৃভূমিরূপে পরিণত হইত। আশার ন্যায় প্রণয় ও প্রেম এই বিশাল জড়জগতে জীব সঞ্চার করিতেছে। সাধারণতঃ প্রণয় ও প্রেম একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে এমন একটু বিভিন্নতা আছে যে, তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায় না, তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় জীবহৃদয়ে যে ভালবাসার সঞ্চার হয়, প্রণয় [illegible] রূপান্তর মাত্র। কিন্তু প্রেম তাহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রণয়—পার্থিব, প্রেম—স্বর্গীয়, তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায়, প্রণয়ের চরমোৎকর্ষই প্রেম।

মানব-হৃদয় কল্পনার সহিত পার্থিব বস্তু লইয়া, এই পার্থিব জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, এ হৃদয়ের অপরাংশটুকু খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে জানে; সেই অপরাংশটুকুর বিষয় কত নির্ম্মলরূপে, তাহাকে হৃদয়ের কোন স্থানে রাখিয়া যত্ন করিলে তাহার ও নিজহৃদয় শান্তিলাভ করিবে, কতটুকু আধ ঘুমন্ত আধ-চাওয়া নেত্রে তাহার মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাহার সেই দৃষ্টির সহিত আপনার দৃষ্টি মিশিয়া যাইবে; তাহার সেই কমনীয় ইন্দীবর-নিন্দিত সেই সূর্য্য-মুখীকে কোন খানে রাখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে, তাহা [illegible] হৃদয় বিলক্ষণরূপে অবগত আছে। মানবহৃদয় ভাবিতে জানে—যে কোন ব্যক্তির রূপে ও গুণে অথবা যে কোন কারণে হউক না কেন, তোমার হৃদয় গলিয়া যায়; বঁধু তাহার হৃদয়ের আক-

র্ষণী শক্তির দ্বারা এ হৃদয় টানিতে লাগিল, হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, তোমার হৃদয়ের সহিত এ হৃদয়ের সমবায় হইতে লাগিল, যখন কালে উভয় হৃদয়ের অনন্ত শক্তি রাশি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা উভয়ের হৃদয়ে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, যখন উভয়ের প্রতি ধমনীতে ধমনীতে পরস্পরের মূর্ত্তিখানি শরীরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যখন একের অদর্শনে অন্যের প্রাণ উদাস হইয়া যায়, প্রাণ ভারি হইয়া পড়ে, শরীর অবশ হইয়া যায়, তখনই বুঝিতে হইবে তাহাতে আর তোমাতে প্রণয় বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি সেই প্রণয়ীর আনন্দে একটু হাস, তাহার দুঃখে একটু অশ্রু-বিসর্জ্জন কর; আপনার বুদ্ধি অনুসারে তাহার কার্য্য করিতে সাহসী হইয়াও একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়, তুমি তাহার সন্তোষে, উৎসাহ দিয়া ও মনের গুরুত্ব হ্রাস করিতে পার না; তাহার বিপদে উপদেষ্টা হইয়াও প্রাণ খুলিয়া সমস্ত কথা বলিতে পার না; সেই প্রেম, প্রকৃত প্রেম বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না—সে প্রেম (প্রণয়) স্বার্থসিদ্ধির প্রেম, তাহা হইতে প্রকৃত প্রেম যে কতদূর তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। যদি কাহারও রূপে বা গুণে তুমি মাতোয়ারা হইয়া থাক, যদি তোমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে সেই আনন্দমূর্ত্তি চির জীবনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকে, যদি তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক শোণিত বিন্দুতে সেই স্বর্গীয় প্রেমের—ভালবাসার তীব্র বিদ্যুৎ প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তরঙ্গিত হইতে থাকে, যদি সেই ত্র্যম্বথিত ত্রিদিব-মদিরা-স্রোত তোমার হৃদয়ের বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া তোমার হৃদয়কে মাতোয়ারা করিয়া তোলে, কর্ণ বধির করিতে এবং চক্ষের প্রতি দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে এই বাহ্য-জগতকে তন্ময় (সেই প্রেমের মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তিময়) করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়; যদি তুমি আজীবন কেবলমাত্র সেই মূর্ত্তির ধ্যানে ডুবিয়া যাইতে সক্ষম হইয়া থাক, যদি তাহার চিন্তায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যাইতে সক্ষম হইয়া থাক, তাহা হইলে স্বর্গীয় প্রেমের সার্থকতা যথার্থই তোমার হৃদয় বুঝিয়াছে। প্রেম, কাহাকে ভাল বাসিতে হইবে, কাহাকে জীবন, মন, জন্মের মত উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে, প্রেম তাহার তারতম্য করিতে অন্ধ। প্রেম জীব-হৃদয়ে স্বতঃ উৎপন্ন হয়; প্রেম কোনটী ভাল, কোনটি মন্দ তাহার বিচার করিতে অক্ষম, এই জন্যই ইংরাজেরা (কিউপিড) প্রণয়-দেবতাকে অন্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন। ভাল মন্দের তারতম্য প্রণয়ের কার্য্য; কোন গুরুতর কারণে প্রণয় বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু প্রেম হৃদয়কে উন্মত্ত, নয়নকে অন্ধ করিয়া দেয়, সুতরাং ভাল মন্দ বিচার করিতে তাহার সে ক্ষমতা থাকে না, সে অবকাশ পায় না; প্রেম একবার সঞ্চারিত হইলে প্রেমিকের জীবনবায়ু জীবনে বিলীন হওয়া পর্য্যন্ত কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না,—মৃত্যু পর্য্যন্ত কি? আমার বোধ হয় সেই প্রেম অনন্তকাল প্রেমিক-হৃদয়ে বহমান থাকে।

তপোবন-পালিতা শকুন্তলা বুঝিয়াছিল প্রেম কাহাকে বলে,—বৃকভানুনন্দিনী রা-

থিকা বুঝিয়াছিলেন প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ কত নির্ম্মল, কতদূর প্রিয়,—উর্ব্বশী ও পুরুরবা বুঝিয়াছিলেন প্রেম কাহাকে বলে,—জুলিয়েট ও রোমিও বুঝিয়াছিলেন প্রেম পার্থিব নহে,—ফার্ডিনেণ্ড ও মিরান্দা বুঝিয়াছিলেন প্রেম কাহাকে বলে,—জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা বুঝিয়াছিলেন প্রেম কাহাকে বলে,—আত্ম-বলি-প্রদাতা-প্রতাপ বুঝিয়াছিল প্রেম কাহাকে বলে—লরা-প্রেমোন্মত্ত পিত্রার্কা ও বিয়াত্রিশ-প্রেমানুরক্ত দান্তে বুঝিয়াছিল প্রেম কাহাকে বলে।—অন্য পক্ষে চৈতন্য, লুথার, প্রহ্লাদ, যিশুখ্রীষ্ট, গুরুগোবিন্দ, নানক, ঈশা, রুষো, রামমোহন রায় প্রভৃতি ঈশ্বরভক্ত মহাত্মাগণ বুঝিয়াছিলেন প্রেম কাহাকে বলে।

কবি-হৃদয় প্রেমের পূর্ণ কুম্ভ। যে কবি কল্পনা-মদে উন্মত্ত হইয়া, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে চিরজীবনের জন্য আত্ম-বিহ্বল হইতে পারেন ও হৃদয়ের প্রতি ধমনীতে ধমনীতে প্রেমের স্বর্গীয় বিদ্যুচ্ছটা ছুটাইতে পারেন, যদি সমস্ত জগৎ একবাক্যে তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া হৃদয়ের সহিত পূজা করেন করুন, কিন্তু আমারি মতে তিনি প্রকৃত কবি নন। আমার মতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক, আমি তাহার হৃদয়কে কাব্য-কাননের কণ্টকময় ভূমি ও তাঁহাকে মলয় পর্ব্বতের বজ্রাহত নীরস পাদপ মাত্র, বলিতে পারি। যিনি কখন কল্পনার মোহে আত্ম-বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন, হৃদয় জন্মের মত সেই কল্পনার ধ্যানে উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, কি সম্পদে, কি বিপদে, যাহার হৃদয় তিলার্দ্ধের জন্যও কল্পনা-রাজ্য ত্যাগ করিয়া বেগবান অন্ধ অশ্বের ন্যায় পথ ভুলিয়া অন্যত্র গমন করে নাই, তাঁহাকেই আমি ভক্তিভাবে পূজা করি, কাব্য-সিংহাসনের তিনিই একমাত্র রাজা। রামপ্রসাদ সংসারের দারুণ উৎপীড়নে অস্থির হইয়া এক সময়ে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন এক মহাজনের নিকট চাকুরী স্বীকার করেন। তাদৃশ অবস্থাতেও চির-সহচরী কল্পনা তাহার হৃদয়-রাজ্য পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সেই অবস্থাতেও মহাজনের খাতার এক পার্শ্বে "আমায় দে মা তবিলদারী" প্রভৃতি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ভাব-প্রবাহ অবিশ্রান্ত অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। হৃদয়বান মহাজন কবির এই অসীম ক্ষমতা দর্শন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে দাসত্ব-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া তাঁহার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তাই বলিতে ছিলাম কবি-হৃদয় প্রেমের ভাণ্ডার।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভালবাসার রূপান্তর প্রণয়; প্রণয়ের চরমোৎকর্ষই প্রেম। প্রত্যেক বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম তাহা ভালবাসা অথবা প্রণয় সঞ্জাত নহে, ভক্তিই তাহার মূলভিত্তি, সুতরাং এস্থলে সে সাধারণ নিয়মের বিচ্যুতি হইল বলিয়া একটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে—ইহার সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য আমরা এই স্থানে একটী গল্পের অবতারণা করিব। একজন পারসীক কবি লিখিয়াছেন, কোন এক সময়ে এক ব্যক্তি একজন দূরদর্শী তাপস সমীপে ঈশ্বর-প্রেমের উপদেশ গ্রহণ

করিতে গমন করিয়াছিল। তাপস আগন্তুকের প্রার্থনা শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন কোন প্রণয়িণীর প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ কি না?" আগন্তুক উত্তর করিল, "এ হৃদয় এতদিন পর্য্যন্ত শুষ্ক আছে, আমি কখন কোন প্রণয়িণীর প্রেমে আবদ্ধ হই নাই।"

তখন তাপস মথিত হইল—তিনি গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, বিশ্বনিয়ন্তার এই বিশাল রাজ্যে তোমার হৃদয় একটী সামান্য মরুক্ষেত্র! ও হৃদয়ে আমার উপদেশ কোন কার্য্যকারী হইবে না। প্রেম যে কি পদার্থ তোমার হৃদয় তাহা ধারণা করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তুমি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হও। তথায় যাইয়া কোন কুলকামিনীর পবিত্র প্রণয় লাভ করতঃ তাহার হৃদয়ের সহিত তোমার হৃদয়ের সমবায় করিয়া দাও; কালে যখন তুমি সেই প্রেমে উন্মত্ত হইবে, সংসারের নৈত্যিক পরিবর্ত্তনে যখন সেই প্রাণ-প্রতিমা প্রিয়তমার সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতিতে অনির্ব্বচনীয় সুখ ও অচিন্তনীয় দুঃখ অনুভব করিতে সক্ষম হইবে তখনই বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বর-প্রেম কি পদার্থ এবং তাহা কি উপায়ে লাভ করিতে হয়। বলা বাহুল্য তাপসের এই উপদেশানুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহ পূর্ব্বক আগন্তুক চরমে ঈশ্বর-প্রেম লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম প্রণয়ের চরমোৎকর্ষই প্রেম।

এখন তুমি বলিতে পার, এক ব্যক্তি বার-যোষিতের ছলনায় অথবা রূপে মুগ্ধ হইয়া, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব তাহার পদতলে সমর্পণ পূর্ব্বক দাসবৎ তাহার সেবা করিতেছে—সেও কি প্রকৃত প্রেমতত্ত্বজ্ঞ হইবে? কখনই নহে। সে কামুক জঘন্য নীচাশয়, সে হতভাগ্য ইন্দ্রিয়ের দাস। তাহার হৃদয়ে মনুষ্যের মহত্ত্ব নাই; তাহার হৃদয় পাশব ভাবে পরিপূর্ণ! সে নরকের কীট, সে মনুষ্য হইয়া পশু, তাহার হৃদয়ে প্রেমের স্বর্গীয় সৌরভ কখনই প্রবেশ করে নাই। তাহার সেই ভ্রান্তি, তাহার কলুষিত জীবনের সেই কলঙ্করাশি, সে হয়ত এক দিন বুঝিতে পারিবে, হয়ত এক দিন তাহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে; হয়ত সে এক দিন যম-যন্ত্রণা অপেক্ষা কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, দারুণ অনুতাপানলে পুড়িতে থাকিবে; হয়ত সে এক দিন হৃদয়ের কলঙ্করাশি ধৌত করিবার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিবে। হয়ত সেই অশ্রু তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে দগ্ধ করিয়া তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিবে। কিন্তু যাহার হৃদয় প্রকৃত প্রেমের স্বর্গীয়-সৌরভে পরিপূর্ণ, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিত—সংসার লীলায় তাহা এক সমুচ্চ দেবী-আদর্শ।

প্রেমিক প্রেমের চিন্তায় নিরত থাকিয়া প্রেমের মূর্ত্তিকে অতিরঞ্জিত করিতে পারে, তাহার চিন্তায় আত্ম-বিস্মৃত হইতে পারে, তাহার জন্য অকাতরে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইতে—আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে। তাহার ভাবে উন্মত্ত হইয়া অহর্নিশ স্বীয় কণ্ঠ বিধুনন পূর্ব্বক তরল সংগীতধারায় পৃথিবী প্লাবিত করিয়া দিয়া জগৎকে মাতাইয়া দিতে পারে;

কিন্তু পাপের কালিমায় তাহার সেই অনিন্দ্য মুখকান্তি চিত্রিত করিতে তাহার ভয় হয়, আপনার হৃদয়কে কলুষিত করিতে সঙ্কুচিত হয়—তাহা তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত। আপনার প্রেমের পাত্র হৃদয়ের সহিত ভাল বাসুক বা নাই বাসুক, প্রকৃত প্রেমিকের সে দিকে লক্ষ্য নাই—ভ্রূক্ষেপও নাই; সে আপনার প্রেমে আপনি উন্মত্ত, সে তাহাতেই আত্মবিহ্বল, সে তাহা লইয়াই বিভোর! তাহার হৃদয়ে সেই সূর্য্যমুখীই তাহার সাক্ষাৎ দেবী, পবিত্রতার উৎস ও ধর্ম্মের অধিকরণ রূপে নিত্য বিরাজমান।

জগৎসিংহ বিমলাকে বলিয়াছিলেন, "আমি একবার মাত্র তোমার সখীর দর্শন প্রার্থী, দ্বিতীয় বার আর এ প্রার্থনা করিব না।" পিত্রার্ক সখীদিগকে বলিয়াছিলেন লরা আমার সঙ্গে কখন আলাপ করে নাই, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি আমাকে যে অভিবাদন করেন, আমি তাহাতেই স্বর্গীয় সুখলাভ করি।" শৈবলিনী-প্রেম-বিহ্বল-প্রতাপ, মুমূর্ষাবস্থায় স্থির চিত্তে তাপস সমীপে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, "অদম্য হৃদয়কে বিশ্বাস নাই, আমি চন্দ্রশেখরের নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন করিলাম।" নির্ব্বাসিতা জনকনন্দিনী লক্ষণ সমীপে গদ্ গদ্ বচনে বলিয়াছিলেন, "আমি তপোবনে থাকিয়াও যদি শুনিতে পাই, আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন, তাহা হইলে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিব।" এই সকলই প্রেমের মহান্ আদর্শ।

তুমি বলিবে যে, যে প্রেম হৃদয়কে আত্ম-বিহ্বল করিয়া তুলে, উন্মত্তের ন্যায় ভোর হইয়া পড়ে, কর্ণকে কি—জানি—কে তাহার মধুর সুললিত স্বরের প্রতিধ্বনি শুনায়। অন্য স্বরের প্রতি বধির করিয়া দেয়, নয়নকে অন্ধ করিয়া তুলে সে প্রেমে সুখ কোথায়? আমি বলি সংসারে যদি কিছু সুখের থাকে, তবে সে সুখ সেই প্রেমে বিরাজমান আছে। আমার অন্য স্বর্গে বিশ্বাস নাই; প্রেমই জীবলোকের জীবন্ত স্বর্গ। যেখানে তুমি আনন্দে আত্ম বিহ্বল হইতে না পারিয়াছ সুখ যে কি অপূর্ব্ব বর্ণনাতীত স্বর্গীয় পদার্থ তাহা তুমি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হও নাই। প্রেম প্রেমিকের হৃদয়কে এক নূতন প্রকারে সংঘটিত করে। প্রেম প্রেমিকের হৃদয়কে এই যন্ত্রণাময় সংসার হইতে পৃথক করিয়া, এক অভিনব স্বর্গরাজ্যে লইয়া যায়, প্রীতির অমৃতময় লহরী তাহার হৃদয়-বেলাভূমিতে প্রতিনিয়ত স্ফীত হইয়া প্রেমিক হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা ভাসাইয়া লইয়া বেড়ায়—এই কষ্টময়, এই যন্ত্রণার আলয়ে তাহার যত সুখ বোধ হয়, তত সুখ কাহারও নাই। এই অসীম বিশ্ব তাহার প্রতি হাস্যময়ী রূপ ধারণ করে; তাহার প্রাণ শারদকৌমুদীর ন্যায় চিরানন্দে প্লাবিত। তাই বলিতেছিলাম, সংসারের যদি কিছু সুখ থাকে—সে প্রেম! এ পার্থিব জগতের বিনিময়ে যদি স্বর্গীয় প্রেমের বিমল দীপ্তি হৃদয়ে অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার, কিন্তু তাহার সে দীপ্তি কয় জন দেখিতে পায়। স্বর্গীয় প্রেমের সৌরভে মনুষ্য উন্মাদ—রামমোহন রায় অনেকের নিকট উন্মাদ

ছিলেন—আধুনিক অনেকানেক ব্যক্তিও মূর্খদিগের নিকট উন্মাদ! কিন্তু কয়জন সেই ঈশ্বর-প্রেমাশক্ত উন্মাদের কথার গভীরতা আজি সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছে? কয় জন তাহাদিগের কার্য্যকারিতার প্রতি অতি সতর্কে অনুসরণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে—কয় জন তাহাদের হৃদয়ের গভীরতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপনাদিগের কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়াছে? হায়! সেই প্রেমে কবে উন্মাদ হইব, সেই প্রেমে কবে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব? তাই বলিতে ছিলাম। আজ যদি শাক্য সিংহের ন্যায় অথবা চৈতন্য অথবা লুথারের ন্যায় সেই ঈশ্বর-প্রেমে উন্মাদ হইয়া জগতের নিকট অপদস্থ হইয়া সুদূর প্রান্তর মধ্যে নির্জ্জনে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণের উদারতা লাভ করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে কে আজ অসার মায়ায় ভ্রান্ত হইয়া সংসারের কুটিল চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহে? স্বীকার করি, পার্থিব প্রেম বড় আদরের বস্তু। যখন পার্থিব প্রেম ঈশ্বর-প্রেমের মূলভিত্তি, তখন আমাদের সেই প্রেমকে প্রতিনিয়ত হৃদয়ের সহিত মানসোপচারে পূজা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

আগমনী।

আরম্ভ।

প্রভাত যামিনী ভারত গগণে
হাসিয়ে চলিয়ে পূরব তোরণে
স্বর্ণ-কিরীটিনি-উষা বিনোদিনী
দিল দেখা আজি প্রমোদ ভরে।
ফুটিল কুসুম, ফুটিল কমল,
মল্লিকার দল——অমল ধবল!
বহিল মৃদুল প্রভাত—পবন
ছুটিল ভ্রমর আসব তরে।

শাখা।

হাসিল জগৎ নবীন আমোদে,
মাতিল জগৎ প্রীতির প্রমোদে,
ছুটিল স্বরগ মরত বিমানে
আনন্দের ধ্বনি ললিত সুতানে
আনন্দ সলিলে ডুবিল সবে।
স্বরগ মরত করিয়া মোহিত,
নিসর্গ কচ্ছপী হইল বাদিত
গণেন্দ্র-জননী সারদা সম্ভাষে,
প্রমোদ হরষে মনের উল্লাসে
ছাইল জগৎ আনন্দ রবে।

উচ্ছ্বাস।

আনন্দ ভুবন মোহিত এখন!
প্রাচীন ভারতে নবীন জীবন!
উঠিল গগণে নবীন তপন!
নব দরশন—নবীন কিরণ!
নব-সুরোবরে—নব কমলিনী
নবীন রূপেতে—মানস-মোহিনী!
শোকের আঁধার পালা'ল এখন
হেরিয়ে উমার উজল বদন!
দাসত্ব বন্ধন—অসহ বেদন!

ভুলিল ভারত এ দুঃখ এখন।
বাজিল দুন্দুভি দামামা সঘনে
আনন্দ নিক্কনে ভারত ভবনে।

আরম্ভ।

হের মা মেনকা! উঠ গিরিরাজ!
ঘরে এল তারা হারা নিধি আজ!
গণেন্দ্র-জননী—বিঘ্ন—বিনাশিনী
ভব-মনোরমা—ভুবন মোহিনী
দাঁড়ায়ে মণ্ডপে দেখনা চেয়ে।
লও কলে তুলি হৃদয়ের ধন,
সাদরে মু'খানি করিয়া চুম্বন,
মুছাও উমার অমল বদন,
অমল অম্বরে কর বিলোকন,
জগৎ-জননী কোলেতে লয়ে।

শাখা।

উঠ গিরিরাজ! তনয়া তোমার,
ঘরে এল—চেয়ে দেখ একবার,
যাপিয়ে বরষ পিণাকী-বাসে।
দক্ষিণে গণেশ বামে ষড়ানন,
মহিষ-মর্দ্দিনী—প্রফুল্ল আনন,
হের শৈলেশ্বর—উঠ গিরিরাণি!
কোলে এল তব কোলের ঈশানী,
তুষিতে তোমায় মধুর ভাসে।

উচ্ছ্বাস।

অনন্ত ভারত কিরীট শোভন,
শুভ্র হিমালয়! কেন অচেতন?
মেলিয়া নয়ন কর দরশন,
উমার বদন ঘুচিবে বেদন,
জুড়াবে তাপিত পাষাণ জীবন,
শীতল হইবে হৃদয়, পরাণ,
—চেয়ে গিরিরাণি! দেখ একবার।

সুধাংশু ভাণ্ডার আনন উমার,
কে বলে ঈশানী ভিখারী ভামিনী,
রাজরাজেশ্বরী তোমার নন্দিনী,
হের গিরিজায়া! লও তুলি, কোলে,
তুষিয়ে উমারে মধুর বচনে।

আরম্ভ।

"এল কিরে উমা দুখিনীর ধন?"
বলি গিরিরাণী ছুটিল তখন,
শৈলেশ-মহিষী উন্মাদিনী বেশ,
সচঞ্চল দৃষ্টি—এলোথেলো কেশ,
যুগল লোচনে আনন্দ ধারা।
"এলি কিরে উমা। হৃদয়ের ধন?"
বলি গিরিরাণী ডাকে ঘন ঘন।
কোথা মা আমার পাষাণী-জীবন!
আয় কোলে লয়ে জুড়াই জীবন,
আয় কোলে আয় নয়ন-তারা।
"মা" বলে মা তো'র পড়িল কি মনে,
মেনকারে আজি এত দিন পরে?
আজি এ পাষাণ হৃদয় চিরিয়ে,
হৃদয়ের দুঃখ দেখ নিরখিয়ে,
পাষাণ-তনয়া! না সরে বাণী।
যাতনার জ্বালা—জ্বলন্ত অনল,
প্রদীপ্ত অনল প্রবাহ তরল,
ব্যাপিয়া হৃদয় কর বিলোকন?
তব অদর্শন—অনন্ত বেদন,
সহি দিবানিশি ভবেশ-রাণি!

উচ্ছ্বাস।

"আয় আয় উমা, দুখিনীর ধন,
আয় কোলে আয় জুড়াই জীবন,
"মা" বলে কি উমা! মা তো'র অন্তরে,

পড়েনি কি মনে তিলেকের তরে ?
পথ পানে চেয়ে থাকে অভাগিনী,
সমস্ত বরষ জানত ঈশানী !
জানত মা তো'র অচলা অভয়া !
ভুলে যাও কিরে পাষাণ-তনয়া ?
মা বলে পাষাণী জীবন শীতল,
তুই বিনে উমা ! কে করিবে বল ?"

আরম্ভ।

"একটি বরষ উমা ! দেখিনি তোমায়,
তারা হারা হয়ে তারা হারা প্রায়,
ছিলাম ভবানি !—আয় কোলে আয় !
ডাক্ মা "মা" বলে অভাগিনী মায়,
দুখিনীর ধন নয়ন-মণি।
এত দিন পরে পড়িল কি মনে
"মা" বলে ঈশানী দুঃখিনী জীবনে ?
আজি মা আমার আনন্দ অপার,
নয়নের তারা কোলেতে আমার
হৃদয়ের ধন মাণিক থানি।
শুখায়ে গিয়াছে অমল আনন,
নিদাঘের তাপে কমল যেমন !
—আয় মা ! মু'থানি মুছায়ে দেই
বহুদিন হ'তে ভুলেছি সে সুখ,
হৃদয়েতে রাখি অমল ও মুখ,
মুছায়ে আঁচলে চুম্বিয়ে বদন,
জুড়াই আজিকে তাপিত জীবন !
—ওই সুখ উমা ! বহুদিন নাই।"

উচ্ছ্বাস।

"আয় আয় উমা !—হৃদয়ের ধন !
ধরিয়ে হৃদয়ে জুড়াই জীবন !
আয় কোলে আয় উজল মাণিক !
আয় কোলে উমা বস মা থানিক !
গণেশ-জননী হয়েছ এখন,
তবু মা ! বুঝনা মায়ের বেদন !
তোর তরে উমা ! সহি দিবা নিশি,
কত যে যাতনা মেনকা মহিষী
দেখ কি ভাবিয়ে ? হয় কি স্মরণ
দুখিনী মা বলে ? পাষাণী-জীবন !
এস ত্রিনয়নী !—জীবন সম্বল !
কোলেতে ধরিয়ে হৃদয়শীতল !

আরম্ভ।

"এলি কি রে উমে !" বলি হিমালয়,
ছাড়িল নিশ্বাস,—টলিল হৃদয় !
আনন্দ লহরে—ছুটিল শোণিত——
যন্ত্রণার জ্বালা চির প্রজ্জ্বলিত !
ছুটিল সবেগে ধমনী মাঝে।
তপ্ত অশ্রুধারা নয়ন ভেদিয়ে,
বিশাল বক্ষেতে পড়িল ছুটিয়ে !
বিকল নগেন্দ্র ! হয়ে দিশে হারা
পুন আরম্ভিল;—"এসেছি কি তারা
ভিখারী হরের নিবাস হ'তে !"

শাখা।

"উঠ গিরিরাজ !" কহে গিরিরাণী,
"চেয়ে দেখ ওই তোমার ঈশানী,
সিংহ-বাহনে ঐ সম্মুখে তব !
স্বর্ণ কমলে রাজে সরস্বতী;
দক্ষিণে কমলা স্বর্ণ ব্রততী !
গণেশ, কুমার যুগল কুমার
দুই পাশে হের শোভিছে উমার
অঙ্গুষ্ঠ বৃষভে করিয়ে ভর"।

উচ্ছ্বাস।

"এলি কি ঈশানি !"—পুন গিরিরাজ,
ডাকিল করুণে;—এলিকিরে আজ,

হৃদয়ের ধন—উমা ত্রিনয়না!
আয় কোলে লয়ে জুড়াই যাতনা
কি দেখিবি তারা! নাই রে এখন
হিমাদ্রি ভবন সুখ নিকেতন!
শক্র-পদাঘাত নিত্য উপহার—
সহি দিবা নিশি কি বলিব আর?
মরুভূমি সব এ পাপ নিলয়,
তস্করের হাতে রত্ন সমুদয়।
সেই দেহ ছায়া—কলঙ্ক জীবন
আছে পড়ি উমা! কর দরশন!

আরম্ভ।

হেরিয়ে উমার উজ্জল বদন
মুছিল ভারত আরক্ত লোচন
রোদন নিনাদ ক্ষণেকের তরে
মন্দীভূত হ'ল প্রতি ঘরে ঘরে
পূর্ণিমার চাঁদ উদিল আসি।
হৃদয়ের ভার——দাসত্ব-বন্ধন
বিস্মৃতির গর্ভে দিল বিসর্জ্জন
আর্য্যের সন্তান আনন্দে বিহ্বল,
ছুটিল বিমানে আনন্দ কল্লোল
শোকের উরষে সুখের হাসি!

শাখা।

পর চারু বেশ আর্য্য কুলবালা!
লও তুলি মাথে বরণের ডালা!
ভিখারী ভামিনী আসিছে ঘরে!
দ্বারে দ্বারে দাও রম্ভাতরু সারি,
রাখ স্বর্ণকুম্ভ পূর্ণ করি বারি
পূর্ব্বকালে তারা শোভিত যেমন
আম্রপত্রে করি শিরস শোভন
আনন্দ পতাকা তোলরে দ্বারে।

উচ্ছ্বাস।

গাও মা গঙ্গে! মৃদুল কল্লোলে;
নাচিয়ে ছুটিয়ে শারদ হিল্লোলে।
উমা-আগমন শুভ সমাচার;
—ভারত হৃদয়ে আনন্দ অপার
হাস ধ্রুবতারা উষার উরষে!
(সুবর্ণ কমল মানস-সরসে,)
স্বর্ণ-শতদল উমার আনন,
দীপ্তমান আজি ভারত ভবন!
ভারত জীবন শোকের সাগরে
তিন দিন সুখ দগধ আগারে!

আরম্ভ।

"এলি কিরে তারা" মুছি অশ্রুনীর
কহিল ভারত—আজি দুঃখিনীর
"যাতনার জ্বালা হ'ল অবসান!
ভব-মনোরমা তারার বয়ান
হেরিয়া আজিকে ভুলিব জ্বালা।
এস বিশ্বরমে! কর দরশন
অভাগীর দশা! কর মা শ্রবণ
হৃদি-বিদারক—ম্লেচ্ছপদাঘাত
কঙ্কাল কেবল হইয়াছে সার
বিঘ্নবিনাশিনী শৈলেশবালা!"

শাখা।

হাসিল ভারত আজি ফুল্লাননে
অশিব নাশিনী—উমা আগমনে
হৃদয়ের জ্বালা শমিত কত!
নেহারি উমার প্রফুল্ল আনন
(দরিদ্রের ঘরে অমূল্য রতন!)
ভুলিল ভারত মানস বেদন
আনন্দের ধারা হ'ল বরিষণ
ভারত নয়নে অজস্র স্রোত।

উচ্ছ্বাস।

এস ত্রিনয়না ! ভারত আবাসে
ডাকে আর্য্যসুত ভকতি অন্তরে
অশ্রুপূর্ণ আজি অযুত ভৃঙ্গার,
মহাস্নান আজি করাবে তোমার !
হৃদয় ছিঁড়িয়ে আর্য্যসুতগণ
দিবে বলিদান—কর মা গ্রহণ !
কোথা চণ্ডী হায় ভারতে এখন,
সুধু 'হাহাকারে' জুড়াও শ্রবণ।
আজি এ আনন্দ হৃদয় উচ্ছ্বাস
নেহারে শিবানী !—হৃদয় বিকাশ !
তব দরশনে আর্য্যসুত দল
ভুলেছে যাতনা—আনন্দে তরল।

আরম্ভ।

এস মা অভয়া—যোগেশ মহিষি !
ভারতের আজি বড় সুখ-নিশি !
ষষ্ঠী সমাগমে আর্য্যসুত দল,
ধান্য দুর্ব্বা লয়ে জাহ্নবীর জল
দুয়ার নিকটে রয়েছে সবে।
এস যোগমায়া ! ভারত নিবাসে ;
আর্য্য সুত আজি রত অধিবাসে !
অগৌর, চন্দন, কুসুমের হার
নয়নের জল দিতে উপহার
ব্যস্ত অনুক্ষণ আয় মা তবে।

শাখা।

বাজিল দুন্দুভি দামামা সঘনে
বীণ সপ্তস্বরা মুরজ মন্দিরা
বাজিল সেতারররাব পিনাক
শঙ্খ ঘণ্টা ঢোল যন্ত্রী লাখে লাখ
ধূপ ধুনা ধূমে ছাইল গগণ।
জয় জয় দুর্গে ত্রিলোক তারিণী,
ভব-মনোরমা বিঘ্ন বিনাশিনী
অশিব নাশিনী দৈত্য-বিনাশিনী,
বিধর্ম্মী যবনে কর মা সংহার।

উচ্ছ্বাস।

আজি আর্য্যগণ দাসত্ব বন্ধন
ভুলিয়ে পেয়েছে নবীন জীবন।
আজি আর্য্য বালা দাসত্ব বিলাসী
পতি সমাগমে হাসে মধুহাসি !
আজি সুখ রবি ভারতে উদয়
বরষের পরে হয়েছে সদয় !
এস কাত্যায়নি—দেবি দশভূজা !
লও মা আজি ভারতের পূজা।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

সূচনা।

তাড়িতের আবিষ্ক্রিয়া-সংক্রান্ত ঐতিবৃত্তিক তত্ত্ব।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বিজ্ঞান-শাস্ত্রের জ্ঞানাভাবে মানবের মহত্ব নাই ; সুতরাং মানব-জাতিরও উন্নতি সংঘটিত হয় না, এ কথা প্রমাণ করিতে এখন আর অধিক আয়াসের আবশ্যক হয় না। বিজ্ঞান-জননী ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জর্ম্মণি এবং আমেরিকা তাহার লক্ষ লক্ষ সাক্ষ্য দিতেছে।

আসিয়া মহাদেশ এবং আফ্রিকার এত দুর্গতি কেন, প্রশ্ন কর—অনেকে বলিবেন, উক্ত মহাদেশ-দ্বয়-বাসিগণের সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক অবনতিই তাহার একমাত্র কারণ। উল্লিখিত অভাব-পরম্পরা গৌণ হেতু হইতে পারে; কিন্তু মুখ্য হেতু নহে—প্রত্যেক চিন্তাশীল মস্তিষ্ক তাহা মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। চিন্তাশীল পুরুষগণের সহিত এক-মত হইয়া আমরাও বলিয়া দিতে পারি – ভারতের এই অনুন্নতির অপরিহার্য্য কারণ – প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন বা বিজ্ঞান-চর্চ্চার অভাব। যে দিন ভারতের প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক মানব বিজ্ঞানোপাসক হইবেন, সেই দণ্ড হইতে আমাদের তামসী নিশার অবসান হইবে।

বিজ্ঞান-বিদ্যা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কিরূপ শ্রেষ্ঠ, একটা দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠক-মণ্ডলীর হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিই। উপনিষৎ * যেমন ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদাদিকে অপরা (নিকৃষ্ট) বিদ্যা বলিয়া, ব্রহ্ম-জ্ঞান-বিষয়ক বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়াছেন, বিজ্ঞানের তুলনায় অন্যান্য বিদ্যাও বিজ্ঞ-বৃন্দের মতে তাদৃশ উৎকৃষ্ট। বৈদ্যুতিক আলোক সমক্ষে গ্যাসালোকই বল, আর দীপালোকই বল, যেমন মিটি মিটি করে, অন্যান্য শাস্ত্রসম্ভও বিজ্ঞান-সম্মুখে তদ্রূপ হীনপ্রভ হয়, সুতরাং শোভা পায় না।

যে শিল্প-বিদ্যার কারিগরিতে আমরা মুগ্ধ হই—সেই শিল্প, বিজ্ঞানের এক অঙ্গমাত্র। ভারতীয় দার্শনিকের বিজ্ঞান-বিষয়ক ব্যাখ্যানও তাহা বৈ আর কিছু নহে †। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়—আর্য্য সভ্যতা-কালে এই মহার্হ শাস্ত্রের ভারতে অতি অল্পই অভ্যুদয় ও প্রচার হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের অমনোযোগের ফল, আজও আমাদের অস্থি-মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এত অনুপ্রবিষ্ট যে, সহজে তাহার ভীষণ সংক্রামক-হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভে আমরা একান্ত অসমর্থ। এখনও আমাদিগকে তাহার কু-ফল ভোগ করিতে হইতেছে। তাহাই যদি না হইবে, তবে অদ্যাপি কেন সেই আরাধ্য দেবের উপাসনায় আমরা বিরত?—প্রাথমিক ভূমিকার সূচনায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। এখন প্রকৃত বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়া যাউক।

আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব তাড়িত-বিষয়ক। এই তাড়িত-তত্ত্বের উৎপত্তি-কাল নির্ণয় করা, আমাদের সর্ব্ব-প্রথম-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গ্রীসের অন্তঃপাতী মিলিট-বাসী থেল্‌স, তাড়িতের প্রথম আবিষ্কারক। তিনি গ্রীক্ সপ্ত সাধুগণের অন্যতম ** মহাপুরুষ। আরো কথিত আছে যে, তিনি থেল্‌স খৃষ্ট-জন্মের ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু

* তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দঃ জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগমধিগম্যতে।

(মুণ্ডকোপনিষৎ; ১ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড, ৫ম শ্লোক।)

† মোক্ষেধী জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।
অমর।

** Seven Sages.

তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তাড়িতের আবিষ্কারক সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তি কি না, অবধারিত হয় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, তিনি কহ্রুবা (Amber) ঘৃষ্ট হইলে বিচালি, (খড়) ঘাস, পালক প্রভৃতি লঘু পদার্থ আকর্ষণে সমর্থ, ইহা অবগত ছিলেন। তাঁহার মতে কহ্রুবা জীবন্ত পদার্থ ‡।

২। যাহা হউক, অতঃপর ৩০০ বৎসর অতীত হইলে, প্লেটো ও এ্যারিষ্টলের শিষ্য থিওফ্রাষ্টস্, লিঙ্কিউরমকে উক্তরূপ-ধর্ম্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাড়িত-তালিকায় ইহাই দ্বিতীয় দ্রব্য। লিঙ্কিউরিয়ম্ (Lincurium) ধুনার প্রক্রিয়া-ভেদোৎপন্ন রজনের মত নির্যাস-বৎ পদার্থ। সাগরোপকূলে সচরাচর ইহা দেখা গিয়া থাকে।

ইয়ুরোপ মহাদেশের বল্টিক সাগরে এবং আমেরিকাস্থ সেবল্ অন্তরীপ-সমীপে প্রচুর পরিমাণে লিঙ্কিউরিয়ম্ পাওয়া যায়। ইহার গন্ধ বা আস্বাদন নাই—বর্ণ পীতাভ।

৩। থিওফ্রাষ্টসের পর তিন শতাব্দী অতীত হইলে, সুবিখ্যাত দার্শনিক প্লিনি ¶ কহ্রুবার আকর্ষণী শক্তি স্বীকার করিতে গিয়া লিঙ্কিউরিয়মের শক্তি অস্বীকার করিয়াছিলেন। প্লিনির ন্যায় এক জন দর্শনবিৎ পণ্ডিত বিনা পরীক্ষায় কেমন করিয়া শেষোক্তের আকর্ষক শক্তি অপলাপ করিয়াছিলেন, বুঝা যায় না। তৎকালে তাঁহার বাক্যের গুরুত্ব বুঝিয়া অনেকেই পরীক্ষা কার্য্যে অগ্রসর না হওয়াতে, বিজ্ঞানের মহান্ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল।

৪। এ্যারিষ্টটল্, গেলেন্ ও ওপিয়ান্ টর্পিডো বৈদ্যুতিক মৎস্যের বিবরণ করাতে তাড়িতের ইতিবৃত্ত ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে। প্লিনি ও টর্পিডো মৎস্যে তাড়িতের সত্তা অনুভব করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

৫। রোমক-ইতিহাস-লেখকদিগের গ্রন্থে কখন কখন জাহাজী খালাসির মস্তকে, সৈন্যগণের বল্লমের অগ্র ভাগে এবং জাহাজের মাস্তুলের সূক্ষ্ম অংশে অগ্নিক্রিয়ার বিবরণ পাঠ করা যায়।

৬। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কনষ্টাণ্টি-

‡ কেহ কেহ এ্যাম্বারকে তৃণমণি শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন (আর্য্যদর্শন; ১২ সংখ্যা, ২য় ভাগ, ৫৫৭ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ৫ম পঙ্‌ক্তি দেখ)। এই শব্দ কিরূপে এ্যাম্বারের প্রতিশব্দ হইবে, আমরা অবগত নহি। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার তাঁহার তাড়িত-বিষয়ক বক্তৃতায় (Lectures on Electricity; Lecture I. Fundamental Phenomena of Electricity p 9, 2nd Line.) ইহাকে কহ্রুবা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কহ্রুবা শব্দের অর্থ তৃণ-আকর্ষক। কহ্রুবা শব্দটী সরকার মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল ডাক্তার বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের নিকট অবগত হন। আমরাও বিজ্ঞবর ডাক্তার মহেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ্যাম্বারের কহ্রুবা প্রতিবাক্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

¶ টাইবিরিয়স্ নরপতির কোন ভৃত্যের টর্পিডো মাছের আঘাতে বাতরোগ হইতে মুক্ত হইবার বিষয় প্লিনির গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তাড়িত দ্বারা রোগ উপশমনের এই প্রথম নির্দ্দেশ। অতি অসভ্যাবস্থাতেও তাড়িতের মহদ্গুণ বিদিত হওয়া অসম্ভব বোধ হইতে পারে।

নোপল্-নিবাসী, থেসালোনিয়ার আর্কি-বিশপ্ ইউষ্টেথিয়স্, হোমরের ইলিয়ড্ ও ওডেসি গ্রন্থের ব্যাখ্যা-পুস্তকে প্রখ্যাত থিওডোরিকের পিতা ওয়ালিমারের শরীর হইতে অগ্নি-কণা বহির্গত হইবার কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন-কালে কাহারও কাহারও দেহ হইতে অগ্নি-কণা বহির্গত হইত। কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত ইহা বিদিত ছিলেন।

হিন্দু-মুনি-ঋষিদিগের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইবার অনেক জনশ্রুতি আমরা শুনিতে পাই। বোধ হয়, ইহা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হইবে। উপায়-বিশেষের সাহায্যে শরীর হইতে অগ্নি বহির্গত হইতে পারে, অধুনা পরীক্ষায় তাহা দৃষ্ট হইয়াছে। ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক নিয়মেই এই তাড়িতোৎপাদন নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া নিশ্চয় বোধ হয় না।

কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের তাড়িত-প্রভাবজ্ঞতার অভিজ্ঞান, মন্দিরাদিতে লৌহ ও পিত্তলময় দণ্ড প্রোথিত করায়, প্রমাণিত হইতেছে। ফ্রাঙ্কলিনের ধাতু দ্বারা তাড়িত আকৃষ্ট হওয়ার ধর্ম্ম আবিষ্কারের বহু কাল পূর্ব্বে এই তথ্য ভারতীয়গণের চিত্তাকাশে সমুদিত হইয়াছিল। সুতরাং মুখ দিয়া আগুন বাহির করাকে কেহ কতক 'বুজ্‌রুকি' মনে করুন, কিন্তু নিতান্ত অমান্য করিতে পারিবেন না। বজ্রপাতের সময় পুরন্ধ্রীগণ কর্ত্তৃক ধাতব পদার্থ-মাত্রই গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিবার রীতিও ঐ কথা স্থিরীকৃত করিয়া দেয়। এই সামান্য ঘটনা হইতে আমরা এ কথা সপ্রমাণিত করিতে ইচ্ছা করিতেছি না যে, বৈদ্যুতিক তত্ত্ব অতি প্রাচীন-কাল হইতেই ভারতে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছিল। তবে তাঁহাদের তদ্বিষয়ে কতক জানা ছিল, এই মাত্র বলিতে পারা যায়।

যাহা হউক, এই সমস্ত বিবরণে তাড়িত-বিষয়ক তথ্য কোন ক্রমেই সুচারু-রূপে পরিস্ফুট হইতেছে না। গণিত, জ্যোতিষ এবং দৃষ্টি-বিজ্ঞানের ন্যায় বৈদ্যুতিক তত্ত্বও পুরাকালে প্রচররূপ ছিল না, উত্তম রূপ প্রতিপন্ন হইল। আলোক ও উত্তাপের ন্যায় যাহার ক্রিয়া সচরাচর ব্যবহার্য্য, সেই তাড়িত-বিজ্ঞানও প্রাচীনগণের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় নাই—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বিশ্বব্যাপী প্রাদুর্ভাব যদি কাহারও থাকে, তবে তাহা এই তাড়িতের। তাড়িতের প্রভাব, তাড়িত-কার্য্যেরই সহিত তুলনা হইতে পারে, অন্য কোন পদার্থে ইহার উপমা হওয়া অসম্ভব।

৭। প্রায় ৪০০ বৎসর অতীত হইল। তাড়িতের আকর্ষণী শক্তি উদ্ভাবিত হইল। তাহার অপরাপর গুণ বা ধর্ম্মের অঙ্কুশ-সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছিল না, এমন সময় (১৬০০ শ শতাব্দীতে) কোল্‌চেষ্টর-নিবাসী রাজ্ঞী এলিজেবেথের চিকিৎসক ডাক্তার গিলবার্ট কহ্রুবা ব্যতীত অন্য জিনিষের আকর্ষক প্রভাব আছে কি না জানিবার নিমিত্ত পরীক্ষা আরম্ভ করিতে মনঃস্থ করিলেন।

তাড়িতোৎপাদনে যে কহ্রুবা সর্ব্বে-সর্ব্বা, এই ভ্রান্ত মত তৎকালে তাঁহা দ্বারা লোকের মন হইতে প্রতাড়িত হয়। তদানীং তিনি পরীক্ষা দ্বারা কহ্রুবার একচেটিয়া

বিদূরিত না করিলে, বিজ্ঞান জগতে কহ্রুবা কত কাল নির্ব্বিবাদে রাজ্য করিত, কে বলিতে পারে? গিল্‌বার্টের এই মহোপকারক কার্য্যে জগৎ কত উপকৃত হইয়াছে, কর্ম্মক্ষেত্রে কত অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া শেষ করা যায় না। এই জন্যই গিল্‌বার্ট "তাড়িত-বিজ্ঞানের জনক" নামে সর্ব্বত্র আদৃত—এই জন্যই আমরা ভক্তি-ভরে গিল্‌বার্টের পূজা করি—বিনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি কহ্রুবা ব্যতিরিক্ত যে যে বস্তু পরীক্ষা করিয়া তাহাদের তাড়িতোৎপাদক ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন—হীরক, স্ফাটিক, মাণিক্য কাচ, রজন, গন্ধক, লাক্ষা (চাঁচগালা) ইত্যাদি দ্রব্যই তন্মধ্যে প্রধান। গ্রীক্‌গণ কহ্রুবাকেই যে 'তাড়িত' আখ্যা দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রযত্নে সেই তাড়িত নাম গ্রীক্ ভাষা হইতে এই সময়ে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইল। পাঠক! এ পর্য্যন্ত যাহা পাঠ করিলেন, তাহাতে আপনি জানিয়াছেন—কহ্রুবা প্রভৃতি দ্রব্য ঘর্ষিত হইলে, লঘু বস্তু আকর্ষণ করে। কিন্তু ডাক্তার গিল্‌বার্ট সপ্রমাণ করেন—ভারি দ্রব্য আকর্ষণেও তাহাদের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। বৃষ্টি, শীতল বাতাস ও প্রবল শীত, তাড়িত-ক্রিয়ার বিশেষ প্রতিরোধক। এতদ্ভিন্ন তাড়িত সম্বন্ধে গিল্‌বার্ট অনেক আলোচনা ও নূতন গবেষণা করেন বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই ভ্রান্তি-সঙ্কুল। কিন্তু মানব কখনই প্রমাদ-পরিশূন্য নহেন, সুতরাং গিল্‌বার্ট ও তাদৃশ ছিলেন। মানবীয় ত্রুটি যদি মার্জ্জনীয় হওয়া উচিত বিবেচিত হয়, তবে তাঁহার সেই সকল ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করা কর্ত্তব্য নহে। সেই ত্রুটি গুলি আমরা আগামী বারে উল্লেখ করিব।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

রামায়ণ।

কবিরা জগতের গুরু। পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় সভ্যতা-জ্যোতিঃ বিকসিত হইবার পূর্ব্বে তাহারাই আমাদের একমাত্র গুরু ছিলেন। তাঁহার পর ধর্ম্মগুরু, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, আচার্য্য, উপাধ্যায়, মৌলবী, মোল্লা, প্রফেসর, টিচর, গুরুমহাশয় প্রভৃতি সত্ত্বেও তাঁহারাই আমাদের নীতিশিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন। অন্য গুরুরা যে উপদেশ দেন, তাহা হয় হুকুম না হয় উপদেশ। হয় বলেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" না হয় Thou shalt not kill. অথবা "স্বর্গকামোযজেত" "দান করিলে স্বর্গ হবে" কিম্বা যে লোক হুকুমে পৃথিবী চালাইতে চায় সে হয় বড় অহঙ্কারী, না হয় সে মানব চরিত্রের কিছুই জানে না, যে উপদেশ দিয়া মানব চরিত্র সংশোধন করিতে চায় সে হয় ছেলেমানুষ, না হয় মানুষের সঙ্গে মিশে না। কবিরা মানুষের সঙ্গে মিশিতেন, মানুষের মন বুঝিতেন, কি রূপে কোন কথা বলিলে ঠিক কাজ হইবে

তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতেন, তাঁহারা যে প্রকারে শিক্ষা দেন, তাহা অতি মনোহর। একজন প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক তাহাকে "কান্তা সম্মিত তয়া উপদেশযুজে" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। অর্থাৎ কান্তা যেমন আপনার প্রতি স্বামীর মন আকর্ষণ করতঃ সরসতাপাদন দ্বারা যে উপদেশ দেন সে উপদেশ অব্যর্থ, তাহার অঙ্ক চিরদিন হৃদয়ে নিহিত থাকে কবিরও শিক্ষা সেইরূপ। তোমরা আপন কাজ কর আপনার সুখ, দুঃখ,সংসার,ভাবনা,জ্বালা, যন্ত্রণা, ঝঞ্ঝাটপত্র লইয়া দিবানিশি থাক, কবি সে সময় তোমাদের কিছুই বলিলেন না। তোমরা যখন নিশ্চয় করিয়াছ যে আমোদ করিতে হইবে, কিছুক্ষণ সব ভাবনা চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে, সেই সময়ে তিনি মৃদু মৃদু গান আরম্ভ করিলেন। কর্ণরন্ধ্র সুধাসিক্ত করিয়া সে তোমার হৃদয়ে গেল, যখন গেল তখন হৃদয়ে কিছুই নাই, তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক জ্বালা যন্ত্রণা ভাবনা দূর করিয়াছ, সুতরাং অবাধে সে সুর তোমার হৃদয় অধিকার করিল, তাহার উপর তোমার আর কোন আধিপত্য রহিল না, সে উহাকে সুধাসিক্ত করিল নরম করিল, সম্পূর্ণরূপে আপন আয়ত্ত করিল, তাহার পর কতকগুলি গভীর অঙ্কপাত করিয়া দিয়া আসিল, তুমি জানিলে না, কিন্তু সে গুলি যাইবার নয়। সেগুলি তোমার চিতায়েও নষ্ট হইবে না, পুরুষানুক্রমে তোমার পরিবারে বাধিয়া থাকিবে। এই গভীর অঙ্কপাতগুলি কবির শিক্ষা, এইরূপে জাঁকজমক, বেত্রাঘাত, কেতাব পত্র, দোয়াত কলম, লেক্‌চার-রুম, বিদ্যালয়, পরীক্ষা ব্যতিরেকে শিক্ষা দিতে পারেন বলিয়াই কবির শিক্ষা এত হৃদয়গ্রাহী, এত লোকায়ত ও এত দীর্ঘস্থায়ী। তাই কবিদের নিকট হইতে আজি কেহ শিক্ষা বিভাগ কাড়িয়া লইতে পারেন নাই। টোল উঠিয়া গেল, পাঠশালা ঘুচিয়া প্রাইমেরি ইস্কুল ইনিষ্টিউসন হইল। কিন্তু কবির হাতের বীণা হাতেই রহিল, তালপাতা, মুছিয়া শ্রীরামপুরে কাগজ হইল, কিন্তু বেহালা গেল না।

প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল কবি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট শিক্ষাংশেও তাহারাই শ্রেষ্ঠ। কাব্যাংশ ত্যাগ করিয়া যাঁহারা শিক্ষাংশ লইয়া ব্যস্ত, তাঁহাদের শিক্ষা চিরকাল টিকে না, পোপ সাহেব এখন লোপের মধ্যে পড়িয়াছেন, কুপারও সেই পথে যাইবেন, সংস্কৃত শতককারদিগের নাম কয়জন জানে? আর যাহারা জানে তাহাদের মধ্যে কয় জন উহা পড়ে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত পদ্য লিখিত এত বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু ধর্ম্ম কাব্য কোথায় আদৃত। বৈষ্ণবদিগের যে অগাধ কাব্য আছে, তাহার মধ্যে কয় খানার নাম লোকে জানে? মধ্য সময়ে ইউরোপে যে এত কাব্য লিখিত হয়, তাহা সব কোথায়? যে ধ্বংসপুরে অনিত্য বস্তুমাত্রই গমন করিয়া থাকে, তাহারাও সেই ধ্বংসপুরে গিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি ত্যাগ করতঃ শুদ্ধ লোকের আনন্দের জন্য লোকের মন মাতাইবার জন্য কাব্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া

অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহারা অমর। এই অনিত্য সংসারে যদি কিছু নিত্য থাকে, তবে তাহাদের কাব্য সমূহ যে মানুষ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা শত শত বৎসর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়োচ্ছ্বাস আজিও জীবিত আছে, কাল সহকারে কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তন নাই—ধ্বংস নাই। সুদূর ভবিষ্যতেও উহারা যেমন নূতন তেমনিই থাকিবে, যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনিই থাকিবে। প্রথম উচ্ছ্বাস দিনে যেমন মনুষ্যহৃদয় মাতাইয়াছিল, তেমনিই মাতাইবে, যেমন শ্রোতৃবর্গ হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, সুদূর ভবিষ্যতেও তেমনিই গভীর রেখাপাত করিবে।

এইরূপ স্বর্গীয় হৃদয়োচ্ছ্বাসে যে সকল মহাকবি জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। যাহাদের আনন্দ সংশ্লিষ্ট উপদেশ-কণা সমূহ বর্ষা সলিলের ন্যায় মানব-হৃদয়ক্ষেত্র আর্দ্র সিক্ত ও নানা শস্য প্রসবক্ষম করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বাল্মীকির স্থান সর্ব্বোপরি। বাল্মীকির আসন সর্ব্ব প্রথম। দেখ ভারত সমাজের মূল বেদশাস্ত্র লোকে সহস্র সহস্র বৎসর বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। মন্বাদিসংহিতা কতিপয় পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের হস্তে নিহিত হইয়াছে। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপ লোপ হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাল্মীকির উচ্ছ্বাস আজিও বহিতেছে; ভাষা ত্যাগ করিয়া ভাষান্তরিত হইয়া বহিতেছে। উহাকে বন্ধ করিবার জন্য পুরাণাদি যত কিছু পুস্তকাদি লিখিত হইয়াছে সমস্ত প্লাবিত করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে আজিও প্রবাহিত হইতেছে। যাহা ধ্বংস পুরে যাইবার তাহা গিয়াছে; যাহা মায়া কাপট্য গ্রথিত তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে যাহা শুদ্ধ নির্ব্বিকার আনন্দ মাত্র যাহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের, কোন জাতি বিশেষের, রাজ্যবিশেষের স্বত্ব রক্ষার জন্য লিখিত হয় নাই তাহা আজিও চলিতেছে। যাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই উপকার যাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই বিশুদ্ধ আনন্দ তাহা ধ্বংস হইবার নহে। সুতরাং রামায়ণের ধ্বংস নাই যাঁহারা "জগতের সেক্সপীরায় ভারতের তুমি" বলিয়াছেন তাঁহাদের বোধ হয় কবিগুরু বাল্মীকির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না।

রামায়ণে যাহা করিয়াছে তাহা পৃথিবীর আর কোন কাব্যেই করে নাই। রামায়ণ হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়াছে সহস্র বৎসর বিংশতি কোটী লোকের মন গঠিত করিয়া দিয়াছে। উহাতে মানুষের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest ideal দেখাইয়া দিয়াছে। রাম বলিলে হিন্দুর মনে যে উচ্ছ্বাস জন্মে রামের চরিত্র পাঠ বা শ্রবণ করিয়া হিন্দুর মন যেরূপ গলিয়া যায় রামের মত হইবার জন্য লোকের যে আপনা আপনি ইচ্ছা হয় তাহা বোধ হয় কোন জাতীয় মহাকাব্য পাঠে হয় না। কবি যদি শুদ্ধ রামের চরিত্র বর্ণন করিয়া ছাড়িয়া দিতেন তাহা হইলে কখন উহা হইতে এত আনন্দ এত শিক্ষা লাভ হইত না। রামের সঙ্গে সঙ্গে কবি একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্র গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। তেমন রমণী চরিত্রও আর কখন চিত্রিত হয় নাই হইবেও না। শুদ্ধ তাহাও

নহে যে অবিভক্ত পারিবারিক সম্বন্ধ হিন্দু-দিগের চির গৌরব। বাল্মীকি রাম-চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ একটী উৎকৃষ্ট পরিবার-চিত্র গাথিয়া দিয়াছেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের ন্যায় ভ্রাতৃচিত্র এবং এই চারি ভ্রাতার একত্র বাস জনিত এক পরিবারের এমন চিত্র আর নাই। এইরূপে একটী চরমোৎকর্ষবান পরিবারের চরমোৎকর্ষবাণ ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে চরমোৎকর্ষবাণ একটী পুরুষ এবং চরমোৎকর্ষবতী একটী রমণী চরমোৎকর্ষবাণ দম্পতী স্থাপন করিয়া মহাকবি যেন আকাশ পটে সমুজ্জল বর্ণে একটী প্রকাণ্ড "অইল পেণ্টিং" রাখিয়া গভীর স্বরে জগন্মধ্যবর্ত্তী মানবনিচয়কে বলিয়া গিয়াছেন দেখরে এই চিত্রখানি দেখ্ আর পারিস্ ত উহার সমান হবার চেষ্টা কর।

পূর্ব্ববর্ত্তী পারাগ্রাফে রামায়ণের অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দিলাম, প্রকাণ্ড রামায়ণের সূক্ষ্ম সমালোচনার স্থান আমাদের নাই শক্তিও বোধ হয় আমাদের নাই। এরূপ প্রকর্ষ পর্য্যন্ত আর কোন কবিই এ অবধি দিতে পারেন নাই, আর এই নানা বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র সমূহের এমন সুন্দর স্বভাবানুগত সমন্বয়ও আর কোথাও দেখা যায় না। মহাভারতকার এইরূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছি[illegible] তিনি হিন্দুপরিবারের সম্যক্ চিত্র দিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি এক রামেরে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কি রামের চরিত্র উঠিয়াছে? কখনই না। রাম'ত মনুষ্য যেমন হতে হয় তেমনি মানুষ। রামকে হিন্দুতে হিন্দু বলিতে পারে, মুসলমানেরা মুসলমান বলিতে পারে, খৃষ্টানে খৃষ্টান বলিতে পারে; কিন্তু যুধিষ্ঠির গোঁড়া হিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে কথা রামের পক্ষে খাটে সে কথা সীতার পক্ষেও খাটে; কিন্তু সে কথা দ্রৌপদীর পক্ষে খাটে না। বাস্তবিকও দ্রৌপদী পুরাণ ও পাণ্ডবদের মনের মত স্ত্রী। আমাদের পছন্দ হয় না। মহাভারতের সঙ্গেই রামায়ণের কতক তুলনা হয়, অন্য কাহারও সঙ্গে তুলনাই হয় না।

আমরা ইংরাজী বিদ্যা শিখিয়া রামায়ণ পড়ি না; যে বা কেহ পড়ে তাহাও উহার শিক্ষার জন্য নহে, উহার কাব্য রসের জন্য নহে, কেবল প্রাচীন সমাজ জানিবার জন্য,—বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত লিখিবার জন্য।

কিন্তু ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশীয়গণ এখন রামায়ণ পাঠে ঃত দর হইতেছেন। যে কেহ রামায়ণ পড়েন, সে কেবল উহার ঐতিহাসিক উপদেশের জন্য। উহাতে ঐতিহাসিক কোন উপদেশ আছে কি না, আমাদের একান্ত সন্দেহ। উহার সর্ব্বোচ্চ কাব্যাংশ ও সর্ব্বকালীন সর্ব্বজনীন শিক্ষার জন্য কেহই রামায়ণ পাঠ করেন না; কিন্তু আমাদের মতে এমন কবি এমন কাব্য ও এমন শিক্ষা বুঝি জগতে আর কোথাও নাই।

সহানুভূতি।

মানব-হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব বস্তু নিহিত আছে,—যাহা সমাজের প্রত্যেক জীবের সুখ ও দুঃখ সময়ে হৃদয়-কপাট খুলিয়া দিয়া তাহার সুখ ও দুঃখের অংশ গ্রহণ করে। প্রাণ যখন যন্ত্রণায়, জ্বালায়, কাতরতায়, প্রিয়জন-বিরহে অস্থির হইয়া ছটফট্ করিতে থাকে, তখন তাহার সেই কষ্ট ও দুঃখের সমভাগী হইবার লোক জগতে বিরল নহে। অপরকে অশ্রুপাত করিতে দেখিলে, অপরের অসীম যন্ত্রণা দেখিলে, সামাজিক জীবের হৃদয় স্বতঃই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অমনি তাহার সেই অসীম দুঃখ ও অশ্রুপাতের কারণ জানিবার জন্য হৃদয় ব্যগ্র হয়, দূরশ্রুতবিলাপধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, মানব-হৃদয় সহসা চমকিয়া উঠে, অমনি তাহার সেই স্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সংযত-হৃদয়ে, নিবিষ্ট-মনে, তাহার হেতু জানিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। তখন মানব চিরশত্রুতা ভুলিয়া, তাহার শত্রুর অশ্রু বিমোচনে কুণ্ঠিত হয় না। যাহাকে তুমি শত্রু জ্ঞান করিয়া হৃদয়-রাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছ, এবং সেই শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য শত সহস্র বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, যদি এক বার দেখিতে পাও, অমনি তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল। এমন বৈরিতা স্থলে যদি সেই ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা ক্লিষ্ট অথবা গভীর মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া ধরাতল অশ্রুতে অভিষিক্ত করিতে থাকে, তখন তোমার হৃদয়ে কি অভূতপূর্ব্ব, অচিন্তনীয় ভাবের আবির্ভাব হইবে, তাহা তুমি স্বয়ং বুঝিতে পারিবে না; সেই ভাব তোমার হৃদয়-পট হইতে পূর্ব্বস্মৃতি ভাসাইয়া দিয়া চির-শত্রুর অশ্রু বিমোচনে নিযুক্ত করিবে। তুমি তখন বুঝিতে পারিবে না, জানিতে পারিবে না, কেন তোমার সহসা এ ভাবের আবির্ভাব হইল। অজ্ঞাতসারে তোমার হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, তোমার মানব নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবার যত্ন পাইবে। তোমার সমুদায় হৃদয় বিগলিত করিয়া অজস্র ধারায় তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণা রাশি হরণ করিবার চেষ্টা করিবে। পাঠক বলিতে পারেন সে অপূর্ব্ব বস্তু কি? যাহা আছে বলিয়া সমাজ চলিতেছে, সংসার চলিতেছে, তোমার হৃদয়ে যদি সেই বস্তু না থাকে ত তুমি জড় পিণ্ড, তোমার হৃদয় পাষাণ, অথবা বজ্র। যদি জগতে কোন হৃদয়-বিমোহনকারী, জীবদুঃখ-দলনকারী, পদার্থ থাকে ত তাহা সহানুভূতি। যাহার প্রভাবে জগৎ শান্তিপূর্ণ ও অনুপম-আনন্দ-ধাম, যাহার প্রসাদে জীব মর্ত্ত্যে থাকিয়া স্বর্গসুখানুভব করে; যাহা সমাজের ভিত্তি ভূমি, ক্ষণভঙ্গুর দেহধারী মানবের বিপুল সম্পত্তি; সৃষ্টির প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে যাহা অল্প অথবা

অধিক পরিমাণে বিরাজিত। মনুষ্য কি—যাহা নির্ব্বাক্ পশুদিগেরও সম্পত্তি। এই সহানুভূতি জীব-হৃদয়ে ছিল বলিয়া, পৌলস্তেয়-পুরস্ত্রী সরমা সীতাকে নিরালঙ্কারা ও বিমর্ষভাবাপন্না দেখিয়া, তাহার অশ্রুতে নিজ অশ্রু মিশাইয়াছিল, এবং তাহাকে শত্রু-ভামিনী জানিয়াও নিজ অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া, তাহার সেই অসীম সৌন্দর্য্যশালী বরবপুঃ শোভিত করিতে চাহিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব কাহিনী জানিবার জন্য রুদ্ধশ্বাস, উৎগ্রীব ও নির্নিমেষ নয়না হইয়া তাহার হৃদয়-উৎস হইতে এই সহানুভূতি সূচক বাক্য সমূহ উৎসারিত করিয়াছিল।

"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে, ইচ্ছা করে তাজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বনবাসে।"

যখন সরমা তাহার হৃদয়-মন্দিরের অমৃতোদ্গারী বাক্য সমূহ শুনিলেন, তখন সরমার মনে কি সহানুভূতি প্রবৃত্তি প্রবল। তাহা কবি বুঝিয়াছিলেন, আর সহৃদয় পাঠক বুঝিলেন। জগতে দুঃখে সহানুভূতি ছিল বলিয়া, বিভীষণ রামের সাহায্যার্থ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সমস্ত ত্যাগ করিয়া, রাজ্য-ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, রক্ষকুলে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া, প্রিয়তমা সরমা প্রণয়-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, নিঃসহায় রামচন্দ্রের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও অসংখ্য শত্রু-সেনা সম্বেষ্টিত হইয়া, অকুতোভয়ে যুদ্ধমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপ জগতের প্রত্যেক জাতীর ইতিহাস ও কাব্য-পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর, দেখিবে মানবহৃদয়ে সহানুভূতি কত প্রবল। দেখিবে সহানুভূতির কি অপূর্ব্ব মহিমা! কি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি! দেখিবে উহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মানব কত দূর বিপদ-মুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কতদূর স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিল। যার সহানুভূতি প্রবৃত্তি প্রবল, সে আপন প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া পরের অশ্রু বিমোচনে কখন কুণ্ঠিত হয় না। জগতে যেমন দুঃখের সহানুভূতি আছে, সুখেও তদ্রূপ। তবে দুঃখে সহানুভূতি যত প্রবল হয়, সুখে ততদূর হয় না। লোকের বিষাদে যতদূর সহানুভূতি উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত হয়, সুখে তত দুর হয় না; কারণ সুখী ব্যক্তিতে সহানুভূতির বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয় না। কিন্তু দুঃখী অথবা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উহার বিশেষ আবশ্যক, বরং তাহার জন্য সে বাধ্য থাকিতে পারে। তাহার জন্য এক সময় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে।

অনেকে বলিতে পারেন এমন দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায় যথায় সহানুভূতির আবির্ভাব হয় না, সে দৃষ্টান্ত অতি বিরল, তাও কেবল শত্রুর সামান্য ক্লেশ দেখিলে। তাহার বিশেষ অন্তরায়—হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া প্রভৃতি। কিন্তু শত্রুর যদি এমন কোন দুর্দ্দৈব ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে সে প্রাণ হারাইবে, যাহাতে সে অসীম ক্লেশানুভব করিবে, যাহাতে সে গভীরও অরুন্তুদ মনোবেদনা প্রাপ্ত হইবে। তখন বোধ হয় সেই স্থলে সহানুভূতি আবির্ভাবের বিলম্ব থাকিবে না।

যদি বল পরিচিত স্থলে কেবল সহানুভূতির বিকাশ পায়, তাঁহার দুঃখ দেখিলে, তাহার অশ্রুবিসর্জ্জন দেখিলে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সৌহার্দ্দ অথবা আত্মীয়তার সূত্র নিবন্ধন এরূপ হয়। কিন্তু যখন এক জন পথিক ভীষণ অন্ধকার রাত্রে গভীর অরণ্যে দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছে, সেই দস্যু তাহার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্য শানিত অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন যদি তুমি তাহার অনতিদূরে বর্ত্তমান থাক, তাহা হইলে তোমার হৃদয় কি ভাবে আন্দোলিত হয়, সাধ্য থাকিলে তুমি তাহার জন্য স্বীয় প্রাণ পণে কৃতসংকল্প হও না? যখন দেখ যে এক ভীষণ বিষধর সর্প অজ্ঞাতসারে, অতর্কিতে কোন শত্রুকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে, যখন দেখ যে অতলস্পর্শ বারিধির মধ্যে আরোহী সমেত পোত নিমজ্জিত হইতেছে ও তাহার হৃদয়-বিদারণ চীৎকার তোমার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে, তখন তোমার কি ইচ্ছা হয়? তুমি কি প্রাণ পণে তাহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর না? তাহার জন্য কি তুমি পরিধাবিত হও না?

তোমার সঙ্গে তার পরিচয় নাই, কোন আত্মীয়তা সূত্রে তুমি আবদ্ধ নহ, তথাপি তোমার হৃদয়-সরোবর সহসা উদ্বেলিত হইল। কেবল ভালবাসা ও আত্মীয়তাই সহানুভূতির প্ররোচক নহে।

যখন বলেন্দ্র সিংহ ভীম সিংহ-দুহিতা অতুল রূপ-লাবণ্যবতী, কুসুমময়ী কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার জন্য নিষ্কোসিত অসি উত্তোলন করিয়াছেন, তখন পাঠক দেখিলে তোমার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। যখন দেখ যে অসি হস্তে ঘাতক সিরাজদ্দৌল্লার—যাহার প্রতাপে এক দিন সমস্ত বঙ্গ কম্পিত হইত, অগ্রে যাহার ভ্রুকুটিতে সমস্ত বঙ্গ-শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইত,—সেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপী বঙ্গেশ্বরের যখন নৃশংস কীটানুকীট মিরণ মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত, আর নবাবের সেই সময়কার আর্ত্তনাদ জীবনাশ ভয়-সম্ভূত সকরুন ক্রন্দনধ্বনী যার কর্ণে প্রবেশ করে সে কি নিস্তব্ধ থাকিতে পারে। কে তখন তাহাকে শত্রু জ্ঞান করে। কে তাহার সেই নৃশংস অত্যাচারের জন্য তাহাকে দোষী করিতে চায়, কেই বা তাহার সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অশ্রুসম্বরণে সক্ষম হয়। তাই বলি সহানুভূতি পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। সে কাহারও অনুরোধ বা উপরোধের অপেক্ষা করে না।

যখন জীব-হৃদয় কোন মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হয় অথবা ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে থাকে, তাহা দেখিয়া সামাজিক জীব কদাচ স্থির থাকিতে পারে না। যদি ভালবাসাই সহানুভূতির প্ররোচক হইত, তাহা হইলে ভালবাসার পাত্র ভিন্ন অন্যে আর সে সহানুভূতি আশা করিত না। তাহা হইলে জগৎ নিষ্ঠুর নামে অভিহিত হইত, সমাজ-সম্বন্ধ হইত না। কে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না। সংসারে কেহ কাহার জন্য অশ্রুপাত করিত না। সংসার মরুভূমির

ন্যায় হইয়া সর্ব্বদা মানব-হৃদয়ে বিভীষিকা প্রদর্শন করিত।

কেহ কাহার অশ্রু দেখিলে "আহা" করিত না। তাই বলি মানব-হৃদয় যতগুলি বৃত্তি আছে; তন্মধ্যে সহানুভূতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সহানুভূতিই মানব-সমাজের গৌরবের নিদান। ইহা ছিল বলিয়া, সংসার আনন্দপূর্ণ। কবি-হৃদয় এত আদরের বস্তু কেন? কেবল সহানুভূতির জন্য। সাধারণ মানব-হৃদয় অপেক্ষা কবি-হৃদয় সহানুভূতি বৃত্তি অধিক প্রবল, তাই কাব্য পাঠকগণকে শীঘ্র বিমোহিত করিতে সক্ষম হয়। কবি সমস্ত চিত্র গুলি এরূপ ভাবে অঙ্কিত করেন, যে পাঠ কালীন পাঠক-হৃদয়ে সহসা সহানুভূতি বৃত্তি উদ্রেক হইবেক। ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে, প্রকৃত কাব্যই সহানুভূতির আলেখ্য এবং প্রত্যেক মানব-হৃদয়েরই কাব্য। এমন হৃদয় নাই যাহাতে সহানুভূতি নাই। বাঙ্গালী কবি—এজন্য বাঙ্গালী-হৃদয় সহানুভূতির ভাণ্ডার। বাঙ্গালী-হৃদয়ে সহানুভূতি অধিক বলিয়াই বাঙ্গালী কবি। এমন হৃদয় নাই যাহাতে কিছু না কিছু সহানুভূতি নাই। যদি বাঙ্গালির সহানুভূতি না থাকিবে, তবে ক্লাইবকে কে সাহায্য করিবে? কে তখন সহায় হইয়া বঙ্গ সিংহাসন ইংরাজ হস্তে প্রদান করিবে। ইতিহাস উদ্ঘাটন কর দেখিবে, বাঙ্গালীর সহানুভূতির বিমল জ্যোতি বিভাসিত আছে। আজ উনবিংশ শতাব্দিতে কেন সেই সহানুভূতি বাঙ্গালী-হৃদয় ত্যাগ করিয়াছে, কেন আর পূর্ব্বকার ন্যায় পরের দুঃখে অশ্রুপাত করে না; বাঙ্গালীর সমাজের প্রতি একবার কটাক্ষ করে না, যে বাঙ্গালী এক সময় পরের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছে, এখন সেই বাঙ্গালী স্বদেশ-ভ্রাতার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত। আইস ভাই বাঙ্গালি আমরা সহানুভূতির উজ্জ্বল জ্যোতিতে সমস্ত বঙ্গ পরিব্যাপ্ত করি! আইস ভাইয়ের জন্য রোদন করি! অভাগিনী বিধবাদিগের জন্য অশ্রুপাত করি! তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত! ভাই বঙ্গে এখন সহানুভূতি প্রকাশের সময়। আইস, এসময় আর নিস্তব্ধ থাকিও না। সমাজ ছারখার হইতেছে। এইবার উপযুক্ত অবসরে সহানুভূতি দেখাও। মানব নামের গৌরব রক্ষা কর!!

প্রণয়-পরিণাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর চরণ।

পূর্ব্ব ঘটনার পর অনেক দিন হইল, সরমা আর তাহার জীবন সর্ব্বস্ব স্বামীর চরণ দর্শন পায় নাই। অনেক দিন ধরিয়া সরমা আর একবার স্বামীর চরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এখন সরমা অন্য কিছুর প্রত্যাশী নয়, কেবল স্বামীর চরণ দেখিতে দেখিতে মরিতে চায়, অভাগিনীর অদৃষ্টে বুঝি তাহাও ঘটে না। অনেকবার মরিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু মরিবার সময় স্বামীর চরণ না দেখিয়া মরিতে পারিল না। আজ সরমা মেকিণ্টসের স্ত্রী দ্বারা স্বামী পাইবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে, সেই জন্য অনেক বিনয় করিয়া বিবির সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিল; বিবি ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছেন, সরমা তাঁহার প্রতিক্ষায় রহিল, প্রতি মুহূর্ত্ত আশা ও নিরাশা আসিয়া এক বার উপরে তুলিতে লাগিল, আবার তৎক্ষণাৎ শত হস্ত নিম্নে ফেলিয়া আছাড়াইতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ সরমা এইরূপ অবস্থায় তাহার ঘরে বসিয়া আছে এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে মেম্ সাহেব আসিয়াছেন। সরমা পূর্ব্বে কখন তাহাকে দেখে নাই, এবং কিরূপ অভ্যার্থনা করিতে হইবে, কিছুই জানে না। শীঘ্র দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি মেরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নাড়িল, সরমা তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে মেরীকে লইয়া একখানি কোচে বসাইল। মেরী বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় বলিল—"আজ আপনার সাক্ষাৎলাভ করিয়া প্রীত হইলাম, ডাকিবার কারণ জানিতে পারিলে বড় সুখী হইব।"

সরমা কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল নীরবে কাঁদিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া মেরী কিছু বিস্মিত হইল।

মেরী অন্য অনেক দোষে দূষিতা হইলেও কঠিন হৃদয়া নয়। এক জনকে কাঁদিতে দেখিয়া মেরীর চক্ষেও জল আসে, কিন্তু কাঁদিবার কারণ কি, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। মেরী ধীরে ধীরে সরমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু সে সান্ত্বনার ফল বিপরীত হইল, সরমা একবারে কাঁদিতে কাঁদিতে অধীরা হইয়া পড়িল। মেরীর হৃদয় সহানুভূতিতে গলিয়া গেল, মেরী সরমার জন্যে ব্যস্ত হইল।

মেরী বার বার বলিতে লাগিল—"কি জন্য কাঁদিতেছে আমায় বল, আমা দ্বারা

২য় খণ্ড। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। ১২৮৮। ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

হিন্দুদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীবিধুভূষণ মিত্র কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

৬৬ নং পটুয়াটোলা লেন হিন্দুদর্শন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৪৬ নং পটুয়াটোলা লেন—বিষ্ণু যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৮৮ সাল।

হিন্দু দর্শন সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ষণ্মাসিক ১৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাক-মাশুল লাগে না।

২। গ্রাহকগণের মূল্য-প্রাপ্তি স্বীকার পত্রিকাতেই করা যাইবে।

৩। ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা হিসাবে দিতে হইবে। দীর্ঘকালের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

৪। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত মফঃস্বলে কাহারও নিকট "হিন্দুদর্শন" প্রেরিত হয় না।

৫। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন। লিখিত প্রবন্ধ গুলি হৃদয়গ্রাহী ও সারবান হওয়া উচিত।

৬। হিন্দুদর্শনের মূল্য পাঠাইতে হইলে সম্পাদকের নামে মণিঅর্ডার অথবা অৰ্দ্ধ আনা ষ্টাম্প রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইতে হইবে।

৭। বেয়ারিং ও ইনসফিসেণ্ট পত্র গৃহীত হইবে না।

৮। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধীয় যাবতীয় পত্রাদি ও সমালোচন্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৯। যিনি দশ জন গ্রাহক করিয়া দিতে পারিবেন, ডাক মাশুল পাঠাইলে তাঁহাকে বিনা মূল্যে আমরা "হিন্দু দর্শন" দিব।

১০। প্রেরিত প্রবন্ধাদি আমাদের মনোনীত না হইলে আমরা লেখককে প্রবন্ধ প্রত্যর্পণ করিব না। তবে বিশেষ অনুরোধ করিয়া টিকিট পাঠাইলে আমরা প্রত্যর্পণ করিব।

হিন্দুদর্শনের ১ম বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষিত হওয়ায় উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। যে সমস্ত গ্রাহক মহোদয় উহা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহারা পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে প্রাপ্ত হইবেন। অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে ৵০ দুই আনা মূল্য দিতে হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

বাবু গোবিন্দকুমার চৌধুরী, সিমলা, কলিকাতা	... ২৲	টাকা
" গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কলুটোলা	... ২৲	"
" আশুতোষ তরফদার, শান্তিপুর	১৲	"
" শশীভূষণ কুণ্ডু, সুকচর,	... ৷৹	আনা
" প্রবোধচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা পটলডাঙ্গা	... ১৲	টাকা
" দুর্গাদাস রায়, ময়মনসিং	... ১৲	"
" কালীমোহন সেন গুপ্ত, উকিল দিনাজপুর	... ২৲	"
" হরদাস বিশ্বাস, চট্টগ্রাম	... ১৲	"
" শরৎচন্দ্র অধিকারী, ঐ	... ১৲	"
" কৃষ্ণচন্দ্র পাল, চোরবাগান	... ২৲	"
" হরি লাল গোস্বামী, কোচবিহার	২৲	"
" ভবতারণ মল্লিক, কলিকাতা	।০	আনা
" কৃষ্ণকুমার বড়ুয়া, আসাম	... ২৲	টাকা
" হীরালাল দে, মণিরামপুর	... ১৲	"
" হরীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাট, কলিকাতা	... ২৲	"
" অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল, আমতা	... ৷৵০	আনা
" গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, D. L.	১৲	টাকা
" দুর্গাচরণ কুমার, জেনারল পোষ্ট অফিস কলিকাতা	২৲	"
" জয়মাধব বন্দোপাধ্যায়, বারাকপুর	... ৷৹	আনা

সংস্কার ও সংস্কারক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আইস, পাঠকগণ, এই সময় একবার সমগ্র য়ুরোপখণ্ড পরিদর্শন করিয়া আসি। পোপগণের অত্যাচারে যখন সমগ্র নৃপমণ্ডলী নিপীড়িত, ত্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে—পোপ সর্ব্বে সর্ব্বা। তিনি আজ শ্যামের রাজ্য রামকে দিতেছেন, কত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজার রাজ্য ছারখার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন, চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নিজের স্বার্থ সংসিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, বাইবেলের অমূল্য সত্য সকল প্রচ্ছন্ন করিয়া চতুর্দ্দিকে অদ্ভুত মত ও বিকৃত নীতি বিস্তার করিতেছেন। নৃপতিগণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় বাক্‌শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় "ভয় নাই ভয় নাই" বলিতে বলিতে ক্ষণজন্মা মার্টিন লুথর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লুথরের তূর্য্যধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত হইল। যিনি নিবিষ্টচিত্তে [illegible]কালের ইতিহাস একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন তিনি অক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিতে পারেন লুথর তৎকালে জন্মগ্রহণ না করিলে পোপমণ্ডলীর দর্পচূর্ণ হইত কিনা সন্দেহ। ধর্ম্মরাজ্যে পরাধীনতা নাই, সকলেই ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পারেন, মহাত্মা লুথর এইটী সমগ্র য়ুরোপে প্রচার করিয়া যান।

এই সময় এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে যে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে সেই বিষয় একবার আলোচনা করিব। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বঙ্গদেশ হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, যোগ ও ভক্তি, প্রীতি ও পবিত্রতা, জ্ঞান ও প্রেম, দয়া ও স্নেহ প্রভৃতি মনের সুকুমার বৃত্তিনিকর বঙ্গত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে ; সর্ব্বত্র তন্ত্রের প্রাবল্য (প্রথম দৃষ্টিতে তান্ত্রিকগণকে ইংলণ্ডীয় দ্রুইদ্ বলিয়া ভ্রমজন্মিত), সুরার স্রোত প্রবাহিত, নিরীহ জীব জন্তুগণের তপ্ত শোণিতে গৃহ প্রাঙ্গণ অনুরঞ্জিত হইতেছে এই সময় অদীনাত্মা চৈতন্য বঙ্গদেশ আলোকিত করিয়া সমস্ত কুরীতি ও কুনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ১৪০৭ শকে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশের—এমন কি সমগ্র ভারতের যে তখন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল আমরা প্রসিদ্ধ "ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা" নামক গ্রন্থ হতে তাহার কিয়দংশ এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "বামাচারী ভক্তিবিরোধী হিন্দুগণ এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। তাঁহাদিগের কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গলে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে সুরাপূর্ণ নরকপাল, গাত্রে কালীনামাঙ্কিত নামাবলী ; যখন মদ্য

মাংসাদি পঞ্চ মকারের সেবার্থ ভৈরবী চক্রে তাঁহারা উপবেশন করিতেন তখনকার ভীমমূর্ত্তি দেখিলে হৃতকম্প উপস্থিত হইত। সুরাপান করিয়া ইঁহারা রাক্ষসের ন্যায় পথে পথে বিচরণ করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন আমরা সুরাকে গঙ্গাজল এবং মাংসকে জবাফুল বলিতে পারি। শক্তির উপাসনার সমধিক প্রাবল্য হেতু সে সময় অনেক লোক মাংসাশী হইয়াছিল। যাহারা নিতান্ত ষণ্ডামার্ক রকমের ছিল তাহারা নেশার ঝোঁকে কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ কুকুর দুই একটা ধরিয়া টানা টানি করিত। বামাচারীরা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিয়াও তাহা পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিত না। মত্ততার অবস্থায় তাহাদের জ্ঞান গোচর থাকিত না। এক দিকে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব, জাত্যভিমান, মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ, কঠোর ধর্ম্ম মত, তার্কিকতা, অসার ধর্ম্মাভিমান, অপরদিকে ধর্ম্মযাজকদিগের কপট ব্যবহার, স্বার্থপরতা, বামাচারীদিগের পঞ্চ মকার এবং সাধারণ লোকের সংসারিকতা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, প্রেম ও ভক্তিবিহীনতা ইহারই মধ্যে ভক্তি-ভাজন চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন। নিমাই পাপীদিগের দুঃখে কাঁদিলেন, অত্যাচার নিপীড়িত দুঃখীগণের গগন-ভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহার মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি অভাগাগণের চক্ষের জল স্বহস্তে মুছাইবার জন্য গৃহ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। শচী দেবী কাঁদিলেন, অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিলেন, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ কাঁদিলেন। সকলেই নিমাইকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু চৈতন্য বলিলেন "মা! আমি আর ফিরিতে পারিব না, কেমন করিয়াই বা ফিরিব মা? আমার প্রাণ যে দুঃখীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আজ তুমি যেমন কাঁদিতেছ এইরূপ হরি বিরহে প্রতি ঘরেই বঙ্গবাসীগণ কাঁদিতেছে হায় মা, হরিকে কেহ চিনিল না, হরিনাম কেহ শুনিল না, এ প্রেম সুধা তারা পান করিতে পাইল না, ইহা কি প্রাণে সয়? আজ ভক্তি স্রোতে বঙ্গভূমি ভাসিবে। মা! তুমি আর চক্ষের জল ফেলিওনা হরি তোমাকে দেখিবেন। ওই হরি আমাকে ডাকিতেছেন আমি চলিলাম।" চৈতন্য চলিলেন, তন্ত্রের মস্তকে বজ্র পড়িল। বঙ্গ আবার হাসিল, ভারত আবার হাসিল, অসংখ্য জগাই, মাধাই, দস্যুতা ভুলিয়া হরিপ্রেমে মজিল। চৈতন্য স্বকার্য্য সংসাধন করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু এই চৈতন্য প্রচারিত পবিত্র ধর্ম্ম পবিত্র ভাবে পাপ বঙ্গে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিল না। চৈতন্য ও প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণের তিরোভাবের কিছু কাল পরে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়া গেল। ব্যভিচার ও যথেচ্ছাচার ইহার মধ্যে প্রবেশ-পথ পাইল, বৈষ্ণব সম্প্রদায় একটী হেয় ভিক্ষুক সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। এইরূপ কিছু দিন যায়, শক্তি-উপাসকগণ [illegible] মাথা তুলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার আবার ক্রমশ বাড়িতে লাগিল, স্ত্রীগণ অতি শঙ্কটে পড়িলেন, কঠোর কঠোর বিধি সকল তাঁহাদের জন্য প্রণীত ও পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল, কোন কোন বিধি ব্রাহ্মণগণ নিজে প্রণয়ন করিয়া পুরাণ ও সংহিতার দোহাই দিয়া, কোনটার বা অর্থ বিকৃত

রূপে ব্যাখ্যা করিয়া অবলা অঙ্গনাগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। কে না জানে স্ত্রীগণ পূর্ব্বে দেবী তুল্যা পূজিতা হইতেন?* কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বল পাইয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রতি যে কিরূপ অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়। পুরুষ হর্ত্তা ও কর্ত্তা, স্ত্রী দাসী, কথা কহিবার যো নাই। স্বামী ভাল হউক মন্দ হউক স্ত্রীর কোন কথা বলিবার অধিকার নাই কিন্তু স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি অনুমাত্র সন্দেহ জন্মিলে তাঁহার প্রতি নিগ্রহ করিবার পুরুষের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। পুরুষ সুখ সৌভাগ্য উপভোগ করিবে, স্ত্রী ক্রমাগত তাহা যোগাইবে† স্বামী জীবিত থাকিলে স্ত্রীরতো এই দশা, তাঁহার মৃত্যু হইলে অনাথার যে কি শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় তাহা পাঠকগণ বিশেষ রূপেই অবগত আছেন। "জ্বলন্ত চিতা সম্মুখে—হয় জ্বলন্ত পুড়িয়া মর না হয় অর্দ্ধাহারে বা অনশনে জীবন্মৃতা হইয়া দেবর ভাসুর বা পুত্রগণের সেবায় নিযুক্ত থাক। তোমার প্রতি দয়া নাই। জলন্ত চিতানলে দগ্ধ হইতে যদি ভয় পাও, গৃহে থাকিয়া সমস্ত স্বাধীনতা সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অক্লান্তমনে আমাদের পদসেবা কর।" ব্রাহ্মণগণ উচ্চরবে ইহাই ঘোষণা করিতে লাগিলেন। (১) পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিতেন, ব্রাহ্মণগণ অবলাগণের সে স্বাধীনতাটকু কাড়িয়া লইলেন। (২)

* "প্রজানার্থ॰ মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।।"

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রীসকল বহু কল্যাণ পাত্রী এবং আদরণীয়া, ইঁহারা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। "বিবাহিত স্ত্রীলোক পিতা কর্ত্তৃক, ভ্রাতা কর্ত্তৃক, স্বামী কর্ত্তৃক ও দেবর ভাসুর কর্ত্তৃক সম্মানিত ও পূজিত হওয়া কর্ত্তব্য। রাজা যুধিষ্ঠির আপন কিঙ্করীকে "ভদ্রে" বলিয়া ডাকিতেন। অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। ভরত, রামচন্দ্রের নিকট বনে গমন করিলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সন্মানপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাক তো?" মনু কহেন "কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী" ভীষ্ম কহেন "মাতা ইহ ও পরলোকের মঙ্গলকারিণী।" পীড়িত ও দুঃখিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই। স্ত্রী পরম ঔষধ। ডাক্তার উইলসন, আমাদের ভাষা ও শাস্ত্র উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দুজাতীয় মহিলাগণ যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, এরূপ আর কোন প্রাচীন জাতিতে হয় নাই। স্ত্রীলোক সকল নাটকে, কবিতাতে উৎকৃষ্ট ও উচ্চরূপে বর্ণিত।" ইহা বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা হইতে গৃহীত হইল।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।।
ইত্যাদি। মনুঃ।

† "সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরম্।
প্রাঙ্গনে মণ্ডলং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা।।
গৃহকৃত্যঞ্চ কৃত্বা চ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েৎ গৃহদেবতাম্।।
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বৃত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথিং পূজয়িত্বা চ স্বং ভুঙ্ক্তে সুখং সতী।।
বহ্নি-পুরাণ

(১) "তাম্বূলং বিধবা স্ত্রীণাং যতিনাং ব্রহ্মচারিণাম্
তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র গোমাংসসদৃশং ধ্রুবম্।"

(২) "বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎপাণিগ্রাহস্য যৌবনে

বঙ্গদেশ—সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতভূমি—যখন এইরূপ অবনতির চরমসীমায় আসিয়া উপনীত হইল, ইহাকে পুনরায় উর্দ্ধে উত্তোলন করিবার জন্য মহাশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা রামমোহন রায় তখন বঙ্গে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার জন্মপরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে সমাজ ও দেশের যে কি শোচনীয় অবস্থা ছিল তাহা পাঠকগণকে বিদিত করিবার জন্য বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের জীবনী হইতে দুই এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—"এক শতাব্দী পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্যজ্ঞানের বিমল রশ্মি অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই, যখন এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ভারতভূমির সর্ব্বত্র অশেষ অনিষ্টকর কুসংস্কার নিয়মের একাধিপত্য লেশমাত্র বিচলিত হয় নাই, যখন ধর্ম্মের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আমোদ ও আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যানুষ্ঠানের পরাক্রম প্রতিহত হয় নাই, যখন দরিদ্র ধনীর অত্যাচার এবং স্ত্রীলোক পুরুষের অত্যাচার বংশ পরম্পরায় বহুদিন হইতে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, যখন ভাগিরথীর উভয় তীর আলোকিত করিয়া জ্বলন্ত চিতানল অনাথা বিধবানারীর জীবন ও দেহ ভস্মসাৎ করিত, সেই সময় মহাত্মা রামমোহন রায় তিমিরাচ্ছন্ন প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী অনলরাশির ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

এইরূপে মহাজনগণের জীবনবৃত্তান্ত যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিবে, সংস্কারকের আবশ্যকতার বিষয় ততই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। অনেকগুলি উদাহরণ দিয়া আমাদের এই মতের যথার্থতার বিষয় কিয়ৎপরিমাণে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলাম। সংস্কারকের কি কি সদ্‌গুণ থাকা কর্ত্তব্য এখন সংক্ষেপে সেই বিষয় আলোচনা করিব।

আমরা সচরাচর দুই শ্রেণীর সংস্কারক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া পরিচিত, অপর শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সমাজ সংস্কারক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তবে ধর্ম্ম ও সমাজ এই উভয়ের মধ্যে এমনই ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ যে একের সংস্কার করিতে গেলে গৌণ কল্পে অন্যেরও সেই সঙ্গে সংস্কার করা হয়। কেশববাবু, শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ মনিষীগণ ধর্ম্মসংস্কারক নামে প্রসিদ্ধ, আর বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মহামহোপাধ্যায়গণ অন্য শ্রেণীর অন্তর্গত। বঙ্গদেশ এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী, অল্পদিন হইল আর একদল সংস্কারক উত্থিত হইয়াছেন। ইঁহারা রাজনীতি ও প্রজানীতি লইয়াই ব্যস্ত। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্র বাবু ও ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বাবু এই ক্ষুদ্র দলের বর্ত্তমান অধিনায়ক। ইঁহাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখিলে ইঁহাদের প্রশংসা না করিয়া আর থাকিতে পারা যায় না। তবে ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র আজও বহুদূর বিস্তৃত হয় নাই। সংস্কারকের অন্তর, নিজের দুঃখ ও বিপদের সময় লৌহবৎ কঠিন ও অপরের দুঃখ ও বিপদের সময় সহজে বিগলিত হওয়া আব-

"পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং।"
মনুঃ।
"দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ"
ইত্যাদি।

শ্যক। সংস্কারক উচ্চাভিলাষী হইবেন না, স্বার্থপর হইবেন না, ধন মানের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবেন না। সর্ব্বসাক্ষী বিভুর মুখেরদিকে চাহিয়া ও স্বীয় কর্ত্তব্য বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে কার্য্য করিতে থাকিবেন। তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া অপরের জন্য জীবন ধারণ করিবেন, নিজের কর্ম্মবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ভ্রমেও কদাপি স্বার্থের বেড়া দিবেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া আসল কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য ও রাখিবেন, তাঁহার জানা কর্ত্তব্য।

"গর্জ্জতি শরদি ন বর্ষতি
বর্ষতি বর্ষাসু নিঃস্বনো মেঘঃ।
নীচো বদতি ন কুরুতে
ন বদতি কুরুতে হি সজ্জনঃ॥"

তাঁহার সৎসাহস ও সরলতা, ন্যায়পরতা ও উদ্যমশীলতা, অধ্যবসায় ও জ্ঞান, ধৈর্য্য ও সৎবুদ্ধি থাকা অত্যাবশ্যক। কতকগুলি ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের বচনই সর্ব্বস্ব কিন্তু আসল কার্য্য খুব অল্প। তাঁহারা টাউনহলে বক্তা এবং কর্ম্মক্ষেত্রে পঙ্গু, তাঁহাদের ঐকান্তিক বাসনা যে চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের যশঃ সৌরভ বিকীরিত হউক, সংবাদপত্র শত মুখে তাঁহাদের কার্য্যের সুখ্যাতি করুক, পথে পথে তাঁহাদের নামের প্রতিধ্বনি সমুখিত হউক আর তাঁহারা গৃহে বসিয়া সমস্ত উপভোগ করুন। এই সময় আমার একটী অদ্ভুত শাঁকের গল্প মনে পড়িল গল্পটী শিক্ষাপ্রদ, সংক্ষেপে বলিয়া লই।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন সময় সমুদ্রের সেবাকরিয়া পুরস্কার স্বরূপ একটী শঙ্খ প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রার্থনা মাত্রেই শাঁখ ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া টাকা দিত। এক মুদী শঠতাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে এই দিব্য সামগ্রীটী চুরী করিয়া তাহার স্থানে অন্য একটী শঙ্খ রাখিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ প্রতারিত হইল কিন্তু কে যে প্রতারণা করিল জানিতে পারিল না, সমুদ্র সবিশেষ শুনিয়া সমস্তই বুঝিল এবং ব্রাহ্মণকে আর একটী শাঁখ দিল। মুদী সেটীও অপহরণ করিল। একদিন বিরলে গিয়া মুদী বলিল "হে শঙ্খ আমাকে একটী মুদ্রা দাও।" সে শঙ্খ কথা কহিত না কিন্তু একটী—অমনি বলিয়া উঠিল "মূর্খ তুমি একটী টাকা লইয়া কি করিবে? একশত চাওতো অমি দিতে পারি" "আচ্ছা তাহাই দাও" "নির্ব্বোধ সহস্র টাকা না চাহিয়া তুমি একশত মাত্র চাহিতেছ?" "আচ্ছা সহস্র মুদ্রাই দাও" "কি বোকা! লক্ষ মুদ্রা চাও তো দি, হাজার টাকা লইয়া কি করিবে?" এইরূপে যত চাহে তাহা না দিয়া আরও দিব বলিয়া বৃথা আশা প্রদান করে। যখন শঙ্খ দেখিল নির্ব্বোধ মুদী আর কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহে না তখন সে বলিল।

"বচন সর্ব্বস্ব মম কার্য্যে সব ফাঁকি
এইরূপে দিন যায় সুখে আমি থাকি।"

এইরূপ বাক্যসর্ব্বস্ব শাঁখের ন্যায় এ দেশে অনেকগুলি ছোট বড় সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা অপকৃষ্টতর আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি (ইহাদের কোন্ লজ্জায় আর সংস্কারক বলিব!) দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা সৎকার্য্যের ভান করিয়া সাধারণ ব্যক্তিবর্গের নিকট

হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং অনেক স্থলে, কি ঘৃণার কথা! তাঁহারা অপরের স্বেদোপার্জ্জিত অর্থ নিজের বিলাস প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অম্লানবদনে ব্যয় করিয়া থাকেন। উল্লেখ করা বাহুল্য যে এরূপ দুরাত্মাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

এখন আমরা সমগ্র সংস্কারক শ্রেণীকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সংক্ষেপে তাহাদিগের বিষয় সমালোচনা করিব। এক দল রক্ষণশীল সংস্কারক; ইঁহারা ভূতকাল লইয়াই ব্যস্ত, অন্যদল উন্নতিশীল; ইহাঁরা বর্ত্তমান সময় লইয়া উন্মত্ত। শেষোক্ত সম্প্রদায় তারস্বরে বলিতেছেন, "ভাঙ্গ সব ভাঙ্গ পুরাতন বাড়ীখানা বনিয়াদ সমেত তুলিয়াফেল, বর্ত্তমানকালের উপযোগী নূতন অট্টালিকা তাহার স্থানে নির্ম্মাণ করিতে থাক।" প্রথমোক্তদল অমনি ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিতেছেন, "না না তাহা করিয়া কায নাই, বাড়ীখানা যেমন আছে থাক তবে দুই এক স্থান যা ভেঙ্গেচুরে গেছে তারই সংস্কার কর।" ইঁহারা অতীত কালকে স্বর্ণচক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে ভূতকালে যাহা কিছু ছিল সমুদায়ই ভাল এখন যাহা কিছু হইতেছে সকলই মন্দ। এ সম্বন্ধে ভারতীয় কোন রসিক লেখক বেশ গুটীকতক কথা বলিয়াছেন। আমরা এস্থানে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন, "যাঁহারা কেবল ভূতকাল লইয়াই ব্যস্ত তাঁহারা নিশ্চয়ই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি, রোজা ডাকাইয়া অচিরাৎ তাঁহাদিগের চিকিৎসা সুরু করিয়া দেওয়া উচিত।" অন্যস্থলে বলিতেছেন "জাতীয়তা যে কি পদার্থ তাহা তাঁহারা কখন তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, জাতীয়তা সম্বন্ধে অস্ফুট, অনির্দ্দেশ্য কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, অপরিপক্ক কতকগুলি ভাব তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ইলিবিলি করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এবং তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা সময়ে সময়ে ভূতগ্রস্তের ন্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া হাত পা ছুঁড়িতে থাকেন।" আমরা কোন দলেরই পক্ষপাতী নহি। আমরা অনুকরণের বিরোধী নহি, প্রতিভাশূন্যব্যক্তিরা অনুকরণ করিতে গিয়া যে সময়ে সময়ে আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন আমরা তাহাও স্বীকার করি। * ভূতকালে যে কিছুই ভাল ছিলনা এ কথা আমরা বলি না। ভূতকালে ভাল মন্দ দুইই ছিল, এখনও ভাল মন্দ দুইই আছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যাহা ভাল, তা কে জানে অতীতের আর কে জানে বর্ত্তমানের, তাহাই গ্রহণীয়। এবং যিনি মন্দ হইতে ভালগুলি স্বতন্ত্র করিয়া মধুপগণের ন্যায় সমাজরূপ একটী সুন্দর মধুচক্র নির্ম্মাণে সমর্থ তিনিই ধন্যবাদের পাত্র, আর যিনি ভালগুলি বজায় রাখিয়াও মন্দের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

* "প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। * * * অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই; একে মন্দ তাহাতে অনুকরণ, নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘৃণ্য নহে।"

বঙ্গ দর্শন।

হইয়া প্রাণপণে কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পারেন তিনিই উপযুক্ত সংস্কারক এবং আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। ঈশ্বরের তিনিই চিহ্নিত ভৃত্য।

——:০:——

জয়দেব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহাত্মা জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা সবিশেষ নির্ণয় করা যায় না। গীতগোবিন্দ লাটিনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে; লাটিনভাষায় গীতগোবিন্দ অনুবাদ কর্ত্তা অধ্যাপক ল্যাসন বলেন মহাত্মা জয়দেব খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধেকাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ডাক্তার কেরীর মতে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গীত গোবিন্দ প্রচারিত হয়। শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন যে জয়দেব গৌড়াধিপতি মহারাজ লক্ষণ সেনের সময় বর্ত্তমান ছিলেন, বস্তুত লক্ষণ সেনের সভামণ্ডপের দ্বারদেশে প্রস্তরে খোদিত এই শ্লোকটি (১) আছে, তদ্দর্শনে জানিতে পারা যায় যে জয়দেব উক্ত রাজার একটি অন্যতম রত্ন ছিলেন। এলফিনষ্টন্ বলেন জয়দেব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। (২) লেথব্রীজ বলেন গীতগোবিন্দ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত, হয়। বাস্তবিক সনাতন গোস্বামীর মত সমর্থন করা যাইতে পারে কিনা দেখা আবশ্যক, তিনি বলেন জয়দেব লক্ষণ সেনের সভায় বর্ত্তমান না থাকিলে তৎপ্রণীত গ্রন্থে অন্যন্যাতি প্রসিদ্ধ চারি রত্নের গুণাগুণের পরিচয় থাকা নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের সহিত ঐক্য হইতেছে না। জয়দেবের জীবন চরিত সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ মধ্যে মহারাজ লক্ষণ সেনের সভার অবস্থানের কোন কথাই পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ জয়দেব স্বনামখ্যাত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তয়িতা রমানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন। (৩) এই রমানন্দ গোস্বামী খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হন (৪) ঐরূপ অনেক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সনাতন গোস্বামীর মতের পোষকতা করিতে হইলে আমাদের দেখা আবশ্যক লক্ষণ সেন কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; সুপ্রসিদ্ধ "আইন আক্‌বরী" গ্রন্থকার আবুল ফজলের মতে লক্ষণ খ্রীঃ ১১১৬ অব্দে বাঙ্গালার শাসন ভার

(১) গোবর্দ্ধনশ্চশরণোজয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষণস্য চ।
সঙ্গীত-সারের ৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) Elphinstone's History of India, Chap. I p, 52.

(৩) Asiatic Researches, Vol XVI Religion of the Hindus.

(৪) Asiatic Researches, Vol XVI. Page. 37 Prof, H, H. Wilson.

গ্রহণ করেন। (৫) প্রিন্সেপ সাহেব বলেন লক্ষণ ১২০৫ খ্রীঃ বর্ত্তমান ছিলেন। (৬) "সময় প্রকাশ" বলেন লক্ষণের পিতা বল্লাল ১০১৯ শকের দানসাগর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা—

"নিখিল নৃপচক্র তিলকশ্রীবল্লালসেন দেবেন পূর্ণে শশিনব দশমিতে শকাব্দে দানসাগরো চরিতঃ।"

ইদানীন্তন তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি মাত্রেরই ঐ মতের পোষকতা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন লক্ষণ সেন পাঁচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমরা সে মতের পোষকতা করিনা, কেননা লক্ষণের মন্ত্রী হলায়ুধ স্বীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন রাজা লক্ষণ সেন আমাকে কৈশোরে সভা-পণ্ডিত, যৌবনে মন্ত্রী ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মো-পদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (৭) স্বল্প কালের মধ্যে এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ; সকলেই স্বীকার করিবেন, যখন বঙ্গদেশে লক্ষণ হেমদণ্ড-ধারণ পূর্ব্বক প্রজাপালন করিতেছিলেন তখন যবন সেনাপতি বক্তিয়ার বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। এই ঘটনা খৃঃ ১২০৪ অব্দে ঘটিয়াছিল। মুসলমান ইতিহাস লেখক মিনহাজোদ্দীনের মতে বক্তিয়ার ১২০৪ অব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করেন ; তখন লক্ষণ জীবিত সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (এই সময়ের মধ্যে) মহারাজ লক্ষণের সভায় জয়দেবের বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত সম্ভব। যদিও জয়-দেবের জীবনীর অভাব আমাদের দেশে নাই, তথাপি প্রকৃত সময় কেহই নিরূপণ করিতে সক্ষম হন নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

জয়দেবের বাল্যাবস্থার বিবরণ অত্যন্ত অপরিজ্ঞেয়, কাব্যকলাপ সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ লিখিয়াছেন যে জয়দেব পক্ষান্তে স্বীয় ধর্ম্ম-উপদেষ্টার নিকট পাঠ-গ্রহণ করিতেন ; পক্ষান্তরে পাঠ গ্রহণ করি-তেন বলিয়া অনেকে বিদ্রূপচ্ছলে তাঁহাকে "পক্ষধর মিশ্র" বলিতেন ; পরিশেষে তিনি সেই নামেই তৎকালীন লোকদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। (৮) বাস্তবিক "পক্ষধর মিশ্র" গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়-দেবের উপাধি নহে; এই উপাধি প্রসন্ন রাঘব নাটক লেখক জয়দেবেরই উপাধি। গীত-গোবিন্দ প্রণেতা ও নাটক লেখক দুই জয়-দেবেই বিভিন্ন ব্যক্তি ; নাটক লেখক জয়দেব স্বীয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় আপনাকে তার্কিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (৯)

চিন্তামনির আলোক (শব্দ খণ্ড) নামক ন্যায় গ্রন্থের টীকা পক্ষধর মিশ্র বলিয়া বিখ্যাত আছে, সুতরাং পক্ষধর মিশ্র নাটক লেখক জয়দেবের প্রকৃত উপাধি (১০) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবে-চনা হয়।

---

(৫) Edwin's Ain-Akbaree Introduction.
(৬) Prinsep's Useful Table.
(৭) ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থ দেখ।

(৮) Fitz Edward Hall সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যের ভূমিকায় জয়দেবকে পক্ষধর মিশ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৯) "—নম্বয়ং প্রমাণপ্রবীণোহপি শ্রূয়তে তদিহ চন্দ্রিকা চণ্ডাতপয়োরিব কবিতাতার্কিকত্ব-য়োরেকাধিকরণতামালোক্য বিস্মিতোহস্মি,,
প্রসন্নরাঘব-প্রস্তাবনা—

(১০) শব্দকল্পদ্রুম ২য় খণ্ড ১৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

আমরা জয়দেবের জীবনের পূর্ব্ব লিখিত পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর একটি পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিব। জয়দেব তৎপরে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিব্রাজকতায় নিযুক্ত হন; এরূপও শুনা যায় যে তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে শিষ্য করিয়াছিলেন। গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়দেব শিষ্য সহ নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য বঙ্গদেশে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এক শতাব্দী পূর্ব্বে জয়দেব সেই ধর্ম্ম—সেই সম্প্রদায় নিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; যাহাই হউক ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া জয়দেব জগতে বিখ্যাত নহেন—তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিপতাকা—কাব্য জগতে উড্ডীন হইয়াছিল—ধর্ম্মপ্রচারে নহে।

জয়দেবের বিবাহ বৃত্তান্ত আরও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। এক জন ব্রাহ্মণ বহুকাল ধরিয়া জগন্নাথের পূজা করিয়া এক কন্যা লাভ করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ সেই কন্যার নাম পদ্মাবতী রাখিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই কন্যা বয়স্থা হইলেন। ব্রাহ্মণ আত্মজাকে জগন্নাথের নামে উৎসর্গ করিবেন স্থির করিয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিতেছিলেন; পথিমধ্যে জগন্নাথ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন "যে জয়দেব নামে আমার এক সেবক, যিনি এক্ষণে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইয়াছেন তাঁহাকেই তুমি কন্যা সম্প্রদান কর।" ব্রাহ্মণ এই রূপ আদিষ্ট হইয়া জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন; যতিধর্ম্মাবলম্বী জয়দেব গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং দারপরিগ্রহ বিষয়ে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আত্মজাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সেই কামিনীকে তদীয় অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে পদ্মাবতী কহিলেন পিতার গৃহে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছি; এক্ষণে তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পন করিয়াছেন। আপনার সেবা ও তুষ্টিসাধন ব্যতীত আর আমার অন্য কর্ম্ম নাই; আপনি পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনার সেবিকা (১১)। জয়দেব উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন। কথিত আছে তিনি এই সময়ে গীতগোবিন্দ রচনা করেন।

জয়দেব সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই—ভাগীরথী কেন্দুবিল্ব হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী ছিলেন, জয়দেব এই অষ্টাদশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া প্রত্যহ পতিত-পাবনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিতেন; একদিন ভাগীরথী জয়দেবকে বলিলেন তোমার প্রতিদিন এত ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই আমি স্বয়ং তোমার গ্রামের সমীপবর্ত্তিনী হইব। সেই অবধি ভাগীরথীর একটি শাখা কেন্দুবিল্ব গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হয়।

গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে প্রবাদ এই—"দেহিপদপল্লবমুদারম্" এই টুকু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লিখিয়া-

(১১) পিতা সমর্পিল আর জগন্নাথ আজ্ঞা।
তুমি মোর স্বামী, মোর এইত প্রতিজ্ঞা॥
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব
কায় মনো বাক্যে তব চরণ সেবিব।

ভক্তমাল; দ্বাদশ মালা।

ছেন। জয়দেব, স্মরগবান,খণ্ডণং মম শিরসি মণ্ডলং—এই পর্য্যন্ত লিখিয়া আর লিখিতে সাহস করেন নাই, অনেক চিন্তার পর ভাগীরথী সলিলে অবগাহন করিতে গমন করেন। গীত গোবিন্দের দশম সর্গে কৃষ্ণ মানিনী রাধিকায় অনুনয় করিতেছেন—বলিতেছেন তোমার উদার পল্লব আমার মস্তকের ভূষণ স্বরূপ অর্পণ কর, ছদ্মবেশী জয়দেবরূপী কৃষ্ণ জয়দেবের স্নান গমন সুযোগে স্নানে প্রত্যাগত জয়দেব রূপধারণ করিয়া তদীয় ভবনে উপস্থিত হন। পদ্মাবতী আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। কৃষ্ণ আহারাদি সমাপন করিয়া গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপিতে "দেহি-পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়া শয়ন করিলেন। পতিপ্রাণা পদ্মাবতী তাঁহাকে শয়ন করাইয়া কৃষ্ণ-ভোজনাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে জয়দেব প্রত্যাগত হইলেন। জয়দেব জানিতেন্ পদ্মাবতী প্রাণান্তেও তাঁহার আহারের পূর্ব্বে আহার করেন না, কিন্তু বর্ত্তমান অসদৃশ অবস্থা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে পদ্মাবতী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলেন। জয়দেব শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর পদ্মাবতী মুখের গ্রাস প্রান্তে রাখিয়া স্বামীর আহারের উৎযোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু জয়দেব তাঁহাকে বলিলেন আমি বুঝিয়াছি। আমি ওই পাত্রাবশিষ্ট অন্নই আহার করিব। ভোজনের পর জয়দেব স্বীয় পাণ্ডুলিপিতে "দেহিপদপল্লবমুদারম্" লেখা রহিয়াছে দেখিয়া প্রভুর আবির্ভাব ও ছলনা বুঝিতে পারিলেন।

জয়দেব তৎপরে কিছুকাল গৃহে থাকিয়া স্বীয় ইষ্টদেবের কোন কীর্ত্তি স্মরণ রাখিবার জন্য অর্থের সংগ্রহার্থ প্রবাসে গমন করেন। তথা হইতে মনোরথ সম্পূর্ণরূপ পূর্ণ না করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন।

এই কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেব মানবলীলা সম্বরণ করেন। কাব্যাকাশের একটি নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া গেল। কেন্দুবিল্বের পঙ্কিল সরোবরে জয়দেবরূপী শত পত্রের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের প্রফুল্ল মুখকান্তি তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে জয়দেব জীবন চরিত লেখক মহাত্মাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। তাঁহাদের নামোল্লেখ জগতে করিলাম না বটে; কিন্তু অন্তরে তাঁহাদের নাম শত বার স্মরণ করিয়াছি।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ম্যাজিনীর

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ। ১৮০৫ হইতে ১৮৩১।

বাল্যকাল; প্রথম কারারোধ।

যে সকল হিতৈষী সহানুভূতির স্বাভাবিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইটালীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; বৈদেশিক শাসনে দেশ কি প্রকার জ্যোতি-বিহীন হইয়া অসারত্বে পরিণত হয়, স্থিরমনে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন; এবং জ্ঞান বলে মানব প্রকৃতির বৈচিত্র সন্দর্শনে আপন শিক্ষাকে উন্নত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই ম্যাজিনী নামে জনৈক ক্ষণজন্মা দেশ-হিতৈষী, বিশ্বাসী ধার্ম্মিককে উত্তমরূপে চিনিয়া লইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে অস্ট্রিয়ার পদানত ইটালি যখন শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়া একতার সুন্দর রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইতেছিল, চতুর্দ্দিকে যখন কেবল অধীনতার, নিরানন্দ ভাব বিস্তারিত হইয়া সকলের জীবনে নৈরাশ্য আনয়ন করিতেছিল, তখন ম্যাজিনী ইটালীর গৌরব হইয়া পৃথিবীতে পরিচিত হয়েন। ইউরোপের ক্ষমতাশালীদিগের শৃঙ্খল যখন শোণিতস্রোতে সিক্ত হইয়া দিক্‌দিগন্তরে বিস্তৃত হইতেছিল, আকাশ যখন অল্পে অল্পে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, লোকমণ্ডলী যখন নিরাশ মনে অত্যাচারে আত্মসমর্পণ করিতেছিল, তখন ইটালীতে যেন দৈববাণী নির্ভয়ে প্রকাশিত হইল, "ঈশ্বর ভিন্ন মানবের আর প্রভু নাই, ঈশ্বরের নিয়ম ভিন্ন আর শাসনকর্ত্তা নাই।"

এই কয়েকটী কথার নিবদ্ধ কর্ত্তব্য পালন করিতেই এই মহাত্মার জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। তাঁহার রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক বিশ্বাসের ফল স্বর্ণাক্ষরে ইটালীর ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে লিখিত রহিয়াছে। উপরে লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর, নিম্নে কর্ত্তব্য একমাত্র মানবের প্রতি, এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া তিনি সমস্ত জীবন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। ম্যাজিনীর জীবনের প্রতি যখন আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে, তখন আমরা আত্ম বিস্মৃত-হইয়া যাই, সামান্য মানবের দ্বারা পৃথিবীর—মানব সমাজের কত উপকার সাধিত হইতে পারে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি, আমাদের সামান্য নির্জীব লেখনী নিশ্চল হইয়া পড়ে। "ম্যাজিনীর পূর্ণ জীবনী' সম্পূর্ণ রূপে লিখিয়া সেই পরলোকগত মহাত্মার গৌরব রক্ষা করা আমা-

দিগের ক্ষমতার অতীত, তবে ম্যাজিনীর ন্যায় জীবনের শতকাংশের একাংশও যদি পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলেও এই উৎসাহ শূন্য, নিরাশ, বিলাসপ্রিয়, নিদ্রার চিরচর দেশের কিছু উপকার লাভ হইতে পারে, এই আশা করিয়াই আমরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ম্যাজিনীর জীবনের উজ্জল বিশ্বাস, যাঁহার বলে তিনি জীবনে অলৌকিক কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যাহা তাঁহার চিরকালের সম্বল, আমরা সেই বিশ্বাসের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেই আমাদিগের পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

জোজেপ ম্যাজিনী জেনোয়ার অন্তর্গত ষ্ট্রেডামেলিনিস্তে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জুনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গাইয়াকম্যোম্যাজিনী উক্ত নগরের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, এবং শরীর তত্ত্ব বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার মাতা মেরি ম্যাজিনী টিয়াভেরী দেশীয় রমণী ছিলেন। তাঁহার মাতা সৌন্দর্য্য, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অবিচলিত স্নেহের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ম্যাজিনী দেশান্তরিত হইয়া যখন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মাতার নয়নের কোণ হইতে অদৃশ্য থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখনও জননীর অকৃত্রিম স্নেহ ও গাঢ় ভালবাসা সম ভাবে তাঁহার প্রতি ধাবিত ছিল। ম্যাজিনী বাল্যকালে অত্যন্ত কোমল ছিলেন; তাঁহার শরীরের দুর্ব্বলতা অপরিপক্কতার ফল না হইলেও তাঁহাকে নিয়মিত সময় অতিক্রম করাইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম করিয়াছিল। শৈশব সময়ে যখন তিনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইতেন না, তখন জননীর গৃহে একখানি ক্ষুদ্র চেয়ারে বসিয়া থাকিতেন। ৬ বৎসর বয়ক্রমের সময় তিনি ভাল করিয়া হাঁটিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং পিতার বাড়ীর সম্মুখের বাগানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে পারিতেন। যে দিবসে প্রথমে ম্যাজিনীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মাতা দূর স্থানে গিয়াছিলেন, সে দিবসের একটী ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে ম্যাজিনীর জননীর হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, যাহা তিনি সকলকেই বলিয়া সুখী হইতেন। পুত্রকে লইয়া জননী যখন ভোজনালয় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন তখন সিঁড়ির নিম্নে হঠাৎ ম্যাজিনী দাঁড়াইয়া একটী বৃদ্ধ দরিদ্র মলিন ভিক্ষুকের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার জননী সহসা সন্তানের এই আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া ভীতা হইলেন, এবং ভাবিলেন জীর্ণ শীর্ণ পরিচ্ছদধারী বৃদ্ধের পক্ক শ্মশ্রু দেখিয়াই বালক ভীত হইয়াছে। এই ভাবিয়া যখন স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে করিতে গেলেন, তখন বালক সহসা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ঐ দরিদ্র বৃদ্ধের গলা স্বীয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন, এবং জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— 'মা ইহাকে কিছু দেও, কিছু দেও।' বৃদ্ধ বালকের এই প্রকার অলৌকিক দয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া, অশ্রুপরিত্যাগ করিলেন, এবং বালকের মুখ চুম্বন করিয়া, জননীকে বলিলেন—'ভদ্রে! ইহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিও, কারণ এই বালক সর্ব্ব সাধারণকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিবে।'

ম্যাজিনীর শৈশব সময়ের এই দয়ার মনোহর চিত্রটী চিরকাল তাঁহার মাতার

হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। যখন ম্যাজিনী দেশান্তরিত হন, তখন তাঁহার মাতা এই স্নেহ-সূচক বাক্য গুলি অন্যের নিকট বলিবার সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তিনি আরো বলিতেন,—" শৈশব সময়ে ম্যাজিনী হৃদয় এতদূর পর্য্যন্ত গরিব দুঃখীর প্রতি দয়ার্দ্র ছিল যে, কোন সময় ভৃত্য কোন দুঃখী দরিদ্র ভিক্ষুকের সংবাদ লইয়া আসিলে, তখনই তাহার হৃদয় আহ্লাদে পরিপ্লুত হইত এবং আমাকে সাহায্য করিতে বলিত; যদি কখনও আমি সাহায্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিতাম 'আমার নিকট কিছুই নাই, কি দিব,' তাহা হইলেই অমনিই তাঁহার দুনয়ন হইতে অবিরল ধারে জল পড়িতে থাকিত; এবং আমার কেশ টানিয়া বলিত,'—না না, মা, দুঃখীকে কিছু দেও দুঃখীকে কিছু দেও।' যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কথানুসারে দুঃখীকে কিছু না দিতাম ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইত না; এবং কিছু দিলেই ধারাবাহী অশ্রু সহিত আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিত ও আমাকে চুম্বন করিত।"

শৈশব সময়েই তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং গম্ভীর ছিলেন; শৈশব সময়ের ক্রীড়া সামগ্রীর প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আসক্তি ছিল না। তাঁহার পিতা শৈশব সময়ে ম্যাজিনীর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াও তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন তাঁহাকে পড়াইতে শিখাইতেন না; তত্রাচ চতুর্থ বৎসর বয়ক্রমের সময় জননী দেখিলেন, ম্যাজিনী উত্তমরূপে পড়িতে শিখিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া জননী বুঝিতে পারিলেন, নিকটবর্ত্তী গৃহে, তাঁহার ভগ্নিদিগের পাঠ শুনিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। সাম্বৎসরিক কোন প্রকার উৎসবের সময় যখন তাঁহার জননী জিজ্ঞাসা করিতেন,—'ম্যাজিনি! তুমি কি চাও।' ম্যাজিনী স্পষ্ট বলিতেন,'পুস্তক।' বাড়ীতে যাহারা বেড়াইতে আসিত, সকলের নিকট তিনি গল্প শুনিতে চাহিতেন; আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিলে হাসিতে থাকিতেন, এবং দুঃখের কথা শুনিলে স্থির ভাবে থাকিতেন; কিন্তু যে গল্পটী একবার শুনিতেন, তাহা আর পুনরায় শুনিতে ভাল বাসিতেন না। ৫ বৎসর বয়সে যখন তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া স্থির ভাবে আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া থাকিতেন, তখন একদা কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে স্থির ভাবে মানচিত্রের প্রতি অবলোকন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—'চতুর্দ্দিকে পুস্তক প্রভৃতির মধ্যে যেন লিলিপটের দার্শনিকের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন।' ম্যাজিনীর জননীর কোন আত্মীয় এক সময়ে জেনোয়াতে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি ম্যাজিনীর মনের আশ্চর্য্য শক্তি এবং অলৌকিক বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া এত চমকিত হইয়াছিলেন, যে কয়েক বৎসর পরে; ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন ম্যাজিনীর মাতা সেই আত্মীয়ের নিকট আপন পুত্রের শিক্ষার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন তখন তাহার পত্রেতেও ম্যাজিনীর প্রশংসার কথা লেখা ছিল। সেই ভূতদর্শী আত্মীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আমার বাক্য বিশ্বাস করিও, প্রিয় সিগনোর ম্যাজিনী, ধ্রুব নক্ষত্র বিশেষ তোমার প্রিয় পুত্র, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভায় উজ্জ্বল হইয়া

একদিন সমস্ত সভ্য ইউরোপের প্রশংসার পাত্র হইবে। * * * তুচ্ছ করিও না, সন্তানের শিক্ষার জন্য অচিন্তনীয় ক্ষতি স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইও না।" দ্বিতীয় পত্রে উক্ত আত্মীয় ম্যাজিনীর শিক্ষা প্রণালী নির্দ্দেশ করিবার সময়ে সে সকল সারগর্ভ কথা লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী অতিশয় মূল্যবান কথাছিল,—"এই বালকের ন্যায় প্রতিভাশালী লোক উপযুক্ত বয়সে আপন শিক্ষার প্রণালী আপনি অনায়াসেই নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে সক্ষম হইবে। পেভিয়া, ২৮ আগষ্ট ১৮১২।"

একটী উপযুক্ত বৃদ্ধ পুরোহিত ম্যাজিনীর প্রথম শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন; তিনি ম্যাজিনীকে একটু লাটিন ভিন্ন আর কিছুই কার্য্যতঃ শিক্ষা দেন নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যাভ্যাসের যে আন্তরিক তৃষ্ণা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহার বলে তিনি অল্পকাল মধ্যে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীতও আধুনিক ভাষা সকলে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার পিতার পুস্তকালয়ের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক সকলের পশ্চাতে কতকগুলি ফরাশী বিপ্লব সময়ের গ্রন্থকারগণের দর্শন এবং রাজনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক লুক্কায়িত ছিল; তিনি সেই সকল বাহির করিয়া অতি শৈশব সময়েই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ক্রমের সময় জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠার্থ গমন করেন। ম্যাজিনীর সমকালীয় জনৈক ছাত্র এই প্রকার লিখিয়াছেন,—"ম্যাজিনী দর্শন সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্কে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী বলিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে বিখ্যাত ছিলেন; এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং উৎকৃষ্ট স্বভাবের গুণে সকল ছাত্রই তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু শিক্ষকগণের অসংখ্য২ নিয়ম প্রতিপালনে ম্যাজিনী উদাসীন ছিলেন বলিয়া, অনেক সময়ে বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি নিয়মিত শিক্ষা প্রণালী অনুসারে অধ্যয়ন করিতেন না, কিন্তু গণিত, সঙ্গীত, ইংরাজি সাহিত্য প্রভৃতি গোপনে অধ্যয়ন করিতেন। বিশেষ চেষ্টা না করিয়াই তিনি সকল বিষয়ে পারদর্শী হইলেন। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম সত্ত্বেও তাঁহার মনের উন্নতির সহিত তাঁহার শৈশবের কোমল এবং দুর্ব্বল শরীর বলিষ্ঠ এবং সবল হইয়া উঠিল।

"তাঁহার সঙ্গিদিগের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং ক্ষমতা বিস্তার অত্যন্ত বিস্ময়জনক। তাঁহার প্রকৃতির অমায়িকতা, স্বভাবের পবিত্র বিনীত ভাব সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া চমকিত হইতেন। তাঁহার ন্যায়ের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করিতে যাইত; কি শিক্ষক, কি ছাত্র, কাহারও দ্বারা কাহাকে নিষ্ঠুর রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার সরলতা এবং মিতব্যয়িতা গুণে তিনি সকলের অভাব মোচনে কৃতকার্য্য হইতেন; বাস্তবিক তিনি এতদূর পর্য্যন্ত অন্যের অভাবে কাতর হইতেন, যে কেবল পুস্তক, টাকা প্রভৃতি দান করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না; তিনি অনেক সময়ে আপন পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্তও বিতরণ করিতেন। তিনি অত্যন্ত সামান্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, বাল্যকাল

হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কাল পোষাক ব্যবহার করিয়াছিলেন।"*

অন্য একটী কালেজের বন্ধু, ম্যাজিনীর স্বাধীন প্রকৃতি এবং স্বভাবের অমায়িকতা সম্বন্ধে, এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন,—"একাধিপত্য নিয়ম সকলের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি তদানিন্তন স্কুলের নিয়ম প্রভৃতিকে অবহেলা করিতে একটুও সঙ্কুচিত হইতেন না। নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন এবং তাড়না দ্বারাও যখন শিক্ষক সকল স্কুলের নিয়ম প্রতিপালনে ম্যাজিনীর মত জন্মাইতে পারিলেন না, তখন অগত্যা তাঁহার নীতিপরায়ণ স্বভাব এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি স্মরণ করিয়া, ম্যাজিনীকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেখিয়াও কিছু বলিতেন না। ম্যাজিনী কিয়দ্দিবস পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিবার বাসনায় শরীরতত্ব বিদ্যা (Anatomy) এবং চিকিৎসাতত্ব (Medicine) অধ্যয়ন করেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার পিতার শরীরতত্ব বিদ্যার বক্তৃতা লিখিতেও সক্ষম হইতেন; কিন্তু মৃতদেহ পরীক্ষার সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে, ঘৃণা উপস্থিত হইবে, ইহা বুঝিয়া তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকালীয় সকলেই ম্যাজিনীর অমায়িক স্বভাব, দয়ার্দ্র চিত্ত এবং বিনীত ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া থাকিবেন কারণ সকলেই তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন, এমন কি, কালেজের বিখ্যাত ছাত্র সকল প্রায়ই তাঁহার বাটীতে আসিতেন।"

সাহিত্যের প্রতি ম্যাজিনীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, এবং তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়ক্রম সময়ের কতিপয় রচনা পাঠ করিয়া স্যাভনার সাহিত্য সমালোচনী সভার সভ্যগণ এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন, যে ম্যাজিনীর বয়স অল্প হইলেও, তাঁহাকে আহ্লাদ সহকারে উক্ত সভার সভ্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় একটী সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে রচনা লিখিয়াছিলেন, উহা অল্পকাল মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল। উক্ত রচনা পাঠ করিয়া অনেকেই অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে একদিন ম্যাজিনী ইউরোপের একতা আনয়নের অধিনায়ক বলিয়া পরিচিত হইবেন।

ম্যাজিনীর মনে স্বদেশ-বৎসল ভাব এবং ইটালীর দুর্দ্দশা অপনয়নের ইচ্ছা কোন্ সময়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। ইটালীর দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দিন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কোন স্থলে ইটালীর উন্নতি সম্বন্ধে কোন কথা বা প্রস্তাব শুনিতে পাইলে তিনি আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া তাহা শুনিতেন। এই প্রকার হিতৈষণা বোধ হয় অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

৫ বৎসর অধ্যয়নের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লইয়া ম্যাজিনী আইন ব্যবসায়ী হইবার অনুমতি লাভ করিলেন। ম্যাজিনী

* Mazzini alludes to this habits and says ... ... I childishly determined to dress always in black, fancying myself in mourning for my country ... ... Matter went so far that my poor mother became terrified lest I should commit suicide.

আইন ব্যবসায়ী হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, এই কথা মনে ভাবিয়া পিতা মাতা আহ্লাদে অত্যন্ত আপ্লুত হইলেন; ম্যাজিনীর ন্যায় প্রতিভাশালী লোক ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহা সকলেরই মনে ধারণা ছিল। কিন্তু ম্যাজিনী আত্মীয় বান্ধব এবং পিতা মাতাকে এই কাল্পনিক আশায় মোহিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং দুঃখিত হইলেন, কারণ তিনি জানিতেন পিতা মাতার আশা ভরসা সকলই বিফল হইবে। তাঁহার হৃদয়ে ইতিপূর্ব্বেই দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিল, তিনি কখনও আইন ব্যবসায়ী হইবেন না; স্বীয় দেশের উন্নতি সাধনেই জীবন পাত করিবেন।

সেই সময়ে ইটালীর নব্য আইন ব্যবসায়ীদিগকে দুই বৎসর দরিদ্রদিগের মকর্দ্দমা বিনা টাকায় গ্রহণ করিতে হইত, ম্যাজিনী অত্যন্ত যত্নের সহিত বিচক্ষণতা পূর্ব্বক এই কষ্টজনক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও দয়া, মকর্দ্দমা বুঝিবার বিচক্ষণ শক্তি, তর্ক করিবার ক্ষমতা, এবং বাক্‌শক্তির প্রখরতা অল্পকাল মধ্যে তাঁহাকে এত প্রসিদ্ধ করিয়াছিল, যে ইটালীর দরিদ্রশ্রেণী, সকলেই ম্যাজিনীকে মকর্দ্দমা দিত। ম্যাজিনীর অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাবে তাঁহাকে সকলে 'ঐ নব্য উকীল' বলিয়া সম্বোধন করিত।

ম্যাজিনীর সময় ইটালীতে একটী গুপ্ত রাজনৈতিক সভা ছিল। তিনি জনৈক গুপ্ত চরের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া উক্ত সভায় যোগ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত চর ম্যাজিনীকে পশ্চাতে প্রবঞ্চনা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ম্যাজিনী উক্ত সভার আচার প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিয়াছিলেন,—গবরমেণ্টের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়া ভিন্ন উক্ত সভার আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই। ১৮২০—১৮২১ সালের রাজবিদ্রোহের কারণ, এবং অকৃতকার্য্য হইবার নিগূঢ় তত্ত্ব অভ্যস্ত করিয়া তিনি এই গুপ্ত সভার বহুল অভাব স্থির মনে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাও জানিতেন, স্বীয় মতানুসারে সভা স্থাপনের সময় এইক্ষণ ও আগমন করে নাই। উক্ত সভার সভ্যদিগের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব যে, ইচ্ছার উত্তেজনায় মানব বিশ্বাসের সহিত কার্য্যের সংযোগ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না, যাহার বলে চিন্তায় কার্য্য প্রসব করে, সেই অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনন্যপায় হইয়া কিছু দিবস উহাতেই যোগদান করিলেন।

উক্ত সভার চাঁদার টাকা দিবার সময় ম্যাজিনী এই প্রকার বলিয়াছিলেন—অসৎ অভিপ্রায় অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত পাপেয় কার্য্য, এবং যে অর্থ দ্বারা সৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, সেই অর্থকে কৃপণতা করিয়া রক্ষা করা আরো পাপ। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান দোষ এই যে, কাল্পনিক সুখ, ভোগ বিলাসের বাসনায় যাঁহারা প্রচুর অর্থ অনায়াসে ব্যয় করিয়া থাকেন, তাঁহারই সৎকর্ম্মে একটী পয়সা দান করিতেও কুণ্ঠিত।

(ক্রমশঃ)

উন্মত্ত বাসনা।

কবিতা-কুসুম-হারে হইব ভূষিত,
হায় রে! হৃদয়ে মম ছিল এ বাসনা;
কবিকুল সরোবরে পঙ্কজের প্রায়,
ছিল মম প্রিয়তম বিখ্যাত জগতে।
সযতনে গাঁথি মালা কবিতা প্রসূনে,
কত যে আদরে সখা পরাত গলায়,—
আদরে পরায়ে মালা চাহি মুখ পানে
হেরিত বদন, মরি, ধরি দু'টী করে,
জিজ্ঞাসিত কতবার, "কহ প্রিয়তমে,
মম এ ভূষণে তুমি শোভেছ কেমন?"
আহা! কি আনন্দ মম হইত সেকালে!
অনন্ত সে সুখরাশি, নবীন, নির্ম্মল।
কি ভাবে নাচিত হৃদি বলিব কেমনে?
পারে কি লিখিতে তাহা এ ক্ষুদ্র লেখনী?
সে সুখের সীমা মরি, আছে কি সংসারে?
হায়! প্রবাহিনী নদী অনন্ত সলিল,
কতেক আছয়ে বারি কে পারে মাপিতে?
পবিত্র প্রেমেতে, পূরি পতির আদরে,
ধরিয়া নাথের কর বলিয়াছি যবে,—
"এ সুন্দর মালা, নাথ, গাঁথিলে কেমনে?
শিখাবে আমারে সখা গাঁথিতে এ হার?
বড় সাধ আছে মনে, ওহে প্রিয়তম,
রচিয়া অপূর্ব্ব মালা নবীন প্রসূনে,
(কল্পনা উদ্যানে মম আছে যে প্রসূন)
পরাব গলায় তব আনন্দে মাতিয়া,
যথা সে ইন্দ্রানী শচী পারিজাত মালা
পরায় প্রাণেশ-গলে অতি সযতনে।
কিন্তু সখে, কেমনে রচিব সেই হার?
যেই কম হার স্মর-মন-লোভনীয়,
পারে কি গাঁথিতে তাহা কভু, প্রাণাধিক,
পুলোমা-দুহিতা শচী পতি-অযতনে?
ধরি তব কর সখা, শিখাও আমায়,
পূরিব মনের সাধ তোমার সহায়ে।"
উত্তরিল সেইক্ষণে প্রাণেশ আমার
—আহা কি অমিয় কথা বীণা বিনিন্দিত—
"কি চিন্তা তোমার কান্তে সে হার গাঁথিতে?
প্রকৃতি রূপিনী তুমি নাহি পার কিবা?
সাজে কিলো তোরে প্রিয়ে এ হেন ভারতী?
সত্য, কবি নামে আমি খ্যাত প্রাণেশ্বরি,
কিন্তু, এ সংসারে কার তরে বল দেখি,
কাহারে সাজাব বল, এ কুসুম হার,
রচি পাইয়াছি কবি নাম! প্রিয়তমে!
তুমি প্রাণ সুমাদেহে—দেহ মাত্র আমি;
যে ভূষণে ইচ্ছা প্রিয়ে, সাজাও আমারে।
প্রেমময়ি, একবার ভেবেদেখ মনে,
কাঞ্চনের বৃক্ষ যদি প্রসবে মাণিক
কে সুখী না হয় মরি হেরিলে তাহারে?
সেইরূপ সরলতা তুমি লো আমার
প্রসবিলে মুক্তারাজি, কি আনন্দ হায়,—
নাজানি, কি স্বর্গ সুখ লভিব ধরাতে।"
এতবলি নীবরিল হৃদয়েশ মম,
ছলিল এ জানে আশামরিচীকা সম॥

শ্রীমতী রা, কি, গুপ্তা।

প্রলাপ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

[১]
আকাশের থাল র'য়েছে সাজান,
চাঁদিমা ধ'রেছে কুমুদ হাসি
তারা লুফে লুফে বসাইছে ভাগ
অজস্র অমিয়া পড়িছে খসি।

[২]
কাল এক মেঘ সুনীল বরণ
দিগন্ত পরশি র'য়েছে প'ড়ে,
কত শত ঋভু আকাশে ছুটিয়া
সোণার রাজত্ব রেখেছে গ'ড়ে।

[৩]
নীচেতে আবার কত শত ফুল,
আলাপে কেবল কৌমুদী সনে
কত সখা সখী যুটেছে তাদের
বাড়ায়ে সোহাগ অল্প প্রাণে।

[৪]
একটী বালিকা অফুট' অবলা
আঁচল ভরিয়া তুলিয়া চাঁপা
দিয়া উপহার চাঁদের কিরণে
সাজাতেছে কভু সাধের খোঁপা।

[৫]
অন্যমনে কভু সুললিত সুরে
গুণ্ গুণ্ স্বরে ধরিয়া তান
গায়িতেছে বালা বিজনে একেলা
সুমধুর হায় একটী গান!

[৬]
সেই গান এবে অতি দূর দেশে
করে প্রতিধ্বনি চাঁদিমা তারা
আকাশেতে শুনি চকোর মাতিছে
সেইই মেতেছে শুনেছে যারা।

[৭]
গায়িতেছে গান হাতে করি মালা
ঘাড়টী তাহার পড়িছে নুয়ে
জেনেও জানেনা ভাব কি তাহার
গলিয়া পড়িছে মোহিনী মেয়ে।

[৮]
সহসা তাহার যেন ঘুম ঘোরে
সাধের খোঁপাটী এলিয়ে গেল
সরলার প্রাণ অঘোর ভাবেতে
কে যেন আসিয়া ভাসায়ে দিল।

[৯]
তবুও 'বালিকা অসাড় এখন'
"কপোলেতে চুল করিছে খেলা"
পশ্চাতে কে যেন চোকটী টিপিল
ভাঙ্গিল অমনি সাধের মেলা;—

[১০]
ছড়াইয়া ফুল অবলা সরলা
চমকি উঠিল পেছনে চেয়ে
সরমে মাথান মু'খানি অমনি
ধরিল রক্তিমা মোহিনী মেয়ে।

[১১]

পলাল' যুবক কি যেন কি ভাবি
আপনার মন বিলায়ে দিয়ে
বালিকা ধরিল আবার সংগীত
আকাশ, চাঁদিমা, তারাতে চেয়ে—

[১২]

"আকাশের তারা তুলিয়া যতনে
বাছি বাছি আমি পরিব চুলে
চাইনা চম্পক প্রলাপ বৰ্দ্ধক
সাজিবনা আর এসব ফুলে।

[১৩]

"তুলিবনা আর মল্লিকা মালতী
ছুঁইবনা আর কুসুম রাশি
আকাশেতে উঠে চুপে চুপে গিয়ে
করিব হরণ চাঁদের হাসি।"

একটী চিন্তা।

সময় বাসন্তী পূর্ণিমা ; স্থান সমুদ্র তীর।

[১]

আশার সুবর্ণ-সিন্ধু
হৃদয়-গগন-ইন্দু
হৃদয় জুড়ান ধন——প্রেমপারাবার।

অমলিন অনাঘ্রাত
রজত কৌমুদীস্নাত
প্রাণের জীবন্ত মণি—লাবণ্যের হার!

সরলে আমার।
ছাড়িয়ে এসেছি তোমা দূর দেশান্তরে
হৃদি বলিদান দিয়ে
প্রাণ-রত্ন বিসর্জ্জিয়ে
জীবনের সুখ-ছবি ডুবায়ে সাগরে
তবু——সেই সরলতাময়
কুঠিরের কুবলয়
প্রীতিমাখা স্থির দৃষ্টি নয়ন নলিন
কেন— চিত্তস্রোত পারাবার
উচ্ছ্বসিছে অনিবার
শারদ বাসন্তী শোভা কলঙ্ক বিহীন
সে বদন শশধরে
হৃদয়ের পারাবারে
স্মৃতিলো! কেন তোল?
থাক্ ঢাকা কালের কলঙ্কে
আর খুলনা আর খুলনা।

[২]

দুঃখের সাগরে—সুখের তরণী
প্রাণের সরলা মম,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক, আজি সে তরণী
দি'ছি ভাসাইয়া অনন্ত সাগরে!
যদি রে প্রকৃতি! দয়া ধর্ম্ম ভাব
সরল—উদার—প্রীতির প্রবাহ—
থাকে তোর হৃদে,—রাখিস্ পালিয়ে
প্রবাসী-হৃদয় মাণিক ধনে!
বহুদিন ধরে ভেবেছি হৃদয়ে
কেমনে? কেমনে?—সংসার শ্মশানে
সঁপিব সরলা কমল ফুল!
ছিঁড়িলাম মায়া—তবু ছিঁড়িলনা প্রেম
—সরগ রাজ্যের সরল ফুল।

কুঠিরের কুবলয়—অভাগা হৃদয়ে
আপনি ফুটিল, খেলিত আপনি
দারুণ সংসার জ্বালা—পবিত্র প্রণয়
—ভুকড়ার আশা—দহিল প্রাণ।

[৩]

প্রেয়সিরে!
কিজানি কি আশা করে
এসেছি ছাড়িয়ে তোরে
কুসুম যৌবন, সেই সরল রতনে
বন উদাসিনী!
পুড়ে প্রাণ সেই জ্বালা—অভাগা জীবন
কোথায় নলিনি!

[৪]

সরলে সরলে ওরে! পারিনে পারিনে
প্রাণ—কেন যে এমন করে তাওত জানিনে
নহে ইহা অন্য স্থানে
নিত্য জ্বলে প্রাণে প্রাণে
নহে ইহা রক্ত মাংসে অস্থিতে অস্থিতে
অসাধ্য বিরহ জ্বালা পারিনা সহিতে।

[৫]

হায় স্মৃতি! কি বলিব আসিবার দিন
প্রাণে আর কত সহে
কত রক্ত বুকে বহে
সে দিন দেখিয়াছি যেই বদন মলিন
কিসেনা দেখিয়া তারে
ছেড়ে আসি একেবারে
প্রাণ কি পাষাণময় এতই কঠিন?
সেই সরলতাময়,
কুঠিরের কুবলয়,
প্রীতিমাখা স্থির দৃষ্টি— নয়ন নলিন
দেখিনু মুহূর্ত্ত তরে,
সে বদন শশধরে
শারদ বাসন্তী শোভা কলঙ্ক বিহীন
দেখিলাম হায় স্মৃতি! আসিবার দিন!

[৬]

হে বারিন্দ্র!
সেই দিন—সেই সন্ধ্যা সরসীর তীর
কত দিন—নদ নদী কানন গভীর
কত দূর ব্যবধান
প্রাণের সমাধি স্থান
বহেনা সে দেহ গন্ধ এ দেশে সমীর,
সন্ধ্যার শীতল ছায়া
ভাসায়না কম কায়া
তোমার এ নীল জলে—প্রীতি তরণীর,
নিত্য এ মলিন বেশে
আসি এই তীর দেশে
কোথায় স্বর্গের সেই কমল কুঠির?
সেই দিন—সেই সন্ধ্যা সরসীর তীর?
নহে এ সুখের ঠাঁই,
সরলা চপলা নাই,
আছে সেই শেষ স্মৃতি—মাখা অশ্রুনীর!
এ সাধনা—উপাসনা
নিত্য এই বিড়ম্বনা
এ ক্ষুদ্র বল্মীক বক্ষে—প্রাণ সমাধিতে
এ যন্ত্রণা দুর্ব্বিসহ
জ্বলে প্রাণ অহরহ
লভিব অনন্ত শান্তি চিরবিস্মৃতিতে!

[৭]

বহিয়ে তরঙ্গশিরে
ফ্যালরে নীরধি নীরে
প্রাণের অসহ্য চিন্তা দূরে সরাইয়া!
ভস্মশেষ হৃদয়ের
শেষ বহ্নি শ্মশানের
হে বারিন্দ্র! তব জলে লও ভাসাইয়া!

[৮]

ধর তব বক্ষে আজি শ্মশান আলয়
প্রবাসীর দেহ!
দেহ স্থান আজি মোরে হে নীলাম্বু স্বামি!
উঠিয়ে—পড়িয়ে ভাসিয়ে যাইগো!
মিশায়ে মিশায়ে তোমার নীরে
কত যে সহিনু কোথায় রহিনু
পাবেনা দেখিতে জগতে কেউ।
অপার অনন্ত তোমার সলিলে
প্রবাসী ভাসিয়ে গেল যে কোথা?
কারে কে বলিবে—কেই বা জানিবে
কেই বা শুধাবে আমার কথা?
যাতনার জালা জ্বলন্ত অনল
ফুটে'ছে হৃদয়ে মিশা'বে আজ
সরলার প্রেম স্বপন সরল
রেখেছিনু হৃদে নিবিল আজ।

আমার জীবনী সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব কাহিনী।

আমার অপূর্ব্ব জীবনী পাঠকগণ কর-কমলে সাদরে সমর্পণ করিতে চলিলাম। ইহাতে বহুবিধ শিক্ষনীয় বিষয় সন্নিবেশিত আছে; অতীব যত্ন সহকারে অনেক আশ্চর্য্য২ বিষয় সকল ইহাতে প্রকটিত করিলাম। ভরসা করি আমার জীবনীকে আদর্শ করিয়া সুচতুর পাঠক পাঠিকাগণ স্ব স্ব চরিত্র সংগঠনে প্রবৃত্ত হইবেন।

অনেক দিন হইল আমি এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। যে গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি, শুনিলাম, সেখানে ইতঃপূর্ব্বে আমার ন্যায় আরও অনেকেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং সেই স্থান আমাদের "জন্মস্থান" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমার আত্মীয়গণ বলেন আমি একটী বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের গর্ভে উৎপন্ন হই। সেই স্ত্রীলোকটীই নাকি আমার জননী। একথা প্রমাণ ব্যতীত আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি এত বড় বিদ্বান্, বীর্য্যবান্ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া যে একটা অবলা স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব এ কথা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। নিশ্চয়ই আমার কোন শত্রু অসূয়া-পরবশ হইয়া এই বিজাতীয় অপবাদ সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছে। শুদ্ধ ইহাই বলিয়া পামর নিন্দুকগণ ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা নাকি আরও বলিয়াছে আমি শৈশব কালে অসহায় ছিলাম, মাতার স্তন পান করিতাম, ও পিসী মাসীর কোলে কোলে বেড়াইতাম। স্ত্রীলোকের স্তন পান করিয়া আমি মানুষ হইয়াছি! ছি ছি! কি লজ্জার কথা! কেন মহাশয়, আমি কি কাপুরুষ যে স্ত্রীলোকের সাহায্যে আবার মনুষ্য হইব। হে রমণীবিদ্বেষী ভ্রাতৃগণ! আপনারা বলুন দেখি রমণী আবার কি কখন আমাদের তোমাদের ন্যায় তেজীয়ান্ পুরুষকে কোলে করিয়া দুগ্ধ দানে মানুষ করিয়া দিতে পারে? স্ত্রীলোকের গর্ভে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি ইহা

মিথ্যা কথা, বরং আমাদের গর্ভে স্ত্রীলোক উৎপন্ন হইয়াছে এক দিন বলা যাইতে পারে। কেননা আমরা পুরুষ, পুরুষেরা না করিতে পারে এমন কার্য্য পৃথিবীতে আর কি আছে? আমি স্বয়ং স্ত্রী কি পুরুষ প্রথমতঃ এ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হয়। পরে যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাস করিয়াছি যে আমি স্ত্রী নহি, পুরুষ! কোমৎ দর্শন ও মিলশাস্ত্র অধ্যয়ন করা অবধি আমি যে-সে কথায় আর বড় একটা আস্থা প্রদর্শন করি না। দুই একটী প্রমাণ ও যুক্তি এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; ইংরাজী ভাষায় "HE" শব্দটী পুং-লিঙ্গ বাচক শব্দ এখন যদি প্রমাণ করিতে পারি আমি "HE" তাহা হইলেই জানা গেল আমি পুরুষ। একদিন আমার পিতা (এ-স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে আমার পিতা পুরুষ; স্ত্রী নহেন। আমি যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তবে এ কথা বিশ্বাস করি-য়াছি।) তাঁহার কোন বন্ধুকে আমার বিষয় লিখিতে২ এই পুংক্তিটী লিখিয়াছিলেন "But he is a fool *।" এতদ্বারা প্রতি-পন্ন হইল আমি পুরুষ। আরও প্রমাণ আছে। আমি চুরট খাই, ছড়ি হাতে করিয়া পথে পথে মস্ মস্ করিয়া বেড়াই, মদ ভূদভাবে গাঁজা বা তাড়ী খাইয়া থাকি, ভূতকে প্রহার করি, সুন্দরী বৌ ঝি দেখিলে লাফাইয়া উঠি, বক্তৃতা করি, তর্ক করি, ঈশ্বর ভয় রাখি না, মিল বেন্থাম কণ্ঠস্থ করি-য়াছি, "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এ বিষয় বেশ বুঝিয়াছি তবে আমি পুরুষ নই ত কি? এ সব তো পুরু-ষেরই কায। আমরা কি কোমল প্রাণা অঙ্গণা যে অপরের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিব, পরের জন্য নিজের শরীরকে কষ্ট দিব, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, ঈশ্বর, ঈশ্বর, করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিব? আমরা যে পুরুষ জাতি!! আমা-দের কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র। আমার বিবাহ হইয়াছে। আমি এতদূর পরোপকারী যে নানা রূপ ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া বিবাহ রাত্রে স্বয়ং বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকিয়া আমার পত্নীর পাণি গ্রহণ করি। আমার শ্বশুরকে কন্যাভার হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্যই এতদূর কষ্ট স্বীকার করা, নহিলে আমার নিজের কোন বিশেষ উপকার নাই। আমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছি—শুনিতে পাই সে নাকি স্ত্রীলোক। আমার অপেক্ষা আবার বয়সে ছোট। ইহারি লজ্জার বিষয়। কিন্তু কি করিব বল, পরের উপকারের জন্য সকলই করিতে হয়। আমাদের উদ্বাহ ব্যাপার নানা রূপ দোষ ও ভ্রম পূর্ণ। এই সকল দোষ সংশোধন করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা আছে। পুরুষের সহিত স্ত্রী-লোকেরই যে বিবাহ হইবে এ কথার কোন মানে নাই। প্রস্তাব করি স্ত্রীলোকে স্ত্রী-

---

* আমি লুকাইয়া পিতার এই চিঠিখানী পড়িয়াছিলাম। বাবা যে এত মুর্খ পূর্ব্বে জানিতাম না। তিনি ফুলের ইংরাজী নাম জানিতেন না অথচ বন্ধুর কাছে আমার সুখ্যাতি করাও তেঁই চাই, এই জন্য মুর্খ পিতা ফুল শব্দটী ইংরাজী অক্ষরেই লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ত আর বোকা নই সে রূপ ভুল পাপ্ করিব কেন? উল্লেখ করা বাহুল্য আমি "fool" টী কাটিয়া তাহার স্থানে "Flower" এই শব্দটী লিখিয়া দিয়াছিলাম।

লোকে ও পুরুষে পুরুষে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হউক। একটী আইন্ পাশ করিয়া আমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হউক তাহা হইলে অনেক কুলিনের মেয়ে ও অনেক বংশজ শ্রত্রীয়দের আইবুড় ছেলে এ যাত্রায় বাঁচিয়া যায়। আর স্ত্রীলোকেরাই বা কেন চিরকাল প্রসব বেদনা সহ্য করিয়া মরে। আইন্ হউক এবার অবধি পুরুষদিগকেই সন্তান প্রসব করিতে হইবে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণ করিয়া ভারতে এক অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি অবলাগণের বিজাতীয় যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য মহামতি বেণ্টিঙ্ককে ধরিয়া বসেন। যাহাতে স্ত্রীলোকেরা প্রসব বেদনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় এই জন্য এক আইন্ প্রণয়ন করিবার জন্য ভারতবন্ধু পুণ্য শ্লোক উদার হৃদয় ভূতপূর্ব্ব শাসন কর্ত্তা লর্ড লিটন বাহাদুরকে অনুরোধ করি। লিটন মহাত্মা নাকি ভারতের এক জন অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন তাই তাঁহার নিকট আবেদন করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি গরিব ভারতকে কাঁদাইয়া শীঘ্রই লণ্ডন যাত্রা করিলেন। কাজেই আমাদের অনুরোধ আর রক্ষা করিতে অবসর পাইলেন না। এখন মা কালীর নিকট প্রার্থনা করি মহাত্মা লিটন পুনরায় যেন ভারতের শাসন কর্ত্তা হইয়া আমাদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য এখানে শীঘ্রই উপস্থিত হন। ভগবান শীঘ্র সেই শুভদিন আনিয়া দিন।

আমি খুব পরিশ্রমী—ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি। আমি স্বয়ং ভোজন করি, স্বয়ং ভ্রমণ করি এমন কি শৌচ প্রস্রাবাদি ত্যাগের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি না। সমস্তই নিজে করিয়া থাকি, আমি মৎস্য মাংস আহার বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছি; পাছে একেবারে ছাড়িলে পীড়িত হইতে হয় এই ভয়ে কেবল দুই বেলা ভোজনের সময় মাছ মাংস খাইয়া থাকি। অন্য সময় বড় একটা খাইনা। আর গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিনা. তবে প্রতি দিন স্নান করিবার পূর্ব্বে যা একটু মাখিয়া লই। আমার আরও বিস্তর গুণ আছে। আমি কোমৎ পাঠ করিয়া ঈশ্বর ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। হিন্দু ধর্ম্ম, বুদ্ধ ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম, সমুদয়ই ছাড়িয়া দিয়া এখন কেবল স্ত্রী ধর্ম্মেরই পক্ষপাতি হইয়া পড়িয়াছি। স্ত্রী ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইহাই কলিযুগের উপযুক্ত ধর্ম্ম। আর ডারউইন্ প্রণীত গ্রন্থ গুলি পড়িয়া অবধি আমি কিছু শান্ত হইয়াছি। ছেলে বেলা আমার স্মরণ হয়, ডারউইনের পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদের বাটীর সমীপবর্ত্তী একটা বৃহৎ তেঁতুলগাছে বসিয়া বড়ই গোলমাল করিত, আমাদের হাত হইতে সসা, কলা কাড়িয়া লইয়া খাইয়া ফেলিত। আমরা বিরক্ত হইয়া শাঁক ঘণ্টা কাঁশর প্রভৃতি বাজাইতেই ডারউইনের আদি পুরুষগণকে তাড়াইয়া দিতাম। কিন্তু বড় হইয়া সে সব আর কিছু করি না। এখন তাহাদের (না না তাঁহাদের) বিরক্ত করা আমাদের আর কর্ত্তব্য নহে তাঁহারা আমাদের আদি পুরুষ কিনা!!

আমি সাধু নিন্দা প্রচারকালীন প্রসিদ্ধ

সিসিরো, অপরের সর্ব্বনাশ করিবার সময় নিরোর বেশ ধারণ করি। আমি কখন হই কনিক, কখন হই বিভীষণ, কখন হই শকুনি, কখন হই যুধিষ্ঠীর। সভাস্থানে হই মূর্খ; সৎকার্য্যের বেলা পঙ্গু হইয়া পড়ি। আমার গুণ অসাধারণ। হে বালকগণ! হে যুবক-বর্গ! হে প্রবীন বৃদ্ধ সকল! আমি অনুরোধ করি সবাই আমার ন্যায় উন্নত হৃদয় সাধু পুরুষ হইতে কায়মনে প্রয়াস পাইও। এখন আসি। ইতি—

(*) সত্যানন্দ শর্ম্মাঃ।

* নামের আগে 'শ্রী' নাই বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। পরীচিত ব্রাহ্মণের উপবীতের প্রয়োজন? যে স্বয়ং শ্রীমান তার শ্রী লেখা আর না লেখা দুইই সমান।

ভবভূতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিম্নে শকুন্তলা ও রত্নাবলী হইতে কয়েকটী চিত্র প্রকটিত হইল; পাঠকগণ সহজে হৃদয়-ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

শকুন্তলা। "কহং গতা ও এব।"

রাজা। "অলমাবেগেন। নম্বয় মারাধয়িতা
জনস্তব সমীপে বর্ত্ততে।
কিং শীতলৈ; ক্লমবিনোদিভি-
র্বার্দ্রবাতান্
সঞ্চরয়ামি নলিনী-দলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথা
সুখংতে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্ম তাম্রৌ॥

শকুন্তলা। "ণমাননী এষু অত্তাণং অব-
রাহইস্সং। (উত্থায় গন্তুমিচ্ছতি)

রাজা। "সুন্দরি অনির্ব্বাণো দিবসঃ।
ইয়ংচতে সমবস্থা।
উৎসৃজ্য কুসুম শয়নং নলিনীদল
কল্পিত স্তবাবরণং।
কথমাতপে গমিষ্যসি পরিবাধা-
পেন বৈরঙ্গৈঃ॥
(বলাদেনাং নিবর্ত্তয়তি।)

শকুন্তলা। "পৌরব রক্খ অবিণঅং মঅণ
সন্তত্তা বিণহুঅওণোপভবামি।"

রাজা। "ভীরু অনং গুরুজন ভয়েন।
দৃষ্টাতে বিদিত-ধর্ম্মা
তত্র ভবানত্র দোষং ন গ্রহিষ্যাতি
কুলপতিঃ।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্বোরাজর্ষি
কন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভি-
শ্চাভিনন্দিতাঃ॥"

শকুন্তলা। "মুঞ্চদাবমং। ভুওবিবাহী জনং
অণুমাণ ইস্সং।"

রাজা। "ভবতু মোক্ষ্যামি।"

শকুন্তলা। "কদা।"

রাজা। "অপরিক্ষত কোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়াতে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য॥"
(মুখমস্যাঃস্যান্নময় তুমিচ্ছতি)

শকুন্তলা। (পরিহর তিনাট্টেন।)

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

রাজা। "দৃষ্টিং রুষা ক্ষিপসি ভামিনি যদ্যপি মাং
স্নিগ্ধেয় মেষ্যতি তথাপি নরূক্ষ ভাবং॥
ত্যক্ত্বা ত্বরাং ব্রজ, পদস্খনি তৈরয়ংতে।
স্বেদং গমিষ্যতি গুরুর্ণিতরাং নিতম্বঃ॥"

সুসং। "ভট্টা অদি কোপণাস্খু এসা; তা অগ্ন হথেণ নিহঅ পসাদেহিণং।"

রাজা। (সানন্দং) যথাহভবতী। (সাগরিকাং হস্তে গৃহীত্বা স্পর্শ সুখং নাটয়াতী।)

বিদূষক। জে এষা ক্খু তুএ অপুব্বা সিরি সমাসাদিদা।

রাজা। বয়স্য! সত্যম্।
শ্রীরেষা প্পানিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ।
কুতোঽন্যথা শ্রবত্যেষ স্বেদচ্ছদ্মামৃত দ্রবঃ॥

সুসং। সহি! অদক্খিনাসি তুমং দাণিং জা এব্বং ভট্টিনা হথেণ গহি দাবি কোবং ন মুঞ্চে- নসি।

রাজা। (সভ্রভঙ্গম্) সুসংঙ্গদে! অক্লপিণ বিরমেসি।

রাজা। অয়ি নখলু সখী জনে যুক্তমেব কোপনু বন্ধং কর্ত্তুম্।

বিদূ। ভো! এসাক্খু অবরাদেবী বাসব দত্তা।

রাজা। (সচকিতং সাগরিকায়া হস্তং মুঞ্চতি।") •

রত্নাবলী।

উত্তর রামচরিতের চিত্রখানি যেরূপ পবিত্র ও মনোহর ভাবব্যঞ্জক এই দুইটী সেরূপ নহে। ইহা পাঠ করিলে অন্তঃকরণে যেন এক প্রকার কলুষিত আমোদের উপলব্ধি হয়; নির্ম্মল ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার উজ্জ্বলিত দীপশিখা যেন তৈল বিহীন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে এবং স্বার্থপরতা রূপ ঘোর অন্ধকার তাহার চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। উত্তর রামচরিতের চিত্রখানি যেরূপ হৃদয়কে অকৃত্রিম ভালবাসায় মোহিত করে, ভক্তিরসে উত্তেজিত করে, এ চিত্রদুটী সে রূপ নহে; ইহা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন এ ভালবাসা নিঃস্বার্থ ভালবাসা নহে ইহাতে কোন প্রকার স্বার্থ আছে।

সীতা, রামের একমাত্র প্রণয় পুত্তলি ছিলেন। তজ্জন্য তিনি রামের জীবনের জীবন, গৃহের লক্ষ্মী, নয়নের অমৃত শলাকা; সুতরাং তাঁহাদের প্রণয়ও অকৃত্রিম এবং নিস্বার্থ। সীতার কষ্ট হইবে বলিয়া রাম শৈশবে, যৌবনে, কি গৃহে, কি বনে স্বকীয় বাহুকে তদীয় উপাধান কল্পনা করিয়াছিলেন; এবং অদ্যও তাঁহাকে সেই উপাধানে শয়ন করাইলেন। কিন্তু দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রণয় কি সেইরূপ? দুষ্মন্ত যেন তাঁহার অসংখ্য অবরোধ সহকারে বহুকাল বিহারে

বীতভৃষ্ণ হইয়াছেন, অদ্য তপোধন পালিতা অপার্থিব রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না শকুন্তলাকে দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি আর হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। "হে সুন্দরি! ষট্‌পদেরা যেরূপ অপরিক্ষত কোমল অভিনব পুষ্পের মধু পান করে আমিও সেই রূপ তোমার অধর-পিপাসী হইয়া উহার মধু পান করি।"—(১)—বলিয়া চুম্বনার্থ শকুন্তলার বদন সমুন্নত করিতে অভিলাষী হইলেন; শকুন্তলা তাহাতে অতিমাত্র লজ্জিতা হইয়া পরিহার করিতে লাগিলেন।

একস্থানে শকুন্তলা সখীগণের সন্নিধানে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন; রাজা অমনি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। এই বলপূর্ব্বক নিবারণের গূঢ়ভাব শকুন্তলার উক্তিতে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। শকুন্তলা বলিলেন—"পৌরব! অশিষ্টাচারিতা পরিত্যাগ কর, মদন সন্তপ্তা হইলেও আমি স্বাধীনা নহি। দুষ্মন্তের ও শকুন্তলার কথোপকথন শ্রবণ করিলে, বোধ হয়, যেন রিপু চরিতার্থই ইহাদের প্রণয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ স্বর্গীয় প্রণয় যাহাকে বলে তাহা ইঁহাদের মধ্যে নাই।

রত্নাবলীর চিত্রটীও অনেকাংশে শকুন্তলার অনুরূপ। কিন্তু ইহাতে তত অশ্লীলতা নাই। বৎসরাজ ও সাগরিকার প্রণয় ভাব অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও বিশুদ্ধ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই একটী অশ্লীল শব্দ প্রয়োগের জন্য কিঞ্চিৎ কলুষিত বলিয়া বোধ হয়।

বীর রস বর্ণনায় ভবভূতি একজন অদ্বিতীয় কবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তদীয় রচনা স্বভাবতই ওজস্বী; তিনি বীররসাদি বর্ণনা কালে গূঢ়ভাবাত্মক কবিতা সকল ওজস্বল শব্দ-সংশ্লিষ্ট করিয়া এরূপ ভাবে রচনা করিয়াছেন যে, ঐ সকল কবিতা অধ্যয়ন কালে তদন্তর-নিহীত-গূঢ়ভাবে অন্তঃকরণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। শিরায় শিরায় প্রবহমান শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে ভীতি, রোমাঞ্চ প্রভৃতি আনুসঙ্গিক ব্যাপার সকল উপস্থিত হইতে থাকে। কালিদাস তাঁহার কাব্যাদিতে অনেক স্থলে বীররস বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যদিও ঐ সকল বর্ণনা কোন অংশে নিন্দনীয় নহে, তথাপি উহা ভবভূতির সমকক্ষ কিছুতেই হইতে পারে না। কালিদাসের বর্ণনা যেন ক্ষুদ্র তটিনীর স্রোতের ন্যায় একদিক হইতে ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে—উহাতে গভীর আবর্ত্তের শ্রবণ-বধির-কারী শব্দ নাই—ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় তোলপাড়কারী আন্দোলন নাই। যেমন চলিয়া আসিতেছে তেমনি চলিতেছে। পাঠকবর্গের বিশেষ উপলব্ধির নিমিত্ত দুই জনের দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ঝণঝণিত কঙ্কণ কণিত কিঙ্কিণী কং ধনু
র্ধনদ্‌গুরু গুণাটনীকৃত করাল কোলাহলম্।
বিতত্য কিরতো! শরানবিরত স্ফুরচ্চ‌ূড়ো
বিচিমভিবর্দ্ধতে ভুবন ভীম মায়ো ধনম্॥"

উত্তর রামচরিতম্।

"আবৃণ্বতো লোচন মার্গমাজৌর জোহন্ধকারস্য বিজৃম্ভিত স্য। শস্ত্র ক্ষতাশ্বদ্বিপবীর

(১) কোন কোন পুস্তকে এই কবিতাটি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ সকল পুস্তকেও এইরূপ স্থলে এ প্রকার অশ্লীল ভাবের অভাব নাই।

জন্মা বাণ ঝণোঽভূদ্রুধির প্রবাহঃ ॥"

রঘুবংশম্।

ভবভূতি কিঙ্কিনীর ঝণ্ঝণবৎ ধ্বনিতে ধনুর ভীম আরবে স্বর্গীয় দুন্দুভির ভীম-গর্জ্জনে রণস্থল শব্দায়মান করিলেন। আর কালিদাস যোদ্ধৃগণের নেত্রাচ্ছাদনকারী রজোন্ধকার সৈন্যরক্তদ্বারা নিবারণ করিলেন। এইরূপে কালিদাস বিভীষিকাময় রণস্থল বর্ণনা করিতে করিতে এক এক স্থানে হাস্য-রসের অবতারণা করেন। আমরা নিম্নে সেইরূপ একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"উপান্তয়োর্নিকুঞ্চিতংবিহঙ্গৈরাক্ষিপ্যতেথঃ পিষিত প্রিয়াভিঃ। কেয়ূর কোটি ক্ষততালু দেশাশিবাভুজচ্ছেদমপা চকার ॥ কশ্চিৎদ্বিষৎ খড়্গ হৃতোওমাঙ্গ সদ্যোবিমান প্রভুতামুপেত্য। বামাঙ্গ সংসক্ত সুরাঙ্গনাস্বংনৃত্যৎকবন্ধং সমরে দদর্শ ॥ পরস্পরেণক্ষতয়োঃপ্রহর্ত্রোরুৎক্রান্ত বায়্বো সমকালমেব। অমর্ত্ত্যভাবেঽপিকয়োশ্চিদাসীবদকাসরঃপ্রার্থিতয়োর্বিবাদ ॥"

রঘুবংশম্ ॥

ভবভূতির রসভঙ্গ দোষ ছিলনা। তিনি যখন যে রস লিখিতেন তাহাতে অন্যপ্রকার ভাব কখনও প্রবিষ্ট হইত না। তবে যে তিনি নিতান্ত নির্দ্দোষী ছিলেন একথা নহে। এ জগতে যিনি যত বড় কেন গুণবান হউন না তাঁহাকে কোননা কোন দোষে দোষী হইতে হইবেই হইবে। সেই নিয়মানুসারে মহাকবি ভবভূতিরও কতগুলি দোষ আছে। প্রথমতঃ তিনি একজন প্রধান অহঙ্কারী, কালিদাস সদৃশ কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কালিদাসের হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না। তিনি রঘুবংশের আদিতে যে প্রকার নম্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে, এরূপ লোক অতি অল্পই আছে।

কিন্তু ভবভূতির তাহা ছিলনা। ভবভূতির প্রত্যেক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ যেন মূর্ত্তিমান অহঙ্কার বিরাজ করিতেছে। ঈদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির এতাদৃশ অহঙ্কার যে কতদূর প্রশংসনীয় তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে সকল সময় সমান নহে। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক আমাদের চক্ষে উহা মন্দ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু হয় ত তাঁহার সময় উহা প্রশংসার কার্য্য বলিয়া আদৃত হইত। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রশংসার কার্য্য বলিয়া কখন পরিগণিত হইতে পারে না।

ক্ষমতাশালী ব্যক্তির যশোরাশী আপনা আপনি ভুবন বিখ্যাত হয়। তজ্জন্য তাঁহাকে কিছুমাত্র যত্ন করিতে হয় না। ভবভূতি, যেরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আত্মশ্লাঘা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তদীয় যশোপঙ্কজ—পরিমল-লোভী অলিকুল চতুর্দ্দিক হইতে আপনা আপনি আগমন করিত। ভবভূতি যদি গ্রন্থারম্ভে ওরূপ সাহঙ্কার বাক্য প্রয়োগ না করিয়া কালিদাসের ন্যায় মৃদুভাব অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে সবিশেষ প্রশংসনীয় হইতেন সে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

ভবভূতির ন্যায় জয়দেবও একজন অহঙ্কারী কবি ছিলেন। তৎপ্রণীত গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে কতকগুলি গর্ব্বিত বাক্য দৃষ্ট

হয়। কবিবর জয়দেব যে ঐ সকল ভবভূতি হইতে অনুকরণ করিয়াছেন সে বিষয় আর কাহার সন্দেহ হইতে পারে?

ভবভূতি-প্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে উত্তর-রামচরিতকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে; কিন্তু বোধ হয় ভবভূতির আন্তরিক অভিপ্রায় সেরূপ ছিল না। তাঁহার মতে মালতিমাধব সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক; কারণ তিনি মালতিমাধবের প্রস্তাবনায় ঐ নাটকের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি যাহাই বলুন আমাদের মতে উত্তর রামচরিত তাঁহার সর্ব্বপ্রধান রত্ন; তাহার নীচে বীরচরিত এবং সকলের নীচে মালতি মাধব। উত্তর রামচরিতের করুণ লহরী পাঠ করিতে করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, ও নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল আর্দ্র হইতে থাকে। এই করুণ রসমিশ্রিত নাটক খানি যতই পাঠ করা যায় উহার নূতনত্ব ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উন্মত্তাবাহ রামের পঞ্চবটী দর্শন, তদনন্তর ছায়াময়ী সীতার সহিত মিলন, এই সকল অংশ কবি এরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে পড়িলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

দুর্ব্বোহ শব্দ প্রয়োগ ও দীর্ঘ সমাস রচনা ভবভূতির অপর একটী দোষ ছিল। কালিদাসের গ্রন্থাদি যেরূপ সরল ও সুশ্রাব্য; ভবভূতির সেরূপ নহে। উহার স্থানে স্থানে এরূপ দুরূহ শব্দ সংশ্লিষ্ট যে, সহসা সে সকল স্থানের অর্থগম্য হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। প্রাকৃত ভাষা অতি মধুর বলিয়া স্ত্রী-উক্তিতে ঐ ভাষা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ভবভূতি দীর্ঘ২ সমাস সংযুক্ত করিয়া ঐ সকল উক্তি এরূপ দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন যে মধুরত্ব দূরে থাকুক প্রকৃত অর্থ বোধ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"সীতা। অহমহেদলন্নবণীলুপ্পলসামলসিণিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলদেহসোহগ্গেণ-বিম্মঅথিমিদতাদদীসন্তসুন্দরসিরীঅণাদর-খুংড়িদসংকরশরাসণোসিহগুমুদ্ধমুহমণ্ডলো অজ্জউত্তোআলিহিদো।"

উত্তর রামচরিতম্।

এই সকল অশেষ দোষে কলুষিত হইয়াও ভবভূতি স্বীয় অচিন্তনীয় কবি-শক্তিদ্বারা মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়াছিলেন। তিনি অন্তর ও বহির্জগতের মনোহারী চিত্র সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করিয়া জনসাধারণের মন ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার দোষ সমূহ এই অশেষ গুণ রাশির মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া "একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" এই মহৎ কবি বাক্যের প্রমাণাস্পদীভূত হইয়াছিল। কবিশক্তি অনুসারে বিবেচনা করিলে ভবভূতি কালিদাসের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক শতাংশের একাংশ-তুল্যও নহেন,—কালিদাস যে থানে হীরক খচিত হৈম সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন ভবভূতি সেখানে রজত সিংহাসন পান কিনা সন্দেহ। কিন্তু মনুষ্যেরা ধনবান্ হইলে বদান্য হয় না, বুদ্ধি থাকিলে পণ্ডিত হয় না, যিনি স্বকীয় ধনরাশি সৎপাত্রে প্রদান করেন অথবা যিনি স্বীয় বুদ্ধিশক্তির সৎব্যবহার করেন তিনি প্রকৃত বদান্য ও পণ্ডিত বলিয়া জন-সমাজে

আদৃত ও পূজিত হন।

কালিদাস অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব কোথাও ভালরূপে প্রযুক্ত হয় নাই। ভবভূতি যদিও তাদৃশী কবিত্ব-শালী ছিলেন না তথাপি প্রয়োগ কৌশলে তিনি স্থানে স্থানে কালিদাসেরও উপর আরোহণ করিয়াছেন। ভবভূতির গ্রন্থ পড়িয়া দেখ বোধ হইবে যেন, কোন জটাজুট-ধারী বেদজ্ঞ উগ্রতপা তেজস্বী বিপ্র কর্ত্তৃক রচিত, আবার কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ কর বোধ হইবে যেন কোন রস-নিপুণ রসিক চূড়ামণির প্রণীত। ইহা রুচির ভিন্নতা বশতঃ ঘটে,—যিনি যে প্রকৃতির লোক তাঁহার রচনাও সেই প্রকৃতির হইয়া থাকে। আমরা এ পর্য্যন্ত প্রকৃতিই সমালোচনা করিয়া আসিতেছি—ভবভূতির স্তাবক বলিয়া বোধ হয় অনেকের নিকট তিরস্কৃত হইব। কিন্তু বাস্তবিক কবিত্ব শক্তি অনুসারে আমরা (*) পদ্মনগরের কোকিলকে উজ্জয়িনীর কোকিলের উপরে আসন প্রদান করি নাই। কবিত্ব-শক্তি অনুসারে কালিদাস সমস্ত পৃথিবীর না হউক——ভারতবর্ষের অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ তত উৎকৃষ্ট নহে। এইজন্যই, বোধ হয়, পুরাকালীয় পণ্ডিতগণ সগর্ব্বে বলিতেন "কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ।"

শ্রী গৌরী নাথ চক্রবর্ত্তী।

(*) "অস্তি দক্ষিণ পথেষু পদ্মনগরং নাম নগরং" মালতি মাধবং।

প্রণয় পরিণাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আজ্ঞা।

মেরী অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিল। আসিয়া ধীরে ধীরে হরদয়াল বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। বাবু এতক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া মেরীর অমল ধবল শ্বেত পদ্মনিভ মুখখানির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। মেরী পশ্চাৎ ভাগ হইতে গিয়া বাবুর চক্ষু চাপিয়া ধরিল। সেই স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে কাহার হস্ত বাবুর জানিতে বাকি রহিল না; তখন উভয়ের হাতে হাতে একটী ছোটখাট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়া গেল। যুদ্ধে হরদয়াল বাবুর পরাজয় হইলে, মেরী জয়োল্লাসে মাতিয়া বিজিত শত্রুর নিকট আপনার প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লইল।

এই সকল শেষ হইয়া গেলে, হরদয়াল বাবু বলিলেন—"আজ যে মেঘ না চাহিতেই জল, এত অনুগ্রহ আজ কেন মেরী?"

কথা শুনিয়া মেরী কিছু গম্ভীর হইল, গম্ভীর স্বরে বলিল—"কি! আজ অনুগ্রহ! তোমরা বাঙ্গালি, কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, জান না। আমার অমন স্বামী বর্ত্তমানে আমি গোপনে তোমায় যেরূপ ভালবাসি, তুমি সে ভালবাসার মূল্য কি বুঝিলে?

আমার অনুগ্রহ, না অনুগ্রহ তোমার, আমি এখন ভালবাসিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছি, তাই আমার এখন দুর্দ্দশার একশেষ। মনে ভেবে দেখ দেখি, সাহেব কিম্বা আমার কোন স্বজাতীয় যদি ইহা জানিতে পারে, তবে আমার দশা কি হইবে? একে ত আমাদের জাতিতে তোমাদের ঘৃণা করে।"

মেরী পূর্ব্বদিন রাত্রে ফিল্ডিংয়ের Joseph Andrews পড়িয়াছিল, তাই ঐরূপ নিস্বার্থ ভালবাসা বাক্য দ্বারা জানাইতে পারিয়াছিল। হরদয়াল বাবু মেরীর কথা শুনিয়াই ভীত হইলেন, মনে মনে শত শত বার আপনাকে গালি দিলেন, এবং ব্যগ্রতার সহিত মেরীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"অপরাধ মার্জ্জনা কর।" কিন্তু কি অপরাধ করিয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

বিবির সে গম্ভীর মূর্ত্তি এখন আর নাই, আবার রসের হাসি হাসিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মদন শরও দুই একটী ছাড়িতে লাগিল। বাবু তখন সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কতক্ষণ আসা হইয়াছে?"

বিবি ঘাড় নাড়িয়া স্বর টানিয়া বলিল—

"অ-নে-ক-ক্ষ-ণ।"

"তবে এতক্ষণ তোমার দর্শন লাভে এ দাস বঞ্চিৎ ছিল কেন?"

"আমি এতক্ষণ অন্তঃপুরে সরমার নিকট ছিলাম।"

"অন্তঃপুরে! সরমার নিকট!"

হরদয়াল বাবুর হৃদয় ভয়ে আবার কাঁপিয়া উঠিল। মনে করিলেন আবার বুঝি কোন বিপদ উপস্থিত হয়। মেরী বলিল—

"আজ আমায় সরমা ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, তাই তাহার নিকট গিয়াছিলাম। তোমাকে আজ হইতে প্রত্যহ একবার করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া সরমাকে দেখা দিয়া আসিতে হইবে।"

"কেন? অপরাধ?"

"অপরাধ কিছুই নয়, আমার আজ্ঞা। এ আজ্ঞা রাখিবে কি?"

"তোমার অবাধ্য কবে? কিন্তু কেন এরূপ আজ্ঞা হইল জানিবার অধিকার আছে কি?"

"যদি কেহ কাহাকে প্রতিদিন একবার মাত্র দেখিলে সুখী হয়, তাহাতে কাহার আপত্তি আছে কি?"

"তাহাতে আবার আপত্তি কি?"

"তবে সরমা প্রতিদিন তোমায় একবার করিয়া দেখিতে চায়। তোমায় একবার করিয়া প্রত্যহ তাহাকে দেখা দিতে হইবে।" এই বলিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া বাবুর দাড়ি ধরিয়া বলিল—"তুমি আমারই থাকিবে, দেখিলে ত আর কিছু ক্ষয়ে যাবে না।"

এতক্ষণে—বাবুর দুর্ভাবনা দূর হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিপদে।

একটি বিস্তৃর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া এক থানি পাল্‌কি যাইতেছিল। বাহকদিগের কণ্ঠস্বর সেই নিস্তব্ধ মাঠ একবারে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল, এবং বাহকেরাও প্রাণপণে দৌড়িতেছিল। তখন ৫।৬ দণ্ড রাত্রি হইয়া গিয়াছে, পাল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে চারিজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছুটিতেছে, তাহাদের বাম হস্তে লণ্ঠন এবং দক্ষিণ হস্তে লাঠি ছিল। বাহকদের প্রাণপণে দৌড়িয়া যাইবার আর একটী কারণ ছিল,—আকাশে কাল মেঘ দেখা দিয়াছিল, ঝড়েরও পূর্ব্ব লক্ষণ সকল দেখা যাইতেছে, বাতাসও এখন পূর্ব্ব অপেক্ষা কিছু জোরে বহিতেছে। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হইলে বড় বিপদ, কারণ দুই ক্রোশ মাঠের মধ্যে দাঁড়াইবার স্থল নাই।

ক্রমে ক্রমে আকাশে কাল মেঘ সকল ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছুটিয়া ছুটিয়া মেঘে মেঘে মিলিত লাগিল; সে মেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল; এই রূপে ছুটিয়া ছুটিয়া মেঘেমেঘে জমাট বাঁধিতে লাগিল। তাহার পর মধ্যে মধ্যে দুই একটি বজ্রধ্বনিও আরম্ভ হইল।

এই সময় কোথা হইতে ২০।৩০ জন লাঠিয়াল আসিয়া হঠাৎ বাহক এবং দরওয়ানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহার পর উভয় দলের মধ্যে লাঠি চালিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কেবল লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ দিগ্‌দিগন্তর কম্পিত করিয়া তুলিল, আক্রমণকারীর মধ্যে অনেকে গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল। দুইজন দরওয়ানও গুরুতর আঘাত পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজন দরওয়ানের সহিত ৮।১০ জন লাঠিয়ালের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময় বাহকেরা ভীত হইয়া পাল্‌কি ফেলিয়া দৌড়িল। পাল্‌কির মধ্য হইতে কোন রমণীর আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল, কিন্তু তখন তাহাতে কর্ণপাত করে কে?

দেখিতে দেখিতে আক্রমণকারীদিগের মধ্যেও ৩।৪ জন ভূতলশায়ী হইল, এবং একজনদরওয়ান ও তাহাদিগের সঙ্গী হইল। আর অপর একজন হিন্দুস্থানী রমণীর করুণ বিলাপ ধ্বনিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত লাঠি চালাইতে লাগিল। এই সময় কড় কড় রবে নিকটে একটী বজ্রাঘাত হইল। যে কোন কারণেই হউক অবশিষ্ট আক্রমণকারীরা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তখন সেই হিন্দুস্থানী দরওয়ান, সেই রোরুদ্যমানা রমণীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, এবং তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখন যে নিরাপদ হইয়াছে তাহা রমণীকে বুঝাইয়া দিল। রমণী কিছু শান্ত হইল বটে, কিন্তু এখনও ভয় দূর হইল না। দরওয়ান প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া রমণীর উদ্ধার

করিল বটে, কিন্তু এখন আর এক বিপদে পড়িল, বাহকেরা সকলই পলায়ন করিয়াছে, এখন কি প্রকারে রমণীকে লইয়া যাইবে। এই সকল বিষয় সে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় আর একটি ভয়ানক শব্দ হইল, এ শব্দ মেঘগর্জ্জন বা বজ্রধ্বনির শব্দ নহে, ইহা বন্দুকের আওয়াজ। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যে হিন্দুস্থানী অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া দস্যু হস্ত হইতে রমণীকে উদ্ধার করিয়া এখন কি উপায়ে তাহাকে লইয়া যাইবে ভাবিতেছিল, সে ভূতলশায়ী হইল।

আবার রমণীর আর্ত্তনাদ আকাশমার্গ কম্পিত করিয়া তুলিল। সেই দুর্যোগ রাত্রি কালে-সেই বিজন মাঠের মধ্যে ঐ করুণ বিলাপ ধ্বনি কি হৃদয় বিদারক! কি মর্ম্মভেদী! কিন্তু ঐ বিজন মাঠে যাহরা ছিল, তাহাদের হৃদয় ছিল না। সুতরাং তাহার ফল কি হইবে? কিছুক্ষণ পরে জনকতক লোক তথায় আসিল, এইরূপ বোধ হইল। তাহার পর আকাশে আবার বিদ্যুৎ চমকিল, "সেই বিদ্যুতালোকে দেখা গেল যে, একজন ইংরাজ এক বন্দুক হস্তে ৮।১০ জন লোক সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত। কিন্তু সে নরহন্তা নরপিশাচ ইংরাজ কে? সে আর কেহ নয় আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত ইংরাজ-কুল-কলঙ্ক পাপাত্মা ম্যাকিণ্টস্!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অত্যাচারের উপর অত্যাচার।

প্রবোধ বাবুর পূর্ব্ব পরিচিত পাঠাগারে আজ, তিনি এবং সুরেন্দ্র বাবু উপবিষ্ট আছেন। তাঁহারা কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কারণ কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়ছেন, এবং কিসে সফল হইবেন, তাহার জন্য আজ গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে প্রবোধ বাবু বলিলেন—

"ভাই সুরেন! সৎকার্য্যে চিরকালই বাধা। কিন্তু তুমি যখন সকল বাধা—সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতেছ, তখন আমরা কোন ক্রমেই নিরুৎসাহ হইব না। আমি ও প্রাণপণে তোমার সহিত যোগ দিব। তোমার বালিকা-বিদ্যালয়, তোমার দাতব্য চিকিৎসালয়, তোমার হিতৈষিণী সভা অনন্তকাল তোমার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; তোমার দেশহিতৈষিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গভূমি উজ্জ্বল করিবে। কিন্তু এখন আমার প্রধান শত্রু ম্যাকিণ্টস্ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি?"

সুরেন্দ্র। যেরূপ সূচনা করা হইয়াছে, তাহাতে আর অধিক দিন আমাদিগকে

তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে না। সমস্ত ইংরাজ যদি ম্যাকিণ্টস্ হয় তাহা হইলেও পাপী পাপের শাস্তি হইতে নিস্তার পাইবে না। ধর্ম্মের জয় অবশ্যই হইবে, আজ হউক, কাল হউক, পাপীকে পাপের দণ্ড অবশ্যই লইতে হইবে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, যে আমাদের সদাশয় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণার নাকি আমরা যে অভিযোগ করিয়াছিলাম, তাহার তদারকের নিমিত্ত কোন উপযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে এখানে শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে পাপাত্মার সমস্ত দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কলিকাতার যে সকল মহাত্মাদিগের নিকট হইতে আমরা সাহায্য চাহিয়াছি, তাঁহারাও আহ্লাদের সহিত আমাদের কার্য্যে যোগ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তবে আমাদের আর ভয় কি?

প্রবোধ। ভয় নাই সত্য, কিন্তু তুমি ভাই নিশ্চয় জানিও, যে ম্যাকিণ্টস্ও নিশ্চিন্ত নয়, সে যাহাতে আমাদিগকে কোন বিপদে ফেলে, তাহার বিশেষ চেষ্টায় আছে; সেই জন্য বলি, আমাদেরও সাবধানে থাকিতে হইবে। তুমি আমার সহায় বলিয়া সে প্রাণপণে তোমারও অমঙ্গলের চেষ্টা করিতেছে, পামর এমনি নরাধম যে তোমার বালিকা বিদ্যালয়, তোমার দাতব্য চিকিৎসালয়, যাহাতে উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টায় আছে। আবার শুনিলাম, তোমার হিতৈষিণী সভাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া মেজেষ্ট্রেটের নিকট নাকি আবেদন করিয়াছে। পাছে আমার জন্য তোমার কোন বিপদ ঘটে, আমার সেই ভয়।

সুরেন্দ্র। কোন ভয় নাই, জগদীশ্বর আমাদের সহায়।

এই সময় বাহিরে একটা গোলযোগ উঠিল, কে যেন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে।" প্রবোধ ও সুরেন্দ্র উভয়েই চমকিয়া উঠিল, এই সময় রমা পাগলা এবং চারি পাঁচজন লোক গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবোধ বাবু ও সুরেন্দ্র বাবু উভয়েই আগ্রহের সহিত গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সকলেই একবারে বলিয়া উঠিল—"খুন! সর্ব্বনাশ!!" আর কোন কথা কেহ বলিল না। তাঁহারা ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময় কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রবোধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন— "বিরাজ মামার বাড়ি হইতে আসিতেছিল, কাল সন্ধ্যারপর রূপপুরের মাঠে হঠাৎ ডাকাইত পড়িয়া তাহাকে কোথায় লইয়া।"—কুসুম আর বলিতে পারিল না, কারণ দেখিল যে সে কথা শুনিয়া প্রবোধ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিল,—সুরেন্দ্র রাগে কাঁপিতেছিল।

কিছুক্ষণ গৃহ একবারে নিস্তব্ধ, কাহার মুখে কথা নাই, সকলেরই মনে২ এই সর্ব্বনাশের বিষয় ভাবিতেছিল। প্রবোধ কিছুক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ভাই সুরেন্দ্র, আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। কিন্তু এ ডাকাইত কে?"

সুরেন্দ্র। ডাকাইত আর কেহ নয়—এ ইংরাজ-কুল-কলঙ্ক পাপাত্মা ম্যাকিণ্টস্। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিরাজ মোহিনীর সঙ্গে

কি কেহ ছিল না।

কুসুম। যে লোক আমাদের সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, সে বলিল তাঁহার পাল্‌কির সঙ্গে চারিজন দরওয়ান ছিল; কিন্তু ডাকাইতরা অনেক। তাহাদের মধ্যে তিন জন গুরুতর আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সকালে তাহাদিগকে ডুলি করিয়া আনা হইয়াছে, আর অপর এক জন খুন হইয়াছে।

প্রবোধ। এ যে আবার অত্যাচারের উপর অত্যাচার।

সুরেন্দ্র। ভাই প্রবোধ! এখন অধীর হইলে চলিবে না। এখন যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে তাহা করিতে হইবে। ধন, সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম, দেশ-হিতৈষিতা প্রতিহিংসার জ্বলন্ত বহ্নিতে আহুতি দিলাম, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ হৃদয়ে আর কিছুই স্থান হইবে না। যতদিন না ম্যাকিণ্টষের উপযুক্ত শাস্তিদিতে পারি তত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যে জলাঞ্জলি দিলাম। এত অত্যাচার আর সহ্য হয় না। এরূপ ঘৃণিত, অবমানিত জীবন বহন করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে প্রার্থনীয়। আমি চলিলাম, আর সহ্য হয় না। ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন,—দরজা অবধি গিয়া কি মনে পড়িল,—ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"ভাই প্রবোধ।" এই ঘটনা যে ম্যাকিণ্টসের কর্ত্তৃক তাহার আর সন্দেহ নাই, এখন আমাদের প্রথমে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে যে, সে বিরাজমোহিনীকে কোথায় রাখিয়াছে। তাহার পর উভয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় স্থির করা যাইবে। আমি ও সেই অনুসন্ধানে চলিলাম, তুমিও যতদুর পার চেষ্টা কর।"

এই বলিয়া সুরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় প্রবোধ বলিয়া দিলেন, "ভাই, আমার আশা ভরসা তুমি সকলি, আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি, আমার দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না।"

এই সময় রমা পাগ্‌লা বলিয়া উঠিল—

"ভালবাসায় এ পৃথিবীতে সুখ নাই! আর কোন স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিও না। যদি সে প্রাণ ছিঁড়িয়া হাতে দেয়, তথাপি তাহাকে বিশ্বাস নাই।"

প্রবোধ একথা শুনিতে পাইল না। কারণ তখন তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন— "অত্যাচারের উপর অত্যাচার।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ।

প্রবোধ অকস্মাৎ বিপদে অস্থির, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। নিকটে কুসুম বসিয়া আছে, কিরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। কুসুম বিরাজমোহিনীর বিপদে নিতান্ত দুঃখিতা, বিরাজ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইলেও তাহার প্রতি কুসুমের ভালবাসা আবার অসীম। আমরা কুসুমের হৃদয়ের প্রতি কক্ষ অন্বেষণ করিয়া দেখিয়া জানিয়াছি যে ইহার প্রথম কারণ কুসুমের সরল হৃদয়, সে হৃদয় হিংসা প্রভৃতি নিচ প্রবৃত্তি সকল স্থান পায় না, দ্বিতীয় কারণ বিরাজের প্রতি প্রবোধের ভালবাসা। যে ভালবাসা আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দেয়, কুসুমের হৃদয়ের শোণিতের প্রতি বিন্দুর সহিত তাহা মিশিয়াছিল। প্রবোধের সুখ ভিন্ন নিজের সুখের জন্য কুসুম কখন ভাবে নাই; বাগানের প্রস্ফুটিত কুসুম গুলি যেমন কেবল গন্ধ দানেই সুখী, কাহারও নিকট কিছুই প্রত্যাশা করে না। আমাদের কুসুমও কেবল প্রবোধকে ভালবাসিয়াই সুখী, ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসার প্রত্যাশী নয়। কুসুম অবলা, কুসুম বালিকা, কিন্তু বালিকা হইলেও প্রবোধকে সুখী করিবার ইচ্ছা কুসুমের বলবতী; হৃদয় ও সাহসে পরিপূর্ণ।

কুসুম প্রবোধকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিল—

"যে রূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বিরাজের সন্ধান পাওয়া যাইবে, দস্যুরাও উপযুক্ত শাস্তি পাইবে।"

প্রবোধ। জীবিতা না দেখিলে, সন্ধান করিয়াই কি হইবে, আর দস্যুদিগকে শাস্তি দিয়াই কি ফল হইবে?

কুসুম। ওরূপ অমঙ্গল কথা মুখে আনিতে নাই।

প্রবোধ। বিরাজ অল্প দিন হইল, পিতৃহীনা হইয়াছে, তাহার সে মনের কষ্ট এখন যায় নাই; তাহার আবার এই বিপদে যে, সে জীবিতা আছে, তাহা কখনই বিশ্বাস হয় না।

কুসুম। বিরাজ বুদ্ধিমতী, সে বিপদে ততদূর অধীরা হইবে না।

প্রবোধ। এই সময় হঠাৎ কি মনে হইল, তাহার প্রতি শীরায় রক্ত ছুটিতে লাগিল। ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, কুসুম প্রবোধের সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভীতা হইল।

প্রবোধ গম্ভীর স্বরে বলিল——

"যদি অত্যাচারীরা বিরাজের সতীত্ব নষ্ট করে, তবে তাহার জীবনেই বা আবশ্যক কি? তাহা হইলে তাহার মৃত্যুই প্রার্থনীয়। এই কথা শুনিয়া কুসুমের ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল, এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদদিল যে, সুরেন্দ্র বাবু এখান

হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, ম্যাকিণ্টস্ হিতৈষিণী সভার বিপক্ষে যে অভিযোগ করিয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ।

সংবাদ প্রবোধের কর্ণে গেল, কাহাকে কোন কথা বলিলেন না, বিদ্যুৎবেগে ছুটিলেন। কুসুমও সে সংবাদে দুঃখিতা হইল। তাহার প্রাণের ভিতর এখন যেন কেমন করিতে লাগিল ; একমনে অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এইরূপে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় আর এক অশুভ সংবাদ আসিল যে প্রবোধ বাবুও পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। এ সংবাদে বিরাজের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল। মনে মনে বলিলেন—"এ যে বিপদের উপর বিপদ!"

গৃহ।

গৃহের বিষয় ভাবিতে গেলে, হৃদয় বল দেখি কেন আনন্দে ভাসিয়া যায়? প্রবাসী সারাটী দিন গলদ্ঘর্ম্মে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া, যখন সায়ংকালে একবার তটিনীতীরে বসিয়া গৃহের বিষয় চিন্তা করে, বল দেখি তাহার মন কেন তখন কেমন-কেমন হইয়া যায়? গৃহের প্রতি আপামর মানববৃন্দের এত লোভ কেন? যেখানে আরাম মানুষ সেই খানেই থাকিতে ভাল বাসে। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম চাই। গৃহই সেই আরামের নিকেতন ও বিশ্রামের দিব্য মন্দির; তাই গৃহের প্রতি মনুষ্যের এত টান্। গৃহ মর্ত্ত-ভূমির অমরাবতী-সাক্ষাৎ স্বর্গ-নিকেতন। এখানে মাতার সস্নেহ আদর, পিতার অকৃত্রিম বাৎসল্য, ভ্রাতার সুবিমল অনুরাগ, ভগ্নীর সুকোমল স্নেহ, সহধর্ম্মিণীর অপার্থিব প্রেম, হিতাকাঙ্খী বন্ধুগণের পবিত্র প্রণয়, পুত্র কন্যাগণের অবিচলিত ভক্তি ও প্রতিবেশীবর্গের অকপট প্রীতি কেমন স্তরে স্তরে সজ্জিত, কেমন সুন্দর রূপে বিরাজিত। এখানে পবিত্র প্রীতি ও স্বর্গীয় ভালবাসার স্রোত নিয়তই প্রবাহিত। গৃহই লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন। অঙ্গণাগণই গৃহের লক্ষ্মী *। এরূপ গৃহ যদি সুখের একমাত্র নিকেতন না হইল তবে সুখ যে কোথায় আছে জানি না, এখানে যদি মানুষ না থাকিতে চায় তবে যে, সে কোথায় থাকিবে জানি না। কেন তবে মহাত্মা শাক্যসিংহ ও চৈতন্য প্রমুখ মণিষিগণ এ হেন সুখ সামগ্রী ত্যাগ করিয়া কৌপিনধারী হইয়াছিলেন? তাহারও অর্থ আছে। তাঁহাদের হৃদয় এত প্রশস্ত ছিল যে, সমগ্র পৃথিবী তন্মধ্যে বেশ ধরিত, তাঁহারা স্ব স্ব ক্ষুদ্র গৃহের পরিবারবর্গকে তাঁহাদের অত্যুন্নত আত্মার প্রণয় প্রীতি প্রভৃতি অপার্থিব সুধা বিতরণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের নিকট এত রত্ন ছিল

(*) "প্রজানার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।।"

যে, নিজের আত্মীয়বর্গের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দিয়াও প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত থাকিত। তাই পৃথিবী শুদ্ধ লোকের নিকট তাহা বিলা-ইবার জন্য গৃহ ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃহৎ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পৃথিবী শুদ্ধ মনুষ্যকেই তাঁহারা আত্মীয় জ্ঞান করিতেন। তাই তাঁহারা নিজের সংসার পরিত্যাগ করিলেন, তাই তাঁহারা পরমেশ্বরের সুবৃহৎ সংসারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের ন্যায় আমাদের হৃদয়ও যদি কখন উন্নত হয়, পৃথিবী শুদ্ধ লোককে আত্মীয় জ্ঞানে যদি কখন পবিত্র ভাবে ভাল-বাসিতে পারি, যদি তহবিলে কখন এত রত্ন জমে যে তাহা অজস্রধারে ব্যয় করিয়াও শেষ করিতে না পারি। তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র গৃহ ছাড়িয়া পৃথিবীকেই নিজের গৃহ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। কিন্তু সেরূপ হৃদয় কয়-জনের? অত রত্ন আছে কার? প্রকৃত প্রস্তাব হইতে কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আর না—আসল বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

আমরা গৃহের একটী পিঠ মাত্র সকলকে দেখাইলাম। বলা বাহুল্য যে, সকল জিনি-সেরই দুইটা করিয়া পিঠ আছে। একটা ভালও ব্যবহার দোষে অন্যটা মন্দ হইয়া পড়ে। যে হস্ত অনাথা বিধবার অশ্রুজল বিমোচনে সক্ষম, আবার সেই হস্তই নিরীহ ভ্রাতার গলদেশে শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিতে সমর্থ; যে অর্থ সকল সুখ সৌভাগ্যের ভিত্তি-ভূমি, ব্যবহার দোষে সেই অর্থ দ্বারাই না কত অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে। গৃহ সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযুয্য। আমরা গৃহের একটী দিক পাঠকগণ সম্মুখে ধরিলাম। কি মনোহর দৃশ্য! কি কমনীয় কান্তি! কি অব্যক্ত সৌন্দর্য্য! কিন্তু লক্ষ্মী বিহীন গৃহে সৌন্দর্য্য কোথায়? সেখানে আমরাই বা কই? লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গৃহে থাকা অপেক্ষা গহন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে বাটীতে সদাসর্ব্বক্ষণ বিবাদ ও বিসম্বাদ, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, রেসারেসী ও ঠেসাঠেসী, মারামারী ও কাটাকাটি সে কি প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহ? না শ্মশান? না না তাহা শ্মশানও নহে। সে যে অশী-বিষপূর্ণ ভয়ঙ্কর দুর্গম অরণ্য। সে যে সর্প বিবর। সে অরণ্য, সে বিবর পরিত্যাগ করিয়া দূরে-বহু দূরে পলায়ন করা কি উচিত নয়? হায়! এরূপ দুর্ভাগা ব্যক্তির জন্য বড় দুঃখ হয়। তাদের ন্যায় দুঃখী কৃপাপাত্র আর কে? বিমল ধর্ম্মের জ্যোতি না পড়িলে কোন গৃহই আলোকিত হয় না। যদি গৃহে শান্তিলাভ করিতে চাও হস্তে ধর্ম্মের মশাল ধারণ কর। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা ঘর সাজাইতে বড় ভাল বাসেন। কিন্তু কোন২ উপাদান গুলি বাছিয়া লইয়া গৃহ সাজাইতে হয় সে বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অন-ভিজ্ঞ। তাঁহারা হিরক ফেলিয়া কাচ লইয়া ঘর সাজাইতে অগ্রসর হন। যদি একান্তই এ নশ্বর বাটী খানি সাজাইতে হয় তবে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক সাজানই কর্ত্তব্য! গৃহের চারিদিকে প্রাচীর চাই নহিলে বন্য জন্তুগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট ও শান্তি ভঙ্গ করিয়া ফেলিবে। চারিদিকে সুদৃঢ়রূপে ভালবাসার প্রাচীর নির্ম্মাণ কর।

এ প্রচীর ভেদ করিয়া কেহই আর গৃহের অনিষ্ট সংসাধন করিতে সক্ষম হইবে না। গৃহের ছাদ্ হউক সন্তোষ। দুঃখ দারিদ্র্যরূপ তপ্তরৌদ্র ও বিপদ আপদরূপ বৃষ্টি গৃহমধ্যে আর আসিতে পারিবে না। দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিয়া গৃহমধ্যে নির্ম্মল বায়ু আনয়ন করিবার জন্য গবাক্ষ সকল চাই, জ্ঞানই গবাক্ষের কার্য্য করুক। "কু" তাড়াইয়া দিয়া "সু" আনয়ন করিতে জ্ঞান যত সক্ষম এমন আর কে? জ্ঞানের জানালা দিয়া কুনীতি, কুরীতি ও কুসংস্কার প্রভৃতির প্রবেশাধিকার নাই। ধর্ম্ম হউক গৃহের দ্বার, বিবেক থাক্ ইহার প্রহরী। শান্তি, ভক্তি, প্রণয়, প্রীতি প্রভৃতি হউক গৃহের আসবাব্। বিদ্যা ও উন্নতি আমাদের ক্রীড়ার সামগ্রী হউক। এইরূপে গৃহ সুসজ্জিত করিয়া যদি বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান রূপ অত্যুচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়া দর্শন শাস্ত্ররূপ সুন্দর দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে একটীবার গৃহের অপার্থিব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করা যায় তাহা হইলে "গৃহই যে মর্ত্তবাসীর ইন্দ্রভবন" একথা বলিতে অনুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। মরুময় জীবনে এইরূপ গৃহই ওয়েসিসের (Oasis) কার্য্য করিয়া থাকে। আড়ম্বর করিয়া ইহার বর্ণনার আবশ্যক নাই। ঈশ্বর এই গৃহের প্রভু, জনক জননী ইঁহারই প্রতিনিধি। মা, শিশুর সুদৃঢ় দুর্গ। শিশু ভয় পাইলেই এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হয়। মা বাপের ন্যায় অকৃত্রিম সুহৃদ এ জগতে আর কে? "যদি ঘরের কড়ি দিয়া কেহ দাসত্ব করিতে যায় তাহাকে লোকে বাতুল বলে, কিন্তু জননীর দাসত্বের কথা একবার স্মরণ কর। আত্ম বিক্রয় করিয়া সন্তানের জন্য দাসত্ব করেন; এমন দাসত্ব আর কোথায় দেখিবে; পাপীকে ঘৃণা করিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিলে কেবল দুইজনে হৃদয় হইতে অন্তর করিতে পারেন না, মাতা এবং পরমেশ্বর। ইহা কি অত্যুক্তি হইল?" গৃহে এই "মা" বিরাজিতা। তাই গৃহ সুখের নিকেতন। পতিব্রতা নারী গৃহের আর এক অমূল্য ভূষণ। এমন সব উৎকৃষ্ট২ রত্ন ছাড়িয়া কেন আর অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইব?

স্বার্থ গার্হস্থ্য সুখ সচ্ছন্দতায় একটী প্রধান অন্তরায়। যেখানে স্বার্থপরতা, সেই খানেই স্বেচ্ছাচারিতা। শোক, দুঃখ, তাপ, অনৈক্য এ সমস্তই স্বার্থের প্রিয় সন্তান। স্বার্থপরতা একটী ভয়ঙ্করী রাক্ষসী, সোণার সংসারের অস্থি চর্ব্বনে ইনি খুব পটু, সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিতে খুব দক্ষ। ঈর্ষ্যা ইহার সহচরী ও চির-সঙ্গিনী। এ রাক্ষসীর বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হইয়া থাকা প্রত্যেক গৃহী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

যে গৃহে স্বাধীনতার ভাব সঙ্কুচিত, সে খানে শান্তিও মৃত। মানুষ স্বাধীনতা চায়, ইহার বিনিময়ে সে অন্য কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে। আমরা পিতা মাতার চরণে অকপটে শ্রদ্ধা ভক্তি সমর্পণ করিতে পারি, কিন্তু স্বাধীনতা তাঁহাদের নিকটও বিক্রয় করিতে পারি না। এরূপ স্বাধীনতা প্রকৃত প্রস্তাবে অবাধ্যতা বা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। মানব হৃদয়ের ইহা শ্রেষ্ঠতম ভূষণ। বিশদরূপে এ বিষয়টী বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পিতা প্রবঞ্চক ও পুত্র ধর্ম্ম-ভীরু এখানে পিতা পুত্রের মধ্যে মতের মিল কথ-

নই সম্ভবপর নহে। পুত্র নিজের স্বাধীনতাটুকু নষ্ট করিয়া পিতার অধীনে আসিতে কখনই সম্মত নহে। যে গৃহে পিতা শকুনী ও পুত্র যুধীষ্ঠির, যে গৃহের পতি রামচন্দ্র ও ক্লিওপেটরা, যে গৃহের স্ত্রী সাবিত্রী ও স্বামী নিরো, যে গৃহের এক ভাই আওরাঙ্গজীব ও অন্য ভাই লক্ষ্মণ, যে গৃহের ভ্রাতা সক্রেটিস ও ভগ্নী শোণিত পিপাসু মেরী (Bloody Mary), যে গৃহের এক ভগ্নী সেমিরেমিস ও অন্য ভগ্নী সীতা, যে গৃহের কর্ত্তা শাক্যসিংহ ও ভৃত্য রবিনহুড্, সে গৃহের শান্তি ও মঙ্গল কোথায়? সেরূপ গৃহ আর রণক্ষেত্র দুইই সমান।

শ্রীসত্যানন্দ শর্ম্মাঃ।

কবি ও বৈজ্ঞানিক।

এক্ষণ সকল দেশেই বিজ্ঞান চর্চ্চা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাবাসীরাও একবারে বিজ্ঞান লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন, তাহাদের সমস্ত যত্ন, সমস্ত উৎসাহ কেবল বিজ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত। কবিত্বের উপর আর তাহাদের ততদূর যত্ন বা উৎসাহ নাই, ইহা দেখিয়া অনেকে ভীত হইয়াছেন। ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যে তথায় আর কবির আদর ততদূর নাই। কবির এই রূপ অযথা অনাদরে ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা বলেন যে বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে চাও, কর, সে ত মঙ্গলের বিষয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের অনাদর করিলে প্রকৃত উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। তাঁহারা আরো বলেন বিজ্ঞান আলোচনায় কেবল জড়প্রকৃতির সেবা করা হয়, কেবল জড়প্রকৃতিকে সার সর্ব্বস্ব করিলে চলিবে না। মনুষ্য জীবনের বা মনোবৃত্তি সকলের উন্নতি করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, সুতরাং কবিকে অনাদর করিয়া কেবল বৈজ্ঞানিকের সেবা করা ভুল। ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে বিজ্ঞানের আলোচনা বহু দিন ধরিয়া চলিয়াছে, আমাদের দেশেও সেই বিজ্ঞানের সূত্র পাত হইয়াছে। আমাদেরও ভয় হয়, পাছে আমরা বিজ্ঞান আলোচনায় উন্মত্ত হইয়া, কাব্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ করি। সেই জন্যই আমরা অদ্য এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমরা প্রথমে কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে কাহার কি কার্য্য এবং উভয়েরই বা সম্বন্ধ কি তাহা দেখাইব, পরে আমরা কাহার নিকট কি পরিমাণে ঋণী তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আজ কাল আমাদের দেশে কাব্যের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। "তুমি আমি" "হরের মা" "শঙ্করার মা" পর্য্যন্ত কবি। কাব্যের উপর কাব্য, নাটকের উপর নাটক, উপন্যাসের উপর উপন্যাস, তাহার উপর আবার

নবন্যাস, এতেও যদি আশা না মিটিল ত তাহার উপর আবার রহস্য-কাব্যের বাজার একবারে ছড়াছড়ি। বাঙ্গালির কবি হইবার এতদূর সাধ যে, অন্যকে অর্থ দিয়া কিম্বা খোসামোদ করিয়া পুস্তক লেখাইয়া লইয়া নিজে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিতেও অনেকে কুণ্ঠিত নহে। কবি হইবার জন্য উন্মত্ততা এক্ষণে বাঙ্গালার একটি উৎকট রোগ মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এ রোগের উপযুক্ত চিকিৎসক—জনকতক সুকবি—বাঙ্গালায় তাহা এখনও অভাব আছে। বাঙ্গালির রুচি এখনও সম্পূর্ণ মার্জ্জিত হয় নাই। বাঙ্গালি এখনও কাব্যের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম হয় নাই। এখনও বাঙ্গালায় বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার মালিনীর সুখ্যাতি করিতে অনেকের লাল পড়ে। আমরা তাই বলি, যদি জনকতক সুকবি একবারে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য আসরে ভর্ দেন, তবে বিশেষ উপকার হইতে পারে। বাঙ্গালায় কয়েক জন সুকবি আছেন সত্য, কিন্তু কুকবির সংখ্যা এত অধিক যে তাঁহারা কোন ক্রমেই থই পাইতেছেন না। আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালির মধ্যে যে কয়জন সুকবি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার সকলের সম্মান নাই, অথচ একজন অপকৃষ্ট লেখক কেবল অপকৃষ্ট রহস্য লিখিয়া চারি সহস্র বঙ্গবাসীকে মোহিত করিয়া আপনার নাম জাহির করিয়া বসিতেছেন। এই সকল দেখিলে আমরা মরমে মরিয়া যাই, আর রাগে, ক্ষোভে, ভয়ে, আর মনের দুঃখে বলি, যে বাঙ্গালির অধঃপতনের আর অধিক বিলম্ব নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি কাহাকে আমরা কবি বলিব, এবং কবিত্বেরই বা প্রধান লক্ষণ কি? এই বিষয় লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, এবং এখনও বলিবার অনেক কথা আছে। কোন লেখক লিখিয়াছেন—

"কবিত্বের প্রধান উপকরণ অনুভাবকতা এবং কল্পনা। অনুভাবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে কেহ কোন ভাবের বেগ, ভাবের তরঙ্গ হৃদয় মধ্যে অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ ভাল বাসিয়াছেন অথবা ঘৃণা করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ এক দিন দুঃখ ভাবিয়া মনেং বলিয়াছেন—'আজকার রজনী যেন আর পোহায় না', যে কেহ সুখ ভাবিয়া এক দিন মনেং বলিয়াছেন—'সূর্য্যদেব তোমার পায়ে পড়ি, একটু শীঘ্রং পাটে গিয়া বস, বাবু' তিনিই কবি। যে কেহ হাসিয়াছেন অথবা কাঁদিয়াছেন, তিনিই কবি ইত্যাদি ইত্যাদি *।"

এইরূপ গুণ বিশিষ্ট হইলে যদি কবি হয়, তবে এ পৃথিবীতে কবি নয় কে? তবে এতক্ষণ 'মাথামুণ্ড-ছাইভস্ম' বকিয়া মরিলাম কেন? তাহা হইলে পৃথিবীর মনুষ্য মাত্রেই কবি। বাস্তবিক ধরিতে গেলে অন্তরে অন্তরে কবি সকলেই, কিন্তু সে সকল নীরব কবি দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার হয় নাই, সেই জন্য কেহ তাহাদিগকে কবি বলিয়া স্বীকার করেন না। কবির হৃদয় যতদূর সম্ভব কোমল হওয়া আবশ্যক, যেন অল্প বাতাসেই তাহাতে ভাবের তরঙ্গ উঠিতে পারে, কিন্তু

(*) বঙ্গ দর্শন ৪র্থ খণ্ড ১ম সংখ্যার ৩৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।

যদি সেই হৃদয়ের তরঙ্গ হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়ের মধ্যেই লীন হয়, তবে সে তরঙ্গে ফল হইল কি? মূল কথা, সে তরঙ্গ কোন কূলে গিয়া আঘাত করা চাই। কবির হৃদয়ের তরঙ্গ অন্য হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাহাতে ঐরূপে তরঙ্গ তুলিতে পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ তাহাকে কোমল করা চাই, তবে সকলে তাহাকে কবি বলিবে। কবির কেবল অনুভাবকতা শক্তি থাকিলে চলিবে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা শক্তি চাই।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, কবিত্ব প্রতিভা ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা। তুমি শত চেষ্টা করিলেও সেক্সপীয়ার বা বাইরণ, কালিদাস কিম্বা ভবভূতির ন্যায় কবিত্ব-প্রতিভা বিশিষ্ট হইতে পারিবে না। এ কথা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু কোন এক বিষয় প্রাণপণে সাধনা করিলে একবারে নিস্ফল হইবে না, তাহা আমরা কোনক্রমেই স্বীকার করি না। সেক্সপীয়ার বা কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় হইতে না পারিলেও একজন মোটা-মোটা কবির মধ্যে গণ্য হইতে পারিবে না, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? প্রতিভা ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা হইতে পারে, এবং তাহা তাঁহারই কোন প্রিয়পাত্রকে তিনি দিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

কবির হৃদয় যতদূর সম্ভব প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক, কারণ ক্ষুদ্র হৃদয় ভাবের তরঙ্গের বেগ ধারণ করিতে পারে না। কবি একটি ফুল বা পাতা লইয়া কাব্য লিখিলে বা কোন একটি রসকে সারসর্ব্বস্ব করিলে চলিবে না। অন্তঃপ্রকৃতি ও বাহ্যপ্রকৃতি এই উভয় প্রকৃতিকে তাঁহার আয়ত্বাধীন করিতে হইবে। সেই প্রশস্ত ও শান্ত হৃদয়ে আমরা উভয় প্রকৃতির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই।

বৈজ্ঞানিকের কার্য্য স্বতন্ত্র, সাধারণতঃ ধরিতে গেলে উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। তিনি পঞ্চভূত বা ইউরোপীয় পণ্ডিত-দিগের মতে অষ্টাদশ ভূত লইয়াই উন্মত্ত। সুতরাং জড় প্রকৃতিই বৈজ্ঞানিকের সার-সর্ব্বস্ব। জড় প্রকৃতির উন্নতি করাই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। তিনি অন্তঃপ্রকৃতির কোন ধার ধারেন না। অম্লজান (Oxygen) জলজান (Hydrogen) যবক্ষারজান (Nitrogen) এবং অঙ্গার (Carbon) প্রভৃতি মূল পদার্থের সার যোগে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ (Chemical compound) উৎপন্ন হয় তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝান বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। কোন্ পদার্থের সহিত কোন্ পদার্থ যোগ করিলে কি রূপ রূপান্তর হয় বা কত বেগ (Force) ধারণ করে তাহা বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি। সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, এবং অসংখ্য অসংখ্য নক্ষত্রগণ কি নিয়মে এই ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত জড় পদার্থ বিশ্লেষণ (Analysis) করিয়া কি কি ভূত-বিশিষ্ট তাহা তিনি আমাদিগকে দেখান। এই রূপ না না প্রকার কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী।

(ক্রমশঃ)

সরলা। *

আধুনিক হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই ক্রন্দন করিয়া থাকেন। জাগতিক জীবের রীতি এই যে কাহার কোন দুঃখ দেখিলে, তাঁহার হৃদয় সহসা উদ্বেলিত হইবে। নচিলে সমাজ সংবদ্ধ হয় না। তুমি আমি লইয়া সমাজ হয় না, দেশস্থ সমস্ত জাতি লইয়া সমাজ সংবদ্ধ হইয়া থাকে। সমাজ এক দিনে হইবার নহে। মনুষ্য প্রথমে অসভ্যাবস্থায় বনে২ ভ্রমণ করিত ও বল্কল পরিধান করিত। যেমন তেমন করিয়া হউক উদর পূর্ত্তি করিত। সকলেই আপন২ সাচ্ছন্দ্য লইয়া ব্যস্ত, কেহ অন্যের মুখের প্রতি চাহে না। তৎপরে যখন তাহারা ক্রমে২ জ্ঞান প্রাপ্ত হইল, বুঝিতে পারিল, আপন২ জীবন লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। যখন অভাব অনুভব করিল, তখন পরস্পরের সাহায্য প্রার্থী হইতে হইল। ক্রমে সমাজ সংবদ্ধ হইতে উপক্রম হইল। অন্যে যাহাতে অপরের দ্রব্যে হস্তক্ষেপ না করে তজ্জন্য আইন কানুনের প্রয়োজন হইল। সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার রাজপুরুষদিগের হস্তে অর্পিত হইল। পরস্পরের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য মীমাংসকের প্রয়োজন হইল। দেখিতে২ একটী অসভ্য জাতি সভ্য জগতে পরিচিত হইতে লাগিল, যত সভ্য নামে পরিচিত, হইতে লাগিল, ততই সমাজিক নিয়মাবলীর ভিত্তি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। এই রূপে একটী অসভ্য জাতি সভ্যজগতের মধ্যে পরিগণিত হইল। যত দিন সেই সমাজ থাকিবে, তত দিন তাহারা সভ্য নাম পাইবে। সামাজিক নিয়মের বিশৃঙ্খলা হইলে আর রক্ষা নাই। দেখিতে২ সে জাতি অধঃপতনে যাইবে। জগতের কোন দেশে সে জাতির উন্নতি নাই। কুসংস্কারান্ধ জাতিকে উন্নত করিতে জগতে লোক অতি বিরল। যে সমাজ গঠন করিতে অনেক দিন লাগিয়াছে, সেই সমাজ ধ্বংস হইতে কিছু বিলম্ব হয়। তাহাতে বিপ্লব ঘটিলে শীঘ্র তাহার প্রকোপ প্রশমিত হয় না। পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে হৃদয়বান সংস্কারকের প্রয়োজন। নচেৎ কোন মতে উহার উদ্ধার নাই। উদ্ধারের গত্যন্তর নাই বলিয়াই, বিপ্লব সময়ে, সহৃদয়, ধীর, চেতা, সহানুভূতি-প্রবণ সংস্কারকগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া, সমাজকে কুরীতি ও কুসংস্কার হইতে রক্ষা করেন।

সমাজের মধ্যে যদি সকলেই কুসংস্কারান্ধ হইয়া থাকেন, তবে কে তাঁহাদের চৈতন্য আনয়ন করিবে। তাই মধ্যে২ বিপ্লব সময়ে, সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। হিন্দুদিগের বহুকালের পুরাতন সমাজ অনেক বিপ্লব সহ্য করিয়া এখন সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

* শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও ক্যানিং প্রেসে শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

যে যে কারণে সমাজ উৎসন্ন যাইতেছে। তন্মধ্যে বিধবা বিবাহ রাহিত্য ও সহমরণ প্রথা প্রচলন আমাদের হৃদয়ে সহসা আসিয়া আঘাত করে। সেই লোমহর্ষণ ও হৃদয়-বিদারণ সহমরণ প্রথা বঙ্গে নাই, শুভক্ষণে বেণ্টিঙ্ক ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাই সেই প্রথা রহিত হইল। ধন্য বেণ্টিঙ্ক! ধন্য তোমার কার্য্যকলাপ! তোমার নাম চির দিন বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইবে। যাঁহারা সেই সময় বঙ্গবাসীর হইয়া, উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রাম মোহন রায় প্রধান। তখন তিনি সমাজের কুলাঙ্গার বলিয়া গণ্য হইলেন! কিন্তু কুসংস্কারান্ধ পিশাচ সমাজ তখন যাহাই বলুক না, রামমোহন স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিলেন, শত২ বিধবাকে মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিলেন। রামমোহন! তুমি তখন সমাজে আদৃত হও নাই, কিন্তু এখন তোমার নাম বঙ্গে—বঙ্গে কেন সমস্ত ভারতে বিধূনিত হইতেছে। তোমার নামের ও যশের সৌরভ বঙ্গদেশ আমোদিত করিতেছে। সামাজিক গগনের একটী উৎপাতবারু খসিয়া পড়িল। অনাথা বিধবাগণ কঠোর সহমরণ হইতে রক্ষা পাইল। একটী রাহু খসিল বটে, কিন্তু আর একটী ঘোরতর কঠোর সামাজিক নিয়ম রহিল, যাহার জন্য এখন প্রত্যেক সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেই অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। যাহার জন্য এখন ইচ্ছা হয়, সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকিলে ভাল হইত। বিধবা বিবাহ রাহিত্যই সেই প্রধান কারণ। তাই বলি, বিধবাদিগের অশ্রুপাত যদি দেখিতে হইল, তবে কেন সহমরণ উঠাইয়া দেওয়া। অনাথা বিধবাদিগের হইয়া দুঃখ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়! এখনও অনেক ব্যক্তির চৈতন্য হয় নাই। হায়! জানি না কবে যে অভাগিনীগণ অশ্রুপাতে নিরস্ত হইবে। বিধবাগণের দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক বাক্যুদ্ধ ও লেখনী সমর করিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিক গতি ফিরাইবার সাধ্য কার? কুসংস্কারান্ধ মনকে ফিরায় কে? বিদ্যাসাগরের বাক্য কেহ শুনিল না, অথবা শুনিয়াও মনোযোগ দিল না। যখন কৃতবিদ্যগণ তাঁহার বিপক্ষে, যখন বঙ্গের শাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্য্যগণ তাঁহার উপর খড়্গা হস্ত, তখন কে আর তাঁহার বাক্য শ্রবণ করে! কিন্তু বড় সুখের বিষয় সেই বিধবা বিবাহ এখন বঙ্গের অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখন অনেকের হৃদয় বিধবাদিগের অশ্রুতে বিগলিত হইতেছে। শুভক্ষণে উপন্যাস-লেখক বঙ্গের সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠক সমাজে বিষবৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন। শুভ ক্ষণে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীকে দেখিলে কাহার না সহানুভূতি উদ্রেক হয়? উপন্যাসাকারে প্রকাশ করিলেন বলিয়া সকলে পড়িল, যেং পাঠক পড়িয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, বিধবা বিবাহ রাহিত্য কি বিষম ব্যাপার। আমরা এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ পক্ষপাতী। বিষবৃক্ষ দেখিলে বঙ্কিম বাবুকে আমরা অন্তরেং শতং ধন্যবাদ দিই। এই রূপ গ্রন্থ আমরা অত্যন্ত আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। প্রণয়-কাহিনী পূর্ণ উপন্যাস অনেক আছে, আর কাজ নাই, এখন সামাজিক চিত্র সকল প্রকাশ করিলে

সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। সমাজের—জীবের চৈতন্য উদয় হইবে। অদ্য আমরা "সরলা" নাম্নী এক খানি ক্ষুদ্র উপন্যাস পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। পুস্তকের বাহ্যিক সৌষ্ঠবের প্রতি লক্ষ্য করিলে, পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় না। আমরা মনে করিয়াছিলাম ইহা একটী প্রণয়-কাহিনী-পূর্ণ অথবা আধুনিক সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র-প্রসূত সামান্য আখ্যায়িকা গ্রন্থ। কিন্তু পুস্তক পাঠ করিয়া সে ভাব দূর হইল, পাঠ শেষ হইলে গ্রন্থ কর্ত্তাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিলাম। পুস্তক খানির মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৬য়টী পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদ কয়টী পড়িতে বিরক্তি বোধ হয় না, একবার পড়িলে আবার পড়িতে ইচ্ছা করে।

আমরা প্রবন্ধের দীর্ঘতার ভয় করিয়া এই পুস্তক সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। সরলা, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র জীবন সর্ব্বস্ব কন্যা। সরলা ভিন্ন কাশীনাথের স্নেহের অধিকারিণী হয় আর এ জগতে কেহ নাই। সুতরাং কাশীনাথ তাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। বালিকা সরলা যখন বিবাহ কাহাকে বলে জানেনা, যখন স্বামী কি ধন চিনে না, তখন কাশীনাথ তাহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়াদিলেন। কাশীনাথ ভাবিলেন না, যে অষ্টম বর্ষীয়া সরলা এ জগতে প্রণয় কাহাকে বলে জানে না। তিনি সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা না করিয়া, অষ্টম বৎসরে কন্যার বিবাহ দিয়া "গৌরী দানের ফল ভোগ" করিলেন। দেখিতে২ ছয়মাস পরে বালিকা সরলা পতি হারাইল। পতি কি ধন চিনিল না, সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া সরলাও কাঁদিল, কিন্তু জানেনা কাহার জন্য এবং কেন কাঁদিতেছে। যেন কাঁদিতে হয় তাই কাঁদিল। ক্রমে সরলা যৌবনে পদার্পণ করিল; যৌবনের মাধুরী, লাবণ্য সমস্তই সরলাকে অধিকার করিল। এখন সরলা বৈধব্য যন্ত্রণা কাহাকে বলে জানিল। হতভাগিনীর কথা কহিবার যো নাই। দুবেলা খাইবার যো নাই। একাদশী করা চাই। নচেৎ পিতা মাতা ছাড়িবেন না। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, উপবাসে শরীর অবস হইয়াছে, প্রাণ বহির্গত হয়, জননী শয্যা পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। তবুও এক বিন্দু জল দিবেন না। উঃ! কি কঠিন হৃদয়, দেশাচার তুমি করিতে না পার এমন কাজ নাই; তোমার চক্রে পড়িয়া স্নেহময়ী জননী প্রাণ তুল্য সরলার কষ্ট অবাধে দেখিতেছেন। দেশাচার ছাড়িবেন না, বরং সরলা যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই। কাশীনাথের সংসারে থাকিয়া সরলা কখন হাসিয়া কথা কয় নাই। হাসিয়া কথা কহিলে প্রতিবেশিনীদিগের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। সরলার সেই হৃদয় মরুভূমে এক মাত্র আশাবারি, মন্মথ। মন্মথকে দেখিলে সরলা সকল জ্বালা ভুলিত। মন্মথ শৈশব অবস্থায় পিতৃ মাতৃ হীন হইয়া কাশীনাথের সংসারে প্রতিপালিত হয়। বাল্যকালে উভয়ে এক সঙ্গে উপবেশন, শয়ন ও ভোজন করিত। সরলার বিদ্যাভ্যাসের ভার মন্মথের উপর ছিল। মন্মথ আদর করিয়া সরলাকে পাঠাভ্যাস করাইতেন। উভয়কে উভয়ে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত। মন্মথকে না দেখিলে সরলা মনে ব্যথা পাইত। সরলার

দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে এ জগতে আর কেহই নাই, কেবল একমাত্র বাল্যসখা, শৈশবের চির-সহচর মন্মথ। মন্মথ কাশীনাথকে অনেক বুঝাইলেন যে বাল বিধবা সরলার বিবাহ দেওয়া হউক। এই অপরাধে মন্মথ কাশীনাথের চক্ষুশূল হইলেন, বাল্য-আশ্রয়-স্থল-চ্যুত হইলেন। কাশীনাথের বাটী হইতে মন্মথ সরলার অজ্ঞাতসারে বহির্গত হইয়া, মনে করিলেন সরলাকে না বলিয়া চিরদিনের জন্য বিদায় হই। তাই সরলার অতর্কিতে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মন্মথ তুমি জাননা, যে সরলা এ জগতে তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রত্যাশিনী নহে। তোমায় দেখিলে বালবিধবা সরলা সব দুঃখ বিস্মৃত হয়। তুমিই সরলার হৃদয় আকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা। তুমি যত কেন গুপ্তভাবে যাওনা, তোমার ছায়ারূপিণী সরলা পশ্চাৎগামিনী হইবে। মন্মথ বহির্গত হইয়া বাগানের পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। বিষাদময়ী সরলা উদাস প্রাণে সেই খানে উপস্থিত। মন্মথ সরলাকে দেখিবা মাত্র "সরলা" শব্দটী উচ্চারণ করিয়া, আর কিছু বলিতে পারিল না। উভয়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া, উভয়ের হৃদয়ের বিষাদময় ভাব প্রকাশ করিল। উভয়ে অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিল, সরলা বলিল, "মন্মথ, আমাদের আবার কোথায় দেখা হইবে।" "মন্মথ কোন উত্তর করিল না, মাত্র আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। সরলা দেখিল সুনির্ম্মল আকাশ, তথায় অসংখ্য তারকারাজি সবেষ্টিত হইয়া পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে; বলিল মন্মথ ও যে বড় সুন্দর স্থান।" মন্মথ বলিল "বড় সুন্দর, ওখানে ঘোর অত্যাচারী হিন্দু-সমাজ নাই, বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক বৈধব্য নাই, আরো শুন সরলা বিধবার উপর এরূপ ভয়ানক অত্যাচার নাই। তথায় প্রণয় অনন্ত, ভাল বাসা অনন্ত, সুখও অনন্ত, সে প্রণয়ে, সে ভাল বাসায়, সে সুখে বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই, বাধা নাই ভয়ও নাই।"

আমরা বলি সরলা, এ হিন্দু সমাজ, পিশাচ হিন্দুসমাজ, তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে না। যাও সেই অনন্ত সুখ ধামে যাও, সেই পবিত্র সাম্য পূরিত স্থানে যাও। এ ছার সমাজ—বৈষম্য পূর্ণ ও চির দুঃখ নিকেতন, বিধবার ভীষণ শত্রু, এ স্থান ত্যাগ কর। মন্মথের প্রতি চাহিয়া সরলা বলিল, "চল মন্মথ, তবে ঐ স্থানে যাই চল।" মন্মথ বলিল, "আমি পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না।" সরলা বলিল "কি বলিলে মন্মথ, আমি পারিব না, কেন পারিব না? এ জীবনে আমার আশা কি? ভরসা কি? সহায় কি? অবলম্বন কি?—যে আমি তোমার সহিত ঐ সুন্দর স্থানে গিয়া অনন্ত সুখ উপভোগ করিতে পারিব না?"

মন্মথ বলিলেন, "তোমার পিতা আছেন, মাতা আছেন, তুমি তাঁহাদের এক মাত্র কন্যা। তোমার মৃত্যুতে তাঁহাদের শোকের সীমা থাকিবে না। রাগ করিওনা সরলা আমি সেই জন্যই ও কথা বলিয়াছিলাম।" মন্মথের সেই অমৃতোদ্গারীবাক্য সমূহ শুনিয়া সরলা বলিল "পিতা মাতা দিবা রাত্র আমার জন্য যে জ্বালায় জ্বলিতেছেন, সে জ্বালার হ্রাস হইবে, আমারও এ যন্ত্রণার

অবসান হইবে। আমি কি আনিয়াছি দেখ।" সরলা তাহার হস্তে একটা কৌটা দিল, মন্মথ কৌটা খুলিলেন জোৎস্নালোকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন "এ যে বিষ-তুমি ইহা লইয়া কি করিবে সরলা ?" সরলা বলিল "ঐ বিষ খাইয়া চরণে মাথা রাখিয়া তোমায় দেখিতে ২ আজ এই খানে মরিব। আর কেন! তোমায় দেখিয়া এত দিন বাঁচিয়া ছিলাম, যখন তোমাকে আর দেখিতে পাইব না, তবে আর কেন।" সরলার কথা শুনিয়া মন্মথের হৃদয় ব্যথা পাইল, মন্মথ বলিলেন "তবে আমাকেও উহার অর্দ্ধেক দাও।" সরলা বলিল, "তাহা পারিবনা, প্রাণ থাকিতে না, তোমায় বিষ খাইতে দিতে পারিবনা। আর ইহাতে দুইজনের মরণ হইবে না, আমি অগ্রে চলিলাম তুমি পরে যাইও।" "আমার সুখে বাধা দিওনা" বলিয়া মন্মথ সরলাকে পুষ্করিণীর জল দেখাইল, উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া আকাশের সুখময় রাজ্যের তারকাগণের সহিত জলে পূর্ণ শশধর দেখিল। আর কথা কহিল না, "উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া ধীরে ২ এক একটী করিয়া সিঁড়ি নামিয়া এক-গলা জলে দাঁড়াইল। উভয়ে জন্মের মত একবার চন্দ্র, নক্ষত্র বৃক্ষ, লতা, যাহা দেখিতে পাইল তাহার পর উভয়ে উভয়কে দেখিয়া ডুবিল, জল কিছুক্ষণ আন্দোলিত হইয়া ক্রমে ২ স্থির হইল। নির্ম্মল আকাশের পূর্ণ শশধর ডুবিল।" নির্ম্মম হিন্দু সমাজ! তোমার একটুও দয়া নাই, দেখ পূর্ণ শশধর তাহাদের মৃত্যু দেখিতে না পারিয়া আপনি লুকাইলেন। তোমার হৃদয় এমনি বজ্রময় যে তাহা অবাধে সহ্য করিলে। শুধু সরলার কেন কত শত কত সহস্র সরলা তোমার অত্যাচারে অকালে জীবন হারাইতেছে। কেন সরলে! তুমি পাপ বঙ্গে জন্মিয়াছিলে ; পাপ সমাজ তোমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তোমার জীবনের বিষাদময় চিত্র পর্য্যন্ত বজ্র হৃদয়ে দেখিল। তবুও এক বিন্দু অশ্রুত্যাগ করিলনা। কেন তুমি অসভ্য বর্ব্বর ইউরোপে জন্ম গ্রহণ কর নাই। সভ্য হিন্দুসমাজে জন্মিয়া, তোমার জীবনে—প্রণয়ে কি সুখ তাহা জানিলেনা। এমন সভ্য দেশ—এমন সভ্য সমাজ জগতে আর দ্বিতীয় নাই!! অসভ্য দেশে; অসভ্য সমাজে থাকিয়া প্রণয়ে কি সুখ তাহা তুমি ভোগ করিতে পাইতে। যে সমাজ প্রণয়ের পবিত্রতা বুঝেনা, যে সমাজ অবাধে বাল-বিধবার অশ্রু দেখিতে পারে, সে সমাজ শত গুণে সভ্য হইলেও আমরা তাহাকে অসভ্য বলিব, ঘোর অত্যাচারী বলিব।

যোগেন্দ্র বাবু সরলার জীবনের শেষ অঙ্কটী অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। সরলার চিত্রটী অঙ্কিত করিয়া, যোগেন্দ্র বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইলেন। চরিত্র গঠনই উপন্যাস লেখকের প্রধান ক্ষমতা, যোগেন্দ্র বাবু তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সরলা চিত্রিত করিয়া, যোগেন বাবু সুপটু চিত্রকরের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। তাহাতে যোগেন বাবুর বেশ অধিকার আছে। চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে তিনি একজন উচ্চদরের উপন্যাস লেখক হইবেন।

পরিশেষে আমরা পাঠক গণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যদি বিধবা দিগের বিষাদময় চিত্র দেখিতে চান, একবার সরলা পাঠ করুন। অবাল বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ইহা পাঠ করিয়া, সময় অপব্যয় হইল বলিয়া, আক্ষেপ করিবেন না; জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যোগেন্দ্র বাবু দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া, এই রূপ সামাজিক চিত্র সকল পাঠক সমাজে অর্পন করুন।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

কল্পনা-কুসুম।—শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা বহুবাজার বসু যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

আমাদের দেশীয় অবলাদিগের দুঃখে কে না সহানুভূতি প্রকাশ করে?—তাহাদের হইয়া একটা কথা বলে এমন লোক অতি দুর্লভ; কেন না সমাজের কুটিল বন্ধন তাহাকে বিভীষিকা দেখায়। শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে ক্রমে সেই বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে—তাই আজ আমাদের সম্মুখে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণীর দুঃখ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছি। আজ কে না গ্রন্থকর্ত্রীর দুঃখে হৃদয় ঢালিয়া দিতে চায়?—গ্রন্থকর্ত্রীর—পতিশোক—

"উষার শীতল বায়ু—স্পর্শে হয় বৃদ্ধি আয়ু
শিশিরে শরীর স্নিগ্ধ জীবের যে হয়।
সে সময়ে উঠি যদি, হুতাসে সুথায় হৃদি,
চারি দিক চে'য়ে দেখি হুতাশন ময়।
এ আগুণ এ জনমে নিবিবার নয়!

—

আত্মীয় স্বজন ঠাঁই, জুড়াইতে যদি যাই,
পরক্ষণে আর তাহা লাগেনাক' ভাল।
জ্ব'লে জ্ব'লে উঠে হিয়ে, সুখ নাই প'রে খেয়ে
দুখিনী বলিয়ে তারা কত বাসে ভাল;
কতই প্রবোধ দেয় করিতে শীতল।

—

তীর্থ স্থান দেবালয়, যাইতে মানস হয়,
শমনের আছে ভয় মরণ যে কাছে।
মন স্থির নাহি যার, ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই তার,
আগুণে পুড়িয়া ছার সে সব হ'য়েছে;
এ পোড়া আগুণ যেন লেগেই র'য়েছে!"

কাহার না হৃদয় বিদ্ধ করে? স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীদিগেরও হৃদয় ব্যথায় ব্যথিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধীদিগের কুটীল নয়নও কবিতা পড়িতে পড়িতে ঝলসিয়া যাইবে।

আমরা ইঁহার কবিত্বে স্থানে স্থানে অতিশয় মোহিত হইয়াছি। স্থানাভাব বশতঃ পাঠকদিগকে উপহার দিতে পারিলাম না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ-শিক্ষায় কাহার না সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়?

মালতীমালা।—(প্রথম ভাগ।) শ্রীমতী কাদম্বিনী প্রণীত। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রকুমার রায়ের প্রযত্নে প্রকাশিত। বীণাযন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা মাত্র।

আরও একটী পুস্তক (বঙ্গ মহিলা প্রণীত) আমরা পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। প্রকাশকগণ গ্রন্থকর্ত্রীর পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন "বঙ্গীয় কুলকামিনীগণ সাধারণতঃ যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, মালতীমালার রচয়িত্রী সেরূপ শিক্ষাও প্রাপ্ত হয়েন নাই।" গ্রন্থকর্ত্রী অল্প শিক্ষিতা হইয়া যে এরূপ সরস ও কোমল কবিতা লিখিতে পারেন ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নয়।

ভারত-সুহৃদ।—(মাসিক পত্র ও সমালোচন) নামার ভারত সুহৃদ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৷৵০। আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।—অনেকগুলি প্রবন্ধও পাঠ করিলাম কিন্তু যেরূপ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম সেরূপ ধৈর্য্য আর রহিল না--আমাদের আশানুযায়ী ফলও পাইলাম না। সম্পাদকের নিকট অনুরোধ তিনি প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সময়ে একটু সাবধান হইবেন।

কল্পতরু।—(মাসিক পত্র ও সমালোচন।) শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীগোপনচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা বিষ্ণুযন্ত্রে মুদ্রিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

বহুদিন হইল, বঙ্গ দর্শন একবার সমালোচনা করিবার সময় বলিয়াছিলেন। "আজ আমরা জানিলাম যাহারা আদৌ পাঠশালায় যায় নাই তাহারাও পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে।" এই পত্রিকা পড়িতে পড়িতে আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি মনে পড়িল। কল্পতরু অবতরণিকায়, বাঙ্গালা ভাষাকে বিশুদ্ধ করিবার মানসে কোন ভাষার সাহায্য লইতে চান্না এই ভাবটী প্রকাশ করিয়াছেন। কল্পতরুর এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল ?—আবার অবতরণিকার আর এক স্থানে অর্থ-হীন বিশুদ্ধ বাঙ্গালার পরিচয় পাঠকদিগকে না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না—এক স্থানে আছে "বঙ্গে নানা রত্ন শোভিত সাহিত্য ভাণ্ডার থাকিতেও কেন যে অনেকানেক মহাত্মারা অন্যান্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ করেন ইহার কারণ নিরাকরণ করা সহজ নহে।"—"অনেকানেকে মহাত্মাদের" বড়ই অপরাধ! এত গেল দূরের কথা—আমরা "নিরাকরণ" শব্দের অর্থ "দূর করিয়া দেওয়া" ভিন্ন অন্য অর্থ বাচস্পত্যাভিধানে ও খুঁজিয়া পাইলাম না। "কারণ দূর করা" কিরূপ, সম্পাদকই জানেন আর কল্পতরু মহাপ্রভুই জানেন! আমরা এরূপ অদ্ভুত পত্রিকা আর দেখি নাই!-সম্পাদক মহাশয় কল্পতরু হইতে

"——মধুচক্র, গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

আশা করেন। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস,—

ইহা এমন "—বিষচক্র গৌড়জন যাহে
ঘৃণিবে দূর হইতে দেখে ভাবভঙ্গি।"

এরূপ পত্রিকার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক!

আচার্য্য।—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জীবনবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ও সমালোচন বিষয়ক মাসিক প্রবন্ধ পত্র। নড়াল ইম্পিরিয়েল যন্ত্রে শ্রীপঞ্চানন দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

আমরা ইহার কেবল প্রথম চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আচার্য্য সামান্য বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়া অতি গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়া শিষ্য সংগ্রহ করিতেছেন। আজ কাল বঙ্গ-দেশে সাময়িক পত্রের অভাব নাই। অনেকে কল্পতরুর ন্যায় সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন তাঁহাদের কেবল অর্থ অপব্যয় করা। আমাদের আচার্য্য সে শ্রেণীর নহেন—আমরা তাঁহাকে আচার্য্য ভাবে সাদরে আসন দিলাম। আচার্য্যের উপদেশ আমাদের অনেক স্থলে ভাল লাগিয়াছে—কিন্তু তিনি অনেক সময় মিছামিছি বকেন। "মনুসংহিতাও তৎসমালোচন" বহুদিন হইল একবার পুস্তকাকারে দেখিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু পরে দেখি "মনুসংহিতা ও তৎসমালোচন" নাম ধেয় পুস্তকাপেক্ষা লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা লেখকের সমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। "বৌদ্ধ-দর্শন" বাস্তবিক আমাদের পক্ষে নূতন জিনিস—বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। "বৌদ্ধ-দর্শন" সমাপ্ত হইলে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি নূতন রত্ন উদ্ধার হইবে। আচার্য্য মহাশয়কে আমরা ভক্তিভাবে নমস্কার করি—পরিশেষে তাঁহার নিকট নিবেদন যা তা বিষয় লইয়া বেশী বুকিবেন না; তাহাতে শিষ্যদের ভাল না লাগিবার সম্ভাবনা। নিতান্ত কেবল আবার "দর্শনাদি" লইয়া আলোচনা করিলেও শিষ্যদের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। মধ্যে মধ্যে কাব্যাদি আলাপন করিলে ভাল হয়। শিষ্যদিগের চিত্ত চাঞ্চল্য হইলে "আচার্য্য" টিকিবেন্না। কেন না বঙ্গদেশে এরূপ পত্রিকার পাঠক অতি অল্প।

২য় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ও পৌষ। ১২৮৮। ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

হিন্দুদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীবিধুভূষণ মিত্র কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

৬৬ নং পটুয়াটোলা লেন হিন্দুদর্শন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক ভবনস্থ

সরস্বতীযন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৮৮ সাল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা, ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রত্যেক সংখ্যার নগদ

গ্রাহকবর্গের প্রতি।

প্রেসাধ্যক্ষের মহিমায় হিন্দুদর্শন-প্রচারে বিলম্ব হইল। আমাদের সংকল্প ছিল যে দুই সংখ্যা করিয়া প্রকাশ করিয়া শীঘ্র ইহার অনিয়ম ঘুচাইব। কিন্তু প্রেসের জ্বালায় তাহা ঘটিল না। যাহা হউক সরস্বতী যন্ত্রে আমরা চারি সংখ্যা একত্রে মুদ্রিত করিতেছি। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় মূল্য এই সংখ্যাদ্বয় প্রাপ্তিমাত্র প্রেরণ করিয়া উৎসাহিত করিবেন। তাহা হইলে অর্থাভাবে ইহার শীঘ্র প্রচার রহিত হইবে না। যাহাতে ইহা শীঘ্র যথাসময়ে প্রচার করিতে পারা যায় তাহার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টিত রহিলাম। গ্রাহকগণ যেন কোন মতে কৃপাহীন না হন, এই আমাদের প্রার্থনা।

সম্পাদক।

হিন্দুদর্শন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ষাণ্মাসিক ১৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাক মাশুল লাগে না।

২। গ্রাহকগণ প্রদত্ত মূল্য-প্রাপ্তি-স্বীকার পত্রিকাতেই করা যাইবে।

৩। ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা হিসাবে দিতে হইবে। দীর্ঘ কালের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

৪। অগ্রিম মূল্য ব্যতিরেকে মফঃস্বলে কাহারও নিকট "হিন্দুদর্শন' প্রেরিত হয় না।

৫। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে, ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন। লিখিত প্রবন্ধগুলি হৃদয়গ্রাহী ও সারবান হওয়া উচিত।

৬। হিন্দুদর্শনের মূল্য পাঠাইতে হইলে সম্পাদকের নামে মণিঅর্ডার অথবা অর্দ্ধ আনা ষ্ট্যাম্প রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইতে হইবে।

৭। বেয়ারিং ও ইনসফিসেণ্ট পত্র গৃহীত হইবে না।

৮। হিন্দুদর্শনসম্বন্ধীয় যাবতীয় পত্রাদি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৯। যিনি দশ জন গ্রাহক করিয়া দিতে পারিবেন, ডাক মাশুল পাঠাইলে তাঁহাকে বিনা মূল্যে আমরা "হিন্দুদর্শন" দিব।

১০। প্রেরিত প্রবন্ধাদি আমাদের মনোনীত না হইলে আমরা লেখককে প্রবন্ধ প্রত্যর্পণ করিব না। তবে বিশেষ অনুরোধ করিয়া টিকিট পাঠাইলে আমরা প্রত্যার্পণ করিব।

হিন্দুদর্শনের ১ম বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হওয়ায়, উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। যে সমস্ত গ্রাহক মহোদয় উহা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহারা পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে প্রাপ্ত হইবেন। অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে ৵০ দুই আনা মূল্য দিতে হইবে।

বঙ্গ-নারী।

(প্রথম প্রস্তাব।)

"O fairest of creation; last and best
Of all god's works, creature in whom excell'd,
Whatever can to sight or thought be formed.
Holy, divine, good, amiable or sweet!'

Milton.

পৃথিবীর অর্দ্ধেক শোভা বিলুপ্ত হইয়া যাইত যদি বিধাতা এই মর জগতে দয়া করিয়া নর নারীর সৃষ্টি না করিতেন। নরগণের সুখ, শান্তি, সম্পদ, সৌভাগ্য অকালে অস্তমিত হইত, যদি সর্ব্বদর্শী বিধাতা নরের পার্শ্বে নারীকে আনিয়া না বসাইতেন। সমগ্র ধরণী শূন্যময়,—শ্মশানময়, মরুময় প্রতীয়মান হইত যদি নরকে একাকী এ সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইত। কোথায় থাকিত সমাজ, কোথায় থাকিত সংসার আর কোথায়ই বা থাকিত আত্মীয় পরিজন যদি রমণী আসিয়া পুরুষের হৃদয়াধিকার করিয়া না বসিতেন। রমণীর সৃষ্টি বিধাতার এক আশ্চর্য্য করুণা। কে জানিত প্রীতি, কে জানিত প্রেম যদি রমণীর হৃদয়োৎস হইতে ইহারা অবিরত উৎসারিত না হইত। রমণী আছে বলিয়াই মনুষ্য বাঁচিয়া আছে; সমগ্র ধরণী হইতে রমণীর মূর্ত্তি বিলুপ্ত কর, তাহার সঙ্গে সমগ্র মানব জাতির মূর্ত্তি আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। নরগণ যদি হন সমাজের জীবন, নারীগণ হইবেন ইহার শোণিত; যদি সমাজরূপ অট্টালিকার স্তম্ভ হন নর, নারী হইবেন ইহার ভিত্তি। ইহা কি অত্যুক্তি হইল?

স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের কবি ও শাস্ত্রকারগণ আপন২ মতামত অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অঙ্গনাগণ যে পুরুষদিগের স্নেহ, প্রেম ও সম্মানের সামগ্রী মনু প্রমুখ মহর্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বসাধারণের নিকটে ইহা কহিয়া গিয়াছেন। মনু বলেন, পুরুষেরা নহে, কিন্তু স্ত্রীরাই গৃহকে উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। ভীষ্ম ইহ জন্মে দারপরিগ্রহ করেন নাই, তথাপি তিনি অসঙ্কুচিত হৃদয়ে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন "পীড়িত ও দুঃখিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই। স্ত্রী পরম ঔষধ।" ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আগ্রহাতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কেমন রাজ্যেতে অঙ্গনারাতো সুরক্ষিতা হয়? রাজবাটীতে স্ত্রীলোকেরাতো সম্মানপূর্ব্বক গৃহীতা হয়?" ভরত, রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে রাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভরত! তুমি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকতো?" যুধিষ্ঠির দাসীগণকেও "ভদ্রে" বলিয়া ডাকিতেন। মেরী-তনয় ঈষ স্ত্রীলোকদিগকে যথোচিত সম্মান করিতেন। হজরৎ মহম্মদ

স্ত্রীলোকদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা যে অমর ইহা বিশ্বাস করিতেন না। তদীয় শিষ্য ও ধর্ম্মপ্রচারক খলিফা আবুবেকার বলিতেন "স্ত্রীজাতি সমাজের কণ্টক স্বরূপ এবং অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই যে, এরূপ কণ্টক আবার পৃথিবীর অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু।" মহাভারতান্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যানে লিখিত আছে "ভার্য্যা ধর্ম্ম-কার্য্যে পিতার স্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম-স্থান স্বরূপ।" দশরথ কৌশল্যা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, পরামর্শদানে ভগ্নীর ন্যায় ও ভোজন কালে জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

এখন মৃত ও জীবিত বঙ্গ-কবিগণ রমণী জাতি সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিব। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন স্ত্রীদিগকে বিষ নেত্রে দেখিতেন; তিনি গাহিতেন "রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী। আগে ইচ্ছা সুখে পান করি, শেষে বিষের জ্বালায় ছটফটী।" কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত কলেন;

"রমণী বচন মদ পান মাত্রে গদ গদ
তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদ প্রফুল্ল হৃদয়।
অবশেষে বোধ শূন্য স্বভাবে স্বভাব ক্ষুন্ন
কোথা তার থাকে পুণ্য পাপে হয় লয়॥"

জনৈক হিন্দি কবি এই মতের পোষকতা করিয়া আরও তীব্রতর রবে বলিতেছেন।

"দিন্‌কা মোহিনী রাত্‌কা বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে,
দুনিয়া লোক সব বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।"

আধুনিক জনৈক লব্ধ প্রতিষ্ঠ বঙ্গ-কবি বলিয়াছেন বাঙ্গালীর মেয়েরা—

"বাসর ঘরে ঝুমুর নাচে চোখের মাথা খেয়ে;
দিনের বেলা পিশ্ শাশুড়ী ঘোম্‌টা মুখে চেয়ে।"

এই তো গেল স্ত্রীজাতির নিন্দাবাদ। তাঁহাদের গুণের প্রশংসা করিয়া কবিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিব। পণ্ডিতবর শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন;

নবীন যৌবনে নব প্রস্ফুটিত
সারল্য বিনয় আনন্দে জড়িত
নারীর বদন সুন্দর কেমন,

* * * *

জগতের শোভা রমণীর মুখ
তাতেও জীবের হরে শত দুঃখ, ইত্যাদি।

উক্ত কবিই আর একস্থানে বলিয়াছেন "রমণী গৃহধর্ম্মের লবণ স্বরূপ তাঁহার অভাবে গৃহ ধর্ম্মের স্বাদ থাকে না।" পরলোকগত কবি সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার নারী জাতির গুণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন;

"হে বর্ব্বর নর! গতি কি হ'তো তোমার
বিহনে অঙ্গনা অবতার!
কে গাঁথিতো প্রেমসূত্রে সমাজের হার,
পিতা মাতা কুমারী কুমার!
দয়া ধর্ম্ম শিখাইয়া কোমল করিয়া হিয়া
কে করিত সভ্যতা স্থাপনা,
কে পূরাতো স্বর্গচ্যুত আত্মার কামনা।"

আর এক স্থানে বলিয়াছেন ;

"অবনী ! রমণী তব গরিমার স্থান।"

প্রথিত নামা কবি হেমবাবু বলেন ;

"কি হবে জীবনে প্রেমের আমোদে
পরাণ যদি না মাতে
রসের বাগানে সখের মেদিনী
নারীফুল ফুটে তাতে !
যে জানে মথিতে এ সুখ জলধি
সেই সে পীযুষ পায়
সখের বাজার সুখের মেদিনী
রসের বেসাতি তায়।"

হেমবাবুর সহোদর ঈশান বাবু তদীয় "যোগেশের" এক স্থানে বলিয়াছেন,

"রমণীর মন বিধি, কেন এত প্রেমময়।"

অন্য এক কবি বলেন ;

"ফুটেছে অতুল ফুল উদ্যান ধরায়,
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার
বৃন্তদল, কলেবর পুরুষের তায়,
নারী বর্ণ, মধু গন্ধ যার !"

নারী জাতি সম্বন্ধে আর কত উদ্ধৃত করিব ? এখন তাঁদের প্রেম সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিয়াছেন পাঠকগণ তাহাই অবগত হউন। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "যেমন সূর্য্যের মূল্য তেজ, চন্দ্রের মূল্য জ্যোৎস্না—স্বর্ণের মূল্য দীপ্তি—তেমনি রমণীর মূল্য প্রেম। ইহারই গুণে তিনি দুর্গম পর্ব্বতে নির্ঝরিণী, সংসার প্রান্তরে বটচ্ছায়া এবং জীবন পথের আতপত্র। পশু যিনি, তিনি রমণীকে বলেন "আমার ইন্দ্রিয় সেবার জন্য তোমাকে পাইয়াছি।" মনুষ্য যিনি, তিনি বলেন "আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হইবার জন্য তোমাকে পাইয়াছি।" দেবতা যিনি, তিনি বলেন "তোমাকে নিস্বার্থ প্রীতি দিয়া ও তোমাকে সুখী করিয়া আমি স্বর্গে যাইব বলিয়া তোমাকে পাইয়াছি।" প্রথিত নামা কবি নবীন বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন ;

"বিদ্যুৎ প্রতীম প্রেম দূর হতে মনোরম
দরশনে অনুপম পরশনে মৃত্যু ফল।"

কিন্তু অন্য স্থানে লিখিয়াছেন যে, প্রণয় অত্যাবশ্যক সামগ্রী—। যে দাম্পত্য মিলনে বিশুদ্ধ প্রণয় নাই তথায় প্রকৃত সৌন্দর্য্যও নাই—

"প্রণয় বিহনে পরিণয় পরিমল
হীন পুষ্প মণিহীন ফণী আজীবন
অনন্ত দংশক—মধুহীন মধুচক্র
মক্ষিকা পূরিত।"

সুকবি বিহারী লাল চক্রবর্ত্তীর মতে—

"প্রণয় পবিত্র ধনে
সন্দেহ করোনা মনে
নাগর দোলায় দোলা শিশুরি মানায়।"

যখন ভারতে আর্য্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন নারী জাতির যথেষ্ঠ সম্মানও ছিল। আর্য্যগণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রমণীগণের ক্রমশঃ পতন হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ রমণীগণ সাধারণতঃ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। সদ্যোবধূরা বিবাহ করিতেন ও সাংসারী হইতেন ; কিন্তু প্রথম সম্প্রদায়ভুক্তা নারীগণ চির কুমারী থাকিতেন। তাঁহারা বেদ পাঠ ও তাহার রচনা করিতেন। গার্গী, সলভা, মৈত্রেয়ী প্রমুখা বিদুষী রমণীগণ বেদাধ্যয়ন করিয়া জীবনাতিবাহন করিয়াছেন। ভারতের সেই এক সময় গিয়াছে

যখন দেবহূতি, কেশিনী, শান্তা ও সতী ভারতে বর্ত্তমান থাকিয়া আর্য্যগণকে আপনাদের দেব ভাব দ্বারা মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন; সেই এক সময় গিয়াছে, যখন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা ও গান্ধারী সতীত্বের অনন্ত দৃষ্টান্ত ভারতবাসীগণকে দেখাইয়া গিয়াছেন; সেই এক সময় গিয়াছে, যখন সুভদ্রা রুক্মিণী, অহল্যাবাই, ও সংযুক্তা জীবিতা থাকিয়া নারী বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আর এখন? হায়! আর এখন তাঁহারা পুরুষ-বিনির্ম্মিত পিঞ্জরে রুদ্ধ ও পুরুষ-রচিত বিধিতে বদ্ধ হইয়া দাসীর ন্যায় আমাদের সেবায় নিযুক্ত আছেন। হায়! আর সে আর্য্যগণও নাই, আর নারীগণের সে মহত্ব ও বীরত্বও নাই। পরাধীন হিন্দু-জাতি—ততোধিক পরাধীন রমণীজাতি।

তাহার পর ক্ষত্রিয় রমণীগণের অদ্ভুত বীরত্বের কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখ—। তখন প্রতি ঘরেই পদ্মিনী-প্রকৃতি বীর নারী বিরাজিতা ছিলেন; হিন্দু রমণীর ন্যায় তখনকার মুসলমানীগণও বীরভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—দক্ষিনস্থ আহামদ নগর রক্ষাকালে চাঁদ সুলতানার বীরত্ব কথা একবার চিন্তা কর, শত্রুহস্ত হইতে প্রিয়তম জাহাঙ্গীরকে রক্ষা করিবার সময় সুচতুরা নুরজাহানের নির্ভীকতা স্মরণ করিয়া দেখ। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কে আর বলিতে সাহসী হইবে যে, নারীজাতি স্বভাবতই বলহীনা ও বীর্য্যহীনা? কিন্তু হায়! সে কাল বহু দিন হইল অতীত হইয়া গিয়াছে। আর সে ক্ষত্রিয় রমণী নাই, আর সে ক্ষত্রিয় তেজ নাই, আর সে বিক্রম নাই—পরাধীন ক্ষত্রিয় জাতি—ততোধিক পরাধীন ক্ষত্রিয় ললনা।

ক্ষত্রিয় তেজোহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতললনাগণের সৌভাগ্য সূর্য্যও ক্রমশঃ অস্তমিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চতুর ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জন্য "নারীপেষণী" কল নির্ম্মাণ করিলেন। নূতন বিধি প্রণীত ও নূতন নারী চরিত্র সংগঠিত হইতে লাগিল। যে স্ত্রী পূর্ব্বে স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র গমন করিতেন * তাঁহারই জন্য পরে বিধি হইল।" স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্রতা নাই, তাহাকে—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা
রক্ষতি যৌবনে
পুত্রস্তু স্থবিরে কালে স্ত্রিয়ো
নাস্তি স্বতন্ত্রতা।"

পৃথিবীর কিছুই চিরদিন সমান ভাবে থাকে না। পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। নারীজাতি তবে কেনই বা এ নিয়মের বহির্ভূত হইবে? আর্য্যনারীগণের একরূপ অবস্থা ছিল, ক্ষত্র রমণীগণের অবস্থা ভিন্নরূপ হইল, আবার যত সময় যাইতে লাগিল, সায়ংকালের আকাশের ন্যায়, তাঁহাদের অবস্থা তত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সময় এখন তাঁহাদিগকে নিবিড় বিভীষিকাময় অন্ধকার মধ্যে আনিয়া বসাইয়াদিল। স্ত্রী-শিক্ষা

* ঋক্‌বেদে দেখা যায়, পূর্ব্বে নারীগণ সালঙ্কৃতা হইয়া উৎসব ও সভাতে গমন করিতেন। মনু সংহিতায় লেখে যে, স্ত্রীগণ প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া মল্লযুদ্ধও বাণ শিক্ষা দেখিতেন। রাজপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞে ও যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময় অঙ্গনাগণ উপস্থিত ছিলেন। মহাবীরচরিতে দেখা যায় যে, রমণীগণ পিতা কিংবা পতির সহিত ভোজে ও যজ্ঞে গমন করিতেন। ইত্যাদি—

অমনি অন্তর্হিত হইয়া গেল। যে স্ত্রী পূর্ব্বে কত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; যিনি পূর্ব্বে বেদ বেদান্তের টীকা ও ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন; যিনি গনিত ও জ্যোতিষাদির গুঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার ও দুরূহ প্রশ্ন সকল অতি সহজে মিমাংসা করিয়া গিয়াছেন; সময় ক্রমে তাঁহাকে নিরক্ষরা হইয়া নির্ব্বোধের ন্যায় থাকিতে হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, রমণীগণের এ শোচণীয় অবস্থাও চিরস্থায়ী হইল না। নিবিড় তিমির রাশির মধ্যেও একটু আশার আলোক দেখা দিল। একটী স্ত্রী-বন্ধু আশার আলোক হস্তে করিয়া সেই দুর্ভেদ কুসংস্কার রাশি ভেদ করিয়া স্ত্রী সমাজে উপস্থিত হইলেন। তিনি কে? সেই রমণী পরিত্রাতা কে? তিনিই মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়।

এই মহাত্মা স্ত্রীজাতির দুঃখে কাতর হইয়া, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। নারীজাতির প্রতিকূলে সবাই, কিন্তু অনুকূলের কেহই নাই। মহাত্মা রাম মোহন সমর ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া স্ত্রীজাতির সত্ব বজায় রাখিবার জন্য ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যাবাগীশগণের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-বিরোধীগণ সমগ্র রমণীজাতির উপর বিবিধ দোষারোপ করিলেন। রাম মোহন সারগর্ভ যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত তর্ক বলে একটী একটী করিয়া সমস্ত খণ্ডণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে জয়শ্রী স্ত্রীজাতির পক্ষই অবলম্বন করিল। লোমহর্ষণ সহমরণ প্রথা রহিত হইল।

তাহার পর বর্ত্তমান সময় স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হইল, মহাত্মা বেথুন প্রমুখ স্ত্রী-হিতৈষী মণীষীগণ দ্বারা বালিকা বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। হিন্দুগণ কতই আপত্তি করিলেন, স্ত্রীশিক্ষা যে বঙ্গদেশে কখন প্রচলিত হইবে, এরূপ আর আশা রহিল না। কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত অদৃশ্য ভাবে ইহাতে কার্য্য করিতে লাগিল।

যদিও বঙ্গাঙ্গণাগণের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, যদিও স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা স্থানে স্থানে বালিকা ও "জানানা" বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইয়াছেন; যদিও আমরা দেখিতেছি বৎসর বৎসর দুই চারিটী কামিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বিদ্যাদেবীর পাদপদ্ম পূজায় অনুরক্তা হইতেছেন; যদিও দুই একটী স্ত্রীসমাজ ও স্ত্রীসমিতি রাজধানীর স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিদুষী রমণীগণের কিয়ৎপরিমাণে আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে; যদিও একটী আধটী স্ত্রীলেখক ও স্ত্রীকবি অন্ধকারময় স্ত্রীসমাজ হইতে সমুত্থিত হইয়া, স্বস্ব কল্পনা ও প্রতিভা বলে বঙ্গসাহিত্য সংসারে জ্যোতিবিস্তার করিতেছেন; তথাপি অধিকাংশ রমণীগণ যে আজও ঘোর তিমির রাশির মধ্যে বাস করিয়া, তাঁহাদের অনেক প্রাপ্য সুখে বঞ্চিত রহিয়াছেন এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? পুরুষবর্গের আত্মোন্নতির পথ [illegible] পরিষ্কৃত, তাঁহাদের স্বচ্ছন্দতা [illegible]র জন্য বঙ্গ সমাজের দ্বারগুলি কেমন উন্মুক্ত, কিন্তু বঙ্গ কামিনীগণের জন্য সমাজ ভাণ্ডারে কয়টী রত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে?

তাঁহাদের সুখ বর্দ্ধনের জন্য কোন্ সামগ্রী সমাজ অনায়াসে প্রদান করিতে সক্ষম? আমাদের সমাজ আছে, সভা আছে, সুখ দুঃখের বন্ধু আছে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিলে প্রাণ জুড়াইবার স্থান আছে, আমোদ অহ্লাদের সহচর আছে, বিপদের সময় সঙ্গী আছে, সৎইচ্ছা থাকিলে সৎকার্য্য করিবার ক্ষেত্র আছে, পিতা, মাতার স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের প্রীতি, ও গৃহের আনন্দ আমাদের জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু দুঃখ-পীড়িতা নারী কুলের আছে কি? থাকিবার মধ্যে এক স্বামী, তিনি ভালই হউন আর তিনি মন্দই হউন, তিনিই নারীর উপাস্য দেবতা, তিনি তাঁহার সুখ দুঃখের সঙ্গী ও ইহ জীবনের চির সহচর। পত্নীর স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই; পতির ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা, পতির বলই তাঁহার বল। যিনি, সৎস্বামী শুভাদৃষ্ট ক্রমে প্রাপ্ত হইলেন, তিনি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়া সুখী হইতে যত্নবতী হইলেন; যাঁহার ভাগ্যে মদ্যপ কুপথগামী স্বামী জুটিল তাঁহার দুঃখ অব্যক্ত, অবর্ণনীয়। হতভাগিনী কাহার কাছেই বা দুঃখের কথা জানাইবেন? কে বা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে? হতভাগিনী ইহ সংসারে অনাথা, কাঁদিবার অবসর নাই, হৃদয়ের বন্ধু নাই, প্রাণ জুড়াইবার স্থান নাই। যখন যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠিল, জীবন্মৃতা রমণী পলায়ন করিয়া তখন আনন্দের সহিত কৃতান্তের শরণাপন্না হইলেন। বঙ্গদেশে এরূপ ঘটনা বিরল নহে, বঙ্গনারীর স্বাতন্ত্র্যহীনতা ও বিশুদ্ধ প্রেমের অভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ কে তাহা সরল হৃদয়ে অস্বীকার করিতে পারেন? আমাদের দেশের বিবাহ প্রথা এত কদর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার সংস্কার না করিলে আর কোন ক্রমেই চলে না। যাঁহার উপর্য্যুপরি চারি পাঁচটী কন্যা জন্মিল, তিনি গৃহিণীকে ধিক্কার দিতে, দিতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। পক্ষান্তরে যাঁহার গুটীকতক পুত্র সন্তান জন্মিল তিনি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া অমনি এক দোকান খুলিয়া বসিলেন। তিনি ক্রমাগতই দর হাঁকিতে লাগিলেন "আয় খরিদার চলে আয়, কে জামাই লইবি আয়, ভাল ছেলে, সুন্দর ছেলে বয়স কম, তিনটে পাশ।" খরিদ্দার সকল দিক্‌বিদিক্ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল। একটা চিররুগ্ন, গণ্ডমূর্খ, কুৎসিৎ বালক অগাধ টাকায় মুহূর্ত্ত মধ্যে বিক্রীত হইয়া গেল। অন্য দিকে মনুষ্যগণ "বৌ" ক্রয় করিতেছে, পিতা টাকার লোভে কন্যা বিক্রয় করিতেছে। কোথায় বা ভক্তিভাজন পিতা শুদ্ধ কুল বজায় রাখিবার জন্য স্বীয় প্রাণ তুল্য দুহিতারত্নটী অকুল দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করিতেছেন। বিবাহের অবস্থা বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই এইরূপ শোচনীয়। কেবল অর্থ ও স্বার্থ লইয়াই সকলে বিব্রত; নারীকুলের সুখ সচ্ছন্দতার দিকে লোকে কেন দৃষ্টি করিবে?

সাধারণতঃ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম গুলি নারজাতির দাস ও নারীজাতি দ্বিতীয়গুলির দাসী। যাঁহারা নিজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া সমস্তই স্ব স্ব স্ত্রীদিগের

উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হন, যাঁহারা পত্নীর কথায় উঠেন, পত্নীর কথায় বসেন, যাঁহারা কেবলমাত্র স্ত্রীর মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য অপরাপর আত্মীয় স্বজনের মনে ব্যথা দিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা যেমন আমাদের অশ্রদ্ধার পাত্র; তেমনি আবার যাঁহারা বিবেচনা করেন স্ত্রীরা কেবল পুরুষের ঘৃণিত রিপু চরিতার্থ করিবার জন্যই সৃজিত, যাঁহারা পত্নী ও দাসীর মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পান না, যাঁহারা পত্নী-পীড়ক ও পত্নী-হন্তারক, তাঁহারও আমাদের আন্তরিক ঘৃণার পাত্র। তাঁহারা সমগ্র নারীজাতিকে বিষ-নয়নে দেখিয়াছেন; তাঁহারা বলেন স্ত্রীরা প্রায়ই কুটিলা, কঠিনা, অবিশ্বাসিনী ও বিশ্বাসঘাতকিনী। নারীরা যে কুটিলা ও কঠিনা এ কথা সরল হৃদয়ে কে বিশ্বাস করিতে পারে? নারীজাতির হৃদয় দয়া ও কোমলতার প্রিয় নিকেতন। অপরের দুঃখ দেখিয়া রমণীর হৃদয় যেমন সহজে বিগলিত হয়, পুরুষের হৃদয় কখনই সেরূপ হয় না। রমণী নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে যত্নবতী হইয়া থাকেন। প্রথিত নামা ইংরাজ পরিব্রাজক মঙ্গোপার্ক আফ্রিকা পর্য্যটন কালে নারিজাতির দয়ার যে জলন্ত পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বকীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন; "আমি একদিন এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপনের জন্য আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় কেহই আমাকে আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইল না। ক্রমে রজনী আগত প্রায়, চতুর্দ্দিক দেখিতে২ গাঢ় তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, ভয়ঙ্কর বাত্যা উঠিল, বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। আমি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণ মনে এক বৃক্ষ তলে উপবেশন করিলাম। সেই স্থান দিয়া এক কৃষক-পত্নী গমন করিতেছিলেন, তিনি আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কুটীরে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম। দয়াবতী রমণী আমাকে যথেষ্ঠ খাদ্য সামগ্রী দিলেন এবং আমার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিয়া নিজে সূতা কাটিতে বসিলেন। পরে নিজের সঙ্গিনীগণকে আহ্বান করিয়া একটী গান গাহিতে লাগিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, বাতাস গর্জ্জিতেছিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, নিরাশ্রয় শ্বেতকায় পুরুষ পরিশ্রান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া আমাদের বৃক্ষতলে বসিলেন। তাঁহার মাতা নাই, কে তাঁহার জন্য দুগ্ধ আনিয়া দিবে, তাঁহার পত্নী নাই, কে তাঁহার জন্য শস্য পিসিবে? শ্বেতকায় ব্যক্তির প্রতি দয়া করা উচিত। তাঁহার মাতা নাই, তাঁহার স্ত্রী নাই।" আমরা কোন্ প্রাণে নারীজাতির নিন্দা করিতে অগ্রসর হই? আমরা কি কৃতঘ্ন! যাঁহার অনুগ্রহে পৃথিবী দেখিলাম, যাঁহার যত্নে জীবিত রহিলাম, যাঁহার স্তন্য দুগ্ধপানে শরীরে সামর্থ্য পাইলাম, যাঁহার ক্রোড় এক সময় আমাদের অভয় দুর্গ ছিল, যিনি নিজে সুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের সুখ

বর্দ্ধনে অষ্টপ্রহর নিযুক্ত ছিলেন, মাংসপিণ্ড যাহার দয়ায় কালে বুদ্ধিজীবী মানুষ হইয়া উঠিল, তিনি আমাদের মাতা, তিনি নারী; তিনি যে জাতির অন্তর্গত আমরা কোন্ প্রাণে সেই নারীজাতির নিন্দাবাদ প্রচারে অগ্রসর হই? ভ্রাতা ভ্রাতাকে যত ভাল-বাসে ভগ্নী ভ্রাতাকে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ভাল বাসিয়া থাকেন, ইহা কল্পনা বা অত্যুক্তি নহে। যাহার দুহিতা আছে তিনিই জানেন, কন্যা পিতাকে কতদূর ভক্তি করিতে সমর্থ। ইহারা আছেন বলিয়াই আমরা সংসারে সুখে বাস করিতে পারি। বিপদের সময় পতিপ্রাণা রমণীর ন্যায় বন্ধু ইহ জগতে আর কে? টলেমি দুহিতা ক্লিওপাটরা-প্রকৃতি রমণী দেখিয়া সমগ্র নারীজাতিই যে সেইরূপ ছাঁচে গঠিত ইহা যাহারা বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিরো-প্রকৃতি পুরুষ দেখিয়া সমগ্র পুরুষ জাতিকে কেন যে নিরোর অনুরূপ বিবেচনা না করেন তাহা তো বলিতে পারি না।

ভারতীয় ভূগোল শাস্ত্র।

কমলালয়া প্রাচীন ভারত সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছিলেন; কি সাহিত্য কি বিজ্ঞান—কি ধর্ম্মনীতি—কি রাজনীতি যে কোন বিষয়ই পর্য্যবেক্ষণ করিনা তাহাতেই তাঁহাদের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ ক্ষমতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হই; তাঁহারা দুরূহ শাস্ত্র সকল এ প্রকার পারদর্শিতা সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন যে, মনে হইলে আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত ও আহ্লাদে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠে। তাঁহাদের তাৎকালিকী এই অলোক সম্পন্ন কার্য্য কলাপ পরিদর্শন করিয়া অধুনাতন প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন; ভারতীয় মহর্ষিগণ সামান্য পর্ণকুটীরে বসবাস ও স্বচ্ছন্দজাত আরণ্য কন্দ-ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়া যে সকল অত্যাশ্চর্য্য জগৎ-রঞ্জিনী অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা এ জগতে দুর্লভ; তাঁহাদের এই সুকীর্ত্তি বার্ত্তা সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত দেশে দেশে পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাঁহাদের সাহিত্য—তাঁহাদের বিজ্ঞান—তাঁহাদের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, চিকিৎসা শাস্ত্র, সঙ্গীত অধুনা সমস্ত সভ্য জাতিরই আলোচ্য বিষয় হইয়াছে; সকলেই মনঃসংযোগ সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে সকল অধ্যয়ন করিতেছেন। আর্য্যগণ সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়া প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছেন, সকল শাস্ত্রেই তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে; সকল শাস্ত্রই তাঁহাদের হস্তে নিষ্পীড়িত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণকার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন ভারতের ইতিহাস বা ভারতের ভূগোল শাস্ত্র নাই। ইতিহাসই

পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের আলোক স্বরূপ; ইতিহাস পথ প্রদর্শন না করিলে পদে পদে পদস্খলিত হইতে হয়। কোন দেশ বিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে হইলে সে দেশের ইতিহাস ও ভূগোল প্রথম পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; যে জাতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নাই তাহা চিরকাল পঙ্কে নিমজ্জিত থাকে; ভারতের তাহা নাই সুতরাং ইহার পুরাবৃত্ত জানিবার পথ অবরুদ্ধ; এই কথা সকলেরই মুখে শ্রুত হওয়া যায়; কিন্তু আমরা বলি ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল আছে, তবে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই এ কথা অলীক নহে। নানাবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও কাব্য হইতে ইতিহাস ও ভূগোল সমুদ্ধৃত করিলে সমগ্র ভারতের সুন্দর ইতিহাস ও ভূগোল শাস্ত্র বাহির হইতে পারে। আমরা অদ্যকার এই শীর্ষস্থ প্রস্তাবে দেখাইব পুরাকালে ভারতে ভৌগলিক জ্ঞান নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিলনা এবং তাঁহাদের জ্ঞান কেবল ভারতেই আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র এসিয়া ভূখণ্ডময় বিকীর্ণ হইয়াছিল; শ্যাম, ব্রহ্ম, চীন, তীব্বৎ, রুষিয়া, আফগানস্থান, পারস্য, তাতার প্রভৃতি সমুদায় দেশই তাঁহারা পরিজ্ঞাত ছিলেন। আমরা এক্ষণে তাহাই প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইব।

পৃথিবীর আকার।

আমরা যে বিস্তীর্ণ নদ নদী সঙ্কুল পর্ব্বত মালা সমাকীর্ণ—নানা গ্রাম, নগর, বন, উপবন সুশোভিত সাগর বেষ্টিত ভূখণ্ডে বাস করিতেছি, তাহার আকার কদম্ব পুষ্পের ন্যায় সম্পূর্ণ গোল। কদম্ব পুষ্পের গ্রন্থি সকল যে রূপ কেশর সমূহে পরিবেষ্টিত সেই রূপ এই ধরাধাম নানা বন, উপবন, পর্ব্বত, কন্দর, মরুভূমি, নদ নদী দ্বারা বেষ্টিত আছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ সততই বলিয়া থাকেন ভারতীয় মহর্ষিগণ পৃথিবীর আকার ত্রিকোণ চতুষ্কোণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন; বস্তুতঃ তাহা নহে; মতভেদে যদিও পৃথিবী ত্রিকোণ ইত্যাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাই সর্ব্বসম্মত মত নহে; যাহারা পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে এই রূপ মত বিবৃত করিয়াছেন তাঁহারা হয়ত এই ভারতবর্ষকেই পৃথিবী নামের বাচ্য করিয়া লইয়াছিলেন; অথবা তাহা কোন এক দেশে কোন পণ্ডিতের উদ্ভাবিত। আমাদের মতে অধুনাতন চতুষ্পাঠী শিষ্যগণ গাত্র কণ্ডুয়ণ করিতে করিতে আদিরস মিশ্রিত এই অযৌক্তিক মত প্রচার করিয়া নিজ নিজ অসাধারণ জঘন্য কল্পনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীর আকার গোল। আমরা এই স্থানে পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদক একটী মত উদ্ধৃত করিলাম;—

যদি সমা মুকুরোদর সন্নিভা
ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমণ
কিমু নরৈ রমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥
সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

ভগবতী ধরণী যদি মুকুরোদরের ন্যায় সমতল হইতেন, তাহা হইলে সূর্য্য বহু উর্দ্ধদেশে থাকিলেও মনুষ্যগণকে কেন অমরের

ন্যায় দেখায় না। অর্থাৎ তাহা হইলে দিবা রজনী হইত না, চিরকালই সূর্য্য উদিত থাকিত। পুনশ্চ

সমতা যদি বিদ্যতে ভুব
স্তরব স্তালনিভা বহুচ্ছয়াঃ।
কথমেব ন দৃষ্টি গোচরং
ভুরহো যান্তি সুদূর সংস্থিতাঃ॥

লল্লাচার্য্য।

পৃথিবী সমতল হইলে দূরস্থিত তালবৃক্ষ প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষ সকল কেন আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না; অর্থাৎ পৃথিবী গোলাকার বলিয়াই ঐ সকল বৃক্ষ হইতে আমরা যত দূরে যাই ততই বৃক্ষ সকল অদৃশ্য হইতে থাকে।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ পৃথিবীকে কদম্ব পুষ্পের ন্যায় সম্পূর্ণ গোল বলিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ইহা কমলা লেবুর মত; উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ কিঞ্চিৎ চাপা। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহাও স্বীকার করেন যে, পূর্ব্বে পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলই ছিল, ক্রমে মধ্যস্থলে লোকের বসতির জন্য ইহা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়াছে ; ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ যখন পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে বিচার করেন তখন পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলই ছিল; অথবা সামান্য মাত্র উচ্চ হইয়া থাকিবে। এই জন্য সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নাই ; কেন না কোন পদার্থ আংশিক অন্যথা হইলেও যেটি দর্শন মাত্রেই উপলব্ধি হয় লোক ব্যবহারে তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের মতে, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই জন্যই পৃথিবীর সম্পূর্ণ গোলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক পৃথিবী যে পুরাকালে গোলাকৃতি প্রতিপন্ন হইয়াছিল তাহাতে আর সংশয় নাই। এ বিষয়ে ভারতীয় মহর্ষিগণই প্রথম প্রদর্শক ; কেন না যৎকালে ভাস্করাচার্য্য স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে এই নূতন মত প্রচার করেন, তৎকালে পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই কোন ভূগোলবেত্তা জন্ম গ্রহণ করেন নাই; কিম্বা পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই ভূখণ্ড একটী বৃহৎ দ্বীপ ; পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ ইহাকে জম্বু দ্বীপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; ইহা যে চতুর্দ্দিকে সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা প্রাচীন ঋষিগণ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন ; তাঁহারা প্রতি কথাতেই "সাগরাম্বরা ধরিত্রী" সাগর বেষ্টিত পৃথিবী বলিয়াছেন। তাহা হইলেই আমরা যে ভূমিখণ্ডে বাস করিতেছি, যাহা এক্ষণে প্রাচীন মহাদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা ইয়ুরোপীয় সমুদ্র বিহারীগণ কর্ত্তৃক দ্বীপ প্রমাণীকৃত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য-ভারতীয়-মহর্ষিগণ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবী প্রধানতঃ দুই প্রধান অংশে বিভক্ত ; জলভাগ ও স্থলভাগ।

জলভাগ।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে, স্থলভাগ চতুর্দ্দিকে যে জল দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা নানা সামান্য অংশে বিভক্ত। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, এই পৃথিবীতে চারিটী সমুদ্র আছে ; যথা উত্তরে উত্তর সমুদ্র ; দক্ষিণে দক্ষিণ সমুদ্র, পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে

পশ্চিম সমুদ্র, কিন্তু রামায়ণে দেখা যায় সমুদ্র সাতটি যথা উত্তর সমুদ্র, লবণ সমুদ্র, পশ্চিম সমুদ্র, ক্ষিরোদ সমুদ্র, লোহিত সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র ও জলোদ সমুদ্র।

রামায়ণে এই সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতে চারিটি ব্যতীত অন্য সমুদ্রের উল্লেখ নাই। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, রামায়ণের সময় যে সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ আছে মহাভারতের সময় সে গুলির আর সেরূপ বিভাগ থাকে নাই। ঐ সাতটি সমুদ্র তখন চারিটিতে পরিণত হইয়াছিল। রামায়ণের উত্তর সমুদ্র, মহাভারতের উত্তর সমুদ্র ও আধুনিক উত্তর মহাসাগর সমান; রামায়ণের লবণ সমুদ্র, মহাভারতের দক্ষিণ সমুদ্র ও আধুনিক ভারত মহাসাগর সমান। এই সমুদ্রের জল অতীব বিস্বাদ বলিয়াই হয়তঃ বাল্মীকির সম-সাময়িক ঋষিরা ইহার লবণ সমুদ্র আখ্যা প্রদান করেন। রামায়ণের পশ্চিম সমুদ্র মহাভারতের পশ্চিম সমুদ্র ও আধুনিক আরব সাগর, লোহিত সাগর সমান; এবং রামায়ণের ক্ষিরোদ সমুদ্র, লোহিত সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র ও জলোদ সমুদ্র মহাভারতের পূর্ব্ব সমুদ্র ও আধুনিক চীন সমুদ্র ও প্রশান্ত মহাসাগর সমান।

হ্রদ ও নদী।

রামায়ণ ও মহাভারতে অনেক হ্রদ ও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রায় তৎসমুদায়ই ভারতবর্ষের অন্তর্গত। সুতরাং সে গুলির এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। কেবল ভারতবর্ষের উত্তর ভাগের দুই একটি হ্রদের উল্লেখ আছে। মানস সরোবর, বিন্দু সরোবর, বৈকাল হ্রদ প্রভৃতি দুই চারিটী হ্রদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিন্দু সরোবর, মহাভারতের মতে মৈনাক পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত। মৈনাক, কৈলাস পর্ব্বতের উত্তর ভাগে অবস্থিত অধুনা থিয়ানসান পর্ব্বত বলিয়া অনুমিত হয়। এই পর্ব্বতের নিকট এখনও দুই একটি হ্রদ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। এই বিন্দু সরোবরের তীরে অসুর শিল্পী ময় একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত গৃহ নির্ম্মাণ করেন (মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩য় অধ্যায়)।

হ্রদের ন্যায় অন্যান্য দেশের নদীরও অধিক উল্লেখ নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে অনেক নদ নদীর উল্লেখ আছে, সত্য বটে, কিন্তু সে গুলির নাম বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। আবার যাহার আছে তাহাও আধুনিক নদ্যাদি সহ তুলনা করিতে গেলে স্থানের নিশ্চয়তা সম্পাদন করিতে পারা যায় না। কেবল রুষিয়ার শৈলোদা নামে একটি উত্তর-বাহিনী নদীর উল্লেখ আছে। তাহা আধুনিক ওবি নদী বলিয়া অনুমিত হয়।

স্থলভাগ।

প্রাচীন মহর্ষিগণ প্রাচীন মহাদ্বীপকে জম্বু দ্বীপ শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই মহাদ্বীপ লক্ষ যোজন বিস্তৃত। পৌরাণিক মতে মহারাজ ঋষভ দেব সমুদায় জম্বুদ্বীপের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার নব পুত্র। তাঁহার মৃত্যুর পর পাছে পুত্রগণ রাজ্য লইয়া বিবাদ করেন; এই জন্য তিনি জম্বুদ্বীপকে নয় বর্ষে বা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক এক এক পুত্রকে ইহার এক এক অংশ প্রদান

করেন। সেই বর্ষ গুলির নাম যথা ইলাবৃতবর্ষ, রম্যক বর্ষ, হিরণ্ময় বর্ষ, কুরুবর্ষ, হরি বর্ষ, ভারত বর্ষ, কেতুমানবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, ও কিম্পুরুষ বর্ষ, প্রত্যেক বর্ষ প্রভেদ করিবার জন্য সীমান্ত পর্ব্বত সকল আছে। এই সকল বর্ষের মধ্যস্থলে ইলাবৃত বর্ষ, তাহার উত্তর সীমা নীল পর্ব্বত; ইহার উত্তরে রম্যক বর্ষ, তাহার উত্তর সীমা শ্বেত পর্ব্বত, তদুত্তরে হিরণ্ময় বর্ষ, উত্তর সীমা শৃঙ্গবান পর্ব্বত; তদুত্তরে কুরুবর্ষ উত্তর সীমা সমুদ্র; ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত তাহার দক্ষিণে হরিবর্ষ; ইহার দক্ষিণ সীমা হেমকূট পর্ব্বত; তাহার নিকট কিম্পুরুষ বর্ষ, ইহার দক্ষিণ সীমা হিমালয় পর্ব্বত, তদ্দক্ষিণে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ সীমা লবণ সমুদ্র; ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিমে মাল্যবান পর্ব্বত, উত্তর ও দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত; তৎপশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ, ইহার পশ্চিমে লবণ সমুদ্র; ইলাবৃতের পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বত; তৎপূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ, তৎপূর্ব্বে সমুদ্র; সুমেরু পর্ব্বত ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

মানচিত্র খুলিয়া দেখিতে গেলে এই বর্ষ গুলির স্থান নির্ণয় কিয়ৎ পরিমাণে হইতে পারে। তবে সমুদায় গুলি নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। আমাদের মতে ইলাবৃত বর্ষ আধুনিক মঙ্গোলিয়া; মঙ্গোলিয়ার উত্তরে আলটাই পর্ব্বত ইহা নীল পর্ব্বত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণে থিয়ানসান পর্ব্বত ইহা নিষধ পর্ব্বত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; রম্যক বর্ষ, হিরণ্ময় বর্ষ ও কুরুবর্ষ, আধুনিক রুষিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হরিবর্ষ, নিষধ পর্ব্বতের (আধুনিক থিয়ানসান পর্ব্বতের) দক্ষিণ; চীনতাতার পূর্ব্বে হরি বর্ষ বলিয়া কথিত হইত। ইহার দক্ষিণে হেমকূট পর্ব্বত। এই পর্ব্বত কিয়ুনলেন পর্ব্বত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার দক্ষিণ কিম্পুরুষ বর্ষ। ইহা আধুনিক তিব্বৎ দেশ, ইহার দক্ষিণ হিমালয় পর্ব্বত; আধুনিক হিমালয়। ইহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা লবণ সমুদ্র আধুনিক ভারত মহাসাগর। ইলাবৃত বর্ষের (মঙ্গোলিয়ার) পশ্চিমে মাল্যবান পর্ব্বত; ইহা বেলুরটগ, মুনগরিয়া পর্ব্বত বলিয়া অনুমিত হয়, ইহার পশ্চিমে কেতুমান বর্ষ। আধুনিক টুর্কিস্থান বা স্বাধীন তাতার বলিয়া বোধ হয়; ইহার পশ্চিমে লবণ সমুদ্র, ইহা কাস্পীয়ান সাগর, ইলাবৃতের পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বত। ইহা মঙ্গোলিয়া ও মানচুরিয়া দেশের বিভাজক খিনসান পর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়। ইহার পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ব বর্ষ ইহা আধুনিক মানচুরিয়া ও চীনদেশ। ইহার পূর্ব্বে সমুদ্র। ইহা প্রশান্ত মহাসাগর ও তাহার অংশ বিশেষ।

রামায়ণে অনেক দেশাদির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিষ্কিন্ধাপতি সুগ্রীব চতুর্দ্দিকে বানর সৈন্য প্রেরণ কালে অনেক দেশাদির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বর্ণনানুসারে মানচিত্র খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন করিলে অনায়াসেই প্রতীত হইবে, তিনি যে সমস্ত দেশ পর্ব্বতাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক নহে। বাস্তবিকই সে সমস্ত দেশ ছিল বা আছে। উত্তরে যে বানর সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের প্রতি আদেশ

দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় তিনি প্রথমতঃ ভারতবর্ষেরই কতকগুলি জনপদের উল্লেখ করিয়া পরে তীব্বত, চীনতাতার, মঙ্গোলিয়া, রুষিয়া, সাইবিরিয়া ও পরে উত্তর সমুদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিমদিকে যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদেরও আদেশ দৃষ্টে আফগানস্থান, পারস্য, আরব, তুরস্ক ও ভূমধ্য সাগর বলিয়া অনুমিত হয়। দক্ষিণ-গামী কপি সৈন্যের প্রতি আদেশে লঙ্কাদ্বীপের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় মাত্র। কিন্তু তিনি পদে পদে বলিয়াছেন দক্ষিণাঞ্চলে অন্য কোন দেশ নাই। কেবল লবণ সমুদ্র ও তাহার মধ্যে মধ্যে দুই একটী পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে তাহাতেই সিদ্ধাচারগণের আশ্রম। পূর্ব্বদিকে যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতেও জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি প্রথমে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কতকগুলি দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। পরে শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও কতকগুলি দ্বীপের উল্লেখ করিয়া একটী বৃহৎ মহাদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মহাদেশ সম্বন্ধে কেবল তিনি বলিয়াছেন এখানে অনেক সিদ্ধাচারের বাস, ও বাসুকীর আবাস স্থল। ইহার পরেই মহাসাগর, তাহার পর পারে যাইবার আবশ্যক নাই। কারণ সেখানে সমস্ত অন্ধকার ও কেহই তথায় যাইতে পারে না। এই মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর বলিয়া বোধ হয়। ও মহাদেশ অষ্ট্রেলেসিয়া। তাহা হইলেই বিলক্ষণ অবগত হওয়া যাইতেছে-বাল্মীকির সম সাময়িক ঋষিরা দেশ জ্ঞানে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না। সমুদায় এসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া তাঁহারা অবগত ছিলেন। এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়া যাইতে হইলে যেমন নানা দ্বীপরাজি আমাদের নয়ন গোচর হয়; সে সময় তত দ্বীপ ছিল না। তখন সমুদয় সংখ্যক দ্বীপ ও অষ্ট্রেলিয়া একটী বৃহৎ দেশ ছিল। পরে সমুদ্রের ভয়ানক আবর্ত্তনে বোধ হয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সেই দেশ আধুনিক দ্বীপ পুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। এসিয়ার অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। কিন্তু ঋষিগণ ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। নানা পুরাণ, তন্ত্র ও কাব্য হইতে ভারতবর্ষের অনেক স্থানের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া আমরা প্রস্তাবান্তরে তাহাই প্রদর্শন করিতে ক্রমশঃ চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ।

সামুয়েল হ্যানিমানের জীবনী সমালোচনা *।

অন্ধকার মধ্যে যাহাদের বাস সূর্য্যের প্রখর কিরণ তাহাদের প্রায়ই চক্ষু-শূল হইয়া থাকে। অন্ধকার মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের প্রকৃতি এমনি পেচকত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়, যে

* শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য।৵০।

সহসা সূর্য্যের আলোকে বাহির হওয়া যার পর নাই কষ্টকর হইয়া পড়ে। মানব সমাজের দশা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। সত্যের তীব্রজ্যোতি সমাজ প্রথম প্রথম কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারে না। সমাজ সত্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, যখন গলা ধরিয়া যায়, চীৎকার করিয়া যখন বুঝিতে পারে যে তাহাদের মনোরথ কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইবার নহে, তখন তাহারা নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র বাহির করিয়া রোষকসায়িত লোচনে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হয়। কিন্তু কর প্রসারণ করিয়া কে কবে সূর্য্যের রশ্মি রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সত্যই শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ-প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীরিত করিতে থাকে। সমাজের সমস্ত উদ্যমই বিফলীকৃত হইয়া যায়, তাহার যে এত চীৎকার, এত রণ সজ্জা, সমস্তই পণ্ড হইয়া পড়ে। পৃথিবীতে কোন কালে ও কোন সমাজে অমূল্য সত্য বিনষ্ট হয় নাই। অতীত-সাক্ষী ইতিহাস উচ্চৈস্বরে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যখন কোপারনিকস্ সৌর-জগতের স্থিতি ও গতির বিষয় নিরূপণ করিতে যান্ তখন সাধারণ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে তিনি কিরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? জর্জ্জষ্টিফনসন্ (George Stephenson) যখন বর্ত্তমান প্রণালীর বাষ্পীয় কলের সৃষ্টি ও তাহার শক্তি ঠিক করিয়া স্বীয় বন্ধুবান্ধবগণের নিকট নিজ অভিমত অভিব্যক্ত ও আবিষ্কৃত সত্যের বিষয় বর্ণনা করেন, তখন সকলেই তাঁহাকে বাতুল বলিয়া কতই না উপহাস করিয়াছিল। সত্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কলম্বস্, গালিলিও, বুধাগ্রগণ্য সক্রেটিসের লাঞ্ছনা, অবমাননা ও দুঃখময় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। মহানুভব গালিলিও এতদূর সত্যানুরাগী ছিলেন যে, যখন তাঁহাকে কারা মধ্যে রুদ্ধ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয় তখন সম্রাট বলিয়াছিলেন, "গালিলিও তুমি এখনও ভাবিয়া দেখ, তোমার ভ্রান্তমত এখনও ছাড়িয়া দাও, এখনও যদি তুমি স্বীকার কর যে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু পৃথিবী সূর্য্যকে নহে তাহা হইলে তোমাকে এই দণ্ডেই মুক্ত করিয়া দিতে পারি।" তখন গালিলিও কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন "হা! হা! নিষ্ঠুর পৃথিবী! তুই এখনও ঘুরিতেছিস্? থাম্ পৃথিবী থাম্ নইলে আমি তোর জন্যে কারাগার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে চলিলাম।" তিনি সেই বিভীষিকাময় কারাগার মধ্যে সারাজীবনটা কর্ত্তন করিলেন, তথাপি সত্যের অবমাননা করিতে পারিলেন না। ধর্ম্মজগতে এইরূপ সত্য-ঘোষণ করিতে গিয় ঈষ, মহম্মদ, লুথর, নানক, রামমোহন প্রভৃতি সত্য-বীরগণ কতই না নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন।

মহাত্মা হানিমানের মহামূল্য সত্য সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল, তাঁহাকেও সত্যের জন্য বিস্তর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার জীবনী-লেখক মহেন্দ্রবাবু তদ্রচিত গ্রন্থে ইহা অতি সুন্দর রূপে বিবৃত করিয়াছেন।

পৃথিবীতে পরোপকার করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। সমাজ এমনি অন্ধ যে, কে

তাহার শত্রু আর কেইবা মিত্র প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে না। যিনি সমাজের উপকার করিতে বসেন, (সমাজ এমনি কৃতজ্ঞ!) সমাজ তাঁহার মাথাতেই আগে খড়্গাঘাত করিয়া বসে। অসত্য ও কুসংস্কার হৃদয়ে পোষণ করিয়া সমাজ এমনি বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, যিনি তাহার রোগ মুক্ত করিবার জন্য মুখে ঔষধ তুলিয়া দিতে যান্ সমাজ সজোরে তাঁহার বুকেই পদাঘাত করে। স্বদেশ ও স্বজাতির হিত সাধন করিতে গিয়া মহামতি মেট্‌সিনীর অশেষ দুর্গতির বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখ। বিদেশের কথা থাক্ স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মা রাজা রামমোহনের দুর্গতি ও অবমাননার বিষয় চিন্তা কর। শুধু অবমাননা নহে তাঁহার জীবন লইয়া টানাটানি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। উন্নত হৃদয় হানিমানও স্বদেশের—শুদ্ধ স্বদেশের নহে সমগ্র ধরণীর—অকথনীয় উপকার সংসাধন করিতে গিয়া এইরূপে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অবমানিত ও জন্মভূমি হইতে বিতাড়ীত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবু তাঁহার জীবনীতে ইহা অতি বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বার্থের ন্যায় ভয়ঙ্কর জিনিস্ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। যেখানেই ইহার ছায়া পতিত হয়, সত্যের জ্যোতি সেই খানেই ম্লান হইয়া যায়। স্বার্থপর ব্যক্তি দ্বারা পৃথিবীতে কোন সত্যই প্রচারিত হইতে পারে না। যিনি আপনাকে অপরের জন্য বিক্রয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই পৃথিবী ও সমাজের প্রভূত কল্যান সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। হানিমান যে হোহিওপাথীর মহান্ সত্যগুলি জন সমক্ষে প্রচার করিয়া অবশেষে হোমিওপাথীর জয় ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যদি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যে তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে স্বার্থের ভাব বিন্দুমাত্র বিরাজিত ছিল না। তিনি যাহা কিছু করিতেন সত্যের জন্য, জগতের উপকারের জন্য; নিজের জন্য নহে। তিনি আপনার জীবন ও স্বাস্থ্যকে লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া হোহিওপাথীর কল্যান বর্দ্ধনে ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি সহজ অবস্থায় পুনঃ পুনঃ কুইনাইন্ সেবন করিয়া ইহার গুণাগুণ নির্ণয় করিতেন। ঔষধ সকলের পরীক্ষা আপনার দেহের উপর দিয়া করিয়া লইতেন, সুস্থ শরীরে, কেবল ঔষধের পরীক্ষার জন্য, তিনি যে কত বিষাক্ত দ্রব্য অক্ষুব্ধ চিত্তে সেবন করিতেন তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। হানিমানের প্রকৃতি যে কত উচ্চ ছিল ও তিনি স্বয়ং যে কতদূর স্বার্থ-শূন্য ব্যক্তি ছিলেন, মহেন্দ্র বাবুর "হানিমানের জীবনী" যিনি আদ্যোপান্ত নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিবেন, তিনিই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

তিনি সম্পূর্ণরূপে অহমিকাশূন্য ছিলেন। তিনি অতবড় পণ্ডিত হইয়াও, রোগ নির্ণয় ও ঔষধ ব্যবস্থা সময় নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। হানিমান অতি যত্ন সহকারে তন্ন তন্ন রূপে সমস্ত রোগ লক্ষণ ও পীড়ার যাবৎ যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন। লিখন কার্য্য এইরূপে শেষ করিয়া যাবতীয় বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেন এবং অবশেষে ঔষধ নির্ব্বাচন

করিয়া দিতেন। কিন্তু ঔষধ প্রদান কালে তিনি নিজ স্মৃতি শক্তি বা বহুজ্ঞতার উপর নির্ভর না করিয়া ভেষজতত্ব ও রকার্টের সংগ্রহ গ্রন্থ দেখিয়া ঔষধ দিতেন। এই গ্রন্থ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত।" পাঠকগণের অবগতির জন্য মহেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতে প্রাগুক্ত পংক্তি গুলি উদ্ধৃত করিলাম *।

হানিমান কিছুতেই নিরুৎসাহ হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্রতিভা যেমন অলৌকিক, তাঁহার সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও অপ্রতিহত পরিশ্রমও তেমনি অসাধারণ। তিনি যেরূপ অমানুষিক সাহস ও বিক্রমের সহিত সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম ও বিরোধীদলের সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনার মহৎ অভিষ্ট সংসাধন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা মনোমধ্যে একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে বাস্তবিক অবাক্ হইতে হয়। তিনি চিকিৎসা সম্বন্ধে বিবিধ সারগর্ভ গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনী-লেখকের যত্ন ও অনুসন্ধিৎসাকে ধন্য; তিনি বিস্তর পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

হানিমান্ বাল্যকালে কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহার শৈশব, কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্য কাল কিরূপে অতিবাহিত হইয়া যায়, তাঁহার পিতা কিরূপ উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তিনি কিরূপে অতি সংগোপনে তৈল সংগ্রহ করিয়া জন-মানব-পরিশূন্য নিভৃত কক্ষে সারা নিশাটী বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার কিরূপ ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তিনি কিরূপে এলোপাথী ছাড়িয়া হোমিওপাথী আবিষ্কার ও তৎপ্রচারে বদ্ধপরিকর হন, তাঁহার পরিণয় ও রমণীর মৃত্যু, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ, স্বদেশ হইতে পলায়ন ইত্যাদি তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক বিষয় সকল মহেন্দ্র বাবু বিস্তার ক্রমে তদীয় পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ সকল লিখিতে হইলে ভাষাটা স্বভাবতই কিছু অপ্রাঞ্জল হইয়া পড়ে। মহেন্দ্র বাবু সমালোচ্য পুস্তক খানির ভাষা যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সুখের বিষয় সকল স্থানেই তাঁহার মনোরথ সুসিদ্ধ হইয়াছে।

সমালোচ্য পুস্তক খানি একখানি নবন্যাস বা উপন্যাস নহে, ইহা একখানি সরস কাব্য বা নাটকও নহে। নভেলভক্ত বঙ্গবাসীগণ ইহার গৌরব না বুঝিতে পারেন, ইহার আদর তাঁহাদের নিকট নাও হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞানের উন্নতি, ভৈষজ্য শাস্ত্রের উন্নতি এবং সত্যের জয় হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন, এরূপ ধরণের গ্রন্থ তাঁহাদের যে অতীব যত্নের সামগ্রী হইবে তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক বঙ্গবাসী আজও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, হোমিওপাথী ঔষধের উপকারিতা ও ব্যাধি আরোগ্য করণের ক্ষমতার বিষয় সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। তবে তাঁহারা হানিমানের গৌরব কি বুঝিবেন? হানিমানের অব-শত্রু আজও অনেক বর্ত্তমান।

* সাম রেল হানিমানের জীবনীর ৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে হানিমান যে সত্যের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন তাহা আর কি কখন নির্ব্বাপিত হইবে? এলোপাথীর গর্ব্ব ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। হোমিওপাথীর এক এক বিন্দু ঔষধ ব্যাধি-রাজ্যে যে রূপ অলৌকিক কার্য্য করিতেছে তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেক কৃতবিদ্য এলোপাথী-শাস্ত্র-বিশারদ-পণ্ডিত পুরাতন চিকিৎসা প্রণালী পাদদলিত করিয়া হোমিওপাথীর সেবক হইয়া পড়িয়াছেন। শিব ও ধন্বন্তরির নামের পার্শ্বেই মহাত্মা হানিমানের নাম সংস্থাপন করা যাইতে পারে। কোন কোন বিষয়ে হানিমান, শিব ও ধন্বন্তরি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এ স্থলে আমরা বিসূচিকা রোগের উল্লেখ করিব। বিসূচিকা রোগ আরাম করা শিবের অসাধ্য ছিল, ধন্বন্তরি বলিয়াছেন বিসূচিকার প্রকৃত কোন ঔষধ নাই। কিন্তু হানিমান এই রোগের যে ঔষধ গুলি বাহির করিয়াছেন তাহারা এক একটী বিসূচিকার যম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যমের ও যে যম আছে তাহা হানিমান সাহেব আমাদিগকে শিখাইলেন *।

ঐ রূপ অলোকসামান্য-গুণরাশি-সম্পন্ন মহাত্মার জীবনী যিনি আমাদের জন্য লিখিয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা যদি মানুষ হই, এরূপ গ্রন্থের আদর ও এরূপ গ্রন্থকারকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিব। গ্রন্থখানি আরও বড় ও জীবনীটী আরও সরল ভাষায় বিশদ রূপে লিখিত হইলে পুস্তক খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। জগৎ-পূজ্য অলৌকিক ধীশক্তি-বিশিষ্ট মনীষীর জীবন চরিত যতই বিস্তৃত হয় ততই প্রীতিপ্রদ, ততই হৃদয়ারাম ও ততই আনন্দ পরিবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

* In the cholera epidemic of 1849 which raged in Cincinnati worse, perhaps, than in any other city of the same size, every homœopathic family was provided with a small case of four Vials containing *Camphor*, *Veratrum*, *Cuprum* and *Sulpher*. These simple but effective means kept the homœopathic practice free from many obstacles and difficulties and made its results so glorious, and, even in the history of Homoeopathy, unrivaled. ... ... During this time of unspeakable suffering and distress, Homœopathy had gloriously and convincingly vindicated its merciful *divine origin*. Hahnemann's name shone in those days bright and glorious; around his memory gathered of itself a glorious wreath of the people's own voluntary thanks and blessing—a homage rendered to genius and philanthropy, willingly and readily, what a man ! what a science !! what a testimony !!

Pulte's "Reflections and Statistics on Asiatic Cholera."

আসামস্থ পার্ব্বত্য জাতির ইতিবৃত্ত।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আর্য্যগণ হিমালয়ের উত্তরস্থ তুষারাবৃত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষিত হইল, আদিম অধিবাসিগণ সেই দুর্দমনীয় প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গম্য পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিল। সেই প্রাচীনতম সময় হইতে অদ্যাবধি তাহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিয়া আসিতেছে। অনার্য্য জাতির ইতিহাস অপাঠ্য বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক তাহাদের ইতিবৃত্ত পাঠকবর্গের মধ্যে প্রায় অনেকেরই নিকট অবিদিত আছে। অনার্য্যই হউক আর আর্য্যই হউক ইতিহাস কোন জাতির উপেক্ষনীয় নহে। জন্মভূমি-প্রিয় উদারচেতা রোমীয় ও গ্রীসীয়দের ইতিহাস যেরূপ সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য, অনার্য্য অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন নিগ্রো জাতির ইতিহাসও তদ্রূপ পাঠ্য। জগদীশ্বরের সৃষ্টির কোন স্থান নিন্দনীয় নহে; যে পর্ব্বত সকল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র ভল্লুকে পরিপূর্ণ, সেই পর্ব্বত কন্দরে গমন কর, নির্ঝরের ঝরঝর নাদে প্রকৃতির মনোহর ছবিতে তোমার অন্তঃকরণ সুশীতল হইবে। তুমি যদি কবি হও হৃদয় ভরিয়া উহার বর্ণনা করিবে; আর যদি পুত্র শোকাসক্ত হও সেই স্থানে যাইলে সমস্ত শোক তাপ বিস্মৃত হইবে; কিম্বা যদি মোক্ষপদ প্রার্থী ভক্তি-প্রিয় যোগী হও সেই রমণীয় প্রদেশে যাইয়া তোমার অন্তঃকরণ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইবে।

কাচারিজাতি।

কিছুদিন হইল আমি আসাম প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য পার্ব্বত্য জাতির আচার ও ব্যবহার দর্শনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। যদিও তাহারা অসভ্য এবং অশিক্ষিত তথাপি তাহাদের মধ্যে এমত কতকগুলি প্রথা আছে যাহা অবগত হইতে সকলেরই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। আসামে কাচারি, (১) গারো, রাভা, ছুটিয়া, ডেফ্‌লা, মিস্‌মি প্রভৃতি বহুপ্রকার পর্ব্বতীয় লোক বাস করে। কাচারিজাতি গোয়ালপাড়া জিলা হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত সমস্ত আসামে দৃষ্ট হয়, কিন্তু গোয়ালপাড়া জিলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই সমভূমিতে বাস করে, অতি অল্প সংখ্যা মাত্র পর্ব্বতাদিতে দৃষ্ট হয়।

কাচারিদের অবয়ব অপেক্ষাকৃত উন্নত, শরীরের বর্ণ তাম্রের ন্যায়, নাসিকা চেপ্‌টা ও দীর্ঘ, মস্তক ও মুখমণ্ডল গোলাকার এবং গণ্ডস্থল কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত। ব্রহ্মদেশীয় লোকদের সঙ্গে উহাদের আকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কাচারিদের মুখমণ্ডল প্রায় শ্মশ্রু-বিরহিত, যাহা আছে তাহাও

(১) কাচারিদের অপর নাম মেছ।

অতি অল্প। প্রায় সকলে মস্তকের চুল কাটিয়া থাকে, কেহ কেহ বা মুণ্ডন করে কিন্তু সকলেরই মস্তকে শিখা থাকা আবশ্যক। রমণীগণ গৃহে গৃহে বস্ত্র প্রস্তুত করে তদ্দারা পুরুষদের লজ্জাবরণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল বস্ত্র দীর্ঘে ৭ হাতের অধিক প্রায় হয় না। প্রস্থে দেড় হাত কিম্বা দুই হাত। পরিধানের নিয়ম অনেকাংশে হিন্দুস্থানীয়দিগের মত, শরীরে অন্য কোন রূপ আবরণ নাই, গ্রীষ্ম-কালে তিন চারি হাত লম্বা অর্দ্ধ হস্ত প্রশস্ত একখানি গামচা স্কন্ধদেশ হইতে ঝুলিতে থাকে এবং শীত কালে একখানি রেশমী কিম্বা সূত্র নির্ম্মিত মোটা চাদর ব্যবহার করে। কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই বাটি হইতে বাহির হইবার সময় এক খানি দাত্র (দা) হস্তে লইয়া বাহির হয়।

রমণীদের বর্ণ পুরুষদের অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং নাসিকাদির গঠন কিছু বিভিন্ন। উহাদের চুল অতি দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ, অনেক রমণীর চুল কটিদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। শরীরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনার্থ কাচারি রমণীগণ কোন বিশেষ ভূষণাদি পরে না। কর্ণদেশে কেবল দুই এক গাছা মালা পরিধান করে। তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশেষ সম্পত্তি-সম্পন্না তাহারাই কেবল কর্ণে ঠেক (১) ও হস্তে পাতা (২) পরিয়া থাকে। রমণীরাও পুরুষদের মত গৃহনির্ম্মিত বসন ব্যবহার করে। উহাদের বসন গুলি দীর্ঘে সাত কিম্বা আট হাত, প্রস্থে তিন হাত। পরিধানের নিয়ম দুই প্রকার—কেহ বা বক্ষস্থলের উপর গ্রন্থি দেয় আর কেহ বা কটিদেশে গ্রন্থি দিয়া বক্ষস্থলে অপর এক খানি ছোট কাপড় বন্ধন করে। কিন্তু সকলেই বাটী হইতে বাহির হইবার সময় একখানা বড় গাত্রাবরণ ব্যবহার করে।

কাচারিদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই শ্রমশীল। প্রত্যুষে উঠিয়া—পুরুষেরা লাঙ্গল স্কন্ধে ক্ষেত্রে গমন করে—রমণীগণ গৃহকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া কেহ বা বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত হয় আর কেহ বা বপনীয় শস্যাদি লইয়া শস্যক্ষেত্রে গমন করে। পুরুষেরা কেবল জমি চাষ মাত্র করে কিন্তু বপন কার্য্যাদি সমস্ত রমণীদের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় (১)। যখন শস্য সুপক্ক হয়, পুরুষ ও রমণী উভয়ে শস্যাদি ছেদন ও মর্দ্দনাদি করে। রমণীরা এই সকল কর্ম্ম করিয়াও প্রতি মাসে ৪।৫ খানা করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করে; এবং পরিবার বর্গের ব্যবহার বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বিক্রয় করে। ঐ সকল কাপড় সূত্রনির্ম্মিত ও রেসমি উভয় প্রকারের হইয়া থাকে। রেসমি বস্ত্রগুলি অতিশয় উৎকৃষ্ট উহা দুই ভাগে বিভক্ত—মুঘা ও এরিয়া, মুঘা কীট হইতে সে সকল নির্ম্মিত হয় তাহাদিগকে মুঘা কহে। আর এরিয়া কীট হইতে যে সকল প্রস্তুত হয় তাহাদিগকে এরিয়া কহে। মুঘাগুলি এরিয়া অপেক্ষা পাতলা ও মসৃণ; এরিয়া গুলি শালের মত মোটা। কীট

(১) কর্ণ ভূষণ বিশেষ।

(২) বলয় বিশেষ।

(১) এই নিয়মটী যাবা অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে (Vide Raffle's "History of Java" Vol I.)

অনুসারে মুঘা ও এরিয়া নানা ভাগে বিভক্ত হয় (২)।

রমণীদের ইহা ছাড়া অন্যান্য অনেক কর্ম্ম আছে। কৃষিকর্ম্ম দ্বারা যে সকল শস্য উৎপন্ন হয়, পরিবারবর্গের সাংবৎসরিক ব্যয় বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে রমণীগণ সেই সকল বাজারে বিক্রয় করিয়া, প্রাপ্ত মূল্যের দ্বারা দৈনন্দিন ব্যয়ের জন্য আবশ্যক জিনিষ সকল আনয়ন করে। পুরুষেরা ঐ সকল কর্ম্মে হস্তক্ষেপও করে না; উহারা কেবল কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত থাকে। বস্ত্র বয়ন জন্য মুঘা ও এরিয়া পোকার পোষণ, কার্পাশ হইতে সূত্র প্রস্তুত করন এই সমস্ত কর্ম্মও রমণীদের হস্তে ন্যস্ত। পুরুষদিগের কৃষিকর্ম্ম ভিন্ন আরও দুই একটী কর্ম্ম আছে—গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তৃণাদি সংগ্রহ করন এবং আহারার্থ মৎস মাংসাদি আহরণ। কাচারিরা অত্যন্ত আমিষাশী। প্রতিদিন ভোজনকালে মৎস মাংস নিতান্ত আবশ্যক, এই জন্য গৃহে গৃহে বরাহ কুক্কুর কপোত প্রভৃতি পালন করে। গো প্রভৃতি কয়েকটী জন্তু ব্যতীত আর সমস্তই উহাদের ভক্ষ্য। উহারা সময়েং দলবদ্ধ হইয়া পশু বধার্থ অরণ্যেও গমন করে।

পশু বধ প্রণালী কাচারিদের তিন প্রকার— "জাল শীকার" ১) "ডালাঘাটা শীকার" ও "বন্দুক শীকার"। যে দিবস সূর্য্যের কিরণ অত্যন্ত প্রখর, অথচ তাহার পূর্ব্ব দিন অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সেই দিবস তাহাদের জাল শীকারের জন্য প্রকৃত সময় প্রত্যুষে উঠিয়া কয়েক জন অরণ্যে গমন করে এবং পদচিহ্ন দ্বারা পশ্বাদির অবস্থিতি জ্ঞাত হইয়া স্থানেং খুঁটা পুঁতিয়া আইসে এবং ক্রমেং সকলের অবগতির জন্য গ্রামের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া এক রকম চীৎকার করে তাহাতে সকলে জানিতে পারে অদ্য মৃগয়ার দিন।

অনন্তর যখন মরীচিমালী উর্দ্ধে উঠিয়া লম্বভাবে কিরণমালা ধরাধামে বিক্ষেপ করিতে থাকে, জগৎ যখন নিস্তব্ধ হয়, বিহঙ্গমকুল কুলায়ে বসিয়া নিরব হয়, মৃগকদম্ব আতপ তাপে অস্থির হইয়া বনস্পতি ছায়ায় নিদ্রিত হয়, তাহারা তখন দলে বলে বহির্গত হয় এবং চিহ্নিত অরণ্য সকল জাল দ্বারা বেষ্টন করিয়া ভয়ানক কোলাহলে মন্থন করিতে থাকে। অরণ্যস্থ পশুগণ এইরূপ আচরণে ভীত হইয়া, প্রাণভয়ে পলায়ন করে। কিন্তু কোথায় যাইবে—চারিদিকে জাল—চারিদিকে মনুষ্য। যে দিকে যায় সেই দিকেই জালে বদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহাকেই "জাল শীকার" কহে। "ডালাঘাটা" শীকার আরও আশ্চর্য্য ও ক্রূরত্বাব্যঞ্জক। গভীর অমাবস্যা নিশী এই বিধ মৃগয়ার সময়। যে দিবস শীকারের দিন নিশ্চিত হয়, সেই

(২) বস্ত্রবয়ন প্রথাটি কেবল কাচারিদের মধ্যে প্রচলিত নহে; আমাদের গৃহে গৃহে ঐ কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ভদ্র মহিলারা যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত করে সে সকল আরও উৎকৃষ্ট হয়। সম্প্রতি বিলাতি কাপড়ের বিশেষ আমদানী হওয়াতে অনেকে ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছে; তাহাতে ঐ ব্যবসাটী এক রকম উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে।

(১) বোধ হয় ডালা ও ঘণ্টা এই দুইটী কথা হইতে "ডালা ঘাটা" এ কথাটী উৎপন্ন হইয়াছে।

দিবস গ্রামস্থ কতিপয় সাহসী ব্যক্তি (পঁচিশ জনের অধিক নহে) কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়, এবং আবশ্যক বস্তু সকল লইয়া, সেই গভীর নিশীতে বহির্গত হয়।

তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দলপতি, তাহার মস্তকে একখানি ডালার উপর একটী মশাল জ্বলিতে থাকে, এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একজন ঘণ্টা বাদ্য করে, ও বামে বন্দুক অসি হস্তে অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকে; অবশিষ্ট লোকেরা পশ্চাৎ২ গমন করে। এই রূপে প্রান্তর, পর্ব্বত, অরণ্য সকল নির্ভয়ে অতিক্রম করিতে আরম্ভ করে; যখন কোন পশু সম্মুখে পতিত হয়, তখন ঘনং ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করে এবং দলপতি মস্তক নাড়িতে থাকে। বন্য পশুগণ ঘণ্টা-বাদ্য শ্রবণে ও মশাল দৃষ্টে মোহিত হইয়া স্থির নেত্রে তাকাইয়া থাকে; এই অবসরে শীকারীরাও আস্তে২ অগ্রসর হয়। যখন অত্যন্ত সন্নিহিত হয়, বাম পার্শ্বস্থ শিকারী, তখন অজ্ঞাতসারে উক্ত পশুর কটিদেশ ছেদ করে। কিন্তু ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দেখিতে পাইলে, ডালা নিক্ষেপ পূর্ব্বক পলায়ন করে। এই বিধ শীকারকে "ডালা ঘাটা" শীকার কহে।

সম্প্রতি ইংরাজদিগকে দেখিয়া, অনেক কাচারি বন্দুকের ব্যবহার শিখিয়াছে; এবং তাহাতেও বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। গত ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে গোয়াল পাড়া জেলা নিবাসী দীফোর নামে একজন কাচারি সম ভূমিতে দণ্ডায়মাণ হইয়া, দুই তিনটী বৃহৎ গণ্ডার ও বহুতর ব্যাঘ্র মারিয়াছে। এই বিধ শীকারকে "বন্দুক শীকার" কহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষি ও বাণিজ্য।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের এক মাত্র উপায়, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। যে দেশে যত পরিমাণে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে, সে দেশ তত পরিমাণে সভ্য ও উন্নতিশীল। আজি যে য়ুরোপ, আমেরিকা, আটলাণ্টিকের দুই কুলে দুইজন বসিয়া ধনের গৌরবে, মানের গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে, যশের গৌরবে দিন দিন স্ফীত হইতেছে, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পরস্পর ঈর্ষা করিতেছে, ঘোড় দৌড়ের ঘোটকের ন্যায় "আমি জিতিব" এই মনে করিয়া তীর বেগে উন্নতি-প্রান্তর কাঁপাইয়া চলিতেছে, আর হতভাগ্য এসিয়া ও আফ্রিকা তাহাদের পশ্চাতে থাকিয়া অবিরত দুঃখাশ্রু পাত করিতেছে। আসিয়া ও আফ্রিকার শিরোভূষণ ভারত ও মিশর অকুল দুঃখ সাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। যে ভারত, যে মিসর এক দিন সভ্যতার নায়ক ছিল, যাহাদের আবিষ্কৃত জ্ঞানলোকে একদা পূর্ব্ব পশ্চিম আলোকিত হইয়াছিল, যাহাদের দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম সময়ে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়াছিল, অদ্য তাহারা পিঞ্জর বদ্ধ কেশরীর ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে; ইহার প্রধান কারণ কৃষি ও বাণি-

জ্যের অধগতি। এক দিন এই ভারতে কৃষি ও বাণিজ্যের সম্পূর্ণ উন্নতি ছিল, আর্য্য ঋষিগণ পুস্তকাদি লিখিয়া কৃষকদিগকে শিক্ষা দিতেন, বণিকদিগকে বাণিজ্য কার্য্যে উৎসাহিত করিতেন, তাহাতেই পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষ এতদূর উন্নত ছিল, তাহাতেই ভূত-পূর্ব্ব ভারত সন্তানগণ দেশ দেশান্তরে, দ্বীপ দ্বীপান্তরে, আপনাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতেন। কিন্তু কাল-ক্রমে সে মহাত্মাগণ তিরোহিত হইলেন।

কুসংস্কার, মূর্খতা, প্রভৃতি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতে বিচরণ করিতে লাগিল; ভারত সন্তানগণ পূর্ব্ব পুরুষদিগের কার্য্য সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। এখন আর সে উন্নতি নাই, সে ভাব নাই, ভারতের যে স্থানে যাওয়া যায় সেই স্থানের দুরবস্থা দেখিয়া অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় হয়। কাচারি জাতির কৃষি বাণিজ্যের অবস্থাও তদ্রূপ শোচনীয়। আসাম প্রদেশের ভূমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা, অতি অল্প মাত্র পরিশ্রম করিলেই শস্যশালিনী হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত—দেব মাতৃকা ও নদী মাতৃকা। যে প্রদেশের ভূমি বৃষ্টির জলে শস্যশালিনী হয় সেই ভূমিকে দেব মাতৃকা কহে; আর যে প্রদেশের ভূমি নদীর জলে শস্যশালিনী হয় সেই ভূমিকে নদী মাতৃকা কহে। আসাম প্রদেশের ভূমিকে নদী মাতৃকা ও দেব মাতৃকা দুইই বলা যাইতে পারে; কারণ এই প্রদেশ অতিশয় নদী-সঙ্কুল। সমস্ত আসাম ভ্রমণ কর এরূপ একটিও স্থান দেখিবেনা যাহার নিম্নে নদী প্রবাহিত হইতেছে না। সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ জন পদ গুলিকে হরিৎ বর্ণে সজাইয়া হাস্য করিতে করিতে চলিয়াছে, উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত মালা হইতে বেগবতী তটিনী-নিচয় তীরবেগে আসিয়া তরঙ্গে আলিঙ্গন করিতেছে, শস্য ক্ষেত্র নিচয় ঐ সকল তটিনী প্লাবনে দিন দিন উর্ব্বরতা লাভ করিতেছে। আবার এদিকে চৈত্র মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর বর্ষা; শস্য রোপণার্থ কৃষকদিগকে জল সিঞ্চনও করিতে হয় না। বর্ষা জলেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ব্রহ্মপুত্র নদ প্লাবিত হয়। সেই প্লাবনে করদায়িনী নিম্নগা-নিচয়ও স্ফীত হইয়া ভয়ানক বন্যা উৎপন্ন করে। কেদার-রাজি সেই নবোদকে স্নাত হইয়া প্রচুর পরিমাণে সারবতী হয়, এবং যে শস্য রোপণ করা যায় তাহাতেই ভূষিতা হইয়া জন সাধারণের মন আকর্ষণ করিতে থাকে।

প্রকৃত বীর কে?

বীরত্ব ও দস্যুতা এই দুয়ের মধ্যে কি কিছুই প্রভেদ নাই? এই দুইটীরই কি আদি এক, অন্ত এক, ও পরিণাম এক? দুইটীই কি মানবজাতির অত্যাচার বৃক্ষের বিষময় ফল? আমরা সকল সময় এই দুইটীর প্রকৃত অর্থ সম্যক্ রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এক দস্যুর কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন, "ভাই আমি আর

তুমি দুজনেই এক।" কিন্তু অন্ধ ঐতিহাসিকগণ তা স্বীকার করেন কৈ? দিক্‌বিজয়ী বীর সৈন্য সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চারিদিকে তুমুল কাণ্ড বাধাইতে লাগিলেন, বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে, বিনা উত্তেজনায়, কত শত নৃপতির রাজ্য আক্রমণ, বিধ্বস্ত ও হতশ্রী করিয়া দিয়া নিজের অমানুষিক বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কত গ্রাম, নগর, জনপদ প্রাণীশূন্য, বীভৎস শ্মশানে পরিণত করিয়া নিজের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ-প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীরিত করিতে লাগিলেন; ঐতিহাসিকগণ অমনি তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে বীর আখ্যা প্রদান করিলেন। আর আমি হায়! দুর্ভাগা, আমি দরিদ্র তপন-তপ্ত জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুধাতুর আমি, অনশনে ক্লিষ্ট, ভ্রমণে পরিশ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, ক্ষুধার নিষ্ঠুর কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত অন্তর হইয়া, হে ধনান্! তোমার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তুমি তাড়াইয়া দিলে, তুমি তখন তাম্বুল রাগে অধরোষ্ঠ সুরঞ্জিত করিয়া উপাধানে স্বীয় স্থূল দেহ-ভার ন্যস্ত করিয়া, চাটুকার বৃন্দে পরিবৃত হইয়া আল্‌বলায় তামাকু পান করিতেছিলে, আমার কথা শুনিবে কেন? তুমি তখন চক্ষু দুটী বুজিয়া তোমার বারনারীর ঈষৎ কম্পিত অতুলনীয় ঠোঁট দুটী ধ্যান করিতেছিলে, গরিব সত্যানন্দের কথা তোমার কানে যাইবে কেন? তুমি ইঙ্গিত করিলে, ধরিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে, এমন সুযোগ্য দ্বারবানগণ আসিয়া আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিল। আমি আসিতেং দেখিলাম তোমার একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কতকগুলি দামী বস্ত্র রহিয়াছে পেটের জ্বালায় কি জ্ঞান থাকে? আমি তাহা চুরি করিলাম। কিন্তু হায়! ধরা পড়িলাম, দ্বারবানের মুখে বিরাশীসিক্কার ওজনে একটী মুষ্টাঘাত করিয়া তথা হইতে পলাইলাম। কিন্তু পুলিস ধরিল। বিচার হইল। সত্যানন্দ পেটের দায়ে চোর ও দস্যু প্রতিপন্ন হইল। কি অবিচার! উদরের জ্বালা নিবারণ করিতে গিয়া আমি হইলাম চোর ও দস্যু, আর আলেকজাণ্ডার যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, যিনি বিনা প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ মানবের অমূল্য জীবন যুদ্ধানলে আহুতি দিলেন তিনি হইলেন বীর!! এক যাত্রার পৃথক ফল। দুষ্কর্ম্ম করিয়া সীজার বীর, হানিবল বীর, নেপোলিয়ন বীর, ক্লাইব বীর, ডাকাতী করিয় নাদির সা বীর, আবদালী বীর, আর মহম্মদ ঘোরিও বীর। আর মীর কাসিম্ দস্যু সত্যানন্দ দস্যু। প্রথমটী দস্যু নিজের সত্ব বজায় রাখিতে গিয়া, আর দ্বিতীয়টী দস্যু পেটের দায়ে।

জিজ্ঞাসা করি বীর কে? দস্যু কে? আলেকজাণ্ডার না পুরুরাজ? হানিবল না সিপিও আফ্রিকেনস্? জারাকসিস্ না লিওনিডস্? আকবর না প্রতাপ সিংহ? বিজয়ী উইলিয়ম না আহত হেরল্ড? কে বীর? আওরঙ্গজেব না শীবাজী? আহমদ আবদালী না শিবদাস রাও। কে বীর? মহম্মদ গোরী না পৃথীরাজ? ধনীর দ্বারবান না সত্যানন্দ?

বীর কে? যে অস্ত্র ধরিতে জানে, যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে পারে, প্রাণী হত্যায় পটু-

সেই? না যিনি অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অপ্রতিহত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ইহ জীবনের কর্ত্তব্য গুলি সংসাধন করিতে সমর্থ দুঃখীর চক্ষুজল মুছাইতে সক্ষম তিনিই? বীর কে? নেপোলিয়ন না ঈশা? তৈমুর না শাক্যসিংহ? হাইদারআলী না গালিলিও? ক্লুপে না হানিমান? বাবর না কলম্বাস?

অপরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া অপেক্ষা অপরের হৃদয় কাড়িয়া লওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার। বাহুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবল, বুদ্ধিবল অপেক্ষা প্রেমবল, প্রেমবল অপেক্ষা ধর্ম্ম-বলের প্রতাপ অধিক। আরঙ্গজেব ক্রমাগত অস্ত্র চালনা করিয়া যাহা না করিয়াছেন, আকবর বিনা-রক্তপাতে তাহা অপেক্ষাও মহত্তর কর্ম্ম সংসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে রাজা দুষ্মন্তের অমোঘ প্রতাপ সসাগরা সদ্বীপা ধরীত্রী পরহঁরি কম্পান্বিতা, তাপস গৃহপালিতা সরলা শকুন্তলা প্রেমবলে তাঁহার হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। বোনাপার্ট বাহুবলে যাহা না করিতে পারিয়াছেন সূত্রধর তনয় ঈশা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কর্ম্ম অনায়াসে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নেপোলিয়ন একদা তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি অস্ত্র ধরিয়া কি করিতে পারিলাম? কয়টী রাজ্য জয় ও কয়টী নৃপতির মুণ্ড আমার পদানত করিতে পারিলাম, আর দেখ দরিদ্র ঈশা যাহার অস্ত্র নাই, ধন নাই, সৈন্য নাই, রণকৌশল নাই, কেমন ধীরে ধীরে সমগ্র য়ুরোপখণ্ড জয় করিয়া ফেলিলেন, আমা অপেক্ষা কত ধনুর্দ্ধর সম্রাট তাঁহার চরণ-প্রান্তে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলেন।"

বীর তিনিই যিনি সত্যের মাহাত্ম্য সংস্থাপনের জন্য প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সেনাপতি পরমেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া অশঙ্কিত হৃদয়ে সংগ্রাম করিতে সমর্থ, যিনি নিজের স্বার্থের মস্তকে সজোরে পদাঘাত করিয়া যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু ন্যায় ও সাধারণের হিতকর তাহারই পক্ষ অবলম্বনে সক্ষম, যিনি মানব জাতির হিতসাধনে দৃঢ়-ব্রত, যিনি দুর্ব্বলের বল, সহায়-হীনের অবলম্বন ও বিপন্ন জনের প্রিয়-সুহৃৎ, তিনিই বীর তিনিই ধন্য। এই জন্য বীর ঈশা, বীর মহম্মদ, বীর নানক ও লুথর, বীর চৈতন্য ও রামমোহন; এই জন্য কলম্বাস, গালিলিও ও হানিমান বীর, এই জন্য চিতোর, স্পার্টা ও কার্থেজ পুরস্ত্রীগণ বীরাঙ্গনা।* এই জন্য মেজিনী ও টেল্‌ওয়েলিংটন্ ও ব্লুচর এবং ওয়াসিংটন্ বীরাগ্রগণ্য। আর সত্যানন্দ-দগ্ধ উদরের জন্য চুরি করিয়াছে বলিয়া সে বীর না হইলেও দস্যু নহে।

শ্রীসত্যানন্দ শর্ম্মাঃ।

* শত্রুগণ নগর অবরোধ করিলে, ইঁহারা স্বদেশের জন্য, ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণার্থ মস্তক-শোভা কেশ গুচ্ছগুলি মুড়াইয়া দিয়াছিলেন। তীর ও গোলা গুলি প্রস্তুতের জন্য শরীরের অলঙ্কার গুলি খুলিয়া গালাইতে দিয়াছিলেন।

প্রমোদ-কুমার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দস্যুহস্তে।

"'Tis the witching time of night
When heaven and hell breathes out."
Shakespeare.

১২৩৯ সালে বৈশাখ মাসে এক দিবস দিবাবসান সময়ে একটী যুবক হরিপুরের নিকটবর্ত্তী এক অরণ্য মধ্য দিয়া যাইতে ছিলেন। দিনমণি প্রচণ্ড কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত করিয়া তখন দিগন্ত বেলায় মিশাইয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া ক্রমে পৃথিবীকে আবৃত করিল; দুটী একটী করিয়া অসংখ্য তারকা-রাজি গগনের ভালে ফুটিতে লাগিল। অমাবস্যার রাত্রি—আজ চন্দ্রের সে ভুবন-মোহন হাসিও নাই—আর সে রজতমাখান কৌমুদীকিরণও নাই। যুবক সকল লক্ষ্য করেন নাই—তিনি আপনার চিন্তায় বিভোর হইয়া গমন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ একটী বৃক্ষে মস্তক প্রহত হওয়াতে চিন্তাভঙ্গ হইলে তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন;—কোথায় বা সে অরণ্য পার্শ্বস্থিত গ্রাম—আর কোথায় বা সে আরণ্য পথ—তিনি এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে আসিয়াছেন। যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল বৃক্ষের পর বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যুবক পথ পাইবার আশায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন;—কিন্তু তিনি যথার্থ পথ হইতে অনেক দূরে আসিয়াছেন—তিনি পথ পাইলেন না কিম্বা ক্লান্ত বলিয়া ভালরূপ অন্বেষণ করিতে পারিলেন না। যুবক নিরাশ মনে ভগ্নান্তঃকরণে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন।

তামসময়ী রজনী ক্রমে গভীরা হইতে লাগিল। অমাবস্যার ভয়ানক অন্ধকারে সেই ভয়াবহ নিবিড় অরণ্যকে অধিকতর ভয়াবহ করিয়া যুবকের মনে ভীতিসঞ্চার করিতে লাগিল—রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা, বৃক্ষপত্রের মর্ মর্ শব্দ এবং চতুঃপার্শ্বস্থিত ঝিল্লীচীৎকার বৃক্ষসমূহ সে ভয় যেন আরও দ্বিগুণতর করিতে লাগিল। যুবক আপন মনে বলিলেন—"হায়! শৈশবে পার্থিব জগতের অমূল্য রত্ন, সংসারের সারবস্তু, সকল সুখের আধার পিতা মাতায় বঞ্চিত হইয়াছি।

কিন্তু এতাদৃশ নিরাশ্রয় হইয়াও আশ্রয় পাইয়াছিলাম—অদ্য তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। নাজানি এ অভাগার কপালে এখনো কত দুঃখ আছে—হয়ত এ দুর্ব্বল মনুষ্যজীবন দুর্ব্বিষহ কষ্ট-ভার সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।”

যুবক! কি বলিতেছ—জানা ন যে কালের মহাচক্র অনবরত ঘুরিতেছে—সে চক্র স্থির নহে। কালি যাহাকে রাজপথে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে দখিয়াছ—আজি তাহাকে সুরম্য হর্ম্ম্যে দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শয়ন করিতে দেখিতেছ। আজি যাহাকে অতুল সম্পত্তির অধিকারী দেখিয়া মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইলে—কালি তাহাকে পথের ভিখারী দেখিয়া হয়ত কাঁদিবে। সংসারের নিয়মই এই। নির্ব্বোধ মনুষ্য! এই সকল দেখিয়াও তুমি বুঝিতে পার না যে তোমার সুখ দুঃখ চিরদিনের জন্য নহে। তোমার সুখ হইলে তুমি আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠ—মনে কর যে তোমার এ সুখ অনন্ত। যদি দুঃখ হইল তবে কাঁদিয়া ভাসাইলে—বিধাতাকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর যাহা ইচ্ছা বলিলে—কিন্তু জান'না যে তোমার এ দুঃখও চির-দিনের জন্য নহে। এমন এক দিন আসিতে পারে, যে দিন তুমি সুখী মনুষ্য—তোমার মত সুখী লোকে পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখিতে পাইবে। সে দিন তুমি বিধাতাকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিবে না। মনুষ্য! যখন কষ্টে পড়িবে তখন ধৈর্য্য ধারণ করিও;—বিধাতাকে কখনও নিন্দা করিও না—তিনি যাহা করেন—তাহা তোমার ভালর জন্যই। যুবক! সেই জন্য তোমায় বলি—“তোমার দুঃখ” চিরদিনের জন্য নহে। এমন এক সময় আসিতে পারে—যখন তুমি জগৎকে জিজ্ঞাসা করিবে—“আমার মত সুখী কে?”

যুবক এই রূপে নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি হঠাৎ চমকিত হইলেন—অস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনি তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। যে দিক্ হইতে ক্রন্দন-ধ্বনি আসিতে ছিল—তিনি দ্রুত-পদ-সঞ্চারে তদভিমুখে চলিলেন—অনেক বার বৃক্ষে মস্তক প্রহত হইল,—অনেক বার অন্ধকারে পদস্খলন হইল, কিন্তু তিনি নিরস্ত হইলেন না—তথায় উপস্থিত হইলেন; কিন্তু যাহা দেখিলেন—তাহা অতীব শোচনীয়,—একজন কৃষ্ণকায় (এত কাল যে অন্ধকারে চেনা কঠিন) দস্যু একটী অল্পবয়স্কা রমণীর উপর বল-প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিতেছে। ক্রোধে ও বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল,—তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া হস্ত-স্থিত যষ্টিদ্বারা দস্যুর মস্তকে সজোরে আঘাত করিলেন। অলক্ষিত ভাবে গুপ্ত শত্রু দ্বারা আহত হইয়া দস্যু ভূমিতে পড়িয়া গেল। যুবক তাহাকে পুনরুত্থানের সময় না দিয়া উপর্য্যুপরি তাহার মস্তকে চারি পাঁচ বার আঘাত করিলেন—দস্যুর মস্তক হইতে ভীষণবেগে রক্তধারা পড়িতে লাগিল। সে অর্দ্ধ-মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। রমণী এ সকল ঘটনা কিছুই দেখেন নাই,—তিনি তৎকালে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলেন, একজন লোক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—কিন্তু তাহাকে দস্যু মনে করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন—

"ওগো! তোমার পায়ে পড়ি—আমায় বাড়ী নিয়ে চল।" স্বরে যুবক বুঝিলেন যে এই রমণী—বালিকা। তিনি দেখিলেন বালিকা তাহাকে দস্যুবোধে ভয় পাইয়াছে—বলিলেন—"ভয় নাই, আমি দস্যু নহি—দস্যু আহত হইয়াছে।" সে ঘোর বিপদে এ আশ্বস্ত কথা বালিকা-হৃদয় বিশ্বাস করিতে চাহিল না। কিন্তু পরেই দেখিলেন যথার্থই দস্যু রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে। বালিকা আশ্বস্তা হইয়া বলিল—"তুমি আমায় বাড়ী নিয়ে চল, ও এখুনি বেঁচে উঠবে।"

বালিকার সরলতায় মোহিত হইয়া ঘোর বিপদেও যুবক মনে মনে হাসিলেন—তিনি বলিলেন—

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

বালিকা বলিল—"হরিপুর।"

যুবক সেই অন্ধকারে হরিপুরের অন্বেষণে বাহির হইলেন—বালিকা তাঁহার অনুসরণ করিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জমীদারগৃহে—পুনঃপ্রাপ্তে।

হরিপুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম—প্রায় পঞ্চাশ ঘর গৃহস্থের বসতি। হরিপুরের পশ্চিমাংশ ধৌত করিয়া দামোদর নদ কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে এবং পূর্ব্বতন অংশ নিবিড় অরণ্যে বেষ্টিত। যে সময়ের ঘটনা বিবৃত করা যাইতেছে, সে সময় হরিপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অবস্থা অতীব শোচনীয়—প্রায় চোর ডাকাতের কথা শুনা যাইত। চল পাঠক—একবার হরিপুরের জমীদারের বাটী দেখিয়া আসি। জমীদারের বাটীটি বৃহৎ—চারি মহলে বিভক্ত—প্রথম মহলে দেউড়ী দপ্তরখানা ও বৈঠকখানা, দ্বিতীয় মহলে ঠাকুরদালান ও তৃতীয় মহলে অন্তঃপুর এবং চতুর্থ মহলে রান্নাবাটী—এখানে গ্রামের দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যহ আহার পায়। এতদ্ব্যতীত অন্তঃপুরের সংলগ্ন একটী রমণীয় উদ্যান আছে।

এ গভীর নিশীথে সমস্ত হরিপুর নিস্তব্ধ—জমীদারের বাটীতে এত গোল কেন? জমীদার কপোলদেশে স্বীয় কর সংন্যস্ত করিয়া বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ন্যূনাধিক দশজন পাইক মহাগোলযোগ করিতেছে। জমীদার দুঃখক্লিষ্টস্বরে দেওয়ানজীকে বলিলেন—

"দেওয়ানজী কি হইবে?"

দেওয়ানজী বলিলেন—"ভয় কি মহাশয়?—আপনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করুন।" এই বলিয়া তিনি সমবেত পাইকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যে কেহ আজ

জমীদার মহাশয়ের কন্যাকে অন্বেষণ করিয়া আনিতে পারিবে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।”

এই কথা শুনিবামাত্র সকলে মহাকোলাহল করিয়া বাহিরে আসিল এবং চীৎকার করিয়া দিঙ্মণ্ডল ফাটাইতে লাগিল। তাহাদের চীৎকারধ্বনিতে ক্ষুদ্র হরিপুর কাঁপিতে লাগিল। কোন কোন গ্রামবাসী ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া ভীতান্তঃকরণে গৃহের ছাদে উঠিলেন—কেহ বা গৃহের বাহির হইলেন না—কেবল দুই একজন সাহসী লোক বাহিরে আসিলেন—দেখিলেন যে জমীদারের বাটীর পাইকেরা মশালহস্তে ছুটিতেছে।

জনৈক গ্রামবাসী একজন পাইককে সম্বোধন করিয়া বলিল—“ও শম্ভু! কি হয়েছে?”

শ।—“আর মশয়! সে কথা তুমি বল কেন?”

গ্রা।—“কি হয়েছে রে—তাই বল্‌না।”

শ।—“বেশ্ ঘুমটা আস্‌ল 'তাও ভাঙ্গিয়া দিল।”

গ্রা।—“কি হ'য়েছে তাই বল্‌না বাপু।”

শ।—“ওই জন্যে বড় লোকের ঘরে চাকরী কর্‌তে নাই।”

গ্রা।—“ভারি বিরক্ত ক'রে তুল্লে যে, কি হ'য়েছে তাই বল্‌না।”

শ।—“মুই কাল্‌ই চাক্‌রী ছাড়ি দিব।”

গ্রা।—“আবার মেলা বকে—বল্‌না ছাই।”

শ।—“আচ্ছা মশয়! তুমি ভেবে দেখ দেখি—কাঁচা ঘুম ভাঙ্গলে কি হয়?”

গ্রা।—“বাপু বল্‌বিতো বল—তা নইলে আর কারুকে জিজ্ঞাসা করি।”

শ।—“বড় ঘরের কথা আপনি কি শুন্‌বে?—কর্ত্তা মশায়ের মেয়ে কোথায় গেছে তাই খুঁজ্‌তে লেগেছি।”

মুহূর্ত্তমধ্যে এই সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। যিনি যে রূপে পারিলেন—সেই রূপে এই সংবাদ প্রচার করিলেন। যাহা হউক যাঁহারা ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এ সংবাদে তাঁহাদের দেহে প্রাণ আসিল। গ্রামের কতকগুলি স্ত্রীলোক এক স্থানে একত্র হইয়া এ বিষয়ের ঘোরতর আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

তন্মধ্যে একজন প্রৌঢ়া বলিলেন—

“জমীদারের মেয়ে বাঁশবনের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময়ে একটা বাঘ এসে তাকে টেনে নিয়ে গেছে।”

এই কথা শুনিয়া একজন প্রখরনয়না ভীষণ-নথধারিণী যুবতী নথ টানিয়া হাতমুখ নাড়িয়া বলিলেন—“নাগো ঠাক্‌রুণ! তা নয়—তার স্বভাব চরিত্তির ভাল ছিল না—কোথায় চলে গেছে।”

এ কথায় আর একজন মহারুষ্টা হইয়া বলিলেন—“নালো না তোরা কেউ জানিস্ না—তাকে নিশিতে ডেকে নিয়েগেছে।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিল—কোকিলের কুহুরবে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কাকেরা 'কা' 'কা' করিয়া গৃহস্থের সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিতে লাগিল। সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে অনেকে কাকের চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরক-গামী করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে জমীদারের বাটী হইতে একটী আনন্দের ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইল। গ্রামের লোকেরা তদভিমুখে ছুটিল, গিয়া শুনিল যে জমীদার স্বীয় কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন—জমীদার কন্যার গলা জড়াইয়া আনন্দে কাঁদিতেছেন—যোগেশ ও কুমুদিনী হর্ষ-বিভাসিতমুখে বসিয়া রহিয়াছেন।

হরি হরি, এত ক্ষণ জমীদারের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। জমীদারের নাম শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়,—দেখিলে বোধ হয় যৌবনাবস্থায় একজন সুপুরুষ ছিলেন, বয়স ৬০ বৎসর; বয়োধর্ম্মানুসারে মস্তকের সমস্ত কেশগুলি শুভ্র-বর্ণ ধারণ করিয়াছে। বৃদ্ধের হৃদয়খানি স্নেহ ও দয়াতে ভরা। তাঁহার স্ত্রী নাই—একটী কন্যা, একটী পুত্র ও একটী সাধের পুত্রবধূ। পুত্রের নাম যোগেশ—এক-বিংশবয়স্ক সুন্দর যুবাপুরুষ। যোগেশ পঞ্চদশ-বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে পণ্ডিত ও মৌলবীর নিকট সংস্কৃত ও উর্দ্দু-শিক্ষা সমাপন করেন। তৎপরে বৃদ্ধ-হরিহর কোন বন্ধুর পরামর্শানুসারে কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। তৎকালে যেরূপ ইংরাজী-শিক্ষা প্রদত্ত হইত যোগেশ তাহা লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা অল্প কিম্বা অধিক যেরূপই হউক না কেন তাহার একটী বিশেষ গুণ আছে—যোগেশ একবার কলিকাতা হইতে বাটী আসিবার সময় দুই খানি বাঙ্গালা পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রী ও ভগ্নীকে পিতার অগোচরে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। উভয়েই বুদ্ধিমতী—অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের বর্ণ-পরিচয় সমাপ্ত হইল। কিন্তু এ সংবাদ কোনরূপে জমীদারের কর্ণ-গোচর হওয়াতে তিনি যোগেশকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা—মেয়েমানুষ লেখা পড়া শিখে কি ক'রবে—ওদের ত চাকরী ক'রে খেতে হবে না?"

যোগেশ হাসিয়া বলিলেন—"লেখাপড়ায় দোষ কি?—আমাদের শাস্ত্রেওত স্ত্রীশিক্ষা দিবার বিধি লিখিত আছে?" এমন সময় জমীদারের সপ্তমবর্ষীয়া আদরের কন্যা গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে শ্লেট ও পেন্সিল—শ্লেটে যোগেশের লিখিত বর্ণ সমূহের উপর সে পেন্সিল দিয়া বুলাইয়াছে। জমীদার সস্নেহে কন্যার মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন—"হাঁ মা—মেয়েছেলেতে কি লিখতে আছে?—তুমি লিখ না।" বালিকা বলিল—"না আমি লিখ্‌ব—আমি কেমন প'ড়্‌তে পারি—তুমি কি প'ড়্‌তে পার?"

যোগেশ ও হরিহর উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন—হরিহর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তুমি আমায় পড়াবে? আমি তোমার কাছে পড়িব।" তৎপরে যোগেশের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"তুমি এদের পড়াও, কিন্তু গ্রামের কোন লোক যেন জানিতে না পারে।"

বৃদ্ধ অনুমতি দিলেন বটে—কিন্তু আমরা জানি তিনি মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে যোগেশকে অনুযোগ করিতেন। কন্যাটীর নাম সুহাসিনী ও পুত্রবধূর নাম কুমুদিনী। হরিহর কুমুদিনীকে বালিকাবস্থায় কোন এক ব্রাহ্মণের নিকট প্রাপ্ত হন। নিরাশ্রয়-সুন্দরী ব্রাহ্মণ-বালিকা দেখিয়া জমীদার তাহাকে আশ্রয় দান করেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে

লাগিল। হরিহর বালিকার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া স্বীয় পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন। সুহাস ও কুমুদ এক বৃন্তে দুইটী কুসুম। সুহাসের আরও দুই একটী সই ছিল—কিন্তু সে তাহাদের সঙ্গে অধিক মিশিত না—তাহার যা কিছু কথা সে কুমুদকে বলিত; কুমুদও তাহাকে সকল কথা বলিত। পরিচয় দিতে বসিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম আর কিছু বলিব না।

এদিকে বৃদ্ধ জমীদার বলিলেন "হাঁমা, বৃদ্ধ পিতাকে কাঁদাইয়া কি এরূপে যাইতে হয় ?" কন্যার ক্রন্দন আর থামে না; অনেক কষ্টে অশ্রু-সম্বরণ করিয়া বলিল—'আমায় ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গিছলো, উনি রক্ষা ক'রেছেন।" সকলে আনন্দে এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলেন যে একজন অপরিচিত যুবক নিকটে দণ্ডায়মান তাহা কেহ লক্ষ্য করেন নাই। সুহাসের "উনি" এই কথা শুনিয়া সকলের দৃষ্টি ফিরিল—সম্মুখে অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর যুবা পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বৃদ্ধ হরিহর কন্যার জীবনরক্ষার জন্য তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং সুহাসকে সম্বোধন করিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন—"মা ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গিছল কি ক'রে ?—বল।"

সুহাস ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—"আমি ঝির সঙ্গে বাড়ী আসিতেছিলাম—বাঁশবনের নিকট কে একজন আসিয়া ঝিকে বনের মধ্যে ফেলিয়া দিল ও আমার মুখবন্ধন করিয়াছিল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম—তাহার পর কি হইয়াছিল জানিনা—আমি মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম—এক অন্ধকার বনের মধ্যে আসিয়াছি, একজন যমের মতন মনুষ্য রক্তাক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—আর উনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

পাঠক-মহাশয়কে বোধ হয় বলিতে হইবে না এই যুবক ও বালিকাকে আমরা অরণ্যমধ্যে দর্শন করিয়াছিলাম। বৃদ্ধ কৃতজ্ঞ অন্তরে যুবককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তাকে একেবারে মেরে ফেলছ নাকি ?" যুবা কহিলেন—"আজ্ঞা—না—সে কেবল মূর্চ্ছা গিয়াছে মাত্র।" বৃদ্ধ পাইকদিগকে দস্যুর অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। বাঁশ বনের নিকট দাসীকে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন—বলা বাহুল্য তাহারা দাসীকে তথায় প্রাপ্ত হইয়াছিল। যুবক অরণ্যে বালিকার সরলতায় মোহিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে বালিকার আশ্চর্য্য রূপ রাশি সন্দর্শন করিয়া নির্নিমেষ লোচনে তাহাকে অবলোকন করিতেছিলেন। সুহাস স্বীয় দুর্ঘটনা বিবৃত করিতে করিতে একবার যুবকের প্রতি চাহিয়াছিল—চারিচক্ষু সংমিলিত হইল—অমনি চারিচক্ষু লজ্জায় নত হইল—দুইটী হৃদয়েরমধ্যে কি একটীভাব বিদ্যুৎবেগে প্রবেশ করিল—অথচ কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। এ শুভ দৃষ্টি অন্য কেহ লক্ষ্য করিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু কুমুদ লক্ষ্য করিয়াছিল। সুহাস স্বীয় দুর্ঘটনা বিবৃত করিলে পর কুমুদ তাহাকে বলিল—"তুই কেবল 'উনি' 'উনি' করিতেছিলি যে ?—'উনি' তোর কে হন ?" সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কুমুদের মুখেরদিকে চাহিয়া বলিল "তবে কি ব'লব ভাই ?"

বৃদ্ধ হরিহর যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাপু তোমার নাম কি?"

"প্রমোদ-কুমার শর্ম্মা।"

"নিবাস?"

"মধুপুর।"

"পিতা মাতা আছেন?"

"নিরুদ্দেশ——"

হরিহর তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় যুবক বলিলেন "মহাশয়! আমি নিজ-বিষয় অল্পই অবগত আছি। আমার ৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা মাতা নিরুদ্দেশ হন—তৎপরে একজন ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিপালিত হই। শুনিতে পাই ব্রাহ্মণই আমার পিতামাতার নিরুদ্দেশের বিষয় বলিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের মৃত্যুকালে বাক্‌রোধ হয়, সুতরাং আমার আশাও পূর্ণ হয় নাই। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর আমি পিতা মাতার অন্বেষণার্থ বহু স্থানে গমন করি, কিন্তু কোন সন্ধান পাই নাই; অবশেষে হরিপুরের অরণ্যে উপস্থিত হইয়া আপনার কন্যাকে দস্যু-হস্ত হইতে মুক্ত করি।"

হরিহর দুঃখিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কোথায় যাইবে?"

"যেখানে অদৃষ্ট লইয়া যাইবে।"

"বাপু—একটী কথা বলিব——"

"আজ্ঞা করুন।"

হরিহর দয়ালু স্বরে কহিলেন "তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমার আজ যে উপকার করিয়াছ—তাহা জীবন দিলেও শোধ হয়না। তুমি আমার গৃহে অবস্থান কর—এখানে তোমার কোন কষ্ট হইবে না—আপনার গৃহ ভাবিও।

নিরাশ্রয় যুবক সম্মত হইলেন—সুহাসের হৃদয়-তন্ত্রী আনন্দের স্বরে বাজিয়া উঠিল—কেন উঠিল তাহা জানি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সখী সঙ্গে।

"Who ever loved that loved
Not at first sight?"
Hero & Deono.

জমীদারের গৃহে প্রমোদের দিন সুখে কাটিতে লাগিল। সময় কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এইরূপ করিয়া জমীদার-গৃহে প্রমোদের দুই বৎসর কাটিয়া গেল—নশ্বর মনুষ্য-জীবনের দুই বৎসর ক্ষয় হইল। কত সহস্র ঘটনা এই বৎসরের মধ্যে মনুষ্যকে দলন করিয়া গেল তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? কত ধনী দরিদ্র হইল, কত দরিদ্র ধনী হইল, কত দুঃখী সুখী

হইল, কত সুখী দুঃখী হইল। আবার যে প্রমোদ এক দিন বৃক্ষতলায় বসিয়া বলিয়াছিলেন "হয়ত এ দুর্ব্বল মনুষ্যজীবন অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" তাহার জীবনে আবার কত নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাই বা কে বলিতে পারে? প্রমোদের বিনম্র ও সৎস্বভাব দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসে। প্রমোদ এখন আর জমীদারের পর নয়—সে একজন জমীদার-পরিবারমধ্যে গণনীয়। প্রমোদ এক্ষণে জমীদারের কনিষ্ঠ পুত্র;—যোগেশের কনিষ্ঠ সহোদর, কুমুদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুহাসের——জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আরে রাম! তাহাও কি হইতে পারে? তবে তাহার হৃদয়ের দেবতা?—তাই কি?—হবে আমরা জানি না। তাহার ভালবাসা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সে কি কুমুদিনীর ন্যায় প্রমোদকে ভালবাসে? বোধ হয়—না, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। আর কিছু বিভিন্ন। প্রমোদ যখন উদ্যানে বেড়ান, সে বাতায়ন-পথ হইতে তাহাকে লুকাইয়া দেখে; যোগেশ বাটী না থাকিলে প্রমোদ সুহাস ও কুমুদকে পড়ান—পড়িবার সময় সুহাস যত ভুল বলে কুমুদ তত বলে না। প্রমোদের নিকট পড়িতে হইলে বালিকার কিছুই মনে থাকে না—সে বিহ্বলা হইয়া পড়ে। প্রমোদ যখন আদর করিয়া সুহাস বলিয়া ডাকেন—হর্ষে লজ্জায় বালিকার মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে—বালিকা হৃদয়ে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, সে ত্রস্ত হইয়া উঠে। বালিকা যখন স্বীয় দুর্ঘটনা বিবৃত করিতে প্রমোদের প্রতি চাহিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই বালিকা হৃদয়ে একটী ভাব বিদ্যুৎবেগে প্রবেশ করিয়াছিল—সে ভাবটী অনুরাগের—কিন্তু তখন কৃতজ্ঞতার প্রাবল্য বশতঃ অনুরাগের ভাব সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায় নাই; অথবা যদি বালিকা পাইয়া থাকে তাহা বালিকা বুঝিতে পারে নাই। যখন প্রমোদ জমীদারগৃহে অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন—সেই ভাবের প্রভাবেই বালিকা-হৃদয়-তন্ত্রী আনন্দের সুরে বাজিয়া উঠিল; কিন্তু বালিকা তাহা নিজে বুঝিতে পারে নাই। ক্রমে তাহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া প্রণয়ে দাঁড়াইল—বালিকার হৃদয়-কোরকে কীট প্রবেশ করিল। তখন বালিকা আপনার হৃদয় বুঝিতে পারিল। সেই সময় হইতে তাহার আচরণে বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল। সে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিতা এবং ভীতা; সে যেন কি কুকর্ম্ম করিয়াছে—পাছে কেহ জানিতে পারে। আবার প্রমোদের কোন কথা হইলে সে বিহ্বলা হইয়া শোনে। এ সকল কুমুদ ব্যতীত আর কেহই লক্ষ্য করিত না। আর কুমুদের ন্যায় সুচতুরা যে, বালিকার হৃদয়ে শীঘ্র জানিতে পারিয়াছিল, বোধ হয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

একদিন কুমুদ সুহাসকে বলিল "সুহাস! তোকে একটী কথা ব'লব?"

সুহাস সভয়ে চক্ষুদুটী তুলিয়া বলিল "কি কথা?"

কুমুদ বলিল "তুই আমায় ভালবাসিস্?"

"বাসি"

"খুব ভালবাসিস্?"

"খুব ভালবাসি।"

"আমার বোধ হয়, তুই আমাকে একটুও ভালবাসিস্ না।"

সুহাস সজল নেত্র দুটী তুলিয়া বলিল "কেন ভাই তোমার এমন বোধ হয়?"

কুমুদ বলিল "তুই যদি আমায় ভালবাসতিস্ তাহ'লে আমায় সব কথা ব'ল্‌তিস্ কিন্তু তুই আমার সব কথা বলিস্ না।"

"আমি কি তোমায় সব কথা বলি না?"

"সব—বলিস্ কেবল একটী ছাড়া।"

"কি একটী ছাড়া ভাই?"

"তুই সত্যি করে বল্—আমার কাছে একটী কথা লুকোস্ কি না?"

সুহাস নির্ব্বাক—মুখে উত্তর নাই। কুমুদ দেখিলেন তাহার অনুমান সত্য। সে হাসিয়া বলিল "তুই কাউকে ভালবাসিস্ না?"

সুহাস হৃদয়ের উদ্বেগে বলিল "বাসি।"

"কাকে?"

সেই প্রিয় নামটী সুহাস মনে মনে সহস্র বার উচ্চারণ করিল—কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। কুমুদ কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল—"প্রমোদ দাদাকে?" সুহাসের মুখ লজ্জায় রক্তিম-বর্ণ ধারণ করিল। কুমুদ দেখিল তাহার অনুমান সত্য এবং বলিল—"তিনি তোমায় ভালবাসেন?"

"বাসেন।"

"খুব?"

সুহাস লজ্জায় নিরুত্তর।

"এতদুর হইয়াছে তা আমায় বল নাই কেন?"

সুহাস এবার অধিকতর লজ্জিতা হইল।

"তা আর লজ্জা করিলে কি হইবে—তোমার দাদাকে বলিয়া এখন যাহাতে বিবাহ হয়, তাহার চেষ্টা করা যাক্। আমি জানি সুহাস আমাদের বালিকা—তোর্ ভিতরে এত তা আমি কেমন করিয়া জানব' বল্!"

সুহাস বলিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছে।

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে এক দিবস কুমুদ ও সুহাস জমীদারের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া কথা কহিতেছেন। এই উদ্যানটী—অন্তঃপুরের সংলগ্ন। উদ্যানের মধ্য-স্থলে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী, বৃদ্ধ জমীদার কর্ম্মকাণ্ডের সময় উপকারে আসিবে বলিয়া, তন্মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ফেলিয়া রাখিয়াছেন। উদ্যানটী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত—প্রাচীরের ধারে ধারে নারিকেল্ আম্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ। কিন্তু পুষ্করিণীর ধারে কিছুই নাই—কেবল দুই এক স্থানে ঘাস অধিক পরিমাণে মাত্রা চড়াইয়া তীরভূমিকে বন্ধুর বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ঘাটের দুই পার্শ্বে কতকগুলি ফুলগাছ আছে—তাহা কুমুদিনীর সখের জিনিস—কুমুদ তাহা স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল, এখন তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে—ফুলফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যহ প্রদোষ কালে কুমুদ ও সুহাস উদ্যানে বেড়াইতে আসেন। আজও আসিয়াছেন। কুমুদিনী ষোড়শ-বর্ষীয়া যুবতী—সুহাসিনী চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া সরলা বালিকা। কুলীন কন্যা বলিয়াই হউক, কিম্বা বৃদ্ধ জমীদারের মায়া বশতই হউক সুহাস আজও অবিবাহিতা। উভয়েরই বর্ণ কনক গৌর, কুমুদিনীর যৌবনের সঙ্গে সে বর্ণ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার সৌন্দর্য্য অনুমিত হয়, তাহাকে দেখিলেই মন আকৃষ্ট হয়। সুহাসের সৌন্দর্য্য অনুভব করা কিঞ্চিৎ

আয়াসসাধ্য। কুমুদিনীর দেহ ক্ষীণ এবং ঈষৎ দীর্ঘ; সুহাসিনী মধ্যমাকারা—গঠন সুন্দর। কুমুদিনীর ওষ্ঠ দুখানি পাত্‌লা লাল্ টুক্‌টুকে—সুহাসের ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ পুরু—কিন্তু সে ওষ্ঠ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল—তাহা কেহ কখন শুষ্ক দেখে নাই। কুমুদিনীর চক্ষু দুটী উজ্জ্বল—কিন্তু বড় চঞ্চল। সুহাসের চক্ষু দুটী উজ্জ্বল, প্রশস্ত ও প্রশান্ত। সে শান্ত ভ্রমর-বিনিন্দিত চক্ষের কটাক্ষে কাহারও মন টলে না। সে চক্ষের দৃষ্টি যেন সততই ভীত; সে চক্ষের দিকে চাহিলে চক্ষের পল্লব দুটী ধীরে ধীরে পড়িয়া যায়। সুহাসের মুখ খানি এখনও শিশুর ন্যায় ঢল্ ঢল্ করিতেছে। সে মুখ দেখিলে তাহাকে সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। উভয়েই নিরুপমা সুন্দরী। তবে কুমুদ—নীহার-সিক্ত প্রফুল্ল শতদল পদ্ম—আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মোহিত হইয়াও চতুর্দ্দিকস্থ সকলকে মোহিত করিয়া আপনার গর্ব্বভরে ফুটিয়া সরোবরের শোভা সম্পাদন করে—লোকে দেখিবামাত্র মোহিত ও আকৃষ্ট হয়। আর সুহাস অনতি-প্রস্ফুটিত গোলাপ-মুকুল—পাপ্‌ড়িগুলি খুলিয়াছে অথচ সম্পূর্ণ বিকাশিত নয়; ফুট ফুট—কিন্তু তবুও ফোটেনি—কিন্তু যখন ফুটিবে সকলেই ইহার নিকট পরাস্ত হইবে। ইহা আপনার সৌরভে আপনি আমোদিত—আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি নত; আদর করিয়া ধর রূপ গুণ সকলই বুঝিতে পারিবে।

সুহাস বলিল—"কুমুদ তোমার মুখ এত বিষণ্ণ কেন?"

"কই?—না আমার মুখত বিষণ্ণ নয়।"

"হাঁ—ভাই!"

"আমার মুখ বিষণ্ণ ত তোর কি?"

এবার সুহাস কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। কুমুদ আবার কিছু পরে বলিল "আমার মুখ দেখ্‌লে কি তোর কষ্ট হয়?"

সুহাস বলিল "ভারি কষ্ট হয়।"

"কেন?"

"বলিতে পারি না।"

কুমুদ সস্নেহে বলিল "তুই আমায় ভালবাসিস্ ব'লে।—আচ্ছা আর কার মুখ বিষণ্ণ দেখিলে তোর কষ্ট হয় সুহাস?" এই গুলি বলিবার সময় কুমুদের অধরে ঈষৎ হাস্য প্রকটিত হইয়াছিল।

সুহাস উত্তর করিল "সকলের।"

"সকলের কি নাম নাই?"

"এই—দাদার—বাবার—আর——"

"আর—আর প্রমোদের?— কেমন—না?"

সুহাস মুখ নত করিল।

কুমুদ বলিল—"আচ্ছা ভাই কার মুখ বিষণ্ণ দেখিলে তোর বেশী কষ্ট হয়?"

সুহাস উত্তর করিল—"আমি জানি না তোমার কোন কথাও শুনিতে চাহি না—তোমার কোন কথার উত্তর দিতে চাহি না—তোমার ভাই সব কথায় ঠাট্টা।"

"আচ্ছা তুমি শুনিওনা, আমি আপনার মনে কথা কহিব। আচ্ছা আজ যে প্রমোদের বিষয়——"

সুহাস সোৎসুকে বলিল "কিভাই বল্‌না?"

"যে কথা—" ইহা কুমুদের মুখে উচ্চা-

রিত হইতে না হইতে সুহাস বলিল "কি কথা বল্—না ?"

কুমুদ "—শুনিলাম সে কি সত্য ?" বলিয়া নিজ কথা সম্পন্ন করিল।

সুহাস কৌতুহল-চিত্তে আবার বলিল "কি ভাই বল্—না ?"

কুমুদ গম্ভীরতা সহকারে (কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইত যে, সে গম্ভীরতার মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান নির্দ্দোষ চাতুরী বর্ত্তমান) বলিল—"তুমি ভাব আমি সব ঠাট্টা করি—তবে তাই আবার কেন আমার কথা শুন্‌ছ ?"

সুহাসের চক্ষু অমনি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল—সে কুমুদের হস্ত দুটী ধরিয়া বলিল—"কমু, ভাই রাগ ক'রেছ ?—আমি ঠাট্টা ক'রে ব'লেছিলাম—আর ব'লব না, তুমি এবার যা ব'লবে সব শুনব'।"

আর কি কুমুদের গম্ভীরতা থাকে ? সে সুহাসের গলা জড়াইয়া সস্নেহে বলিল। "সুহাস তোর উপর কি রাগ করতে পারি—তোর ভাই একটুতেই চোকে জল আসে—আমি ত তোর উপর রাগ করিনি ?"

"তবে অমন ক'রে ব'ল্‌লে কেন ?"

কুমুদ হাসিয়া বলিল "দেখিতেছিলাম যে তুমি কি কর।"

"তুমি কি কথা শুনিয়াছ বল ?"

"কি কথা আবার শুনিয়াছি ?"

"এই যে এইমাত্র বল্‌ছিলে যে ?"

"কি কথা আমার ত' মনে নাই ?"

সুহাস হাসিয়া বলিল "এই যে ব'লছিলে ?"

"আচ্ছা তুই কথাটাই বল্ না।"

"কথাটা ব'লব——'এই যে তুমি ব'লছিলে'।"

"'এই যে তুমি ব'লছিলে'—কি ?—কথাটাই বল না ?"

"এই প্রমো——"

কুমুদ বলিল—"ওঃ—প্রমোদ দাদার কথা ?—নাম্‌টা উচ্চারণ ক'র্‌তেও বুঝি লজ্জা করে—আচ্ছা সত্যি ক'রে বল্ দেখি দিনের মধ্যে মনে মনে কত বার প্রমোদ দাদার নাম করিস্—তুই আমার কাছেও লজ্জা ক'র্‌বি ?"

কুমু। "কথাটা শোন্‌বার জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌ছিস্—না ? তবে শোন্—কারণ তোর সঙ্গে প্রমোদের বিবাহ হবে। শুনে বাঁচ্‌লে ত ?"

"আমি তোমার সঙ্গে কথায় পারি না—অথচ কেন যে সব কথা জিজ্ঞাসা করি তাহা জানি না।"

সুহাস অনেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কুমুদের কাছে প্রমোদের নাম পর্য্যন্ত করিবে না। কারণ সে দেখিত যে কুমুদ প্রমোদ-সম্বন্ধে কোন কথা পাইলেই তাহাকে ঠাট্টার বাণে জর্জ্জরিত করিত। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা থাকে কই ? সে যত পলায়ন করিতে চাহে—কুমুদ তত তাহাকে ধরিয়া আনে।

কুমুদ হাসিয়া বলিল—"কাল না হয় একদিন ত হবে চল—এখন ঘরে যাই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুহাস ও প্রমোদ।

"Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly
Never met or never granted.
We had never been broken hearted.

Burns.

অসীম দিগন্ত-ব্যাপী সুনীল আকাশে স্বর্ণালোক বিস্তার করিয়া পূর্ণিমার চন্দ্র হাসিতেছে। চন্দ্রকে গগনে দেখিয়া কুমুদিনী সোহাগ-ভরে হাসিয়া উঠিল। দুঃখে ঈর্ষায় সরোজিনী সরোবর কোলে ঢলিয়া পড়িল—লম্পট ভ্রমর, সরোজিনীর ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে প্রফুল্লিত করিবার মানসে 'নলিনীবালা—মুখ তোল'—'নলিনীবালা মুখ তোল' বলিয়া গুণ্ গুণ্ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা-বায়ু বৃক্ষসমূহ দোলাইয়া সরোজিনীর দুঃখ বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। এমন সময় সুহাসিনী জমীদারের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে। চন্দ্রের স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ তাহার মুখের উপর পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখ অধিকতর সুন্দর করিয়াছে। সন্ধ্যা-বায়ু বালিকার রেশম-বিনিন্দিত অযত্নরক্ষিত ইতঃস্তত-বিক্ষিপ্ত কৃষ্ণ-অলকাবলী লইয়া কেমন ক্রীড়া করিতেছে, সুহাসের মালা গাঁথা শেষ হইল। সে মালা ছড়াটী রাখিয়া চন্দ্রের প্রতি চাহিল, হঠাৎ কে পশ্চাতে তাহার চক্ষু আবরণ করিল। সুহাস স্বীয় হস্ত দ্বারা আবরণকারীর হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিল—'কুম';—হস্ত উঠিল না; 'হেমাঙ্গিনী' তথাপি হাত উঠিল না। সুশীলা, সরলা, বিমলা, গিরিবালা, কুসুম কত নাম করিল—কিন্তু তথাপিও হস্ত উঠিল না। আর একটী প্রিয় নাম সুহাসের মনে হইল কিন্তু মুখে ফুটিল না। সুহাস অবশেষে বলিল—"আমি বলিতে পারিলাম না" আবরণ-কারী চক্ষু পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে সুহাসের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "সুহাস বলিতে পারিলেনা।"

সুহাস দেখিল "প্রমোদ"—বালিকার মুখ লজ্জায় রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল, সে মুখ-নত করিয়া বলিল,—"তুমি তা আমি কেমন করিয়া জানিব।"

প্রমোদ বলিলেন তুমি আমার হস্ত-স্পর্শ করিয়াও বলিতে পারিলে না?—তুমি আমায় ভালবাস না।"

সুহাস শান্ত চক্ষু দুটী ধীরে ধীরে তুলিয়া প্রমোদের প্রতি চাহিল—সে দৃষ্টি যেন প্রমোদকে বলিল "প্রমোদ, ও কথা বলিও না—ও কথা শুনিলে হৃদয়ে বড় আঘাত লাগে। যদি হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইত—তাহা হইলে দেখাইতাম কাহার দেব আকৃতি হৃদয়-মধ্যে জাগিতেছে—দিবারাত্র কাহার দেব মূর্ত্তি আলোচনা করিয়া বালিকার জীবন কাটিতেছে। প্রমোদ তুমি এরূপ অন্যায় সন্দেহ করিও না।"

প্রমোদ ও যেন সে দৃষ্টির ভাব বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন—তিনি বলিলেন "সুহাস আমাদের মধ্যে কাহার ভালবাসা অধিক ?" বালিকার অধরে ঈষৎ হাস্যের দেখা দিল, উজ্জ্বল চক্ষু দুটী অধিকতর উজ্জ্বল হইল—সে ধীরে ধীরে বলিল "আমার।" প্রমোদ নিকটস্থ গোলাপ-বৃক্ষের দুইটী ফুল তুলিয়া বলিলেন—"সুহাস, আজ আমি পরীক্ষা করিব—আমাদের মধ্যে কাহার ভালবাসা অধিক—তুমি এই ফুলটী ধর—আমরা এই দুইটী ফুল পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দিব, যাহার ফুল অগ্রে তটে লাগিবে তাহার ভালবাসা অধিক বলিয়া গণ্য হইবে। অনন্তর উভয়ে পুষ্প দুটী ভাসাইয়া দিলেন। সোহাগের পুষ্প সোহাগভরে জলের হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া চলিল। ওই দেখ সুহাসের মুখ, বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল—নয়ন দুটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল—প্রমোদের পুষ্প তাহার পুষ্পের গতি অতিক্রম করিয়াছে। হে পবন! প্রমোদের পুষ্পের গতি ফিরাও—দেবতাগো আমার পুষ্প অগ্রে তটে লাগাও। দেবতা বোধ হয় সুহাসের প্রার্থনা শুনিলেন—প্রমোদের পুষ্প একটী কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইল—সুহাসের পুষ্প মৃদুগতিতে অগ্রে তটে লাগিল। প্রমোদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সুহাস তোমার ভালবাসাই অধিক।" সে প্রমোদকে ভাল; বাসে, একথা শুনিতে বালিকা বড় ভালবাসে আজ প্রমোদের সম্মুখে একথা শুনিয়া বালিকা-হৃদয় হর্ষে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সুহাস হাসিয়া বলিল "তুমি এই মাত্র বলিলে আমি তোমায় ভালবাসি না।" প্রমোদ হাসিতে লাগিলেন। সুহাস বলিল—"এতক্ষণ কথায় কথায় মালার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

প্রমোদ বলিল—"কি মালা সুহাস ?"

সুহাস উত্তরে বলিল "তোমাকে দিব বলিয়া" এক ছড়া মালা গাঁথিয়াছি—তুমি আমায় সে দিন একছড়া মালা দিয়াছিলে—আমি আজ তোমায় এই মালা দিলাম।" এই বলিয়া সুহাস মালাছড়াটী প্রমোদের গলায় পরাইয়া দিলেন। বালিকা—সরলা সে কি বলিল, তাহা জানে না।

প্রমোদ বলিলেন "সুহাস আমার সহিত কি মাল্য পরিবর্ত্তন করিলে ?"

বালিকা লজ্জায় মুখনত করিয়া বলিল—

"তোমায় মালা পরিলে বড় সুন্দর দেখায়—আমাদের বাগানে যদি ফুল ফুটিত তাহা হইলে তোমায় প্রত্যহ একছড়া করিয়া গাঁথিয়া দিতাম।"

প্রমোদ উত্তর করিল—তুমি সুহাস!—সকলেই তোমার মত দেখ—তোমার স্নেহ অসীম। জগদীশ! এমন কি পুণ্য

করিয়াছি, যে এই দেবীললনাকে হৃদয়ে ধারণ করিব ?

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিবর্ত্তন অতীব আশ্চর্য্য—এই যাহাকে সুখে হাসিতে দেখিলাম, আবার তাহাকে দুঃখে কাঁদিতে দেখিতেছি। যে পূর্ণিমার চন্দ্র এতক্ষণ রজত মাখান বিমল-কিরণে জগতকে মাতাইয়া, আপনি সুখে হাসিতেছিল, একখণ্ড কাল মেঘ আসিয়া তাহাকে আবৃত করিল—মুহূর্ত্তের নিমিত্ত প্রকৃতির শোভা বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। আবার যে প্রমোদ এতক্ষণ 'মনের মানুষের' সঙ্গে কথোপকথন করিয়া মর্ত্ত্যে বসিয়া স্বর্গীয় সুখ কল্পনা করিতেছিল—তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল—তিনি দুঃখ-ক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন—

"সুহাস! অনেক দিন হইতে তোমাকে একটী কথা বলিব বলিয়া মনে করিতেছি, অনেক সময় বলি বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই কিন্তু আজ বলিব।" প্রমোদের এইরূপ ব্যাকুল স্বর শুনিয়া বালিকা উদ্বিগ্ন-স্বরে বলিল "প্রমোদ—কি কথা প্রমোদ ?"

প্রমোদ মুখ নত করিয়া বলিলেন—"সুহাস! তোমায় যখন প্রথম ভালবাসি তখন তাহার পরিণাম ভাবি নাই—কিন্তু এখন তাহার পরিণাম বুঝিয়াছি—আমায় জন্মের মত বোধ হয় হরিপুর ত্যাগ করিতে হইবে। সুহাস! তোমার পিতা কোন এক জমীদার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন—আমার সুহাস—তুমি—আর "আমার" হইবে না। তোমার দাদা আমায় প্রাণের সহিত ভালবাসেন ; যাহাতে তোমার সহিত আমার বিবাহ হয়—তাহার জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান্—কিন্তু তোমার পিতা কি ইহাতে সম্মত হইবেন? সুহাস! তোমার পিতা সদাশয়, দয়ালু তিনি দরিদ্র অনাথ যুবক দেখিয়া পুত্রের ন্যায় পালন করিতেছেন। ইহার অধিক আর কি করিবেন ?—অজ্ঞাত কুলশীল দরিদ্র পুত্রের হস্তে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করিয়া আপন পবিত্রকুলে কলঙ্ক অর্পণ করিবেন ? না—তিনি তাহা কখনই পারিবেন না, তাই' বলি সুহাস! আমার এ দুরাশা কখন পূর্ণ হইবে না—আমি জন্মের মত হরিপুর পরিত্যাগ করিব"। একথায় বালিকা-হৃদয়ে যে কি আঘাত লাগিল তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য।

বালিকা শিশুর ন্যায় প্রমোদের চক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। "প্রমোদও সুহাসের হইবেনা, সুহাসও প্রমোদের হইবে না" এই চিন্তা বালিকার পক্ষে অসহনীয়।

প্রমোদ স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা সুহাসের অশ্রু মুছাইয়া দিল—(কিন্তু অগত্যা আপনার চক্ষে জল আসিল) অনেক কষ্টে বলিলেন "সুহাস! কাঁদিও না—তোমার পিতার কথার উপর সব নির্ভর করিতেছে—অনেক রাত্রি হইয়াছে চল এখন ঘরে যাই।" উভয়ে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। সে রাত্রে উভয়ে কেহ নিদ্রা যায় নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে সুহাসের সিক্ত শয্যা দেখিয়া কুমুদ বলিল "সুহাস! তোর বিছানা ভিজে কেন ?"

সুহাস কিয়ৎকাল ইতস্তত করিয়া বলিল "রাত্রিতে জল খাইয়াছিলাম—তাই বোধ হয়

পড়িয়া থাকিবে। সত্যই সে রাত্রিতে জল পান করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে শয্যায় জল পড়িয়াছিল কিনা আমরা অত সত দেখিনি। আমরা লুকাইয়া কেবল এই দেখিয়াছি— সুহাস—রমস্ত রাত্রি উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিল।

তুমি কি আমার?

(১)

"তুমি কি আমার?"
পারিব না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে তারে,
এত অবিশ্বাস হায়
কেমনে করিব তায়,
না হয় সে একেবারে ভুলিবে আমারে;
পারিব না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে তারে!

(২)

জিজ্ঞাসিব? কিসে প্রশ্ন?—গ্রীবাভঙ্গি তার
দেখিব দূরের কথা—
স্মরিতে সে বিদ্যুল্লতা—
আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে হৃদয় আমার!
—সরল গরিমাময় গ্রীবাভঙ্গি তার!

(৩)

সরল গরিমাময় দৃষ্টি অপলক,
সরলতা ছানা মাখা—
গরিমা গোপনে ঢাকা;—
(সরলতা—পাপ চক্ষে বড় ভয়ানক!)
গর্জ্জিবে কোমল কণ্ঠে "বিশ্বাস-ঘাতক!
তুমি কর অবিশ্বাস?
সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!
প্রেম পারিজাত পুষ্প প্রাণ সংহারক?
তুমি কর অবিশ্বাস—বিশ্বাস-ঘাতক?"

(৪)

উঃ কি ভয়ানক প্রশ্ন!—অসাধ্য আমার;—
জীবন্ত প্রাণটী ধরি
দয়া মায়া পরিহরি
আকণ্ঠ ছুরিকাঘাতে করিব বিদার?
পারিবনা জিজ্ঞাসিতে "তুমি কি আমার?"

(৫)

পারিব না জিজ্ঞাসিতে;
এত কি নিষ্ঠুর আমি——এত কি কঠিন?
সে নয়নে—সে আননে,
চাহিয়া তাহার পানে
এত কি রাক্ষস আমি দয়া মায়া হীন,—
জিজ্ঞাসিব দেখিয়া সে নয়ন সুদীন?

(৬)

এই কি সে অপার্থিব প্রেম পুরস্কার?
অজানা লুকায়ে এসে
সরলা বালিকা বেশে
আদরে পরায়ে ছিল গলায় আমার;
এই না সে দিন হায় ভালবাসা তার?

(৭)

ভূত ভাগ্য সে মুহূর্ত্ত কত দূরতর,
অনন্ত সময় হায়,
অনন্ত গগন প্রায়,
জ্বলিছে সে দূর শূন্যে——কত মনোহর—
জীবনের ধ্রুব তারা উজলি অম্বর!

(৮)

হোক না সে শত বর্ষ——শত যুগান্তর
প্রেমের মুহূর্ত্তটীতে—
দেখিতে কি না দেখিতে
আঁখি পালটিতে যায় সহস্র বৎসর!

(৯)

নিবে নাই সেই জ্যোতি——তেমনি উজ্জ্বল,
দুর্ব্বহ জীবন-ভার
গাঢ় ঘন অন্ধকার
আশার আলোক কেন্দ্র——শত পুণ্যফল,
নিবে নাই সেই জ্যোতি তেমনি উজ্জ্বল!

(১০)

নিবিবে না সে মুহূর্ত্ত——নিবিবে না আর
আশায় সেবিব নিত্য
ভাঙ্গুক চুরুক চিত্ত
সহস্র সাহারা প্রাণ করুক্ অঙ্গার!——
জীবনের জ্যোতি বিন্দু——হাসি সরলার!

(১১)

সেই—
আশার আলোকবর্ত্তি——জীবন সম্বল
দিবানিশি সমভাবে—
দিন মাস যুগ যাবে—
হৃদয় শোণিত সেক করি অবিরল,
আশার আলোকবর্ত্তি রাখিব উজ্জ্বল!

(১২)

সেই—
সুন্দর সরলা-মূর্ত্তি——শারদ সন্ধ্যায়
কুটীরের দ্বারদেশে
বিমল রজত বেশে ;—
কি যেন অমিয় রাশি উছলিয়া যায়,
অজ্ঞাত কি জ্ঞাত সারে
জিজ্ঞাসিনু সরলারে
ভূতলে নে'মেছে শশি! কত তপস্যায়?
আদরে ধরিল প্রিয়া হাসিয়া গলায়!

(১৩)

কি সুন্দর প্রত্যুত্তর,——আপনি উত্তর!
অপূর্ণ মানব ভাষা
নাহি পুরাইত আশা,
চতুর্ম্মুখে চতুর্ম্মুখ—পঞ্চ মুখে হর
পরিপূর্ণ দেব ভাষা দিত এ উত্তর?

(১৪)

আপনি উত্তরময়ী গলায় আমার
কি যেন মাহেন্দ্র ক্ষণে
শুভলগ্ন পরশনে,
জিজ্ঞাসিনু শুভ প্রশ্ন, পাইলাম তার
জীবন্ত উত্তর ওই গলায় আমার!

(১৫)

আজি কি না, সেই আমি—সে মুহূর্ত্ত হায়,
হইয়া পাষাণ হিয়া ;—
সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ;—
যে কালে সোণার চাঁদ হাতে পাওয়া যায়?
কি সে ভুলি সে মুহূর্ত্ত? তাকি ভোলা যায়,

(১৬)

পারিব না জিজ্ঞাসিতে ;
ডাকে সে অন্যেরে যদি আমার সাক্ষাতে

ডাকে যদি "প্রাণনাথ!"
হয় যেন বজ্রপাত!
দেখাব হৃদয় চিরি আছে কিনা তাতে
বিনিময়ে "অবিশ্বাস",—দেখাব সাক্ষাতে!
(১৭)
তথাপি কস্মিন্ কালে হবে না আমার,
জিজ্ঞাসা ও সরলারে
"বল ভালবাস কারে"
হাতখানি হাতে নিয়ে হেম চন্দ্রমার—
"বল প্রিয়তমে! প্রাণ! তুমি কি আমার?"

শ্রী—

শৈল-শৃঙ্গে।

(চন্দ্রগ্রহণের দিবস লিখিত।)

দেখিনু ভূধর শৃঙ্গে দুই নেত্র মেলিয়া:—
পূর্ণিমা রজনী আজ
নীলে ভাসে দ্বিজরাজ
মাধুরী, সৌন্দর্য্যময়ী বর অঙ্গে মাখিয়া;
গিরিশৃঙ্গ, নদী জল,
তরু, লতা, তৃণ দল,
কুটীর, প্রাসাদ যায় জোছনায় ভাসিয়া;
দেখিনু ভূধর শিরে নেত্র যুগ খুলিয়া।
শান্ত শৈল কলেবরে
মৃদু প্রস্রবণ ঝরে—
স্নিগ্ধ করি অঙ্গ তার——চাঁদিনীরে ধরিয়া।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড ময়
সকলি ঘুমায়ে রয়,
কেবল চকোর উচ্চে চাঁদে ডাকে হাঁকিয়া;
তরুকোলে ঝিল্লী কাঁদে ঝিঁ ঝিঁ রব তুলিয়া।
বিধুর কিরণ জালে
হীনতেজা তারা মালে
গগন মণ্ডল জুড়ি চন্দ্রমারে বেড়িয়া;
উন্নত ভূধর শৃঙ্গে দেখিনুরে চাহিয়া।
আকাশ কানন জলে,
অচল অবনী তলে
মানব, বিহগ জীব অচেতনে ঘুমিয়া।
কুসুম সুরভি ময়
মেদুর সমীর বয়
তরু, লতা, পাতা, ফুল উঠে মৃদু নাচিয়া।
প্রেমাদরে মৃদুলাজে
প্রকৃতি কানন মাঝে
পূজিছে রজনী রাজে ফুল রাশি ঢালিয়া;—
তা দেখি পাদপ যত
করি শির অবনত
সমাদরে উপহারে মুক্তারাশি অর্পিয়া;
শশীর কিরণ লয়ে
সুনীলে উধাও হয়ে
শ্বেত-বর্ণ মেঘ খণ্ড যাইতেছে ধাইয়া।
নীরব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
কালের নিনাদ বাজে
দ্রুত বেগে পুন যায় স্বভাবতে মিশিয়া;
দাঁড়ায়ে পাষাণ-স্তূপে দেখিনুরে চাহিয়া;
গগনে ভীষণ কায়,
সর্ব্বাঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ধায়
বিভীষণ মূর্ত্তি এক ভীম তেজ ধরিয়া,
আসিছে উল্কার প্রায়

চন্দ্রমা, নক্ষত্র তায়
গগন মণ্ডল উঠে ঘর ঘরে কাঁপিয়া;
যুগল সে চক্ষু ফুটে
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ ছুটে;
বদন ব্যাদান করি. ভীম রবে গর্জ্জিয়া;
বিপুল সে বেগবতী
ধাইছে প্রচণ্ড গতি
লক্ষ্য করি পূর্ণ চাঁদে—নভোতল দলিয়া;
সহস্র অশনি যদি
ভীমনাদে নিরবধি
ফাটায় গগন, গিরি—এ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া,—
তাতেও নীরব নয়
এমনি ভৈরব হয়
প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত—অনম্বর ছাইয়া;
মুহূর্ত্তে পরিধিতলে
পশিয়া প্রচণ্ড বলে
ফেলিল রে ওই দেখ পূর্ণচাঁদে গিলিয়া;
যেন কাল সর্ব্বনাশী
ব্রহ্মাণ্ডে মণ্ডলে আসি
প্রলয়ে সংহার করে হুহুঙ্কার ছাড়িয়া;
ভীম মূর্ত্তি, ভীম বাহু
বিষম দুর্দ্দান্ত রাহু
গ্রাসিল চাঁদেরে আজ দীপ্ত তেজে আসিয়া;
গভীর তিমিরে গেল চরাচর মিলিয়া।
সে ভীষণ অভিনয়
নেহারিয়ে তারাচয়
একে একে নভোতলে গেল সব নিবিয়া;
দেখিনু আকাশ মাঝে বিভীষিকা চাহিয়া।
অমনি ধরণী তলে
জীব জন্তু জল স্থলে
নরকুল কোলাহলে উঠিল রে জাগিয়া;
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশা ঘোর
ভুবন করিল ভোর,
খেদাইতে দুষ্ট গ্রহে চারু চন্দ্রে ত্যজিয়া
কালান্তক কাল এলে
যা কিছু এ ধরাতলে
দারুণ কালের চক্রে যায় সব গুঁড়িয়া।
স্বাধীন—আকাশে বসি
উজ্জ্বল ভারত শশী
ছিল একদিন হায়!—এবে রাহু গ্রাসিয়া।
দেখিনু ভূধর শৃঙ্গে দুই নেত্র মেলিয়া।

নিঠুরা আমার।

জীবন জটিল পথে কেন দেখা দিলে
নিঠুরা আমার!
বিনোদিনী বেশে ধনি আগে মন নিলে
পরে কেন হেন ব্যবহার!
নিলে মন দিতে হয়,
ব্যথা দেওয়া বিধি নয়,
বিপরীত অনুচিত কেন লো তোমার?
বুঝেছি বুঝেছি চিতে,
ভালবাস দুঃখ দিতে,
ভালবাস কি না বাস শুনি একবার;
কাঁদাতে কাঁদাতে যথা নিঠুরা আমার।

শ্রী অঃ

রাবণ-বধ। *

সাহিত্য-সংসারে রামায়ণ, মহাভারতের ধন লইয়া অনেকে ধনী—কত লক্ষ বৎসর অতীত হইল প্রকৃতির শিশু বাল্মীকি স্বীয় বীণা লইয়া যে গান গাহিয়াছিল; আজ সেই গান ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতার কণ্ঠস্থ। সেই রামায়ণ শুনিতে শুনিতে মানুষের মন কখন শিহরিয়া উঠে—কখন কাঁদিয়া উঠে—কখন আহ্লাদে নাচে। পাপী তাহার শাস্তি-দণ্ড সম্মুখে বিদ্যমান দেখে—ধার্ম্মিক ধর্ম্মের মোক্ষফল সম্মুখে ধরিয়া স্থির-নয়নে জাগতিক আশ্চর্য্য মায়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংসার শিক্ষা লাভ করে। আমাদের পরিচিত প্রসিদ্ধ অভিনেতা বাবু গিরীশ চন্দ্র ঘোষ সেই অতুল ভাণ্ডার হইতে কিছু ধন সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান। যে ধন-ভাণ্ডারের স্বল্প মাত্র ধন লইয়া কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস—মাইকেল চিরস্মরণীয় সেই কুবেরের ভাণ্ডার হইতে গিরীশ বাবু কিছু ধন সংগ্রহ করিয়া, কিছু চাকৃচিক্যশালিতা বৃদ্ধি করিয়া, অত না পারেন কিছু মাত্র যশের আশা করেন। এবং তিনি তাহার পাত্রও বটে—কেন না বাঙ্গালায় কবি নাই।

গিরীশ বাবু এই পুস্তক খানিকে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত নাটকাকারে "ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে" লিখিয়াছেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম বাঙ্গালা-কবিতা লিখিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার পদগুলি চৌদ্দ অক্ষরের কম হয় নাই—গিরীশ বাবু তাহার ব্যত্যয় করিয়া অক্ষর না গুণিয়া লিখিয়াছেন, পাঠকদিগের জ্ঞাপনার্থে নিম্নে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।——

রাবণ। "হে শুক শারণ, কর অন্বেষণ,
নিরানন্দ বৈরীবৃন্দ,
কি হেতু গর্জ্জিল অকস্মাৎ?
আদ্যাশক্তি তুষ্টা মম স্তবে,
তবে কি শক্তি প্রভাবে,
আসিছে রাঘব, পুন পশিতে আহবে?

যদিও এইরূপ ভাবে কবিতা লেখা নূতন—কিন্তু ইহাতে কিছু কি লালিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে? আমরা কেবল দেখিতে পাই মুদ্রাকরদিগের সুবিধা। বোধ হয় এবার হইতে এই প্রণালীতে অনেকে কবিতা লিখিবেন—কেননা তাঁহাদের আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া চৌদ্দ অক্ষর গুণিতে হইবে না।

তাহার পর গিরীশ বাবুর গুণপনা। কবি কাহাকে বলে?—যিনি কাঁদাইতে পারেন, হাসাইতে পারেন, ভয় দেখান, যাঁহার রচনাচাতুর্য্যে মানব অমোঘ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—তিনিই কবি। আমি বলিলাম "মিথ্যা কথা কহা উচিত নহে।"—ইহা অনেকের উপকারের কথা সত্য বটে—কিন্তু তাহা কর্ণমূলে প্রবেশ করিয়াও প্রবেশ করে না——সেই কথাটী আমার অসীম ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রের জলবুদ্বুদ্ মাত্র—উচ্চারিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হইল। কিন্তু কবি সে

* রাবণবধ—শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। (ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত) শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রপলিটান যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা।

রূপ ভাবে উপদেশ দেন না—তাঁহার চিত্র-পটের সময়োচিত রঙ্গ করার গুণে—পাপীর সম্মুখে ধার্ম্মিককে স্থাপন করিয়া পাপীর দণ্ড ও শেষোক্তের পুরস্কার দ্বারা এরূপ ভাবে জগৎকে অমোঘ শিক্ষা দেন, যে পাপী পড়িবা মাত্র তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে, —তাহার হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে—সে ভয়ে ত্রস্তে সরিয়া দাঁড়ায়। সেই কবির গুণে অসচ্চরিত্র সাধু হয়—সেই জন্য আজ আমাদের দেশে রামায়ণের এত আদর। সামান্য দোকানদার পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া—রাবণের প্রতি কোপ ও রামের প্রতি সহানুভূতির অশ্রুপাত করে। আজ গিরীশ বাবুকে সে পরিশ্রম করিতে হয় নাই—তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র গুণপনা নাই—তাহাতে তিনি নির্ধন—কেননা তিনি পরধনের সুদ লইতে অগ্রসর।

রাবণ মেঘনাদ-শোকে উন্মত্ত হইয়া রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন—তিনি রণোন্মাদকতায় মত্ত হইয়া বিপ্লব-আহবে আহুতি দিবেন বলিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা দিতেছেন; এমন সময় মন্দোদরী সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন——

কটাক্ষে ঈক্ষণ কর প্রাণনাথ দাসীপ্রতি!
কোথা যাও ত্যজি পদাশ্রিতে ?"

ইহার পূর্ব্বে রাবণের জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা দিবার সময় আমরা মন্দোদরীকে এরূপ জঘন্য ভাবে সম্বোধন করিতে শুনিব না বেশ আশা করিয়াছিলাম। এখানে মন্দোদরীকে দেখিয়া আমাদের যথার্থই নাট্যশালার অভিনেত্রী বীরাঙ্গনাদিগকে মনে পড়ে!—গ্রন্থকারের এরূপ দোষ কোন মতেই পরিহার্য্য নহে। তিনি এখানে মন্দোদরীকে কলির মন্দোদরী করিয়া ফেলিয়াছেন!

পূর্ব্বোক্ত পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত কবিতার পর রাবণের সহিত মন্দোদরীর যে ভাবে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;———

রাবণ। রাণী মন্দোদরি! নহে বীরাঙ্গণারীতি এই——

মন্দোদরী। নাথ! নহি রাণী, নহি বীরাঙ্গণা;——
ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন;
সার মাত্র তোমার চরণসেবা।
সতী নারী আমি অধিক না জানি,
অধিক না চাহি আর;
চল, বিজন বিপিনে ভিখারীর বেশে—
ত্যজিও দাসীরে সেই দিন,
যদি কভু যাচি রাজ্যসুখ।

রাবণ। সতী তুমি পতিসেবা তব ব্রত,
তবে কি কারণে আজি নিবার আমারে ?
বহুদিন অলস এ ভুজ,
রণোল্লাস বহুদিন আছি ভুলে,
সৃজিয়াছ তুমি রণ-ক্রীড়া তুষিতে আমার মন।
দিবানিশি, শয়নে স্বপনে,
রণসাধ বিনা নাহি অন্য সাধ রাণি!
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন ভ্রমিয়াছি আমি রণ সাধে;
তুল্য মিলেছে ঘরের দ্বারে।

মন্দোদরী। নাথ!
কি কারণে বিক্রমের পরিচয় আজি ?
যবে দিগ্বিজয়ে করেছ গমন,

পড়িয়া মঙ্গল সাজায়েছি সহস্তে তোমায় ;
অশ্রুবিন্দু হেরনি নয়নে !
নহে সাধারণ অরি জটাধারী রাম—
শুনেছি রাক্ষসবংশ ধ্বংসের কারণ
অবনীতে অবতীর্ণ আপনি গোলকপতি—
নহে কার প্রাণে বানর সহায়ে
আসিত জিনিতে ইন্দ্রজিতে ?
হেরি কুম্ভকর্ণ বীরে থাকিত সমরে স্থির ?
পেয়ে সমর-আরতি দম্ভে পশিল সংগ্রামে
ভুবন বিজয়ী বীরবৃন্দ সিংহনাদে,
সুরবৃন্দ চলিল গগনে,
পদভরে নড়িল বাসুকি-শির—
কিন্তু হায় দারুণ রামের বাণ—
প্রাণ ল'য়ে কেহ না আইল ফিরে !
রণে যেই যায় আর নাহি দেখি তায়,
তাই নাথ কাঁদে পোড়া প্রাণ ?
নহি বীরাঙ্গণা আমি,
অবোধ অধীনী নারী রাবণের দাসী ;
এ হ'তে অধিক পরিচয় নাহি আর মম।
পড়িয়াছে অক্ষয় কুমার, ইন্দ্রজিত ;
ভুলিয়াছি সে দারুণ জ্বালা
তোমার চরণ সেবি।
ভুবন বিজয়ী তুমি নাথ, তব স্বেচ্ছাধীনী আমি ;
তবু কোন বাঞ্ছা ও পদে
করে নাই কভু রাণী মন্দোদরী !
ভাসি নয়নের জলে পড়ি পদ তলে,
যাচি, সাপিনী রূপিণী সীতা।
রাজধর্ম্মে সুপণ্ডিত তুমি।
নাহি লাজ রমণীর যাচিতে প্রণয়,
সতীর সর্ব্বস্ব ধন পতির নিকটে।
তোমার কৃপায় লঙ্কার ঈশ্বরী আমি,
সুন্দরী রমণী—
আমার সম্মুখে কি হেতু অশোক বনে ?"

যথার্থ বীরাঙ্গণার কথা !—পুর্ব্বের কয়েকটী কথার দোষ কেবল বলিবার ধরণে—আসল কথায় নহে। মানুষ হাজার সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচয় দিক্ না কেন তাহার কথার ভঙ্গিমাতে সব ধরা পড়িয়া যায় ! গিরীশ বাবু মন্দো-দরীর মুখ হইতে ঐ কথাটী বর্ত্তমান ধরণে বাহির করায়—মন্দোদরীকে কপটী বলিয়া আমাদের সন্দেহ থাকিয়া গেল এবং তাহার রাবণের প্রতি শেষের উক্তির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারিলাম না। কিন্তু গিরীশ বাবু পরিচয় দিবার অগ্রে আমরা মন্দোদরীকে চিনি—তাহাকে যথার্থ পতিব্রতা রমণী ও রমণী চরিত্রের আদর্শ বলিয়া জানি, তাই গিরীশ বাবুর পরিচয়ে আমাদের সন্দেহ জন্মিল।

গিরীশ বাবু আরও দুই এক যায়গায় এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—মন্দির সম্মুখে হনুমানকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে সমালোচ্য পুস্তকে দেখিলে বোধ হয় বর্ত্তমানকালের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের রসিকতাটা কিছু আধু-নিক থিয়েটরের গোছ বোধ হইল—যথা—

"বেটীর নাকের কিবা খাঁজ,
চ'লে যায় তিন খানা জাহাজ,
অমন-মুখে পড়ে না বাজ
আমায় বলিস্ বুড়ো।"

যাহা হউক গিরীশ বাবুকে আমরা সত্যের অনুরোধে কয়েকটী কথা বলিলাম—তাহাতে তাঁহার রাগ করিবার বিষয় নাই। তবে অভিনয় দর্শন করিলে এই সকল দোষ তত ধরা যায় না। কারণ যাঁহারা থিয়েটরে যান—কেবল বাহ্যিক ভাবভঙ্গী দেখিতে—

অন্তরে তলাইয়া বোঝেন না। এই দোষ গুলি না থাকিলে গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে আমরা তাঁহার রচনা চাতুর্য্যে মোহিত হইয়াছি—এই পুস্তক খানি তাঁহার প্রথম উদ্যম—ভবিষ্যতে এই দোষ গুলি সংশোধিত হইলে; এক খানি বিশুদ্ধকাব্য তাঁহার হস্তে দেখিতে ইচ্ছা করি। কারণ কালে তাঁহার প্রতিভা উদ্দীপিত হইয়া ভাল কবির আসন গ্রহণ করিতে পারে—আমাদের বিলক্ষণ আশা ভরসা আছে।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH ANNIVERSARY REPORT OF THE BURA BAZAR FAMILY LITERARY CLUB, Printed at the Calcutta Press. আমরা বিগত বর্ষে উক্ত রিপোর্টদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু অবকাশাভাবে এতাবৎ কাল উহার সমালোচনা করিয়া উঠিতে পারি নাই। তজ্জন্য উক্ত সভার সম্পাদকের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদ দাস মল্লিক মহাশয়ের যত্নে উহার বার্ষিক উৎসব সময়ে উৎকৃষ্ট ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হয়। অনেক বিজ্ঞ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহার সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত আছেন। আমরা আশা করি প্রসাদ দাস বাবু দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া, এরূপ দেশ হিতকর সদনুষ্ঠানে সময় অতিবাহিত করুন। প্রসাদ দাস বাবুকে এই হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া, আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

FOURTH ANNUAL REPORT OF THE INDIAN ASSOCIATION. (1179-1880). Printed and Published by Ram Kumar Dey, at the Bengalee Press. No. 33 Neogy pookur East Lane Taltolah.

শুভক্ষণে বঙ্গে সুরেণ ও আনন্দ মোহন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহে "ভারত সভা" দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। বঙ্গের মূক প্রজার হইয়া ক্রন্দন করে, এমন লোক অতি বিরল; তাই বিধাতা কৃপা করিয়া আনন্দ ও সুরেণকে বঙ্গে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারাই এখন বঙ্গের ভাবী উন্নতির পথ প্রদর্শক। উৎসাহের জ্বলন্ত ও তেজোময় বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া দরিদ্র প্রজার হইয়া রাজদ্বারে চীৎকার করিতেছেন। মুদ্রাযন্ত্র ও নিরস্ত্রকরণ আইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহারা মহতী সভা ও সমিতি আহ্বান করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার দ্বারে লালমোহনকে প্রেরণ করিলেন। যখন কয়েকটী মাত্র যুবক লইয়া উক্ত সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন কে ভাবিয়া ছিল, শেষে উক্ত সভা দ্বারা এরূপ গুরুতর ও আয়াসসাধ্য কার্য্যসমূহ সমাহিত হইবে। দেশে দেশে প্রতিনিধি পাঠাইয়া প্রজাগণের দুঃখ দূরকরণার্থে বদ্ধপরিকর হইয়া কত যে শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা আশা করি—উক্ত হিতৈষী মহাত্মদ্বয় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া উক্ত ভারত সভার উন্নতি করে

জীবন উৎসর্গিত করুন। দরিদ্র নিরক্ষর বঙ্গীয় প্রজার হইয়া যিনি এসময় একটু মাত্র সাহানুভূতি-সূচক অশ্রুপাত করিবেন, জগদীশ্বর তাঁহার মঙ্গল করিবেন। প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিবে।

ধর্ম্মবন্ধু—পাক্ষিক পত্রিকা। মূল্য এক পয়সা। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণকে সরল ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া। ইহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইতেছে। প্রবন্ধ গুলি ক্ষুদ্র হইলেও সুপাঠ্য। আমারা ইহার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

খোড়ার ডিম। খোস্ গল্প। নং ১
পাঁচ ঝাঁটা। ঐ। নং ৩

৩৭ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আমরা পুস্তিকাদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলাম, ইহা বুঝি বটতলার কোন বর পুত্রের অমৃত নিষ্যন্দিনী লেখনী প্রসূত, কিন্তু পাঠ করিবা মাত্র সে ভাব দূর হইল। দুই খানিই বর্ণ চোরা আঁব। নাম শুনিলে পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু যিনি একবার পাঠ করিবেন, তাঁহার উহা পুনঃ পাঠ করিতে ইচ্ছা হইবে। লেখকের স্বভাব বর্ণনায় বিশেষ ক্ষমতা আছে। সুললিত পদ্যে এরূপ উপদেশ পূর্ণ পুস্তক আমরা আদৌ দেখি নাই বলিয়া বোধ হয়। লেখক নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই। তিনি যে এক জন কবি, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা আরও এরূপ খোসগল্প শুনিবার আশায় বসিয়া রহিলাম। বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেরই এক ২ খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

The Indian Homoeopathic Review, a monthly journal of Homoeopathy and Collateral Sciences. Edited by B. L. Bhaduri L. M. S.

আমরা এই অভিনব হোমিওপ্যাথি বিষয়ক মাসিক পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম। পত্রিকা খানি দুই ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ইংরাজী প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালা প্রবন্ধ গুলি বেশ সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি ইচ্ছা করিতেছি।

বঙ্গবাসী। সপ্তাহিক সংবাদ পত্র, বরাট যন্ত্র হইতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দ্বারা প্রকাশিত। বঙ্গবাসী কয়েক দিন মাত্র সাহিত্য আসরে নামিয়াছেন। ইহার মধ্যে ইনি যেরূপ—উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা অনেক সংবাদপত্রের ভাগ্যে ঘটে না। বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ইহা অতি সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইতেছে। ইহাকে নির্ভীকতার সহিত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আন্দোলন জন্য লেখনী ধারণ করিতে দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার স্পষ্টবাদিতা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আমরা বঙ্গবাসীর উন্নতি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি।

গোপাল ভাঁড়। রহস্য-জনক মাসিক পত্র। শ্রীকিষণলাল বর্ম্মণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলুটলা ৮নং তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, গোপাল ভাঁড় কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। একে একে সমস্ত রহস্য-জনক পত্রগুলি অন্তর্হিত হইলেন। পঞ্চানন্দ, রসিকরাজ কিছুদিন লীলা খেলা করিয়া অনন্ত কাল কবলে নিমগ্ন হইলেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের ভয় হয়, পাছে গোপাল ভাঁড়ের ভাগ্যে তাই ঘটে। সম্পাদক মহাশয় যেন একটু বিশেষ যত্ন লয়েন, গোপাল ভাঁড়ের উদ্দেশ্য ভাল। কেবল ভাঁড়ামী করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা তাঁহার উদ্দ্যেশ্য নহে। সামাজিক কুনীতির নিরাকৃত করা, ইহার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা গোপাল ভাঁড়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে যেন বিবিধ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন। নিরবচ্ছিন্ন এক বিষয় লইয়া বকিলে পাঠকের বিরক্তি জন্মিবে। যাহাতে "গোপাল ভাঁড়" নাম সার্থক হয়, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয় সচেষ্ট থাকিবেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা। ইহার কলেবর বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। আমরা বামাবোধিনীকে আদর করি, কারণ বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন করা ইহার গূঢ় ও মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে ডিমাই আকারে বাহির হইত। এক্ষণে ৪ ফর্ম্মা রয়েল আকারে প্রকাশিত হইতেছে। একটী ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। ইহার ভাষার লালিত্যে ও বিবিধত্বে বিশেষ সন্তুষ্ট আছি। বামাবোধিনী দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে সময় অতিবাহিত করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ঋষিতত্ত্ব। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষাদি যুক্তি ও আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিকপত্র ও সমালোচনা। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সরস্বতী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। আমরা ডাক পিয়নের মাঃ এই পত্রিকা খানি পাইবা মাত্র "ঋষিতত্ত্ব" কথাটী মাত্র দেখিতে পাইলাম। পরে আগ্রহসহকারে মোড়ক খুলিলাম। খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। শেষে আশায় নৈরাশ হইলাম। প্রস্তাবের তালিকা বড় কম নয়, কিন্তু কার্য্যে তাহা নহে। পত্রিকার আকার রয়েল এক ফর্ম্মা। তালিকার আড়ম্বর বড় কম নয়। কিন্তু কার্য্যে কিছু নহে। প্রস্তাবগুলির ভাষা ভাল বলিয়া বোধ হইল না। একজন সরস্বতীর লেখনী হইতে এরূপ ভাষা নির্গত হওয়া বড় দুঃখের বিষয়। পত্রিকাখানি যাহাতে ভাল করিয়া চলে, তাহার জন্য সম্পাদকের চেষ্টা করা উচিত। ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কলেবর বৃদ্ধি করিয়া তালিক মত প্রবন্ধ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ এরূপ ছেলে খেলা কোন মতে উচিত নহে। মূল্য যথেষ্ট বেশী হইয়াছে। আমরা ঋষিতত্ত্বের পক্ষপাতী বলিয়া উপদেশ স্বরূপ এত কথা বলিলাম।

প্রেম রাজ্যে পরাধীনতা।

"কেন গো পরের করে   সুখের নির্ভর করে
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর।
সদাশিব সদানন্দ   সতী বিনা নিরানন্দ
শ্মশানে ভ্রমেণ ভোলা খেপা দিগম্বর॥"
সারদামঙ্গল।

মানুষ কি চায়? সে স্বাধীন হইয়া আমরণ অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, না পরাধীন হইয়া অপরের দাসত্ব করিতে চায়? ঐতিহাসিকগণ যাহাই বলুন না কেন, রাজনীতিজ্ঞ মনীষিগণ শাসন-তন্ত্র ও প্রজানীতির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মন দুঃখে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে হৃদয় ভেদী আর্ত্তস্বরে যাহাই বলুন না কেন, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি যে মানুষ পরাধীনতাতেই সুখী। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক আমি যে পরাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে অগ্রসর হইতেছি, সে পরাধীনতা, আর ব্রীটিস্ জাতির অধীনে বঙ্গজাতি ও পুরুষ জাতির অধীনে বঙ্গ নারীজাতির পরাধীনতা, দুইটী এক বস্তু নহে। একটীর উৎপত্তি স্ব-ইচ্ছা হইতে অন্যটীর উৎপত্তি পর-পীড়ন। এই জন্য এই দুইটীর নাম এক হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথমটী এই দুঃখপূর্ণ বিভীষিকাময় মর জগতেই দিব্য নন্দন কাননের সৃষ্টি করিয়া থাকে; দ্বিতীয়টী তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্যের সম্মুখে ক্রমিময় মল ক্লেদ পূর্ণ একটী নরক আনিয়া উপস্থিত করে; প্রথমটীর সৌন্দর্য্য অব্যক্ত, দ্বিতীয়টীর বীভৎস আকার অবর্ণনীয়; একটী সুখ ও আনন্দের প্রস্রবণ, অন্যটী দুঃখ ও নিরানন্দের কেন্দ্র-ভূমি। এই দুই রকমের দুইটী পরাধীনতা যিনি এক ও অভিন্ন বলিয়া ভাবিবেন, তিনি মহাভ্রমে পতিত হইবেন; এরূপ ব্যক্তি যদি অনুগ্রহ করিয়া এ প্রবন্ধটী পাঠ না করেন তাহা হইলে লেখক ও পাঠক উভয়েই পরম উপকৃত হইবেন।

যে ভালবাসা ইহ জগতের প্রাণ তাহা পরাধীনতার নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র। আত্ম বিক্রয় না করিয়া কে কবে প্রেমিক হইতে পারিয়াছে? স্বার্থ ও প্রেম, আলোক অন্ধকারের ন্যায় উভয়ে এক সময় এক স্থানে বাস করিতে পারে না। স্বার্থ কহে "দেখ আমি সারাটী দিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া আসিলাম, তোমার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য আমাকে কি পর্য্যন্তই না ক্লেশ স্বীকার করিতে হইতেছে, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, শীঘ্র আমার বিশ্রামের আয়োজন করিয়া দাও, ও তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার পদ সেবা করিতে থাক।" প্রেম বলে "আমি তোমাদের জন্য পরিশ্রম করিতে না পাইলে বড় কষ্ট অনুভব করি, তোমার কি করিতে হইবে বল আমি শীঘ্র তাহা সম্পাদন করিয়া দিই, তুমি বস আমি

খাটি।” স্বার্থ বলে “আমি পথ পর্য্যটনে কাতর হইয়া পড়িয়াছি, তুমি বসিয়া ব্যজন কর আমি তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাই।” প্রেম বলে ‘‘দেখিতেছি তুমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছ, তোমার শরীরে অত-ক্লেশ সহিবে না, আমি জাগিয়া থাকি, তুমি আমার বাহুতে মস্তক রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাও।” যে স্থলে স্বার্থ থাকে, প্রেম তথায় তিষ্ঠিতে পারে না, আবার প্রেম বিদ্যমানে স্বার্থের আগমনও অসম্ভব। প্রেম সমুদ্রে মগ্ন হইতে হইলে অগ্রে আমির আমিত্ব হারাইতে হয়। স্বার্থ-রজ্জু-বদ্ধ মন এ অমৃত সাগরের তলদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। আমিত্ব বিনাশ না করিয়া প্রেমিক হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আমিত্ব বন্ধনটী কাটিয়া না দিলে, প্রেমপারাবারে নিমগ্ন হওয়া যায় না। এই আমিত্ব বিনাশে যত সুখ, আমিত্ব বজায় রাখিয়া স্বাধীনতায় তত সুখ নহে। আমি শুধু মানবীয় পার্থিব প্রেমের কথা বলিতেছি না; যে দিকে নেত্র-পাত করিবে, দেখিবে প্রেমের দশা সর্ব্বত্রই এই রূপ। ঈষা বল, নানক বল, শাক্য মুনি বল, শ্রীগৌরাঙ্গ বল, ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার পদে সবাই আত্মবিক্রয় করিয়া নিজে ফকির হইয়াছেন।

আর স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক মহাত্মা যিনি “স্বাধীনতা” “স্বাধীনতা” শব্দে দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছেন, বাস্তবিক তিনিও কি পরাধীন নহেন? তিনি স্বদেশকে ভালবাসিয়া নিজের জন্য রাখিয়াছেন কি? তিনি বলেন “হে মাতঃ জন্মভূমি! তোমার মঙ্গলের জন্য কি করিব বল। আমাকে বলি-দান দিলে যদি তোমার মঙ্গল হয় আমি তাহাও করিব।” স্বাধীনচেতা প্রতাপসিংহ স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার জন্য কি নির্যাতনই না সহ্য করিয়া ছিলেন! সে সমুদয় স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। পুত্র কলত্রাদি লইয়া সারাটী দিন পরিশ্রম, ও পর্য্যটনের পর ক্ষুধায় কাতর ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া অরণ্যের এক নিভৃত প্রদেশে আসিয়া অর্দ্ধ দগ্ধ রুটী ভোজন করিতে বসিলেন। বন্য বিড়াল তাঁহার পুত্রের অর্দ্ধ উত্তোলিত হস্ত হইতে মুখের গ্রাস, সেই অর্দ্ধ দগ্ধ রুটী খানি কাড়িয়া লইয়া গেল; অপগণ্ড শিশু ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া উঠিল; প্রতাপ তাহা দেখিলেন, স্বদেশের মুখ পানে চাহিয়া তাহাও সহিলেন। তিনি স্বদেশ প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহার গোলাম হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সেই জগৎ-পূজ্য স্বদেশ-হিতৈষিতা ও দেবগণ-ঈপ্সিত স্বাধীনতার মধ্যে আমি সুস্পষ্টরূপে পরাধীনতার ছায়া দেখিতেছি। যিনি প্রেমের পদে আত্ম-বিক্রয় করিতে না পারিয়াছেন তিনি কি কখন এরূপ ক্লেশপরম্পরা অম্লান বদনে সহ্য করিতে সমর্থ হন? প্রতাপ ভাবিতেন, “আমি কে? মেওয়ার! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তোমার জন্য আমার মরণেও সুখ”। ইহা কি পরাধীনতা নহে? এরূপ অধীনতা কি আপাত শ্রুতিমধুর স্বাধীনতা অপেক্ষা নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠতর নহে? এ ভাব কি স্বর্গীয় ভাব নহে? মানব সাধারণের ইহা কি ঈপ্সিত ও বাঞ্ছিত সামগ্রী নহে? গল জাতি যবে রোম আক্রমণ করে, ইহার

দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। স্বদেশ-ভক্ত সিনেটরগণ রোমের আসন্ন বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া সেই যে ফোরমে স্থির হইয়া বসিলেন আর উঠিলেন না, তাহারা সকলেই শত্রু হস্তে নিহত হইলেন, তথাপি রোম ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন না। তাঁহারা স্বদেশ প্রেমের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে অষ্টে পৃষ্ঠে এমনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে সে স্থানের মায়া ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গমন করা তাঁহাদের সাধ্যের অতীত হইয়া পড়িয়াছিল। কোথায় তাঁহাদের স্বাধীনতা? কোথায় তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা? উইলিয়ম টেল্ বল, যোসেফ্ মেজিনী বল, উইলিয়ম ওয়ালেস্ বল আর রবার্টব্রুস্ই বল, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমে বদ্ধ হইয়া তাঁহারা কি পর্য্যন্তই না পরাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের জন্মভূমি যখন যাহা বলিয়াছেন তাঁহারা তখন তাহাই করিয়াছেন, উঠিতে বলিলে উঠিয়াছেন, বসিতে বলিলে বসিয়াছেন; *যাও যুদ্ধে যাও স্বদেশ প্রেমিক অমনি আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া রণ স্থলে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, গৃহে ফিরিয়া আইস, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন, আহার কর, করিলেন; আহার করিও না, করিলেন না। শত্রু আসিতেছে সংগ্রামে পারিবে না, লুকাইয়া থাক, তাহাই থাকিলেন, আমার জন্য প্রাণ দাও স্বদেশ-হিতৈষী তাহাতেই প্রস্তুত, ইহা অপেক্ষা আর পরাধীনতা কি হইতে পারে? পূর্ব্বে বলিয়াছি এরূপ অধীনতার উৎপত্তি-স্থান স্বাধীনতা, অত্যাচার বা পরপীড়ন নহে, তজ্জন্যই ইহা, মনুষ্যমাত্রেরই আদরের সামগ্রী। "স্বাধীনতার মধ্যে পরাধীনতা" কথাটা শুনিতে প্রথমতঃ কেমন কেমন বোধ হয় কিন্তু স্থির ভাবে এক বার চিন্তা করিলে দেখিবে ইহার অভ্যন্তরে একটী জ্বলন্ত সত্য নিহিত রহিয়াছে। প্রেম রাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যের মন সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর সে স্বাধীনতাটুকু থাকে না। কিন্তু একটা কথা এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল, পরাধীন হইলেই মনুষ্য প্রেমিক হয় না, কিন্তু প্রেমিক হইলে সে পরাধীন হইবেই হইবে, ইহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য।

প্রেম শুধু মানুষকে পরাধীন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তোলে, তাহার উত্তেজনায় তিনি আত্মহারা ও বাহ্য-জ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া নির্জীব পদার্থকেও সজীব জ্ঞান করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সংশাধন করিয়া লইতেও উদ্যত হন।*

রাম সীতার প্রণয়ের মধ্যে পরাধীনতার পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। সীতা স্বীয়

*Scots wha' ha' wi' Wallace bled,
Scot whom Bruce hath often led,
Welcome to your gory bed,
Or to glorious victory.

Burns.

* জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং।
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ॥
তেনার্থিত্বং ত্বয়িবিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং।
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে-লব্ধকামা॥

মেঘদূত।

স্বার্থ ও সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া প্রিয়তমের জন্য যে রূপ ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া ছিলেন তাহা কাহার অবিদিত নাই। আর রাম; তিনি কি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন?*

এক প্রেমেই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। এক দিকে পত্নী-প্রেম অন্য দিকে প্রজা-প্রেম, এক দিকে সীতার জন্য ব্যাকুলতা অন্য দিকে প্রজারঞ্জন ও প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য মনের কঠোরতা, এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে কি যন্ত্রণাই না সহ্য করিতে হইয়াছিল; তিনি তাঁহার নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে গিয়া জানকীকে জন্মের মত হারাইলেন, কিন্তু যে প্রেমরজ্জু তাঁহাকে জানকীর হৃদয়ের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা তিনি ইহ জন্মে ছিন্ন করিতে পারিলেন না।

রোমিও জুলিয়টের প্রণয়ের মধ্যে আগাগোড়া পরাধীনতা। রোমিও প্রেম প্ররোচনায় সুগভীর নিশীথে সহায়-হীন অবলম্বন-হীন হইয়া চোরের ন্যায় দস্যুর ন্যায় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নির্ভয়ে শত্রুপুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তিনি জুলিয়ট প্রেমে জ্ঞান হারা হইয়া নিজের আমিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। † পার্থিব কোন বস্তুই তাঁহার প্রেমের গতিরোধ করিতে পারিল না।

প্রেম আদ্যন্ত কেবল মাত্র পরাধীনতায় পরিপূর্ণ। যে প্রেম আত্মত্যাগ ও পরাধীনতায় পর্য্যবসিত না হয় সে প্রেম প্রেমই নহে, তাহা পাশব বৃত্তির নামান্তর মাত্র। হর পার্ব্বতীর প্রেমই যথার্থ প্রেম। ইহাই প্রেমের পূর্ণ আদর্শ। যে মহাদেব এক দিন হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরে বসিয়া, পার্থিব যাবতীয় সুখ সৌভাগ্য পাদদলিত করিয়া এক মনে এক প্রাণে যোগাসনে বসিয়াছিলেন, যাঁহার প্রশাসনে এক দিন "নিষ্কম্পং বৃক্ষং নিভৃতাদ্বিরেফং, মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারং; কাননমেব সর্ব্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে"; যিনি এক দিন স্বহস্তে কামের মূল পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে উৎপাটন করিয়া ছিলেন। তিনিও প্রেমের হস্তে পড়িয়া তাহার একটী

---

* ত্বয়াসহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিষু।
ইতিহারমতে বাসো স্নেহস্তস্যাঃ স তাদৃশঃ॥
অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃসৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তৎতস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥

উত্তররামচরিত।

† "But soft! what light through yonder window breaks.

It is the east and Juliet is the sun.
It is my lady O! it is my love.
O! that she knew she were.
She speaks, yet she says nothing; what of that?
Her eye discourses, I will answer it.
O! that I were a glove upon that hand.
That I might touch that cheek!
* * * * * *
Call me but love and I will be new baptised.
Henceforth I never will be Romeo,
With love's light wings I overperch these walls.
For stony limits cannot hold out love."

Romeo and Juliet.

ক্ষুদ্র ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিলেন, পার্ব্বতীর কাছে তাঁহাকেও এক দিন স্বীকার করিতে হইয়াছিল, "অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি! তবাস্মি দাসঃ।"* তাই বলিতেছি প্রেম রাজ্যে কাহারই স্বাধীনতা নাই। পরাধীনতাই এখানে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছে। আজ সত্যানন্দ প্রেমতত্ত্ব লিখিতে লিখিতে কালিদাসের সেই কবিতাটী ভাবিতেছে—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ-সংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতনীয়মানস্য।"

শরীর আগে আগে যায় কিন্তু মন কেন পশ্চাৎ পড়িয়া থাকে? কেন সে সর্ব্বদা পশ্চাৎ ভাগেই নেত্রপাত করে? শরীর পলাইতে পারে কিন্তু মন প্রেমের হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না। শরীর পলায় কিন্তু মন ধরা পড়ে কেন? অসীম ক্ষমতা তোমার প্রেম! কিন্তু সত্যানন্দের প্রতি কেন তুমি দয়া করিলে না? তাঁহার স্কন্ধে কেন চাপিলে না? হায়! আমি কেন পরাধীন হইলাম না?

শ্রীসত্যানন্দ শর্ম্মা।

হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক দু একটী কথা।

(প্রথম খণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠার পর)

১। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ ধর্ম্মভাবের অভাব। আমরা হিন্দু, ধর্ম্মের মর্য্যাদা আমরা যেমন বুঝি, জগতের কোন জাতি তেমন বুঝে না। ধর্ম্মভাব আমাদের প্রত্যেক লোমকূপে প্রসূত—হিন্দু আবাল বৃদ্ধ বণিতার শয়ন, ভোজন, উপবেশন বা জাগরণ ধর্ম্মভাবপূর্ণ। আমরা বুঝি যে হিন্দু ধর্ম্ম আমাদের সর্ব্বস্ব,—হিন্দু ধর্ম্ম জগতের আদর্শধর্ম্ম। আর্য্যজাতির প্রথম হৃদয়োচ্ছ্বাস যাহা, তাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রদত্ত বই আর কি বলিব! আজি সহস্রের পর সহস্র বৎসর অতীত গর্ভে লীন হইয়াছে, আর্য্যধর্ম্ম অমন অটল হিমাদ্রিসম স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যত দিন চন্দ্র সূর্য্য গগনপটে শোভা পাইবে, তত দিন ইহা মানব কার্য্যের নিয়ামক রহিবে। যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জগতের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া পৃথিবীস্থ এক তৃতীয়াংশ মনুষ্যের উপাস্য, হিন্দু ধর্ম্মই সেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসূতি। বাহ্যতঃ কথাটা বিসদৃশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে পরিণত হইবার সম্ভাবনা হওয়াতেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হয়; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন সম্পূর্ণ রূপে মাতৃবিরোধী হইয়া দাঁড়াইল, যখন দোষাংশমাত্র পরিবর্জ্জন না করিয়া হিন্দুধর্ম্মের আমূল পরিবর্ত্তনে কৃত-সঙ্কল্প

* কুমারসম্ভব ৫। ৮৬।

হইল, যখন সংস্কারকের কোমল হস্ত ব্যবহার না করিয়া, বিপ্লবের শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিল, তখন তাহাকে পরাজিত হইয়া দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সাক্ষী ইহার ইতিহাস। ইতিহাস শিক্ষা দিল হিন্দুধর্ম্ম বিপ্লবের বস্তু নহে, সংস্কারের সামগ্রী।

২। কিন্তু এই বিপ্লব ও বিজয়ই হিন্দুধর্ম্মের কাল হইল। হিন্দু চরিত্রে বৈরাগ্যের অযথা আধিক্য ঘটিল। ঐহিক বিষয়ে আর ইঁহাদের তাদৃশ মনোযোগ রহিল না। স্বর্গ হইবে কিসে; মুক্তির উপায় কি? কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন হইবে কি করিয়া, কি করিলে আর জীবদেহ প্রাপ্ত হইতে হইবে না এই সকল মনের প্রধান চিন্তা—কার্য্যের প্রধান নিয়ামক হইয়া উঠিল। পরকাল ২ করিয়া লোকে পার্থিব বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িল। এ জগৎ কেবল ভোজের বাজি, মায়ার মোহ—এ বিশ্বাস দৃঢ় হইল। যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু প্রার্থনীয় তাহা এ জন্মের নয়; সুতরাং এ জন্মের কাযে তত মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে। সকলেই পর কালের জন্য অধিক চিন্তিত। বিষয়ী লোকেরও ঐহিকের উপর বাসনা অল্প। বিপ্লবের পূর্ব্বে, ঐহিক পারত্রিক উভয় প্রায় সমান ভাবনার বিষয় ছিল, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকে পারত্রিক চিন্তায় ব্যস্ত হইত। বিপ্লবের পর সকলেই বৈরাগী। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, তিন আশ্রম না কাটাইয়া বৈরাগী হইতে পারিবে না, এখন কি ব্রহ্মচারী কি গৃহস্থ সকলেই বৈরাগী। এই জন্য আর্য্যজাতির পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। এই ভাবে ভারতবর্ষ কিছু কাল রহিল। সে বড় অল্প দিন নহে।

৩। তার পর অভ্যুত্থানোন্মুখ মুসলমান অবসর বুঝিয়া আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে—ধর্ম্মভ্রষ্ট ভারতবর্ষ মুসলমানের করতলস্থ হইল। মুসলমান সাত শত বৎসর অনিয়ন্ত্রিত ভাবে রাজ্য শাসন করিয়া, সপ্ত সমুদ্রপারবাসী, বণিক্‌বৃত্তিপরায়ণ বিধর্ম্মী ইংরাজের হস্তে রাজ্য ভার খোয়াইয়া আমাদের সমান অবস্থাপন্ন হইয়া কাল যাপন করিতেছে। কিন্তু মহম্মদীয় ধর্ম্ম বড় ভয়ঙ্কর ধর্ম্ম। ধর্ম্মের বিস্তার এ ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য, কোরাণ ও তরবারি ইহার একমাত্র সহায় ও উপায় এবং কাফের বধ ইহার স্বর্গ-দ্বার। ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা—তখনকার জানিত, সমস্ত পৃথিবী মুসলমানের নামে কম্পিত। সেই ধর্ম্মোপাসকদিগের নির্যাতনে সাত শত বৎসর উৎপীড়িত হইয়া হিন্দু ধর্ম্ম স্খলিতপদ হয় নাই। কিন্তু মুসলমান শাসনাধীন হওয়ায় উদারনীতিক, প্রশস্ত হৃদয় হিন্দুধর্ম্ম স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য ক্রমে স্থিতিশীল (conservative), সঙ্কুচিত-প্রাণ হইয়া উঠে। ধর্ম্ম এমনই চমৎকার বস্তু যে ইহার বন্ধন যত দৃঢ় করিতে যাও, ইহার গৌরব ও বিস্তার তত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাতে মূল ধর্ম্মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিল না। সত্য কথা, কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মের ভার সমস্তই ব্রাহ্মণ হস্তে নিহিত হইল। এ দিকে ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট প্রণোদনা ও যত্নে বঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার

হ্রাস হইতে লাগিল। সুতরাং তাহাদের অবনতি ঘটিল। তাহাদের অবনতির সঙ্গে২ ধর্ম্ম কর্ম্মের ক্ষতি হইল। অন্তঃপুরের কঠোরতা এই সময় প্রয়োজন বোধে প্রথম প্রচলিত হয় এবং জাতিবিভাগের কঠিন নিগড় এই সময়েই সমাজপদে প্রদত্ত হয়।

৪। তার পর পাশ্চাত্যজ্ঞানে উদ্বোধিত, খৃষ্টধর্ম্মে আলোকিত, বিষম পরাক্রান্ত ইংরাজজাতি ভারত-গগন ছাইয়া ফেলিল। কোম্পানি দেশের রাজা হইল, মিশনরিগণ শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের কথা পাড়িল, কোন২ হিন্দুকে প্রলোভনে ফেলিয়া খৃষ্টান করিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় কিছু দিন চলিল। তার পর সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। কোম্পানির হস্ত হইতে স্বয়ং রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। শিক্ষাবিভাগও গভর্মেণ্টের অধীনস্থ করা হইল। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে হাত দিয়া ইংরাজ বিলক্ষণ শিক্ষাপাইয়াছিলেন।—বুঝিয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় হিন্দু সন্তান ধর্ম্ম-ময়-জীবন।—সে ধর্ম্মে হাত দিলে দেহে জীবন থাকিতে কাহারও নিস্তার নাই। সেই জন্য ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভূত করা হইল না। সুতরাং যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী হইয়া শিক্ষিতপদবাচ্য হইতে লাগিলেন—তাঁহারা বাল্যকাল হইতে ধর্ম্ম নীতির সম্পর্ক শূন্য হওয়ায় নাস্তিক মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। অথচ ইঁহারাই রাজপুরুষদিগের অনুগৃহীত, সমাজের শীর্ষ স্থান ইঁহাদের অধিকৃত, ব্রাহ্মণদের—যে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ ধর্ম্মকর্ম্ম নিরত রহিলেন সেই ব্রাহ্মণদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। সত্য বটে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের সঙ্গে২ স্বীয় আধিপত্য বিস্তার কামনা চরিতার্থ করায় ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছিল—কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম তাহারাই জোরে রাখিয়াছিল। তাহাদের অবনতি ও অবহেলার সঙ্গে২ হিন্দু ধর্ম্মের অবমাননা হইতে লাগিল। অথচ এই অবমাননা হেতুই যে আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা সমুদ্ভূত, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

৫। এক্ষণে বঙ্গদেশে—বঙ্গদেশে কেন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্ম্ম ভাবের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক কথা বলিতে কি? সমাজ মধ্যে ধর্ম্মভাবের অপচয়ে আমরা ভীত হই, মনে মনে অনিষ্ট আশঙ্কা উপস্থিত হয়। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের দৃঢ় প্রতীতি, আমরা ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি, যে মনুষ্য জীবনের প্রয়োজন সমূহের মধ্যে ধর্ম্ম একটী প্রধান অঙ্গ। পরিণতিবাদের সাহায্যে এ কথা প্রমাণ করিতে পারা যায়। যে মানব সমাজে মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের কার্য্যকারিতা আছে, উপকারিতা আছে· জীবের ক্রমপরিণতিতে ইহা মানবহৃদয়ে দেখা দিয়াছে। মানবের এখন অনেক অভাব আছে, যাহা ধর্ম্মভাব ভিন্ন অন্য কিছু দিয়া পূর্ণ করা যায় না। এই বিজ্ঞান-সর্ব্বস্ব, নাস্তিকতা-প্রাণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়ে, এই ধর্ম্ম ভাব অনেক শোকে সান্ত্বনা, অনেক বিপদে ভরসা, অনেক পথভ্রান্ত জীবন পোতের ধ্রুবতারা, অনেক সৎকার্য্যের মূল, অনেক দেশহিতকর কার্য্যের উত্তেজক, অনেক তাপিত হৃদয়ে শান্তি সলিল।

৬। আর একটা কথা—সমাজের জন্য যে একটা বন্ধন আবশ্যক তাহা চিন্তাশীল

ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে সে বন্ধনের যে একান্ত অভাব রহিয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে, সুতরাং সাধারণ লোকের জন্য একটা শাসন চাই—একটী বন্ধনী আবশ্যক। রিপুগণকে বশীভূত করিতে, নিকৃষ্টবৃত্তি নিচয়কে হীনবল করিতে সাধারণের জন্য একটা শাসন চাই। আমাদের কার্য্যমূলা বৃত্তিসমূহ অন্ধ ও চিন্তা বিরহিত। যখন আমরা আবেগ প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করি, তখন কিছু আমাদের কুপথ সুপথ জ্ঞান থাকে না। তাই বলিতেছি, সমাজের মঙ্গলের জন্য, আমাদের হিতের জন্য, আমাদের উপর একটী শাসন চাই—আমাদের হৃদয়ে একটী বন্ধনী আবশ্যক। ধর্ম্ম ভিন্ন কোন্ বন্ধন সে স্থানের উপযুক্ত? ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন্ শাসন, সে শাসনের স্থানে অভিষিক্ত হইতে পারে? কি রাজবিধি, কি বিবেচনা শক্তি, কোনটাই এ কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সামাজিক একতা সম্পাদনক্ষম যত কিছু বন্ধনী আছে ধর্ম্মবন্ধনী যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা আর প্রমাণ দ্বারা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আর হিন্দু ধর্ম্মই যে ভারতবর্ষে সেই ধর্ম্মভাবের প্রধান পরিপোষক তাহা কে অস্বীকার করিবে? যে ধর্ম্ম মুসলমানের নির্যাতনে, খৃষ্টধর্ম্মের বাক্ চাতুরীতে, বৌদ্ধধর্ম্মে নির্ব্বাণমুক্তির এই প্রলোভনেও নাস্তিকতার কঠোর আঘাতে এবং হিন্দু সমাজ জীবন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অবতারণায়ও ভ্রষ্ট বা লুপ্ত হয় নাই; তাহা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহা যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা যে ভারতীয় হিন্দু মাত্রেরই আরাধ্য বস্তু, তাহা কোন্ হৃদয়বান্ পুরুষ স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইবেন! হিন্দু ধর্ম্মের মূলতথ্য গ্রহণ কর—ব্রাহ্মণগণ নিজে মর্য্যাদা ক্ষয় করিবার জন্য হিন্দু ধর্ম্মকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছেন সেই সঙ্কোচভাব পরিহার কর দেখিবে হিন্দু ধর্ম্ম পুনরায় ভারতবর্ষে সত্য যুগের অবতারণা করিবে। নতুবা জগতের আদর্শস্থল আর্য্যাবর্ত্ত চিরদিনের তরে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতে চলিল। সম্প্রতি বৃথায় তাহার পূর্ব্ব গৌরব নয়ন পথের পথিক করিয়া প্রলোভন দেখাইতেছে, আর্য্যজাতির প্রত্যেক লোমকূপে আর্য্যধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে, সেই সুপ্ততেজ একবার প্রজ্জলিত কর দেখি ভারত পুনরায় উন্নতির নেতা হইবে, সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা দূরে প্রেরণ পূর্ব্বক সুখের জীবন আনিয়া ঘরে২ যোগাইবে। ইহাতে যে জাতীয়তা ও উদ্দীপনার উদ্ভব হইবে তাহা আবার ভারতকে পৃথিবীর পূজনীয় করিয়া তুলিবে। প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী যে একতার জন্য লালায়িত, প্রত্যেক রাজনীতিজ্ঞ যে জাতীয়তা উদ্ভাবনে বদ্ধপরিকর এই হিন্দু ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবনই তাহাদের প্রকৃষ্ট উপায়—প্রধান সহায়। ধর্ম্মভাব বীজমন্ত্রই তাহাদের শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধির আকার আরং চেষ্টা যে গর্ভস্রাববৎ বিফল হইতেছে, তাহাই এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ।

ঐশিক জ্যোতি।

গভীর বিশাল সাগর-তলে
যে সব মোহন রতন ফলে,
অযুত বিভাসে তাদের দেহে
যে লাবণ্য-স্রোত সদাই বহে;
নবীন কিশলে, তরুর গায়
যে মোহিনী-বিভা সদাই ধায়;
স্ফুটিত-কুসুমে, কানন মাঝে
যে রম্য-মাধুরী মিলন রাজে;
নিশার তুষারে মুকুতা প্রায়
কুসুম পল্লবে ঢুলিত বায়;
অরুণ-উদয়ে তৃণের দলে
যে ছটা অতুলে চিকণ ঝলে;
গগন-মাঝারে ধনুর করে
অযুত আভাসে যে রাগ ঝরে;
পতগ, পাখীর পালখ-ময়,
যে জ্যোতির ছটা ছড়ান'রয়;
প্রভাতে, প্রদোষে, সুনীলাকাশে
যে জ্যোতি অযুতে সুছাঁদ ভাসে;
সলিলে চিকণ ঝিনুক ময়
বিমল বিভায় যে জ্যোতি রয়;
আদরে যখন মাতার কোলে
তরুণ তনয় মৃদুল দোলে;
অমল মধুর হাসের রেখা
অযুত লহরে দেয় যে দেখা;
প্রণয়ী পতির প্রেমের কোলে
অতুল সোহাগে রমণী ঢোলে—
তখন তাহার কপোল ভাগে
আরক্ত ঈষদে যে আভা জাগে।
রবির কিরণে অনল-ময়,
জীবের নয়নে যে জ্যোতি রয়;
দিবাশেষে নৈশ-আকাশগায়
যে জ্যোতি ধরিয়া জোনাকি ধায়;
সুচারু চাঁদের মোহন কায়
অযুত লাবণ্য-তরঙ্গ ধায়,
তামসী-নিশার আকাশ ময়
অযুত তারকা সাজান রয়;
তাদের শরীরে জ্যোতির রেখা
অযুত আভাসে রয় যে লেখা;
অথবা তখন জলদ-মালে
উজলা বিজলী-ঝলসা খেলে;
তখন তাহার অতুল অঙ্গে
যে জ্যোতি তরঙ্গ ভাসিছে রঙ্গে;
সে ঐশী তেজ—ভুবন ময়
স্থাবর, জঙ্গম জ্যোতিঃ রয়।

শ্রীদাঃ—

ভারতীয় ভূগোল শাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভারতবর্ষ।

উত্তরে হিমাদ্রি, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে কিরাত রাজ্য ও পশ্চিমে যবন রাজ্যে এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী স্থান ভারতবর্ষ নামে আখ্যাত; ইহার বিস্তার নয় সহস্র যোজন। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত ছিল। আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য, আর্য্যাবর্ত্ত আবার নানা সামান্য অংশে বিভক্ত।

হিমবৎ পর্ব্বতের দক্ষিণ ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর, পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী স্থান পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া কথিত হইত।

(মনু ২।২২)

আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি, মধ্যদেশ, পঞ্চনদ, গান্ধার, কাশ্মীর, অযোধ্যা বা উত্তর কোশল, মিথিলা বা বিদেহ, মগধ বা সাকেত, বারাণসী, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌-জ্যোতিষ, মালব বা অবন্তী, গুর্জ্জর, কচ্ছ, কাম্বে বা স্তম্ভ, সিন্ধু, কিরাত প্রভৃতি প্রধান ও হংস কারণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, মদ্র, কেকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, পৌণ্ড্রিক, শক,গয়, তাম্রলিপ্তি, সুপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোন, বিরাট, পঞ্চাল প্রভৃতি নানা সামান্য খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে সমুদায় রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থান সম্বন্ধে নির্ণয় করা যায় না; এমন কি অনেক গুলি নির্ণীত হইবার কোন উপায়ই নাই; আমরা যতগুলি রাজ্যের বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, এই স্থলে তাহাই প্রদান করিলাম।

ব্রহ্মাবর্ত্ত—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।

মনু ২।১৭

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী (অধুনাকাগার) নদীদ্বয়ের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ ব্যাপ্ত স্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল; ভগবান্ মনু বলেন এই স্থানই আর্য্যগণের আদি বাসস্থান।

ব্রহ্মর্ষি—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্॥

মনু ২।১৯

ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী; এই রাজ্য মধ্যে কুরুক্ষেত্র অধুনা থানেশ্বর, মৎস্য দেশ অধুনা জয়পুর, পঞ্চাল অধুনা কান্যকুব্জ, শূরসেন অধুনা মথুরা এই কয়টি রাজ্য সন্নিবেশিত ছিল।

মধ্যদেশ—হিমবৎ ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্য, পূর্ব্বে বিনসান এবং পশ্চিমে প্রয়াগ এই

চতুঃসীমান্তবর্ত্তী স্থান মধ্যদেশ নামে আখ্যাত ছিল। মনু ২।২১

পঞ্চনদ—অধুনা পঞ্জাব; শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটী নদী যুক্ত দেশ বলিয়া ইহার নাম পঞ্চনদ, পরে পঞ্চ+অপ বা পঞ্চাপ ও অধুনা পঞ্জাব হইয়াছে; এই রাজ্যের মধ্যে কেকয়, শিবি, মদ্রক ও সৌবীর দেশ সন্নিবিষ্ট ছিল।

গান্ধার—অধুনা কাণ্ডাহার; পূর্ব্বে এই স্থান ভারতবর্ষের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল; যবন রাজ্য হইলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কখনই গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর পাণি গ্রহণ করিতেন না। ক্রমশঃ উহা যবন রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছিল।

কাশ্মীর—অধুনা কাশ্মীর।

উত্তর কোশল—অধুনা অযোধ্যা। ইহা দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী সূর্য্যবংশীয়গণের রাজ্য ছিল।

মিথিলা বা বিদেহ—অধুনা ত্রিহুত; পূর্ব্বকালে জনক রাজার রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে।

মগধ—অধুনা বেহার; শকদ্বীপবাসী শক বা মগগণ এদেশে প্রথম বাস করিত বলিয়া ইহার নাম শাকেত ও মগধ হইয়াছে। ইহা পূরাকালে জরাসন্ধের রাজ্য ছিল; এই দেশেই মহারাজ চন্দ্র গুপ্ত পাটলী পুত্র নগরে রাজত্ব করিতেন। এই নগর মুদ্রারাক্ষসে পুষ্পপুর বা কুসুমপুর নামে উক্ত হইয়াছে। (Strabo) স্ত্রাবো বলেন গঙ্গা ও অপর এক নদীর সঙ্গম স্থলে প্রাচ্যগণের রাজধানী (Palibothra) পালিবোত্রা ইহাই পাটলীপুত্র নগর। অপর নদীর কথায় এরিয়ান (Arrian) বলেন, সেই নদীর নাম (Erannaboas) বা হিরণ্যবাহু অধুনা শোণ নদ। মগধ দেশে মহারাজ নন্দের রাজধানী পদ্মাবতী নগর অধুনা পাটনা; কিন্তু অনেকে পাটলীপুত্র ও পাটনা একই নগর বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ রাজগৃহ নগরী এই মগধের অন্তর্নিবিষ্ট। কথিত আছে মহাত্মা বলদেব স্বীয় পুত্রগণের জন্য তিনটি সুন্দর নগরী নির্ম্মাণ করেন; ঐ তিনটীরই নাম বলদেব পত্তন ছিল; কিন্তু সাধারণতঃ ঐ নগর গুলি বলীপুর বা মহাবলীপুর বলিয়া মহাভারতাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই নগরত্রয়ের মধ্যে একটী মান্দ্রাজের দক্ষিণ করমণ্ডল উপকূলে অন্য একটী বিদর্ভ দেশে ও অপরটী গঙ্গা নদীর তীরে; এইটী রাজগৃহ ও পরে রাজমহল বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বিদর্ভ দেশে যে বলীপুর আছে তাহা অধুনা মুজঃফর নগর বলিয়া অভিহিত; ইহারই নিকটে রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক রাজার রাজধানী ছিল; তাঁহার রাজধানীর নাম কুণ্ডলপুর।

বারানসী—অধুনা বারাণসী বা কাশী। পূর্ব্বকালে ইহা বিদ্যাচর্চ্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল; কাশীর অধিপতি দিবোদাস বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়া স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করেন এবং ইহার ১০ ক্রোশ উত্তরে চম্পক নামক স্থানে একটী সুদৃঢ় দুর্গ ও কাশী সদৃশী নগরী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই দুর্গ ও নগরীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও পরিলক্ষিত হয়।

Asiatic Researches. Vo iii P. 411.

অঙ্গদেশ—অধুনা ভাগলপুর ও তন্নিকট-

বর্ত্তী স্থান। অঙ্গ দেশকে অনেকে তীর্থবৎ দেশ বলিয়া উক্ত করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে, প্রমাণ স্বরূপ আমরা শক্তিসঙ্গম তন্ত্র হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনে শাস্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥
শক্তিসঙ্গম তন্ত্র ৭ম, পটল।

অঙ্গ, বঙ্গ ইত্যাদি দেশ গুলি বলিরাজের পুত্রগণের নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া উক্ত আছে। চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটী ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে, তাঁহাদের প্রত্যেকের নামানুসারে এক একটি দেশের নাম হইয়াছে, আরও পূর্ব্বকালের সূর্য্যবংশীয় মহারাজ মান্ধাতার গৌড় নামক দৌহিত্র হইতে একটী দেশের নাম গৌড় দেশ হইয়াছে।

বঙ্গ—গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যস্থিত গাঙ্গ প্রদেশকেই পূর্ব্বে বঙ্গ দেশ বলিত।

পুণ্ড্র—অধুনা মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থান গুলি পূর্ব্বে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নামে আখ্যাত হইত।

গৌড় দেশ—আধুনিক মালদহের নিকটবর্ত্তী।

সুহ্মদেশ—অধুনা চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি প্রদেশ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ—পূর্ব্বকালে এই নামে অনেক গুলি দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি অধুনা কামরূপ; অন্যটি পারস্য দেশের অন্তর্গত; ইহাকে উত্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলিত।

মালব বা অবন্তী—এই রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল; ইনি খৃষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন; মহাকবি কালি দাস ইঁহারই সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে; কিন্তু পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন বলেন কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন (১)। যাহা হউক এ বিষয়ে আমরা এ স্থানে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। বিক্রমাদিত্য নামে অনেক রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; বৃহৎ কথার মতে পাটলীপুত্র নগরে একজন বিক্রমাদিত্য ছিলেন; ইনি প্রতিষ্ঠান নগরীর রাজা নৃসিংহ রাজকে সমরে পরাস্ত করেন ও তিব্বতাধিপতি গজপতি ও পারস্য দেশাধিপতি অশ্বপতিকে সমরে সাহচর্য্য করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন; বৃহৎ কথার মতে প্রতিষ্ঠান নগরী গোদাবরী-তীরে অবস্থিত ছিল; ইহার অপর নাম পত্তন নগর। মহাভারতেও পদে পদে মালব দেশ উক্ত হইয়াছে; দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ের একস্থলের নকুল নানা দেশ জয় করিয়া মালবাদিদেশ জয় করিতে যান এরূপ উল্লেখ আছে।

তান্ দশার্ণান্ বিজিত্বা চ প্রতস্থে পাণ্ডুনন্দনঃ।
শিবীংস্ত্রিগর্ত্তান্ অম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্॥
ইত্যাদি (মহাভারত সভাপর্ব্ব।)

গুর্জ্জর—অধুনা গুজরাট, এই রাজ্য যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত; দ্বারাবতী নগর তাঁহার রাজধানী ছিল; এই দ্বারাবতী অধুনা দ্বারিকা নগর, এই স্থানে কনক সেনাদি নরপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(১) ঐতিহাসিক রহস্য প্রথমভাগ ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

এই গুর্জ্জরবাসী ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকালে দক্ষিণ বিন্ধ্যবাসীর এক পৃথক্ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। যথা;—

কার্ণাটাশ্চৈব তৈলাঙ্গী গুর্জ্জরা রাষ্ট্র বাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যাদক্ষিণবাসিনঃ॥

গুজরাটে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের নিধনের পর সূর্য্যবংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করেন; বল্লভী নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল; ভট্টিকাব্য প্রণেতার এই স্থানে বাসস্থান ছিল।

কচ্ছদেশ—অধুনা কচ্ছ। গুজরাটের সেন বংশীয় কোন রাজা কর্তৃক সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বে ইহাকে মরু কচ্ছ দেশ বলিত।

স্তুস্ত দেশ—বৃহৎ কথার অনুসারে কলিঙ্গ সেন এই দেশের অধিপতি ছিলেন; ইহা অধুনা কাম্বে বলিয়া অভিহিত।

সিন্ধু দেশ—অধুনা সিন্ধু। ইহা জয়দ্রথের রাজ্য ছিল।

কিরাত দেশ—বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব পার্শ্ব স্থিত, ব্রহ্ম রাজ্যের পশ্চিম, আরাকানের উত্তর ও শ্রীহট্টের দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ কিরাত রাজ্য বলিয়া আখ্যাত হইত; ইহার অধিবাসিগণকে পূর্ব্বে সাধারণতঃ কিরাত বলিত; এই রাজ্যের বর্ত্তমান নাম ত্রিপুরা। কিরাত দেশাধিপতি মহারাজ ত্রিপুরা আপন নামানুসারে এই দেশের ত্রিপুরা নাম করণ করেন; ইহারা চন্দ্রবংশীয়; কথিত আছে মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে যৌবন দশায় জরাগ্রস্ত হ'ন; পরে সেই জরা স্বীয় পুত্রগণ মধ্যে সংক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ভিন্ন আর কেহই তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই; সেই জন্য তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য চারি পুত্রকে অভিসম্পাত করেন; ও তাহাদিগকে রাজ্য বহিষ্কৃত করিয়া দেন; তন্মধ্যে দ্রুহ্য তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এই কিরাত রাজ্যে—এই অভিনব রাজ্য সংস্থাপন করেন; ত্রিবেগ নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল; ইহা ব্রহ্মপুত্র নদ তীরে সংস্থাপিত ব্রহ্ম পুত্রের অপর নাম কেপেল নদ; মহারাজ ত্রিপুর ইহারই বংশধর; ত্রিপুর পুত্র ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। (২)

হেরম্ব দেশ—অধুনা শ্রীহট্ট প্রদেশ।

দরদ—সিন্ধু নদের উৎপত্তি স্থান। আধুনিক দদ্দিস্তান বলিয়া অনুমিত হয়।

দর্ব্ব বা দর্ব্বি—কাশ্মীরের দক্ষিণ।

শিবি—পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ শিবি দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইত।

ত্রিগর্ত্ত—রাজতরঙ্গিণীর মতে কাশ্মীরের সন্নিহিত প্রদেশ।

যৌধেয়—ইহা পার্ব্বতীয় দেশ বিশেষ।

মদ্রক পঞ্জাবের মধ্যবর্ত্তী; এখানকার রাজকন্যা মাদ্রীকে মহারাজ পাণ্ডু বিবাহ করেন।

কেকয়—পঞ্জাবের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

অম্বষ্ঠ দেশ—রাজ পুতনার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ।

অম্বষ্ঠ দেশ—রাজপুতনার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ।

সৌবীর বা সিন্ধু সৌবীর—পঞ্জাবের মধ্যস্থিত।

(১) ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত।

পঞ্চ কম্বট—রাজপুতনার মধ্যস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

পুষ্কর—রাজপুতনার অন্তর্গত পুষ্কর হ্রদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

পহ্লব দেশ—ভারতবর্ষ ও পারস্য রাজ্যের মধ্যস্থিত প্রদেশ ; এই প্রদেশ পহ্লব বা পল্লব বলিয়াও কথিত হইত ; রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে।

শক—হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ইহার অধিবাসীরা শক বা সিথিয়ান বলিয়া উল্লিখিত ; ইহারা অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিল, এবং সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব করিত। সুতরাং ভারতবর্ষীয় নরপতিগণ ইহাদের সহিত নানা সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন ও শকাদিত্য উভয়েই ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তদবধি উভয়েরই নামে দুইটি শকাব্দার প্রচলন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মগধই শকগণের আদি বাস স্থান ছিল ; এবং এই জন্যই মগধ পূর্ব্বকালে সময়ে সময়ে শাকেত বলিয়া উল্লিখিত হইত।

তাম্রলিপ্ত—ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত ; আধুনিক তমলুক ; ইহা পুরাকালে সমুদ্র-যাত্রিগণের প্রধান আড্ডা ছিল ; এই স্থান হইতেই বঙ্গীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ পোতারোহণে সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপে গমন করিয়া তথায় রাজ্য সংস্থাপন করেন। চাঁদ সদাগর প্রভৃতি বণিক্ বৃন্দ এই স্থান দিয়াই গমনাগমন করিতেন।

সুপুণ্ড্রক—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধুনা ঢাকা অঞ্চল।

দৌবালীক—মেদিনীপুর অঞ্চলের কিয়দংশ বলিয়া বোধ হয়।

সাগরক—গঙ্গাসাগর সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী স্থান সাগরক বলিয়া অভিহিত হইত।

পত্রোর্ণ—মধ্য দেশে।

বিরাট—দিনাজপুর অঞ্চলের কিয়দংশ স্থান বিরাট ভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিরাট ভূমির অপর নাম মৎস্য দেশ ; ভগবান্ মনু, মৎস্য দেশ ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্গত বলিয়াছেন ; তাহা হইলে ইহা রাজপুতনার বলিয়া অনুমিত হয় ; আবার কেহ কেহ বলেন বিরাট ভূমি গুজরাটের নিকটবর্ত্তী।

পঞ্চাল—অধুনা কান্যকুব্জ বা কনৌজ (মনু)। মহাভারতের মতে পঞ্চাল দুই ভাগে বিভক্ত ; উত্তর ও দক্ষিণ ; উত্তর পঞ্চালের রাজধানী মাকন্দী ; ও দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী অহিক্ষেত্র বা অহিচ্ছত্র।

কুলিন্দ—দিল্লী প্রদেশ ও পঞ্জাবের মধ্যস্থিত প্রদেশ।

গণ্ডক—মিথিলার পূর্ব্ব ; গণ্ডকী নদীর তীরবর্ত্তী দেশ গণ্ডক দেশ বলিয়া অভিহিত হইত।

দশার্ণ—বিন্ধ্য পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ।

উত্তমার্ণ—বিন্ধ্যাচলে।

শূরসেন—অধুনা মথুরা।

মালাবর্ত্ত—কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেবের মতে মল্লভূমি।

কুন্তল—মধ্য ভারতবর্ষে।

কাশি-কোশল—মধ্যদেশে।

বাটধান—ভারতবর্ষের পশ্চিম ; আভীরের নিকট।

আভীর—কাশ্মীরের দক্ষিণ হইতে সিন্ধু নদের মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

জলতোয়ক—অপরান্ত, চর্ম্মখণ্ডিক, শতহ্রদ, ললিত্য, হারমূষিক, মাঠর, রক্ষ হতক, দশ মাণিক্য, প্রভৃতি দেশ গুলি, বিষ্ণু, ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত ছিল।

পুলিন্দ—গুজরাটের নিকট।

চেদি—নাগপুরের নিকট. কেহ কেহ ইহা দিনাজপুর অঞ্চলে ছিল বলিয়া থাকেন।

ঔড্র বা উৎকল—উড়িষ্যা।

মদ্রদেশ—কেহ কেহ ভূটান বলিয়া অনুমান করেন।

সুহ্ময়—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে।

অন্তর্গিরি— } হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে
বহির্গিরি— } আসাম প্রদেশ বলিয়া অনুমিত হয়।

মল্ল—হিমালয়ের পাদ দেশে।

দক্ষিণা পথ বা দাক্ষিণাত্য। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগ হইতে কুমারিকা খণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে রামায়ণের সময় আর্য্যগণের বসতি ছিল না। বাল্মীকির সময়ে এই সকল স্থানে ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস প্রভৃতি আখ্যাধারী অসভ্য লোকগণের আবাস ছিল ; কিন্তু মহাভারতের সময় ইহা আর্য্যগণের বাসভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল ও কতিপয় সামান্য অংশে বিভক্ত ছিল। যথা,—কিষ্কিন্ধ্যা, মাহিষ্মতী, সৌরাষ্ট্র, ভোজকটক, সুরভী পট্টন, তাম্রাখ্য দ্বীপ, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্র, কর্ণিক, আটবীপুরী, যবনপুর, চোল, চীর, মুষিক, কর্ণাট, কল্যাণ, উৎকল, কঙ্কন, বিদর্ভ, শূরাভীর, অর্ব্বুদ, পরান্ত, কারুষ; শাকল, পারসিক, পরিপাত্র, বিদিশা, মাহিষ, মলয়, নিষধ, নিষাদ, বিন্ধ্যচুকে, ইত্যাদি।

কিষ্কিন্ধ্যা—অধুনা উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগ। রাম চন্দ্র বালীরাজকে বধ করিয়া লক্ষ্মণ সহিত প্রস্রবণ নামক পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় লয়েন, ও সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করেন। প্রস্রবণ পর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তে অন্য একটি পর্ব্বত, উত্তরে একটী শৃঙ্গ, দক্ষিণদিকেও অপর একটি শৃঙ্গ ছিল। এই পর্ব্বত সকল দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানে রাম ও লক্ষ্মণ আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার মধ্যদেশ দিয়া একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা ছিল এবং এই স্থানের অতি নিকটেই কিষ্কিন্ধ্যা নগরী উল্লিখিত হইয়াছে(১)। তাহা হইলেই ইহা উড়িষ্যার দক্ষিণ বলিয়া অবগত হওয়া যাইতেছে। ঐ পর্ব্বত ত্রিকূট পর্ব্বতের দক্ষিণাংশ।

মাহিষ্মতী—নর্ম্মদা তীরে মাহিষ্মতীপুরী, ইহা চন্দ্রবংশীয় সহস্রবাহু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ; এইজন্য সময়ে সময়ে ইহাকে সহস্রবাহুও বলিত ও বলে। ইহার আধুনিক নাম মহেশ্বর।

সৌরাষ্ট্র—অধুনা সুরাট অঞ্চল।

বিদর্ভ—অধুনা বিদর বা বেরার ; ইহার অন্তর্গত কুণ্ডলপুর নগরে ভীষ্মক রাজের

(১) রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সপ্তবিংশ অধ্যায়।

রাজধানী ছিল।

ভোজ কটক—বিদর্ভের পূর্ব্ব প্রান্তে; ভীষ্মক কখন কখন ভোজ কটকেও অবস্থিতি করিতেন; এই জন্য যখন সহদেব দক্ষিণ দেশ জয় করিতে যান, তখন ভীষ্মক স্বীয় পুত্র রুক্ম সহ এই ভোজ কটক হইতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন।

পাণ্ড্য—অধুনা দাক্ষিণাত্যের মদুরা ও তেরুনেল্লবলী।

দ্রাবিড়—এই দেশ ভারতবর্ষের সর্ব্ব দক্ষিণ ভাগ; করমণ্ডল উপকূলে পাণ্ড্য, চোল ও চীর রাজ্য ইহারই অন্তর্ণিবিষ্ট ছিল।

কেরল—এই রাজ্য পরশুরাম কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়; অধুনা মালাবার।

অন্ধ্র—অধুনা তেলিঙ্গনার কিয়দংশ; অন্ধ্র বংশীয় রাজগণের রাজধানী বরঙ্গল। এই দেশেই শালিবাহন রাজত্ব করেন। মগধে জরাসন্ধ-বংশীয়গণের হস্ত হইতে অন্ধ্র-বংশীয় রাজগণই মগধের শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। শালিবাহনের রাজধানী পত্তন নগর বা প্রতিষ্ঠান নগরী।

আলেক্‌জাণ্ডার পূর্ব্বদেশ করায়ত্ত করিয়া প্রত্যাগমন কালীন কতকগুলি ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অভিলাষী হ'ন; তদনুযায়ী শর্ম্মণাচার্য্য নামক কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার সহগামী হন; মৃত্যুকালে এই শর্ম্মণাচার্য্য স্বীয় দেহ যবন সংস্পর্শে কলুষিত হইবে জ্ঞান করিয়া জীবিতাবস্থাতেই প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। গ্রীকেরা এই অভূত-পূর্ব্ব আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন এবং সেই স্থানে একটি সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করেন; সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে গ্রীক ভাষায় এইটি খোদিত আছে "Here lies Sarmencheya from Barygaza" এই বারি গাজার বর্ত্তমান নাম বরোচ; বরোচ শালিবাহনের রাজধানী পত্তন নগর হইতে ১১৫ ক্রোশ অন্তর। ষ্ট্রাবোর (Strabo) মতে শর্ম্মণাচার্য্য (Zarmons chegus) অগষ্টসের সভায় দৌত্যকার্য্য জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কল্যাণ নামক জনৈক ভারতবাসী গমন করেন; ইনিও ঐ রূপে অগ্নিকুণ্ডে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

তালবন—ইহা দাক্ষিণাত্যে তেলিঙ্গনার নিকট।

কলিঙ্গ—করমণ্ডল উপকূলে; উড়িষ্যা হইতে দ্রাবিড়পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বোপদ্বীপে ইহা ক্লিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই স্থান হইতে পূর্ব্বকালে ব্যবসায়িগণ জাবা প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্যাদি করিতে যাইতেন।

উষ্ট্রদেশ—কলিঙ্গ দেশেরই অন্তর্গত একটি স্থান।

কর্ণিক—গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বন ছিল; তাহারই নিকট কর্ণিক দেশ; এই দেশে অপর একটি অরণ্য ছিল; তাহার নাম কর্ণিকার বন।

আটবী পুরী—অধুনা মহীশুরের সন্নিকট।

যবন পুর—বোম্বাই প্রদেশস্থ পার্সিগণের রাজধানী; পার্সিগণ বহু পূর্ব্বকালেই পারস্য দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। তাহাদের নামানুসারে তাহাদের বাসস্থানকে কখন কখন যবনপুর কখন বা পারসীক দেশ বলিত।

চোল—অধুনা কঞ্জিবেরম ; ইহার রাজধানী কাঞ্চিপুর ছিল।

মূষিক—চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যের দক্ষিণ হইতে কুমারিকা খণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মন্দদেশ—ছোট নাগপুর।

কর্ণাটক—অধুনা কর্ণাট। ইহাতে যদুবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন ; এখানকার ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণ-বিন্ধ্য বলিয়া অভিহিত ও পৃথক্-শ্রেণী-ভুক্ত।

কার্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥

কর্ণাট পুরাকালে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

কল্যাণ—এক্ষণে বিদর্ভের পশ্চিম দিক্।

উৎকল—অধুনা উড়িষ্যা : এখানে গঙ্গাবংশীয়গণের রাজত্ব-সময়ে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হয় ; এখানকার ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্-শ্রেণী-ভুক্ত। যথা ;—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিল-উৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥

কঙ্কন—অধুনা কোকন ; মালবার উপকূলে স্থিত।

বিদর্ভ—অধুনা বিদুর বা বেরার।

শূরাভীর—আভীরের অপর নাম।

অর্ব্বুদ—বিন্ধ্য-পর্ব্বত-সন্নিহিত প্রদেশ।

কারুষ—বায়ু ও মৎস্য পুরাণ মতে বিন্ধ্যাচলের নিকট।

শাকল—সিন্ধু-প্রদেশস্থ বলিয়া অনুমিত হয়।

পারিপাত্র—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগস্থ দেশ।

বিদিশা—বেত্রবতী-নদী-তীরে।

মাহিক—বর্ত্তমান মহীশূর।

মলয়—পূর্ব্ব-ঘাটের দক্ষিণস্থ দেশ।

নিষধ—বিদর্ভের নিকট ; নৈষধে ইহা বিন্ধ্যাচল ও পয়স্বিনী নদীর মধ্য-স্থিত দেশ বলিয়া উক্ত আছে।

বিন্ধ্যচূলক—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ছিল।

নিষাদ—ভিলগণের অরণ্যময় আবাসস্থান।

কুন্তল—বিদর্ভের নিকট।

গোমন্ত—অধুনা গোয়ার অংশ।

মহারাষ্ট্র—অধুনা মহারাষ্ট্র। বোধ হয় পুরাকালে ইহাকেই সময়ে সময়ে মল্লরাষ্ট্র বা বল্লীরাষ্ট্র বলিত।

গোপরাষ্ট্র—কঙ্কনের দক্ষিণ ভাগ।

কোলগিরি, সুরভীপট্টন, তাম্রাখ্য দ্বীপ প্রভৃতি স্থান ; অধুনা বোম্বাই দ্বীপের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

সেতুক—সেতুবন্ধ রামেশ্বরের সন্নিকটস্থ প্রদেশ।

কুমার—অধুনা কুমারীকা খণ্ড।

ঐষিক—ইহার অপর নাম ঈজিক বা ঈষিক।

শবর—	এই সকলগুলিই দাক্ষিণাত্যে ; কিন্তু ইহাদের বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় করা দুষ্কর।
মৌলিক—	
পৌরিক—	
অশ্মক—	
ভোগবর্দ্ধন—	
তৈলিক—	

উপরে যে সকল স্থানের নাম প্রদত্ত হইল তদ্ব্যতীত আরও কত আছে তাহার

সংখ্যা করা যায় না ; কিন্তু আমরা যে সকল স্থলের সহিত সেই সেই স্থলের বর্ত্তমান নাম স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহাদেরই নামোদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য স্থানেরও নাম আমরা কতকগুলি পাইয়াছি ; তাহাদের বর্ত্তমান নামও কিয়ৎ পরিমাণে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি ; তাহাদের বৃত্তান্ত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে নানা পুরাণাদিতে দেশ প্রদেশাদির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহা হইতে তাহাদের আধুনিক সংস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্ন-প্রদত্ত বর্ণনা টি উদ্ধৃত করিলাম।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥
নবযোজনসহস্রো বিস্তারোঽস্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্॥
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ॥

* * * * * *

* * * * * *

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর-সংবৃতঃ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরঃ।
পূর্ব্বে কিরাতাঃ যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাদ্যৈর্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥
শতদ্রুচন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ।
বেদস্মৃতিমুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোদ্ভবাঃ মুনে॥
নর্ম্মদাসুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ।
তাপী-পয়োষ্ণী-নির্ব্বিন্ধ্যাপ্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ॥
গোদাবরী-ভীমরথী-কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা।
সহ্যপাদোদ্ভবাঃ নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ॥
কৃতমালা-তাম্রপর্ণি-প্রমুখাঃ মলয়োদ্ভবাঃ।
ত্রিসামাচার্য্যকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥
ঋষিকুল্যা-কুমার্য্যাদ্যা শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ॥
আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ॥
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গাঃ মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ॥
তথাপরান্তা সৌরাষ্ট্রাঃ শূরাভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ।
কারুষা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ॥
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূনাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা॥
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগ! হৃষ্টপুষ্ট-জনাকুলাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ। দ্বিতীয়াংশ,
তৃতীয় অধ্যায়।

ইহা পাঠ করিলে অনেক স্থান, পর্ব্বত ও নদীর বিষয় অবগত হওয়া যায় যথার্থ বটে, কিন্তু সেগুলি অধুনা কোথায়, তাহা স্থির করিবার সুন্দর উপায় নাই ; সুতরাং আমরা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে আমাদের পাদস্খলন হইবে না এ কথা বলিতে পারি না। এক্ষণে ভারতীয় নদী গুলির বৃত্তান্ত প্রদান করিতে অগ্রসর হইলাম।

ক্রমশঃ।

প্রমোদ কুমার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যোগেশ ও কুমুদ।

"পতির আদরে আদরিণী নারী
সে আদরে সাধ সদাই প্রাণে"

জমীদার-গৃহে একটী প্রকোষ্ঠে কুমদিনী একখানি পুস্তক হস্তে উপবিষ্টা রহিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু পুস্তকের উপরি স্থাপিত, কিন্তু মন বোধ হয় পুস্তকে নিবিষ্ট নহে। তাঁহার বদন-মণ্ডল চিন্তাকুল, বিষণ্ণ এবং ঈষৎ ঘর্ম্মে আপ্লুত। কুমুদ অন্যমনস্কতার সহিত দুচারি পাত উল্টাইয়া পুস্তকখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। এমন সময় সুহাস গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "কুমুদ!—খাবে না?—অনেক বেলা হ'য়েছে যে—"

কু। "আমার আজ অসুখ ক'রেছে।"

সু। "অসুখ ক'রেছে?—কি অসুখ কুমুদ?"

কু। "কি অসুখ তা' জানিনে।"

সু। "তোমার অসুখ তুমি জান না?—মাথা ধরেছে?"

কু। "আমার শরীরে কোন অসুখ নাই—মনের অসুখ।"

সু। "বিনা কারণে মনের অসুখ?"

কু। "বিনা কারণে!"

সু। "ওঃ! মনে ছিল না—দাদা এখানে নাই ব'লে—তা এক দিনে কি তোর এত মনের অসুখ হ'য়েছে?"

কু। "হুঁ—তুই বড় দুষ্ট হ'য়েছিস্—দাঁড়া তোকে জব্দ কর্‌ছি। শোন্ তোকে একটা গল্প বলি—একটী মেয়ে আছে তার নাম সুহাস—সে প্রমো—" কুমুদ আরও বলিতে যাইতেছিলেন, সুহাস হস্ত দ্বারা তাহার মুখ আবরণ করিল।

কু। "আর আমায় কিছু ব'ল্‌বি?"

সু। "না।"

কু। "আচ্ছা আমি একটা কাজ ব'ল্‌ব—শুন্‌বি?"

সু। "হাঁ।"

কু। "আচ্ছা আমার পাখীটা দিয়ে আস্তে আস্তে চ'লে যা।"

সুহাস পক্ষী দিয়া চলিয়া গেল।

কুমুদ সাদরে পক্ষীর চঞ্চুতে স্বীয় ওষ্ঠ স্থাপন করিয়া বলিল "বল্ দেখি পাখী, পুরুষের মন এত কঠিন কেন?" সহজে পক্ষি-জাতি—তাহাতে সে আবার এত বেলা অবধি আহার পায় নাই, সে আদর বুঝিবে কেন?—পক্ষী ক্রোধে কুমুদের ওষ্ঠে দংশন করিল। কুমুদ ক্রোধ-ভরে পক্ষীকে দূরে নিক্ষেপ করিল। অদূরে বসিয়া একটী মার্জ্জার মহাশয় লোলুপ নেত্রে পক্ষীর প্রতি চাহিয়াছিলেন—এক্ষণে সুবিধা পাইয়া তৎ-প্রতি ধাবমান হইলেন। কুমুদ দংশন-জ্বালা বিস্মৃত হইয়া মার্জ্জার-হস্ত হইতে পক্ষীকে রক্ষা করিলেন এবং পুনরায় সাদরে পক্ষীকে বলিলেন "বল্ দেখি পাখী, তিনি এসেছেন কি না?" পাখীটী শিক্ষিত—যাহা শুনে তাহার সমুদয় অংশ পারুক বা নাই পারুক তাহার দুটী একটী কথা তৎক্ষণাৎ বলিতে পারে। সে বলিল "এসেছেন।"

কুমুদ বলিল "দূর্ মিথ্যাবাদী।"

পাখীও বলিল "দূর্ মিথ্যাবাদী।"

"না কুমুদ পাখী মিথ্যাবাদী নহে" বলিয়া যোগেশ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি এত ক্ষণ দ্বারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল শুনিতেছিলেন। কুমুদ হর্ষ-বিভাসিত মুখে বলিল "তুমি কখন এলে।"

যোগেশ বলিল "এই কত ক্ষণ।"

কু। "দুদিনের মধ্যে আসিবে বলিয়া এত দেরি করিলে—যাও, তোমার সহিত কথা কহিব না।"

কুমুদ মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিলেন। যোগেশ হাসিয়া বলিলেন "সাধ করিয়া বিলম্ব করি নাই, কার্য্য-গতিকে বিলম্ব হইয়া গেল—আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখন বিলম্ব করিব না। যোগেশের প্রতিজ্ঞা তাহার কাছে বেদ-বাক্য—তাহার অভিমান দূরে গেল। সে হাসিয়া বলিল "এক জনকে কাঁদাইতে তোমার মনে ভারি সুখ হয়—না?"

যো। "কেন কুমুদ?"

কু। "আমি এই কদিন তোমার জন্য কত ভাবিয়াছি—আর তুমি সেখানে নিরু-দ্বেগে বসিয়াছিলে।"

যোগেশের মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন "কুমুদ! তুমি দেখিতেছি অন্ত-র্যামিনী হইয়াছ—আমি নিরুদ্বেগে ছিলাম তাহা তোমায় কে বলিল? প্রাণের কুম! তোমায় ভাল বাসিয়া আমার আজও আশা মিটে নাই—হৃদয়ে এমন কোন স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না যেখানে তোমায় রাখিয়া সুখী হই।" এই বলিয়া যোগেশ সস্নেহে কুমু-দিনীর হস্ত দুটী লইয়া স্বীয় বক্ষে স্থাপিত করিলেন। কুমুদের হৃদয় যে কি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য। স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর স্নেহ, স্বামীর আদর ভিন্ন পতিব্রতা রমণীর এ জগতে আর কি প্রার্থনীয়? যোগেশ! তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা ব্যতীত কুমুদ আর কিছুই চাহে না—তোমার আদ-রেই সে আদরিণী, তোমার স্নেহেই সেই সুখী। কুমুদ চঞ্চল চক্ষু দুটী তুলিয়া যোগে-শের প্রতি চাহিলেন—চারি চক্ষু সংমিলিত হইল—কুমুদ মুখ অবনত করিলেন। যদি সে সময় কেহ সে ভ্রমর-নিন্দিত চঞ্চল নয়ন দুটী দেখিতেন, তাহা হইলে কুমুদের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিতেন।

কুমুদিনী বলিল "সুহাসের বিবাহের কি হইল?"

যোগেশ। "বোধ হয় শীঘ্র হইবে।"

"কার সঙ্গে?"

"তা আমি জানি না।"

কুমুদ হাসিয়া বলিল "তবে কি করিয়া শীঘ্র হইবে?"

"আমি যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি।"

"প্রমোদ দাদার সহিত সুহাসের বিবাহ হইবে না?"

"জানি না—হইলেও হইতে পারে।"

"তুমি না সে বিষয় ঠাকুরকে ব'ল্‌বে ব'লেছিলে?"

"হাঁ—বলিব।"

"কবে?"

"আজ।"

যোগেশ কিয়ৎ ক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "সুহাস প্রমোদকে খুব ভাল বাসে—না?"

"হাঁ।"

"তাহাদের এ বিবাহ হওয়া খুব উচিত।"

"হাঁ।"

যোগে। "কুমুদ! বাবাজি কি এ বিবাহে সম্মত হইবেন? তিনি কুলীন-পুত্র চান—প্রমোদের সহিত কি তিনি সুহাসের বিবাহ দিবেন?—প্রমোদের কুলশীল অজ্ঞাত; কিন্তু প্রমোদের মত সৎপাত্র পাওয়া অতিশয় দুষ্কর। আমি তাহাকে সহোদর অপেক্ষা স্নেহ করি। আমি এখনই এ বিষয় পিতাকে জানাইব; সুহাসের সহিত প্রমোদের বিবাহ যেরূপে পারি দেওয়াইব। কুম! আমি যাই—"

কু। "যাবে?—যাও; তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না।"

যো। "আমারও যাইতে ইচ্ছা করে না।"

যোগেশ চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাবে।

'All his successors gone before him
Have done it.'

Shakespeare.

'But man proud man
Drest in a little brief authority
Most ignorant of what he is most assured'.

Shakespeare.

প্রাতঃকালের কার্য্যাদিতে পরিশ্রান্ত হইয়া আহারান্তে বৃদ্ধ জমীদার শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা-দেবীকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত—মুখে আনন্দ।

নিকটে বসিয়া অনেক ভৃত্য ব্যজন করিতেছে। এমন সময় কে দ্বারে আঘাত করিল। হরিহর ভৃত্যকে বলিলেন "কে দেখত ?" ভৃত্য পাখা রাখিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিল। যোগেশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন—জমীদার নয়ন উন্মীলন করিলেন না; নিমীলিত নেত্রে বলিলেন "কে ?" ভৃত্য উত্তর দিল "বড় বাবু।" বৃদ্ধের নিদ্রা ঘুচিয়া গেল—তিনি উঠিয়া বসিলেন। জমীদার বলিলেন "কে—যোগেশ ?" যোগেশ উত্তর দিল—"আজ্ঞা হাঁ।"

জমীদার বলিলেন "কখন এলে ?"

যো। "অনেক ক্ষণ।"

জ। "আমার নিকট আসিতে বিলম্ব করিলে কেন ?"

যোগেশ বলিলেন "এই সকলের সহিত কথাবার্ত্তায় বিলম্ব হ'য়ে গেল।"

জ। "রৌদ্রেতে বোধ হয় আসিতে কষ্ট হইয়াছে—বৈকালে বাহির হইলে না কেন ?"

যোগেশ নিরুত্তর।

জ। "আহার হইয়াছে ?"

যো। "হাঁ, আহার করিয়াই বাহির হইয়াছিলাম।"

জমীদার কিয়ৎ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "গোলমালের কি হইল ?—চুকিয়া গিয়াছেত ?"

যো। "আজ্ঞা হাঁ—সে সকল নায়েবের দোষেই ঘটিয়াছিল।"

জ। "নায়েব কি করিয়াছিল ?"

যো। "যে হারে খাজনা লইবার আজ্ঞা ছিল, সে তাহাপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিত; এবং যে প্রজা তাহাতে অসম্মত হইত সে তাহার উপর নানাবিধ অযথা অত্যাচার করিত।"

জ। "আহা—গরীব লোকেরা তাহা হইলে বড় কষ্ট পাইয়াছে ?—নায়েবকে শাসন করিয়া দিয়াছ ?"

যো। "হাঁ।"

জ। "এবার ফসলের অবস্থা কিরূপ দেখ্‌লে ?"

যো। "খুব ভাল—সকল জমীতেই প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়াছে।"

জ। "আর আর জমীদারদিগের জমীর অবস্থা কিরূপ ?"

যো। সকলেরই ভাল—বিশেষতঃ গোবিন্দপুরের জমীদারের জমীর অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।"

জমীদার ধীরে ধীরে দুই এক বার "গোবিন্দ পুর" উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—"তাহাদের জমীদারি কি খুব বিস্তীর্ণ ?"

যো। "হাঁ।"

জ। "গোবিন্দপুরের জমীদার-পুত্রের সহিত সুহাসের বিবাহ হইবে।" যোগেশ নির্ব্বাক্,—মুখে আর কথাটি নাই।

জ। "কি ভাবিতেছ ?"

যো। "গোবিন্দ পুরের জমীদার-পুত্রের সহিত সুহাসের বিবাহ হইবে ?—কবে ঠিক হইল ?—আমিত কিছুই জানি না।"

জ। "হাঁ—সব ঠিক করিয়া তোমায় বলিব মনে করিয়াছিলাম। পরশ্ব দিবস আমি পাত্র দেখিয়া আসিয়াছি—পাত্রটী আমার মনোনীত হইয়াছে। সেখান হইতে অদ্য একখান পত্র পাইয়াছি—এই দেখ।" এই বলিয়া পত্রখানি যোগেশের হস্তে

দিলেন। যোগেশ পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন, ১৫ই বৈশাখ বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। আর কেবল ১৫ দিবস মাত্র আছে। যোগেশ কিয়ৎ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "পাত্রটী লেখা পড়া কেমন জানে?"

জ। "লেখা পড়া জানে না। আর কোন্ জমীদারই বা ছেলেকে লেখা পড়া শিখান? এতগুলি পাত্র দেখিলাম কেহই লেখা পড়া জানে না। আমিই কেবল বোস্জার অনুরোধে তোমায় কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলাম। তাহার ফলও পাইতেছি।"

যোগেশ ঈষৎ হাস্য সহকারে মুখ নত করিয়া বলিলেন—"কি ফল পাইয়াছেন?"

জ। "আর ফল নয়—তুমি সুহাসকে লেখা পড়া শিখাইয়াছ একথা তাহাদের কর্ণে গিয়াছে—তাহারা বলে অধিক পণ না দিলে আমরা লেখা পড়াওয়ালা মেয়ে ঘরে নেব না।"

যো। "পাত্রের কি কোন বিশেষ গুণ আছে?"

জ। "তাহা কিরূপে বলিব—রামচরণ মুখোপাধ্যায় (গোবিন্দ পুরের জমীদার) কুলীন-চূড়ামণি।"

যোগেশ মনে মনে হাসিয়া বলিলেন "আপনি যদি কুলহীন সৎপাত্র পান তাহা হইলে কি কন্যাদান করেন না?"

জ। "না—তুমি যাই বল, আমি কুলীন হ'য়ে কখনই কুলভঙ্গ ক'র্‌তে পারি না।"

যো। "প্রমোদের সহিত সুহাসের বিবাহ দিন্ না?"

জ। "বাবা, তা যদি হবে তাহা হইলে এত কষ্ট কেন? আমি সে বিষয় পূর্ব্বে ভাবিয়াছি—প্রমোদের সহিত সুহাসের বিবাহ হইতে পারে না, কারণ প্রমোদ অজ্ঞাত-কুলশীল। আমায় যদি কেহ প্রমোদের কুলশীল জানাইতে পারে তাহা হইলে আমি এখনই সুহাসের সহিত প্রমোদের বিবাহ দিই। আমার অদৃষ্ট মন্দ যে প্রমোদ নিজের বিষয় জ্ঞাত নয়।"

যো। "কুলীন পাত্রে কন্যা দান করিলে কি কিছু লাভ আছে?"

জ। "লাভ থাকুক্ বা নাই থাকুক্, বংশ-পরম্পরায় যাহা হইয়া আসিতেছে তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না।"

যোগেশ ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন "আপনার বংশেও কখন স্ত্রীশিক্ষা ছিল না, তবে এখন হইতেছে কেন?"

জ। "সে কেবল তোমার অনুরোধে—আমার ইচ্ছায় নহে।"

যো। "আমার অনুরোধে প্রমোদের সহিত সুহাসের বিবাহ দিন্ না?"

জ। "না বাবা, তা আমি কিছুতেই করিতে পারি না।"

যো। "আপনি কি স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছেন যে প্রমোদের সহিত সুহাসের বিবাহ হইতে পারিবে না?"

জ। "হাঁ।"

উভয়ে কিয়ৎ কাল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

যো। "প্রমোদের সহিত সুহাসের বিবাহ হইলে সকলে সুখী হইত।"

জ। "তাহা আমি জানি—আমিও অতিশয় সুখী হইতাম, কিন্তু তাহা কি করিয়া

হইতে পারে—কি জানি প্রমোদকে দেখিয়া অবধি উহার উপর আমার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে—আমি জানি প্রমোদ আমার কনিষ্ঠ পুত্র।"

যো। "আমি প্রমোদকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানি—প্রমোদকে জামাতা করুন, সকলে সুখী হইবে।"

জ। "সকলই বিধাতার ইচ্ছা—প্রমোদের যদি কুলশীল জানিতাম তাহা হইলে কাহা-কেও আমায় অনুরোধ করিতে হইত না। যোগেশ! ভাবিয়া দেখ কি করিয়া অজ্ঞাত-কুলশীল যুবককে কন্যা অর্পণ করিতে পারি। প্রমোদ আমার জামাতা নাই হউক—প্রমোদ আমার কনিষ্ঠ পুত্র।"

যোগেশ শেষ বার জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রমোদের সহিত সুহাসের বিবাহ হইতে পারে কি না?" বৃদ্ধ বলিলেন "না।"

যোগেশ জন্মে পিতার কথায় এত অধিক কথা কখন বলেন নাই। যোগেশ দেখিলেন হরিহর স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছেন, আর অধিক কিছু বলা নিষ্ফল। তিনি বলিলেন "আমি এখন যাই" জমীদার বলিলেন "এস।"

যোগেশ ক্ষুণ্ণ মনে গৃহ পরিত্যাগ করি-লেন। বৃদ্ধ শয়নের উদ্যোগ দেখিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশায় নৈরাশ্যে।

—:o:—

"এযে নিষ্ঠুর সংসার——
(হেথা) পাপ প্রণয়ের নাম বন প্রেমিকের ধাম"

বাসন্তী।

সুহাসের বিবাহ-বার্ত্তা প্রমোদের কর্ণ-গোচর হইল। প্রমোদ তাহা জানিতেন—কিন্তু মনুষ্য আশার দাস, প্রমোদও আশার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন; আজ তাঁহার সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হইল। মরুভূমির মাঝে একমাত্র প্রস্রবণ, আঁধার আকাশের এক-মাত্র তারকা সুহাস—সে যদি প্রমোদের হইল না তবে প্রমোদের আর জীবনে সুখ কি? প্রমোদ জন্মের মত হরিপুর পরিত্যাগ করিবেন;—প্রমোদ সন্ন্যাসী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবেন, প্রমোদ আর সংসারে প্রবেশ করিবেন না। সংসার নিষ্ঠুর;—সংসার দরিদ্রের নিমিত্ত নহে—সংসারের লোক দরিদ্রের দুঃখ বোঝে না। তরু, মরু, বায়ু,

নদী, ভবন ও বিহঙ্গের নিকট প্রমোদ দুঃখের কথা বলিবেন,—আর সেই হৃদয়ের ধনকে ধ্যান করিয়া জীবন কাটাইবেন। প্রমোদ দৃঢ়-সঙ্কল্প। প্রমোদ যাহা ভাবিয়াছেন—তাহা করিবেন। প্রমোদ অটল—প্রমোদ অচল। প্রমোদ আজ রাত্রেই হরিপুর ত্যাগ করিয়া, হৃদয়ের সুহাসকে ছাড়িয়া, যোগেশ হরিহর প্রভৃতির স্নেহ এড়াইয়া, চলিয়া যাইবেন; তাই বুঝি সূর্য্য অদ্য অস্ত যাইবে না। প্রমোদ বারংবার আকাশের প্রতি চাহিতেছেন—এখনও সূর্য্য রহিয়াছে, এখনও রৌদ্র রহিয়াছে। সূর্য্য! আজি আর তুমি অস্ত যাইও না—তুমিও অস্ত যাইবে, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনী সুহাসের হৃদয়াকাশের সূর্য্যও অস্ত যাইবে। দিনমণি! রাত্রি-প্রভাতে আসিয়া তুমি কি প্রেম-বিদগ্ধা দুঃখিনী সরলা বালিকার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিবে? সূর্য্য আমাদের কথা শুনিলেন না—ধীরে ধীরে পশ্চিমে নামিলেন। উঃ পশ্চিম-গগন কি আরক্ত! ওই দেখিতে দেখিতে অৰ্দ্ধেক সূর্য্য কোথায় গেল—আরও একটু কমিল, ওই আবার একটু কমিল, ওই,—ওই—আর দেখা যায় না—সূর্য্য দিগন্ত-বেলায় মিশাইয়া গেল; প্রমোদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সুহাস কুমুদের সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিল "ভাই! সূর্য্য আজ বড় শীঘ্র গেল।" প্রমোদ স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন; কাগজ, কলম, মস্যাধার বাহির করিলেন। প্রমোদ পত্র লিখিবেন; একখানি কাগজ লইয়া একটী অক্ষর লিখিলেন—দুইটী, তিনটী লিখিবেন; হস্ত কাঁপিতে লাগিল; দুই এক ফোটা করিয়া অশ্রু-বিন্দু কাগজের উপর পড়িতে লাগিল—পত্র লেখা হইল না—কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; কিয়ৎ কাল নীরবে রোদন করিলেন; কিন্তু শীঘ্র সে অশ্রু-বিন্দু শুকাইল—নৈরাশ্যের দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব মুখে দেখা দিল। প্রমোদ পুনরায় কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন; অনেক কষ্টে দুইখানি পত্র লিখিলেন; একখানি পত্রের শিরোনামায় যোগেশের নাম দিলেন—অপরটী ভাল দেখিতে পাইলাম না, বোধ হয় সুহাসের।

প্রমোদ যোগেশের পত্রখানি যোগেশের একখানি পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া দিলেন—অপরখানি তাঁহার নিকট রহিল। এমন সময় যোগেশ "প্রমোদ" "প্রমোদ" বলিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। প্রমোদ দ্বার খুলিলেন—যোগেশ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "প্রমোদ! খাবে না?" প্রমোদ বলিল "হুঁ।"

যো। "তুমি ভাই বড় নিরাশ হইয়াছ; সুহাসের যাহাতে এ বিবাহ না হয় আমি তাহার চেষ্টা দেখিতেছি। তুমি ভাই নিরাশ হইও না—।"

প্রমোদ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন "না।"

যো। "আমার 'শকুন্তলা' খানা কোথায়?"

প্র। আমার নিকটে আছে, বিশেষ আবশ্যক আছে কি?—আমি আজ রাত্রে পড়িব মনে করিয়াছি।"

যো। "বিশেষ আবশ্যক নাই; তুমি পড়িবে?—পড়িও। তোমায় আবার বলিতেছি "নিরাশ হইও না; এস এখন খাবে এস।"

উভয়ে আহারোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। আহার শেষ হইলে সকলে শয়নের উদ্যোগ দেখিলেন। যোগেশ পুনরায় প্রমোদকে বলিলেন "নিরাশ হইও না—আমি তোমার জন্য আবার চেষ্টা দেখিব।" কিন্তু প্রমোদ বুঝিয়াছিলেন জমীদার স্থির-সঙ্কল্প। কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবে না; সেই জন্য যোগেশের চেষ্টাও সফল হইবে না। যাহা হউক, তিনি স্বীয়-সঙ্কল্প-সাধন করিতে বিরত হইলেন না।

ক্রমে রজনী গভীরা হইল। প্রমোদ ব্যতীত জমীদার-গৃহে সকলেই সুষুপ্ত। আর একটুকু অন্ধকার হইলে প্রমোদ বাহির হইবেন। ক্রমে সেটুকুও হইল। প্রমোদ ভাবিলেন "যাইবার পূর্ব্বে এক বার হৃদয়ের ধনকে হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া যাইব।" আবার ভাবিলেন "না দেখিব না।" কিন্তু এ দুর্দমনীয় ইচ্ছা দমন করিতে পারিলেন না; হৃদয়ের উদ্বেগে ধীরে ধীরে সুহাসের গৃহোদ্দেশে চলিলেন। অন্তঃপুরে উদ্যানের উপরেই সুহাসের গৃহ। প্রমোদ মৃদু-পদ-সঞ্চারে সুহাসের গৃহের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন কবাট অর্দ্ধোন্মুক্ত; সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে কবাট খুলিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেন কোন মন্ত্র-বলে চালিত হইয়া তিনি নিদ্রিত বালিকার শিয়র-দেশে দাঁড়াইলেন; নির্নিমেষ নয়নে সেই অতুল রূপ-রাশি দেখিতে লাগিলেন—আঁখি আর ফিরিতে চাহে না—দেখিয়া আর সাধ মিটে না। প্রমোদ সুহাসকে চাহে না; সে কেবল তাহাকে দেখিয়া জীবন কাটাইবে। প্রমোদ, এমন সোণার পুত্তলীকে কাঁদাইয়া কোথায় যাইবে? হরিপুর পরিত্যাগ করিলে প্রমোদ ত আর এ অতুল রূপ-রাশি দেখিতে পাইবেন না, এ মধুময় সুধা-মাখা কথা ত আর শুনিতে পাইবেন না; প্রমোদ তবে কেন হরিপুর পরিত্যাগ করিবেন? প্রমোদ হরিপুর পরিত্যাগ করিবেন না। প্রমোদ! সুহাসের মুখ দেখিয়া সকল সংকল্প ভুলিলে? প্রমোদ! সুহাসের মুখ দেখিয়া জীবন কাটাইবে? নির্ব্বোধ! সে তখন কি আর তোমার থাকিবে?—সে তখন পর-স্ত্রী। পাপিষ্ঠ! পর-স্ত্রীর মুখ দেখিয়া জীবন কাটাইবে? উঃ! সে চিন্তাও প্রমোদের পক্ষে অসহনীয়। না—প্রমোদ হরিপুর পরিত্যাগ করিবেন। সহসা প্রমোদের চমক ভাঙ্গিল—রাত্রি ক্রমে গভীরা হইতেছে। প্রমোদ দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন, আবার ফিরিয়া চাহিলেন—নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল; পুনরায় অগ্রসর হইলেন, পুনরায় ফিরিলেন, পুনরায় কাঁদিলেন। এই রূপে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন—আর এক বার জন্মের মত ফিরিলেন—আর এক বার জন্মের মত হৃদয়ের ধনকে দেখিলেন, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। প্রমোদ ধীরে ধীরে কবাট উন্মোচন পূর্ব্বক উদ্যানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রমোদ পূর্ব্বেই চাবি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে উদ্যানের দ্বার উন্মোচন করিলেন—এক পদ বাড়াইলেন। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—আকাশের দিকে চাহিলেন; মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন; হৃদয়ের উদ্বেগে অপর পদ বাড়াইলেন;

ধীরে ধীরে দামোদর-তীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুহাস তখন স্বপ্নে দেখিতেছিল "যে লতাকে এত যত্ন করিয়া সে স্নেহ-সলিল সিঞ্চন করিতেছিল আজ সহসা এক প্রবল ঝটিকা আসিয়া তাহার যত্নের, তাহার স্নেহের, তাহার সেই সোণার লতা ছিন্ন করিল।" নিদ্রিতা বালিকা কাঁদিয়া উঠিল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

তাড়িত তত্ত্বের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

গিল্‌বার্ট চুম্বকার্ষণ ও তাড়িতাকর্ষণের বিভেদ-নির্দ্দেশ-স্থলে বলেন যে, লৌহ ও চুম্বক পরস্পর আকর্ষণ করিয়া থাকে—ঘৃষ্ট তাড়িত-পদার্থ অনুত্তেজিত (অঘৃষ্ট) দ্রব্য আকর্ষণ করে এবং প্রকৃতিস্থ আকৃষ্ট (Atracted) বস্তু আকর্ষণ-বেগ-বিশূন্য—নিশ্চেষ্ট। আর চুম্বক যেমন প্রতিক্ষেপণ (Repulsion) ও আকর্ষণ (Atraction)-গুণ-বিশিষ্ট, তাড়িতের তাদৃশ উভয় ধর্ম্ম নাই—কেবল আকর্ষণ-শক্তিমাত্র আছে। গিল্‌বার্টের এই সকল মত ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত।

৮। রবার্ট বয়েল (Robert Boyle)।—মহোদয় গিল্‌বার্টের পূর্ব্বোক্ত মহতী আবিষ্ক্রিয়ার ষষ্টি (৬০) বৎসরের মধ্যে তাড়িত-কার্য্যের কোনও অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হয় নাই। অতঃপর বয়েল্‌ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ লক্‌ (Locke) এবং নিউটনের (Newton) সমকালিক। ঘর্ষিত বা উত্তেজিত এবং অঘর্ষিত বা অনুত্তেজিত তাড়িত দ্রব্যের সম্বন্ধ ও স্বরূপ নির্ণয়োদ্দেশে যে যে পরীক্ষণ-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, যদিও তাহা সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অনুমোদিত এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অবধানতারও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে বটে, তথাপি তাহা কখনই সন্তোষজনক নহে। এই সময়ে তাড়িত-তালিকায় কয়েকটী অভিনব পদার্থের সংযোগ হয়। কিংবদন্তী আছে—এই মহানুভাবই তাড়িত হইতে অগ্নিকণা সমুদ্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কি নিয়মে বা

কারণে এই ক্রিয়া সংঘটিত হয়, বয়েল্ তাহা অবগত ছিলেন না।

৯। অটো গেরিক্ (Ottoe Guericke) বায়ু-যন্ত্রের (Air-Pump) আদি আবিষ্কর্ত্তা ও বৈদ্যুতিক তত্ত্বের বিশেষ-উন্নতি-বিধাতা বলিয়া খ্যাত। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুধীগণের সময়ে চাঁচগালা, কাচ, গন্ধক চাকৃতি বা দণ্ড, রেশম কিংবা হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, তড়িৎ উৎপন্ন হইত; গ্যারিক্-প্রচারিত যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ অধিক পরিমাণে উদ্ভূত হইতে থাকিল এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরীক্ষাও চলিতে লাগিল। এত কাল ধরিয়া জন সাধারণ তড়িত্তের আকর্ষণী-শক্তি-মাত্র বিজ্ঞাত ছিলেন। গেরিকের প্রযত্নে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ও ধ্বনি আবিষ্কৃত হয়। এতদ্ব্যতীত তড়িৎ-প্রতিক্ষেপণ-গুণও এই সময় প্রচারিত হইয়াছিল।

১০। সার্ আইজাক্ নিউটন্ (Sir Isaac Nowton) নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইলেও, কেবল একমাত্র মাধ্যাকর্ষণে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিউটন্ যে প্রিন্সিপিয়া (Principia) গ্রন্থ রচনা করিয়া অতুল প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক মতে ইয়ুরোপে হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া যায়। তদানীং বিদ্যুতীয় বিদ্যায় সাধারণের মনোযোগ-দানের নিরবকাশতা হেতু ইহার উন্নতি কিয়দংশে বিলম্বিত হইয়া পড়ে। কিন্তু নিউটন্ এমন একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন, যাহাতে তড়িদ্বিষয়ক উন্নতি এক পদ অগ্রসর হইয়াছিল, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বলেন, কাচের মধ্য দিয়া তড়িৎ আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণ-কার্য্য সংসাধিত হয়। কাচ যে পরিচালক (Conductor) তাহার সূচনা এই মহাপুরুষ দ্বারাই অনেকাংশে সুনিষ্পন্ন হয়।

১১। ডাক্তার ওয়াল্ (Doctor Wall) যষ্টি-পরিমিত কহরুবা রেশম বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া এত অধিক তড়িৎ প্রাপ্ত হন যে, গেরিকের যন্ত্র (Air-Pump) দ্বারা তত অধিক তড়িৎ কোন মতেই পাওয়া সম্ভাবিত নহে। তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ (Electric Spark) ও বিদ্যুৎ (Electricity) যে একই পদার্থ, ওয়াল্ই তাহা সপ্রমাণ করেন।*

১২। ষ্টিফেন্ গ্রে (Stephen Gray)।— ওয়াল্ সাহেবের তত্ত্বানুসন্ধানের ৪০ চল্লিশ-বৎসরান্তে অর্থাৎ ১৭২৯ খৃষ্ট-শতাব্দে তড়িদ্বিজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রাথমিক পুস্তক রচনা ও প্রচারণের ১৩০ বর্ষ পরে তাড়িতের অপরিচালকতা (Insulation Non-Conduction) ও পরিচালকতা (Conduction) নিরূপিত হয়। কার্পাস-সূত্র, রেশম সূত্র ও ধাতব 'তার' দ্বারা নানারূপ পরীক্ষা (Experi-

* এই তথ্যটী প্রতিপাদনার্থে ওয়ালের নিজের কথার উপরে নির্ভর করা সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত। অতএব এক্ষণে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল ;—

"যখনই আমি কহরুবা ঘর্ষণ করি, তখনই ফট্ ফট্ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। এবং প্রতি শব্দের সহিত এক একটী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গও দৃষ্ট হওয়ায় আমায় একান্ত বিস্মিত করিয়াছিল। কেননা, অগ্নি-কণা-বিনির্গমন-কালে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিলে, বিলক্ষণ আঘাত (Shock) অনুভব করা যায়। এই অগ্নি-কণা এবং ফট্ ফট্ শব্দ তড়িৎ ও বজ্র হইতে অভিন্ন।"

ments) ও সমীক্ষণে (Observation) সিদ্ধান্ত হয় যে. ধাতব 'তার' যেরূপ সুপরিচালক তেমন আর কিছুই নহে। 'গ্রে' সাহেবের সহকারী হুইলার এ বিষয়ে গ্রে সাহেবকে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তথ্যটী সহজে ও স্বল্প কালের মধ্যে বিশদী-কৃত হইয়া আইসে।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায়।

—:০:—

বঙ্গ-নারী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

স্ত্রীগণের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, ও
স্ত্রীশিক্ষার প্রতিবন্ধক কি?

"Women govern us. Let us render them perfect; the more they are enlightened, so much the more shall we be. On the cultivation of the mind of women depends the wisdom of men. It is by women that nature writes on the hearts of men."

Sheridan.

এক একটী সংসার সেই রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। রমণী ইহার শাসনকর্ত্রী, পুরুষ তাঁহার মন্ত্রী ও সহকারী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন ইহার আশ্রিত প্রজা ও দাস-দাসী-বর্গ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। রাজকর বিশুদ্ধ প্রীতি ও শাসনকর্ত্রী ও তাঁহার সহকারীর লাভ বিমল আনন্দ। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা এ রাজ্যের বিঘ্নকারী বৈরি-দল; এ রাজ্যের প্রধান শান্তি-রক্ষক প্রেম; সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা তাঁহার অনুচর ও সহচর। পুরুষ, দিবসের অধিকাংশ সময়ই সংসারের বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, রমণীকে ইহার আভ্যন্তরীণ কার্য্য সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইহার আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সুখ সচ্ছন্দতার হ্রাস বৃদ্ধি সমুদায়ই রমণীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পুরুষের কার্য্য সংসারের বাহিরে, রমণীর কার্য্য ইহার ভিতরে। পুরুষ রমণীর মন্ত্রী, কিন্তু রমণী স্বয়ং কার্য্য-নির্ব্বাহক। তজ্জন্য রমণীর সৎ শিক্ষার প্রয়োজন, সেই জন্য তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও ভূয়োদর্শনের আবশ্যকতা। যে জ্ঞান-বলে তিনি আপনার কর্ত্তব্য-নিরূপণে সমর্থ, যে জ্ঞান-বলে মন্দ হইতে ভাল পৃথক করিয়া সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সক্ষম, তাঁহার সেই জ্ঞান থাকা আবশ্যক; কিন্তু বঙ্গ-নারীগণের অবস্থা কিরূপ? এখানে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে এরূপ শিক্ষার অস্তিত্ব অপেক্ষা ইহার বিলোপই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। স্ত্রী-গণের পুরুষদিগের ন্যায় উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। অল্প শিক্ষা বিষময় ফল উৎপাদন করে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা হইতে অমৃত উৎপন্ন হয়। "বোধোদয়" বা "চারুপাঠের" দুই চারি ছত্র পড়িয়া স্বামীকে মাথামুণ্ড পত্র লেখা অপেক্ষা, নিরক্ষরা হইয়া গৃহ-পালিত পশুর ন্যায় অন্তঃপুর পিঞ্জরের মধ্যে সংবদ্ধ হইয়া থাকা সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর। অমূল্য জীবনের অমূল্য সময় কেবলমাত্র নবীনী-পদ্য ও বঙ্কিমী উপন্যাস পড়িয়া, কার্পেট বুনিয়া, পায়ের উপর পা দিয়া, প্রাণনাথকে পত্র লিখিয়া, অপব্যয় করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীগণের বিশুদ্ধ কবিতা বা উপন্যাস পাঠের আমরা বিরোধী নহি। তবে যদি তাঁহাদের তাবৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য উপন্যাস-পাঠ ভিন্ন আর কিছুই না হয়, আমরা ঐপ্রকার শিক্ষারই বিরোধী। শিক্ষার উদ্দেশ্য উপন্যাস-পাঠ যদি ইহাই শেষে স্থিরীকৃত হইল, তবে এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন কি? স্ত্রীগণের উচ্চ শিক্ষা চাই। আমরা এইরূপ শিক্ষারই পক্ষপাতী।

স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধিগণ বলেন "স্ত্রীশিক্ষায় অনেক দোষ, শিক্ষিতা স্ত্রীরা ভারি বাবু, বড় অলস, খুব বিলাসী। তাঁহারা সংসারের কোন কর্ম্মেই আসেন না; কেবল পুঁথী লইয়াই ব্যস্ত থাকেন; তাঁহাদের চরিত্র বিগড়াইয়া যায়; শিক্ষিতা স্ত্রী মূর্খ স্বামী পছন্দ করেন না; দাম্পত্য প্রণয় তাঁহাদের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" স্ত্রীগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই যে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্যের বাহির হইয়া পড়েন এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। অর্দ্ধ-শিক্ষা-প্রাপ্তা গর্ব্বিতা স্ত্রীদের আচার ব্যবহার দেখিয়া স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধিগণ যে এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; নচেৎ শিক্ষার কোন দোষ নাই; বরং পক্ষান্তরে শিক্ষিতা নারীই সংসারের অশেষ কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইয়া থাকেন। মা শিক্ষিতা হইলে পুত্রও সহজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এথেন-উল্‌ফ-তনয় মহামতি আল্‌ফ্রেড (Alfred the Great) তাঁহার মাতার নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। যোসেফ্ মেজিনী ও নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর উন্নতির মূলে তাঁহাদের জননী বিরাজিতা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীর এক অমূল্য রত্ন। যিনি মিলের জীবনী একটী বার পাঠ করিয়াছেন তাঁহাকে অক্ষুব্ধ হৃদয়ে এ বাক্যের যথার্থতার বিষয় স্বীকার করিতেই হইবে। কি শুভক্ষণেই

মিল মিস্ টেনারের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞানের উন্নতি-সাধক সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম হামিলটন (Sir William Hamilton) তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে তিনি উন্নতির উচ্চ মঞ্চে কখন উঠিতে চেষ্টা করিতেন কি না সন্দেহ। শুনা যায় যে তাঁহার দর্শন-বিষয়ক উপদেশ সকল, অধিকাংশ তাঁহার স্ত্রী দ্বারাই লিখিত। আমাদের কালিদাসের বিদ্যা-লাভের বিষয়ে একটী প্রবাদ আছে যে তিনি তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালাভে বদ্ধ-পরিকর হন। প্রবাদ-বাক্য সম্পূর্ণ সত্য না হইতে পারে; কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এ কথা বলিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার উন্নতির মূলে যে তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন এ কথা আমরা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারি।

স্ত্রী শিক্ষিতা হইলে যে তাঁহার চরিত্র বিগড়িয়া যায় এ কথা আমরা আদৌ স্বীকার করি না। স্বভাব ও সংসর্গ দোষে চরিত্র মন্দ হয়, কুরীতি ও কুনীতির মধ্যে পড়িয়া চরিত্র বিগড়িয়া যায়, শিক্ষার জন্য কখনই চরিত্র মন্দ হইতে পারে না। শিক্ষাই যদি চরিত্র বিগড়াইয়া দিবার একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে ইহাকে নর-সমাজ হইতেই বা দূর করিয়া না দাও কেন? শিক্ষিত পুরুষ যদি সাধারণ্যে সম্মান-ভাজন হইতে পারেন, তবে শিক্ষিতা রমণীই বা কেন না হইবেন? যদি পুরুষদিগের শিক্ষা দোষাবহ ও নিন্দনীয় না হয়, তবে স্ত্রী-শিক্ষাই বা কেন দোষাবহ ও নিন্দনীয় হইবে? সৎ ও উচ্চ শিক্ষায় চরিত্র কলুষিত হয় না, মন্দ শিক্ষায় চরিত্র কলুষিত হইয়া যায়। আমরা এরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী নহি। স্ত্রীলোকের গোলেবকাবলী ও বিদ্যাসুন্দর পাঠ আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।* কুশিক্ষার ফল অমৃত নহে, গরল অপেক্ষাও কোন ভয়ঙ্কর জিনিস্। এরূপ শিক্ষা শুদ্ধ স্ত্রী-সমাজ হইতে কেন, পুরুষ-সমাজ হইতেও উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীদিগের বিশুদ্ধ রকম শিক্ষার প্রয়োজন। স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধিগণ এখানে এক আপত্তি উত্থাপন করিবেন। "রমণীগণ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের স্বভাব ও প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া পড়িবে। শিক্ষা-বলে তাঁহাদের হৃদয় উন্নত ও আশা উচ্চ হইলে তাঁহারা যে-সে পতিকে আর পছন্দ করিবেন না, কাজেই সংসারের মধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইবে।" যাঁহারা এই ভয়ে ভীত হইয়া স্ত্রী-শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বদ্ধ-পরিকর হন, তাঁহারা নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তি। যদি তোমার এতই ভয়, তবে চুপ করিয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ বসিয়া কেন? যদি তোমার ঈর্ষা এতই প্রবল হইয়া থাকে, তবে তুমিও

* গোলেবকাবলী ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে এক শ্রেণীর পুস্তক বলিয়া ধরিলাম। আমরা কবিত্বের বিচার করিতেছি না; সে সম্বন্ধে বিদ্যাসুন্দর শ্রেষ্ঠতর আসন পাইবার যোগ্য তদ্বিষয়ে আমারা সন্দেহ করি না। পাঠকগণ মনে রাখিবেন আমরা সৎ শিক্ষা ও নীতির কথা বলিতেছি, কাব্য ও কবিত্বের কথা বলিতেছি না। শ্রীদেঃ।

কেন সেইরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা না কর? স্বার্থান্ধ মনুষ্য! তুমি নিজে যত্ন ও চেষ্টা করিবে না, অপরকেও তাহা করিতে দিবে না। তুমি নিজে ভাল ও উন্নত হইতে চাও না বলিয়া কি আর কেহ ভাল ও উন্নত হবে না? এ নীতি কোথায় শিখিলে? স্বার্থপরতা! তোমার পদে কোটী কোটী নমস্কার।

স্ত্রী লেখা পড়া শিখিলে পতিকে অমান্য করে না বা অমান্য করিতে পারে না। যাহার স্বভাব মন্দ সে নিরক্ষরা হইলেও স্বামীকে নিজের ইচ্ছামত উঠায় ও বসায়। এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গ-সমাজে বিরল নহে। অনেক পত্নী বৎসল স্বামী অশিক্ষিতা স্ত্রীর ক্রীড়নক-স্বরূপ হইয়া তৎ কর্তৃক যদৃচ্ছা ব্যবহৃত হইতেছেন। পক্ষান্তরে সৎ শিক্ষাই স্ত্রীর অন্তরে পতি-ভক্তির ইচ্ছা আনয়ন করিতে সমর্থ। স্ত্রী লেখা পড়া জানিলে আমাদের মান্য করিবে না এই অমূলক আশঙ্কা-প্রণোদিত হইয়া যদি স্ত্রী-শিক্ষা বন্ধ করিতে অগ্রসর হও তবে পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র বর্গের শিক্ষা কেন বন্ধ করিয়া না দাও? তাহারা যে বিদ্বান্ ও বড় লোক হইলে আমাদের মান্য করিবে ইহা তুমি পূর্ব্বে কিরূপে জানিলে? অনেক অকৃতজ্ঞ (কৃত-বিদ্য) পুরুষ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া গুরু জনকে তো অবজ্ঞা করে, তবে সমগ্র পুরুষ-জাতির শিক্ষার দ্বার সেই জন্য রুদ্ধ করিয়া না দাও কেন? কতিপয় অসৎ-প্রকৃতি পুরুষ বিদ্যার অপব্যবহার করে বলিয়া যেমন আমরা সমগ্র নর-সমাজ হইতে শিক্ষা দূরী-ভূত করিতে প্রয়াস পাই না, সেই রূপ কতিপয় গর্ব্বিতা স্ত্রীর শিক্ষার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সমগ্র স্ত্রী-সমাজ হইতে ইহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি না। যদি বিদ্বান্ পুত্র পিতার চক্ষুঃশূল না হইলেন, তবে বিদুষী কন্যাই বা কেন তাঁহার চক্ষুঃশূল হইবে? ধর্ম্ম-পরায়ণ পিতা এরূপ কন্যা কখনই মূর্খ জামাতার করে সমর্পণ করিতে পারেন না। পণ্ডিত জামাতা এরূপ বিদুষী পত্নী পাইয়া কেন অসুখী হইবেন? যদি সমস্ত স্ত্রীলোকেই এইরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, কাজেই পুরুষদিগকেও সেইরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার জন্য কায় মনে প্রয়াস পাইতে হইবে। নহিলে বিবাহ হইবে না, ইহা কি প্রার্থনীয় নহে? *

শিক্ষিতা রমণী যদি অশিক্ষিত পুরুষের সহবাসে সুখী হইতে না পারেন, তবে শিক্ষিত যুবকই বা কেন নিরক্ষরা বালিকা পাইয়া সুখী হইবেন? তুমি রমণীর পক্ষে যে যুক্তি অবলম্বন করিলে আমি পুরুষের পক্ষে ঠিক সেই যুক্তিই অবলম্বন করিলাম। তুমি বলিলে রমণী যদি বিদুষী হন আর পুরুষ যদি সেরূপ না হয় তাঁহাদের মিলন, অর্থাৎ বিবাহ অতীব ভয়ানক ও নানারূপ

* যদি দেশশুদ্ধ লোক লেখা পড়া শিখিল, তবে মজুরী করে কে? চাষবাস হয় কিরূপে? পুরুষদেরই লেখা পড়া শিখিয়া খাইবার উপায় নাই, তাঁহারাই চাকরীর জন্য ব্যতিব্যস্ত; স্ত্রীদিগকেও যদি সেইরূপ লেখা পড়া শিখান যায় তাহা হইলেই তো প্রতুল। লেখক নিতান্তই অর্ব্বাচীন, নহিলে তাঁহার এরূপ মতিচ্ছন্ন হইবে কেন? ভরসা করি তিনি এ বিষয়টী একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবেন। শ্রীসত্যানন্দ

দুঃখ যন্ত্রণার কেন্দ্র-ভূমি। আমি বলি পুরুষ যদি খুব বিদ্বান্ হন ও তাঁহার আশা যদি উচ্চ হয়, আর তাঁহার পত্নী যদি মূর্খা হয়, তাহা হইলে সেরূপ মিলনও কি যার পর নাই ক্লেশকর নহে? আমাদের দেশের দম্পতিদিগের মধ্যে যে মনের মিল হয় না তাহা শিক্ষার দোষে নহে, আমাদের বিবাহ-প্রণালীর দোষে, অসম-সম্মিলনের দোষে।

পুরুষের যত দিন বিবাহ না হয় শাস্ত্রকারেরা বলেন পুরুষ তত দিন অর্দ্ধেক থাকেন।* পরে দার-পরিগ্রহ করিয়া তিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। পুরুষ হইলেন অর্দ্ধেক আর স্ত্রী হইলেন অর্দ্ধেক, উভয়ের সম্মিলনেই পূর্ণতা। পুরুষ যেরূপ শিক্ষিত, রমণী যদি সেইরূপ শিক্ষিতা না হন, তবে সে রমণী পুরুষের অর্দ্ধেক কি রূপে হইবেন? সে স্থলে পুরুষের বিবাহ হইল বটে, কিন্তু তিনি তখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না, কাজেই বিবাহের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হইল না। এরূপ বিবাহ অসিদ্ধ। আলোক অন্ধকারের মিলনের ন্যায় এরূপ নর-নারীর হৃদয়ের মিলন অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। তাঁহাদের পরিণয় হইলে, সকলে ভাবিলেন স্ত্রীপুরুষের মিল হইল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে একটী প্রকাণ্ড সাগরের ব্যবধান রহিয়া গেল, অদূরদর্শী মনুষ্যগণ তাহা দেখিয়াও দেখিল না। পুরুষের হৃদয় এক দিকে, রমণী-হৃদয় অন্য দিকে, মধ্যে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র, সময়ে সময়ে যে কত দুর্য্যোগ হয়, বাত্যাবলে কত কত যে ভয়ঙ্কর উর্ম্মির সৃষ্টি হইয়া সমুদ্রকে তোলপাড় করিয়া থাকে, কত শত বাড়বানল যে তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতে থাকে, হায়! হায়! অদূরদর্শী মনুষ্যগণ তাহা কি দেখিতে পায়? তাহা যদি দেখিতে পাইত, এরূপ শোচনীয় মিলনের তাহারা কখনই পক্ষপাতী হইত না, তাহা যদি দেখিত, স্ত্রীপুরুষের সমানরূপে উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিতে সাহসী হইত না।

কিন্তু স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার পথে অনেক প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান। বাল্য-বিবাহ ও স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্যহীনতাই তন্মধ্যে প্রধান। বাল্য-বিবাহ বর্ত্তমানে, উচ্চ শিক্ষার আশা দুরাশা-মাত্র। বাল্য-বিবাহ, শুধু স্ত্রীজাতির কেন, পুরুষজাতির উন্নতিরও একটী প্রধান অন্তরায়। বালকের পক্ষে স্ত্রী ও স্বরস্বতী এই দুয়ের সেবা যেমন অসম্ভব, বালিকাগণের পক্ষেও স্বামী ও সংসার এক দিকে ও স্বরস্বতী অন্য দিকে, উভয়ের মধ্যে বাস করাও তেমনি অসম্ভব। অল্প বয়সেই বালিকা সন্তানের মাতা হইয়া পড়িলেন, সন্তানগণের মুখাবলোকনের সঙ্গে সঙ্গে স্বরস্বতীর চরণ অদৃশ্য হইতে লাগিল। বালিকাগণের পরিণয়ব্যাপার সাঙ্গ হইলেই তাহারা আর পিতারও নয় মাতারও নয়, তবে কার? স্বামীর?

* অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥
একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখং।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥
পুনরপি
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্
মনু।

না তাঁহারও নয় (কেন না তখন তাহারা স্বামীকে চেন না, স্বামীর হইবে কি রূপে?), তাহারা শ্বশুর-বাটীর একটী আস্‌বাব্ অথবা যদি একটু বড় হয় ক্রীত-দাসী হইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া শিখিবার আশা ভরসা শরৎকালীন মেঘের ন্যায় সামান্য-বায়ু-ভরে কোথায় উড়িয়া গেল।

বাল্য-বিবাহ-প্রথা কি কখন তিরোহিত হইবে না? ইহার তিরোধান সাধারণ ব্যক্তি-বর্গের সমবেত চেষ্টা ও যত্নের উপর নির্ভর করিতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ বিবাহের অপকারিতার বিষয় অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ইহার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসও হইয়া আসিতেছে।

বাল্য-বিবাহের অনেক দোষ। ইহাতে শরীর রুগ্ন ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, মনের উৎসাহ, প্রাণের গভীর পিপাসা ও জীবনের উচ্চ আশা সমস্তই অকালে বিলীন হইয়া যায়। বাঙ্গালী নর-নারীর অবস্থা যে এত শোচনীয় এরূপ বিবাহের অস্তিত্বই তাহার অন্যতর কারণ। কেহ কেহ বলেন "স্ত্রীলোকের শৈশব কালেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী প্রণয় হয় না। বুড় পাখী কখন পোষ মানে না।" এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব। যখন জানিয়াছি, শকুন্তলা, সাবিত্রী, শর্ম্মিষ্ঠা, দময়ন্তী, রুক্মিণী ও সুভদ্রা প্রমুখা প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণ বয়স্থা অবস্থায় স্বামী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহারা হৃদয়ের সহিত কেমন আপনা-পন স্বামীদিগকে ভাল বাসিতেন। স্ত্রী-পুরুষের অবস্থা সমান না হইলে স্থায়ী প্রণয় হয় না। পত্নী পঞ্চমবর্ষীয়া ও পতি বিংশতি-বর্ষীয়, উভয়ের সম্মিলনে, অসুখের উৎপত্তি। যাঁহারা প্রণয়ের তত্ত্ব নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন অসম পরিণয়ে প্রকৃত প্রণয় কতটুকু বর্ত্তমান। যাঁহারা বালিকা পত্নীর পাণি-গ্রহণ করেন তাঁহাদের বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য নীচ রিপুর তুষ্টি-সম্পাদন, প্রকৃত প্রণয়-লাভ নহে। প্রণয় তাঁহাদের নিকট আকাশ-কুসুমবৎ প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা সংসারে সুখ খুঁজিয়া পান না। তাঁহাদের নিকট সমস্তই দুঃখময় ও শ্মশানময় বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারাই সংসারকে কারাগার বলিয়া বর্ণনা করেন ও পরিশেষে মর্ম্ম-স্থলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র রমণী-জাতির পরিবাদ-পরিকীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহারা সাংসারিক সুখ প্রাপ্ত হন না বলিয়া পৃথিবীকে নরক বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, কখন কখন প্রণয়হীন মরুময় জীবনে সুখের লেশমাত্র না পাইয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি দোষা-রোপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তানোৎপাদন। "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা" ইহাই তাঁহাদের ধুয়া। *

---

* ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য ভার্য্যা মূলং সুখস্য চ।
ভার্য্যা ধর্ম্মফলাবাপ্তৌ ভার্য্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে॥
স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড।

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥
মনুসংহিতা।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য প্রতিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
মনু।

কেহ কেহ বলেন "ইংরাজদিগের মধ্যে তো বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, তবে তাঁহাদের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ের অসদ্ভাব কেন? আইনের সাহায্যে পুরুষগণ স্ত্রী-পরিত্যাগে বাধ্য হন কেন? আদালতে গণ্ডা গণ্ডা স্ত্রী-ত্যাগ-মকদ্দমা (Divorce) শুনিতে পাওয়া যায় কেন? যাঁহারা এইরূপ যুক্তি-পরম্পরার অনুসরণ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে বাল্য-বিবাহে প্রণয় আছে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত, তাঁহারা একদেশদর্শী। অসৎ-প্রকৃতি শঠগণের মধ্যেই স্ত্রী-ত্যাগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ধর্ম্মভীরু ও সচ্চরিত্র, যাঁহাদের পত্নীও সরলা ও সচ্চরিত্রা তাঁহারা বৈবাহিক বন্ধন হইতে কেনই বা বিচ্ছিন্ন হইবেন? ইংরাজদিগের মধ্যে যে সকলেই ডাইভোর্স-প্রয়াসী, কে ইহা বলিতে অগ্রসর হইবেন? ভাল মন্দ আমাদের ন্যায় তাঁহাদের সমাজেও বর্ত্তমান। ব্রীটিস ললনাগণের মধ্যেও ক্লিওপাটরা ও দ্বিতীয় এডওয়ার্ড পত্নী ইসাবিনাও (The she-wolf of France) আছে, আবার জুলিয়ট ও দেস্‌-দিমোনীয়া প্রকৃতির রমণীও আছেন। পুরুষদিগেরও মধ্যে হামলেট পিতৃব্য ক্লডিস্‌ ও ইয়াগো বর্ত্তমান, আবার রোমিও ও বসানিওরও অপ্রতুল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ওথেলো-প্রকৃতি অন্ধ ব্যক্তির সংখ্যা সকল সমাজেই অধিক। তাঁহাদের মধ্যে অতিরিক্ত স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বলিয়াই আমরা প্রাগুক্তরূপ অভিযোগের কথা প্রায়ই শুনিতে পাই; কিন্তু একটা কথা এ স্থলে না বলিলে নয়। স্ত্রীত্যাগ-প্রথার অস্তিত্ব কি সমাজের মঙ্গলজনক নহে? সারাটা জীবন ব্যাঘ্রিণী-প্রকৃতি রমণীর সহবাসে ক্ষতবিক্ষত-হৃদয় হওয়া অপেক্ষা তাহাকে একবারে পরিত্যাগ করা কি উচিত নহে?

পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে তো বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে, তবে সকল পরিবার-মধ্যে পবিত্র প্রণয়ের স্রোত খরধারে প্রবাহিত হয় না কেন? হিন্দু-সমাজে বৈবাহিক বন্ধন ছেদনের নিয়ম নাই, তজ্জন্যই ঐরূপ ঘৃণিত অভিযোগের কথা কখনই শুনিতে পাওয়া যায় না। কারণ বর্ত্তমান আছে, মধ্যে হিন্দু-শাস্ত্র ও সামাজিক নিয়ম উপস্থিত হইয়া কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে দেয় না। গাঁজা হইতে অধিক পরিমাণে ধূম নির্গত ও অগ্নি-শিখা বাহির হয় না বলিয়া ভাবিও না যে গাঁজার মধ্যে অগ্নি নাই। একবারে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে না সত্য, কিন্তু ইহা নিরবে ধীরে ধীরে জ্বলিতে থাকে। বঙ্গ-সমাজের অবস্থাও তদ্রূপ জ্বলিতেছে কিন্তু গুমে গুমে। হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুশাস্ত্র যদি আজ কাল ডাইভোর্স-প্রথার অনুমোদন করিত, কে বলিতে পারে যে তাহা হইলে বিচারালয়ে ঐরূপ অভিযোগ রাশি রাশি আসিয়া না পড়িত? আমাদের মধ্যে পত্নী-পরিত্যাগের অভিযোগ শ্রুতি-গোচর হয় না, এই জন্য আমাদের দাম্পত্য প্রণয় বর্ত্তমান, এ কথা বলাও যা, আর বেশ করিয়া বস্ত্রদ্বারা এক জনের মুখ বন্ধ করিয়া—"এ লোক কেমন শান্ত, দেখ মুখে কথাটী পর্য্যন্ত নাই" বলাও তা। মুখের বন্ধন উন্মোচিত হইলেও যদি সে কথা না কহে তবেই তাহাকে শান্ত বলিব। বঙ্গ-

সমাজে বৈবাহিক বন্ধন ছেদনের নাম গন্ধও নাই সত্য, কিন্তু ইহার স্থান আর একটী ভয়ঙ্করী রাক্ষসী দ্বারা অধিকৃত হইয়া আছে। সে রাক্ষসীটী কে? আত্মহত্যা।

বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে যে কত বাক্যহীনা, বলহীনা বঙ্গ-মহিলা পিশাচ-প্রকৃতি স্বামীর অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, বিষ, অহিফেন, রজ্জু ও সলিলের সাহায্যে ধ্বংসপুরে গমন করিতেছে; কে তাহার সঠিক হিসাব প্রস্তুত করিতে পারে? আমরা তো প্রায়ই শুনিতে পাই, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রে দেখিতে পাই, আজ অমুকের ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, আজ অমুক, স্বামীর সহিত মনান্তর করিয়া জলে ডুবিয়া মরিল, ইত্যাদি। রমণীগণ কেন তবে সমস্ত সুখ সৌভাগ্যের আশা ভরসা জন্মের মতন জলাঞ্জলি দিয়া, অবলার একমাত্র সহায়, নিপীড়িতের একমাত্র বন্ধু, আর্ত্ত জনের এক মাত্র শান্তি ও সান্ত্বনার স্থল, বিপন্ন জনের একমাত্র আশ্রয়, আশা-ভরসা-হীন অভাজনের একমাত্র আশার আলোক, তাপিতের একমাত্র প্রাণ জুড়াইবার স্থান ধর্ম্মপুরের রাজাধিরাজ অতি দয়ালু কৃতান্তের শরণাপন্ন হয়? যে যমের নাম শুনিলে মানুষ শিহরিয়া উঠে, বল, কেন বঙ্গ-রমণীগণ হৃদয়ের বন্ধুজ্ঞানে অনাহূত হইয়া তাঁহার দ্বারে ছুটিয়া যায়? ইহা কি দাম্পত্য প্রণয়ের চিহ্ন? যদি বাল্য-বিবাহে প্রণয় থাকিত বঙ্গাঙ্গনাগণের এরূপ লোমহর্ষণ পরিণাম দেখিতে হইত না। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অতঃপর কে বলিতে সাহসী হইবে যে বাল্য-বিবাহই প্রণয়ের কেন্দ্র-ভূমি।

কেহ কেহ বলেন "বঙ্গদেশ উষ্ণ-প্রধান দেশ। এখানে বালক-বালিকাগণ যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠেন। আর ইন্দ্রিয়-শক্তি সঞ্চার হইলেই ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় নিকটে থাকা আবশ্যক, নতুবা তাহাদের কুপথগামী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্য কোন বস্তু উপভোগ করিয়া কি কখন পরিতৃপ্ত হয়? সে যত উপভোগ করে তাহার উপভোগের বাসনা ততই বলবতী হইয়া উঠে। যে এক বার সম্ভোগের তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে সে কি কখন আর তাহা ছাড়িতে পারে? ছাড়া দূরে থাক্ তাহার পিপাসা বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না। বরং ভোগের পদার্থ দূরে থাকিলে মনুষ্য নিজের অন্যায় ইচ্ছাকে দমন করিতে পারে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতিরেকে মনুষ্য কু ইচ্ছা কোন মতেই দমন করিয়া রাখিতে পারে না। পাঠকগণ স্থির জানিবেন ভোগাভিলাষ ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কদাচ নিবৃত্ত হয় না, বরং ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।*

বাল্য-বিবাহে সুখ নাই। ইহা দারিদ্রতার উৎপত্তি-স্থান। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কত বয়সে অস্মদ্দেশীয় অঙ্গনাগণের উদ্বাহ-ব্যাপার সম্পন্ন করা যাইতে পারে? কত বয়সে তাঁহাদের বিবাহ দিলে তাহা বাল্য-

* "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইবে না? বিবাহের ঠিক একটী সময় নিরূপণ করা সহজ নহে। আমরা বলি যত দিন না বালিকা সম্যক্ রূপে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, যত দিন না তাহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়, যত দিন না তাহার মন সংসারের ভার-বহনে সম্যক্ রূপে সমর্থ হয়, যত দিন না তাহার দেহস্থ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, তত দিন কোন ক্রমেই তাহার পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করা যুক্তিযুক্ত নয়। যত দিন স্ত্রী নিজের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বুঝিয়া উঠিতে না পারে, তত দিন তাহাকে কুমারী অবস্থায় রাখাই যুক্তি-সঙ্গত।

বাল্য-বিবাহ স্ত্রীগণের উচ্চ শিক্ষার পথে যে কত বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার স্বপক্ষে যাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করেন তাঁহাদের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া ইহার অপকারিতার বিষয় বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বাল্য-বিবাহ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের বর্ত্তমান সমালোচ্য বিষয়ের সহিত ইহা বিজড়িত রহিয়াছে বলিয়াই এতৎ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিতে হইল। স্ত্রীগণের উচ্চ শিক্ষার আর একটী অন্তরায় অঙ্গনাগণের স্বাতন্ত্র্য-হীনতা।

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা যে কোন কালেই ছিল না এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। যখন তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল ভারতের অবস্থাও তখন এত দূর অপকৃষ্ট হইয়া দাঁড়ায় নাই। তখন যে কত গার্গী ও মৈত্রেয়ী, কত খনা ও লীলাবতী ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ইহার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এ কথা সজ্ঞানে কেহ আর অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ স্থলে কেহ যেন এই "স্বাধীনতার" প্রকৃত অর্থ বিকৃত করিয়া কুভাবে ইহার ব্যাখ্যা না করেন। "স্বাধীনতার" অর্থ ইহা নহে যে স্ত্রী অন্যের উপদেশ, পরামর্শ ও হিতবাক্য পাদ-দলিত করিয়া নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিবেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থ ইহা নয় যে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া সংসারের ভিতরে বাহিরে ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে থাকিবেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থ ইহা নয় যে স্ত্রী পিতা বা পতির কথা অগ্রাহ্য করিয়া শকটারোহণ পূর্ব্বক উদ্যান-ভ্রমণে প্রবৃত্ত ও নিজের কু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন। অবাধ্যতা বা স্বেচ্ছাচারিতা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা নহে। যাহা স্বাধীন ভাব তাহা পুরুষজাতির যেমন রমণীজাতিরও তেমনি স্পৃহণীয়। আমরা ঈদৃশ পবিত্র স্বাধীন ভাবের কথা বলিতেছি, স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলিতেছি না।

বঙ্গ-সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতার নাম-গন্ধও নাই। স্ত্রী যত দিন বালিকা থাকে তত দিন সে স্বাধীন রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। বিবাহ হইলেই সে পরাধীন হইয়া পড়ে। পরাধীন সে কাহার? স্বামীর? তাহা হইলে তো বাঁচিতাম। স্বামীর অধীনে তো স্ত্রী থাকিবেই, কেন না প্রেমের ইহাই ধর্ম্ম যে সে প্রণয়িগণকে পরস্পর পরস্পরের অধীন করিয়া দেয়। আর সৎ ও উন্নত-হৃদয় স্বামীর অধীনে থাকিলে তাহার শিক্ষা ও উন্নতিরও কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না বা হওয়া সম্ভবও নয়। তবে পরাধীন কাহার?

শশুর শাশুড়ীর? তাঁহারা পিতৃ-মাতৃ-স্থানীয়, পিতৃ-মাতৃ তুল্য পূজনীয়। তাঁহাদের অধীনে থাকা তো স্পৃহণীয়। তাঁহারা ভ্রমেও কখন "বৌমার" অনিষ্ট চিন্তা করেন না। পরাধীন কার? ভাসুর ননদের? তাহাও তত দোষাবহ নহে। তবে সে আবার পরাধীন কার? পতির নয়, শশুর শাশুড়ীর নয়, ভাসুর ননদের নয়, তবে কার? আমরা জিজ্ঞাসা করি সে বেচারী পরাধীনা নহে কার? (পাঠকগণ এ স্থলে "নহে" কথাটার উপর একটু দৃষ্টি রাখিবেন।) বঙ্গ-কুলবধূ দেবর ননদের অধীন, যে সন্তানকে তিনি বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিলেন, তিনি তাহারও অধীন, যে ভৃত্যবর্গ তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহারই সংসারে থাকিয়া তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, বঙ্গকুলবধূ তাহাদেরও অধীন, যে সকল প্রতিবেশী তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিয়ত উপকার প্রাপ্ত হইয়া সুখ সচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছে বঙ্গনারী তাহাদেরও অধীন, যে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ যাঁহাদের মুখ তিনি ইহ জন্মে কখন দেখিতে পাইলেন না, বঙ্গনারী তাঁহাদেরও অধীন। আর অধীন কার? রাক্ষস দেশাচারের ও স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপূর্ণ শাস্ত্রের। আহার বল, নিদ্রা বল, গৃহকর্ম্ম বল ও ধর্ম্মকার্য্য বল, স্ত্রীজাতির কিছুতেই স্বাধীনতা নাই।* বঙ্গ-নারীর তবে আর স্বতন্ত্রতা কোথায়? তাঁহাকে দেবর, ননদ, পুত্র, ভৃত্য, প্রতিবেশী ও কুটুম্বগণের মন যোগাইয়া চলিতে হইবে, নহিলে তাঁহার আর নিস্তার নাই, নিন্দার সীমা পরিসীমা নাই। তিনি যাহা ভাল বোঝেন বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকিলেও তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। তবে আর তাঁহার উচ্চ শিক্ষার আশা কোথায়? এ দেশের লোকের বিবাহ হইলেই গৃহিণী বিনা আর এক দিনও ঘর চলে না। তাঁহারা স্ত্রী ও দাসী এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পান না। তাঁহারা বলেন "স্ত্রীর দাসী হওয়া তাহার তো শ্লাঘার বিষয়।" তাঁহারা কিন্তু বোঝেন না যে, সে গৃহের দাসী নহে, স্বামীর প্রেমের দাসীমাত্র। স্ত্রী যত দিন এইরূপ স্বামীর গৃহের দাসী থাকিবে, তত দিন তাঁহার উচ্চ শিক্ষার বিন্দুমাত্র আশা নাই। স্ত্রীগণ যে গৃহকার্য্য করিবে না এ কথা আমরা বলিতেছি না। আমরা বলি যত দিন না তিনি স্বামীর প্রণয়ের পত্নী হইয়া নিজের বিবেক ও সৎ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বাধীন ভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন, নিজের কর্ত্তব্য গুলি অন্যের মুখাপেক্ষিণী না হইয়া স্বাধীন ভাবে সম্পাদন করিতে পারিবেন, তত দিন তাঁহার শিক্ষা ও উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনামাত্র।

কেহ কেহ বলেন স্ত্রীরা যদি লেখা পড়া লইয়া বিব্রত থাকেন তবে আমাদের সংসার দেখিবে কে? স্ত্রীশিক্ষার দায়ে কি তবে সংসার অধঃপাতে যাইবে? আমরা সংসারকে অধঃপাতে যাইতে বলি না। স্ত্রীরা বিদ্যালাভে ব্যস্ত থাকিলে সংসার যে অধঃ-

---

* বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষপি॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং
মনু।

অস্বতন্ত্রা ধর্ম্মে স্ত্রী। গৌতম সংহিতা।

পাতে যায় এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। পুরুষদিগের শিক্ষার প্রণালী কিরূপ? বাল্য হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত সংসারিক কার্য্য হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র থাকিয়া বিদ্যা-লাভে মনোযোগী হয়; স্ত্রীজাতির পক্ষে কি এই প্রণালী অবলম্বন করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়? স্বীকার করি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী শীঘ্রই যৌবনসীমায় পদার্পণ করে, কিন্তু যৌবনসীমায় পা দিয়াই যে পুঁথীগুলি দূর করিয়া ফেলিতে হইবে ইহারই বা অর্থ কি? পুরুষকেও কি সংসারের অন্যান্য কার্য্য দেখিতে হয় না? তিনি কি শুদ্ধ লেখা পড়া লইয়াই যাবজ্জীবন ব্যস্ত থাকেন? আমরা জানি ও স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে পঞ্চদশবর্ষীয় বালক সংসারভার মস্তকে বহন করিতেছে অথচ হস্ত হইতে পুস্তক পতিত হয় নাই। তাহার পক্ষে যদি সংসার ও বিদ্যা এ উভয়ের মধ্যে অবস্থান সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইল তবে রমণীর পক্ষেও তাহা না হইবে কেন? পুরুষদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য পৃথিবীতে যথেষ্ট। শুদ্ধ পুস্তক কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে তাঁহারও চলে না। এক ব্যক্তি সম্পাদক তিনিই আবার রাজনৈতিক সভার সভ্য ও কার্য্য-নির্ব্বাহক। তিনি কখন টাউন হলে বাগ্মী, আবার বিদ্যালয়ে শিক্ষক আবার সন্ধ্যার পর গৃহে আসিয়া ঘোর গৃহস্থ, অথচ তিনি বিদ্যাদেবীর চির উপাসক। এক ব্যক্তি প্রভাতে চিকিৎসক, দ্বিপ্রহরে বৈজ্ঞা-নিক-তত্ত্ব-আলোচক, অপরাহ্ণে ঘোর সংসারী অথচ তিনি একটী পুস্তকের কীট। পুরুষ-দিগের এতগুলি কার্য্য সংসাধন করিয়াও যদি গ্রন্থাদি-অধ্যয়ন ও আত্মোন্নতির এত অবসর রহিল, তবে রমণীও কেন সেইরূপ সাংসা-রিক কার্য্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া বিদ্যা-শিক্ষার অবসর না পাইবেন? পুরুষ-দিগের পক্ষে যাহা সহজ ও সম্ভব, রমণীর পক্ষে তাহা কেনই বা কঠিন ও অসম্ভব হইবে? কেহ কেহ হয় তো বলিবেন, "রমণীরা স্বভাবতই দুর্ব্বলা ভীরু ও ক্লেশসহনে অসমর্থা। তাঁদের পক্ষে ওরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম।" কিন্তু যদি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা যায়, তাঁহারা কোন্ যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা মূক হইয়া যাইবেন। কেহ কেহ বলিবেন "তাঁহারা রমণী কি না, এই জন্য দুর্ব্বল।" কোন সময় এক স্থানে আমরা এক পাত্র দেখিতে গিয়াছিলাম। পাত্রটীর লেখা পড়ার দৌড় দেখিবার জন্য তাহাকে গুটী-কত বিষয় জিজ্ঞাসার পর বলিয়াছিলাম, "বল দেখি জল অপেক্ষা বরফ এত ঠাণ্ডা কেন?" পাত্র একটু ভাবিয়া বলিল "তা হবে না? বরফ তো ঠাণ্ডা হবেই।" আমরা বলিলাম "কেন?" সে বলিল "বলেন কি মশাই? উহা বরফ কি না এই জন্য ঠাণ্ডা।" বরফ ঠাণ্ডা, কেন না তাহা বরফ কি না!! রমণীরা দুর্ব্বল ও ক্লেশসহনে অপটু, কারণ তাঁহারা রমণী কি না!! আমরা বলি স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল জাতি নহে। কোন্ কর্ম্ম আছে যাহা স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক কখন সম্পাদিতে হয় নাই? তাঁহারা পারেন না কি? শিক্ষা ও উৎসাহ পাইলে তাঁহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হয়েন না। তাঁহারা কোন্ কার্য্যে অপটু? রণে? ও কথা মুখে আনিও না। হে ভীরু!

তুমি আপনার মতন জগৎকে দেখিও না। ইতিহাস পড়িয়াছ, বোডেসীয়া ও জোয়ান অফ্ আর্কের বীরত্বের কথা শুনিয়াছ, অষ্টম-হেনেরী-পত্নী মার্গারেটের সেণ্ট আল্‌-বিনের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত অবগত আছ। চাঁদবিবি ও দুর্গাবতীর অদ্ভুত রণ-কৌশল ও বীরপণার বিবরণ পাইয়াছ, ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই আজও বিস্মৃতি-সলিলে নিমজ্জিত হন নাই। এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও কি বলিতে সাহসী হইবে প্রয়োজন হইলে রমণীরা অস্ত্র ধরিতে অপারগ? রমণীরা অপটু কি সে? স্বার্থ-ত্যাগে? স্পার্টা, কার্থেজ ও রাজপুতনার বীরাঙ্গনাগণ যুদ্ধের সময় ধনুকের গুণের জন্য মাথার কেশগুলি মুড়াইয়া দিয়াছিলেন, অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া দিয়া গোলাগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, জ্বলন্ত অনলে স্বদেশের জন্য অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া স্বদেশের জয় গান করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা স্বার্থ-বিসর্জ্জন ও ত্যাগ-স্বীকারের কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে? তাঁহারা কি সে অপটু? জ্ঞান-উপার্জ্জনে, না বুদ্ধি-চালনায়? খনা তোমার সম্মুখে, লীলাবতী তোমার পার্শ্বে, অহল্যা বাই তোমার নিকটে। অতীতের কথা ছাড়িয়া দাও। হিমেন, হানা-মোর, হেরিয়েট, কার্পেণ্টর, রো, কলেট্ প্রভৃতি বৃটিস ললনা; তরু ও রমাবাই প্রভৃতি ভারত-ললনাগণ ও অসংখ্য মার্কীন ললনা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "যদি শিক্ষা পায় রমণীগণও পুরুষদিগের সমকক্ষ হইতে পারে।" বিবি ফ্রাই, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল ও মেরি কারপেণ্টর প্রমুখা মহিলাগণের দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিগণের জন্য ক্লেশ-স্বীকার ও স্বার্থ-ত্যাগের বিষয় স্মরণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কারাগৃহে, রণ-প্রাঙ্গণে, স্বদেশে, বিদেশে পরের উপকারের জন্য তাঁহারা অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করি-তেন। এমন কার্য্য ছিল না অপরের মঙ্গলের জন্য যাহা তাঁহারা করেন নাই, এমন স্থান ছিল না অপরের মঙ্গলের জন্য যেখানে তাঁহারা যান নাই। এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও অতঃপর কে বলিতে সাহসী হইবে যে স্ত্রীদিগকে শিক্ষা, উপ-দেশ ও উৎসাহ দিলে তাঁহারাও পুরুষ-দিগের সমকক্ষ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইবেন না?

সত্য বটে রমণীদিগের ন্যায় পুরুষগণকে সূপ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয় না, সত্য বটে অঙ্কে করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তান প্রতিপালন করিতে হয় না, কিন্তু তা বলিয়া কি তাঁহা-দের আর অন্য কোন কার্য্য নাই? বরং বর্ত্তমান সময়ে দেখিতেছি রমণীগণ অপেক্ষা তাঁহাদের কার্য্য আয়াস-সাধ্য, শ্রম-সাধ্য ও যত্ন-সাধ্য। তাঁহাদেরও কি বিষয়-কার্য্য দেখিতে হয় না? সাংসারিক জটিল প্রশ্ন সকলের মীমাংসা, গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ ও সন্তান-সন্ততিগণের জন্য কি তাঁহাদের ও ব্যস্ত থাকিতে হয় না? এ সমস্ত অবশ্য-করণীয় কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করিয়াও তাঁহাদের যথেষ্ট অবসর থাকে। রমণীগণও আপনা-দের কর্ত্তব্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া সেরূপ প্রচুর অবসর প্রাপ্ত না হইবেন কেন? তাঁহারা গৃহকার্য্য সাঙ্গ করিয়া যথেষ্ট অবসর

প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং প্রতিপন্ন করিয়াছি যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা কোন কার্য্য করিতেই অপারগ হ'ন না। এই অবসর যদি সৎশিক্ষা ও সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে সংসারের ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক্, ইহা প্রকারান্তরে তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই উপায় দ্বারা স্ত্রীগণের উচ্চ শিক্ষার পথও প্রসারিত হইতে পারে। রমণীগণের অবকাশ যথেষ্ট আছে, কিন্তু কিরূপে তাঁহারা সেই সময় ব্যয় করিয়া থাকেন? পা ছড়াইয়া তাম্বূলে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া হয় কার্পেট বুনিয়া-না হয় তো প্রিয়তমকে হিজিবিজি পত্র লিখিয়া,—না হয় তো অশ্লীলতা-পূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহারা সময় অপব্যয় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা সঙ্গিনীগণে পরিবৃত হইয়া মনের কবাট খুলিয়া আত্মীয় ও প্রতিবেশিগণের চরিত্র সমালোচনায় উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। রমণীগণ অপরের নিন্দাবাদ অনুশীলন ও পরিকীর্ত্তন করিবার সময় যেরূপ উৎসাহ, অনুরাগ ও দক্ষতা দেখাইয়া থাকেন, যদি জ্ঞানোপার্জ্জন ও স্বকীয় উন্নতি সাধনের সময় সেইরূপ উৎসাহ ও অনুরাগ দেখাইতেন তাহা হইলে বঙ্গ-সংসার সাক্ষাৎ স্বর্গ-নিকেতন বলিয়া প্রতিয়মান হইত।

বিহারী-আহীর-বালা।

এখনো রাতি, তারার বাতি,
ডিমি ডিমি জ্বলে গগন-থালে;
লোহিতভূষা, এখনো ঊষা
রাগের ফোঁটা পরেনি ভালে;
এহেন কালে, এহেন হালে,
কোথায় যাইছ আহীর বালে;
পাঁচনী লইয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া
চরণে দলিয়া নীহারমালে।

২

ধাইয়া আসে, উরধ শ্বাসে,
পাছে পাছে ওই গাভীর মালা;
কেহ না জাগে, রজনীভাগে
গোচারে যাইছে কানন-বালা;
দেখিতে দেখিতে, চলিল চকিতে,
ত্যজিয়া নগর আবাস ঘরে;
পঁহুছি প্রান্তর, গাভীর নিকর,
ছাড়িল বালা তৃণের পরে।

৩

অস্ফুট-তান, ধরিয়া গান
ভ্রমর যেমন কুসুমে গুঞ্জে;
গাভীর দলে, ত্যজিয়া চলে
নাচিয়া নাচিয়া কাননকুঞ্জে;
এলায়িত বেশ, চিকণ কেশ,
দুলিয়া দুলিয়া সমীরভরে;
অস্ফুট কমলে, ঢাকে যেন দলে
উড়িয়া পড়িছে বদন-পরে।

৪

যালায় জিনি, চল সৌদামিনী
বদনে ঝকিছে ঈষৎ হাসি;
(কি লাজ মানি, ঐ [illegible] খানি
দেখিতে আমি বড় ভাল বাসি;
বিদ্যুৎ ঘটা, রূপের ছটা
বায়ুতে বায়ুতে যাইছে ভাসি,
ভ্রমিছে বালা, করিয়ে আলা
খুলিয়া যেন রূপের রাশি।

৫

ঘোর বিজন, কুসুমবন
শোভিছে একটি সরসী তায়;
বিকচ ফুল, দ্বিরেফকুল
চুমিয়া চুমিয়া মাতিয়া যায়;

কোনটি অলি, কুসুম-কলি
জানিয়া বালার অধরে বসে ;
তাড়ায়ে আঁচলে, মাতোয়ারা দলে,
তুলিতে ফুল কিশোরী পশে।

৬

ছুটিতে ছুটিতে, হেলিতে দুলিতে,
গাছে গাছে ফুল তুলিল বালা ;
অমনি আসি, আমোদে ভাসি
ঘাটেতে বসিল গাঁথিতে মালা ;
বদন-ইন্দু—নীহারবিন্দু
ধরিল যেন মুকুতাচয় ;
সুবিমল রাগ, শিরিস্ পরাগ,
উড়িয়া পড়িল বদনময়।

৭

পোহাতে নিশি, নিতুই আসি
এই সে সরসে করিতে স্নান ;
নয়ন ভরি, নিতুই হেরি
এই সে বালা জুড়ায়ে প্রাণ ;
কুসুম চয়ি, আনন্দময়ী
বিরাজে সতত বিকচ মনে—
উষার সঙ্গিনী, বালা বিনোদিনী
দেবতা যেন এই সে বনে।

বাণী।

(চতুর্দ্দশপদী।)

তোর ও চরণ, বাণি, মানস-বাসিনি,
বহুদিন পরে, মাগো, সেবিব আবার।
কবির মানস-সরে ফুল্ল সরোজিনী ;
ভবে আশাতীত ধন ; সুখের আধার
তুই গো এ দুঃখের ধামে ; তোরি চা
মা গো মজিয়াছে মোর মনোমধুকর।
বৃথা তবে ফিরাইছ তারে রে বাসনে ;
ছাড়ি কভু কমলিনী ফিরে কি ভ্রমর,
মন যার মুগ্ধ পরিমলে। যাও তবে
যা... কবিত্বের স্বচ্ছ সরোবরে,
...মনোহর কাব্য-কমলিনী
... মধুকর সুমধুর স্বরে
মাতিয়া সে মধুপানে ;—মধুতান ধরি
বেষ্টনিয়া কবিগণে নাচে বিদ্যাধরী।

স্বাধীনতা।

যখন কোন সমাজ কোন এক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অপর অবস্থায় পতিত হয়, তখন সে সমাজে দুইটী শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ১মটী নাশক শক্তি—এই শক্তি পূর্ব্বের যাহা কিছু তাহা ভাল কি মন্দ, এ বিচারের অবসর পায় না। পূর্ব্বের যে যে কোন বিষয় তাহাই যেন এ শক্তির নিকট দূষণীয় বলিয়া বোধ হয়। তৎসমুদয় পদার্থের সম্পূর্ণ ধ্বংসই ঐ শক্তির প্রয়াস সেই ধ্বংসিত পদার্থ স্থানে আর কোন পদার্থ গঠিত হইতে পারে কি না, আর কোন পদার্থ গঠিত না হইলে সে স্থান শূন্য থাকিলে সমাজের ইষ্ট হইতে পারে কি না এ শক্তি এ সমুদয় বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করে না। নাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। নাশ করিয়াই এ শক্তির তৃপ্তি, অপর কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নাই, কারণ এ শক্তি অপর পদার্থের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যকই মনে করে না। ২য় গঠনশক্তি—ধ্বংসিত পদার্থ স্থলে অপর পদার্থ সংস্থাপন, শূন্য স্থল পূর্ণ করণ

এ শক্তির ক্রিয়া। সমাজে ঐ শক্তি চির দিনই যেন দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয়। ১ম শক্তির এক দিনের কার্য্য দ্বারা যত স্থান শূন্য হয় দ্বিতীয় শক্তির এক যুগের কার্য্য দ্বারাও তাহা পূর্ণ হয় না। সবলে আঘাত দ্বারা কোন অনু-সমষ্টিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা যত সহজ, সেই বিচ্ছিন্ন অণুবিন্দু সমূহকে আবার সমষ্টিতে গ্রথিত করা তত সহজ হইবেক না। যত দেশে যত সমাজের উন্নতির দিকে বা অবনতির দিকে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সমুদয় স্থানেই এই দুই শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার অভাবে বা আবির্ভাবে, সমাজে এই দুই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়; অর্থাৎ যখন কোন জাতি কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, সময় এবং অবস্থার দাস হইয়া কার্য্য করেন, সেই সময় অথবা যখন কোন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ব্বল জাতি শিক্ষা এবং সভ্যতার আলোকে নিজের গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া গন্তব্য পথে সবলে অগ্রসর হয় সেই সময়, এই দুই সময়ই—এই দুই অবস্থাতেই এই দুই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়,—এই দুই সময় পূর্ব্ব ভাব জাতীয় জীবনকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভাব আশ্রয় করে।

আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের কথাটীর প্রমাণ করিতেছি —১ম চারিলসের রাজত্ব সময়ে যখন পিউরিটানগণ সবল হইয়া, সমাজে অভূতপূর্ব্ব-পরিবর্ত্তন-প্রয়াসে, নাশের দণ্ড হস্তে গ্রহণ করিল, তখন সেই নাশক শক্তির সগর্ব্ব পাদ-চারণে ইউরোপীয় অন্যান্য রাজগণ বিস্ফারিত চক্ষে সেই ক্ষুদ্র দ্বীপখণ্ডের দিকে চাহিয়াছিলেন, যখন সামান্য কৃষকের পদধূলিতে হোয়াইট হলের রাজমঞ্চ ধূসরিত হইয়াছিল, সেই সময় ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে আমরা কি দেখিতে পাই;—অশ্রুত-পূর্ব্ব—অভূত-পূর্ব্ব স্বাধীন ভাব; রাজা দেশের কর্ত্তা; জীবন মরণের কর্ত্তা, কি বলিতেছেন তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, সম্মুখ যুদ্ধে নিষ্কোষিত অসি করে, তাহাকে এক জন সামান্য কৃষক, স্থির ভাবে আহ্বান করিতেছে। পোপ—ধর্ম্মের কর্ত্তা—তিনি খৃষ্টীয়ান্ বলিলে খৃষ্টীয়ান্, তিনি না বলিলে নয়; তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিত্রাণের আদেশ করিলে ত্রাণ, নচেৎ নরক; তিনি ইচ্ছা করিলে একটী মসির আঁক দ্বারা এক জনকে চির দিন খৃষ্টান্ জগতের বহির্ভূত করিতে পারিতেন, তাঁহার শাসনে রাজচক্রবর্ত্তিগণ পর্য্যন্ত কম্পিত; সেই পোপের ক্ষমতার মস্তকে পদার্পণ করিয়া উচ্চ বেদীতে তৎক্ষণাৎ মাত্র পাঁচনী পরিত্যাগ করিয়া এক জন সামান্য কৃষক তাহার নিজ মত প্রচার করিতেছে। ইহাপেক্ষা স্বাধীনতা আর কাহাকে বল? এইরূপ স্বাধীনতা—যাহাকে পাঠক বোধ হয় অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও প্রগল্‌ভতাময় স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া মনে করিবেন, এই স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় কি না? সে সম্বন্ধে আমি এখন কোন কথা বলিতে চাহি না। আমি কেবল এই দেখাইতেছি, এই স্বাধীনতা উপস্থিতিতেই তখন অত ধ্বংস এবং তাহার আনুমানিক সেই অভূত-পূর্ব্ব এবং পরম আয়াস-সাধ্য গঠনের মূলীভূত কারণ। আবার পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি কর, অন্য স্থানের কথায় প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষ নিজেই এক পৃথিবী। পৃথিবীর সমুদয় দেশের ইতিহাস হইতে তুমি যত জ্ঞান, যত দৃষ্টান্ত পাইবে, একমাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে তাহার সমান জ্ঞান সমান দৃষ্টান্ত পাইবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের খাঁটি ইতিহাস পাওয়া যায় না; খাদ ধুইয়া ইতিহাস বাহির করিয়া লইতে হয়; তথাপি যাহা কিছু সর্ব্ববাদি-সম্মত, ভারত ইতিহাসের সেই অংশই আমাদের বর্ত্তমান অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। পাঠকগণ একটী বিষয় স্মরণ রাখিবেন যে ভারতের ইতিহাস বলিলে কেবল ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির ইতিহাসই বুঝা যায়।

ভারত-সমাজে শতাধিক বার বিপ্লব

হইয়া গিয়াছে। এক এক পুরাণ, এক এক মতের সৃষ্টি, আর এক এক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় আর এক একটী নূতন বিপ্লব। কিন্তু এই সমুদয় মত মধ্যে যে মত বৈদিক সময়ের কেবল পরে বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেবল পরে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সমুদয় মতের সময়ই শক্তির ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমরা বৈদিক সময় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু বৌদ্ধ সময়ের অনেক ইতিহাস আছে, সুতরাং সে সময় সম্বন্ধীয় যে কোন তর্কসঙ্গত মীমাংসার উপর নির্ভয়ে নির্ভর করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্বাধীন মতের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে শাস্ত্র নাই, গুরুবাক্য, ঈশ্বরের শাসন নাই, নরকের নীলাগ্নির তাম্র-শিখা, কৃমি-দংশন, লৌহদণ্ডাঘাত প্রভৃতি আত্মার শক্তিনাশক ভয়সূচক বিশ্বাসের কোন সংশ্রব নাই। এই সময় ভারতবর্ষ স্বাধীনতার তরঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। সহসা অগ্নিকুলের আবির্ভাবে, সে স্বাধীনতা অন্তমিত হইল। তখন ভারতবর্ষ আবার নূতন সাজ ধারণ করিল। পূর্ব্বের নিষ্কাম বৌদ্ধ আরাধনা স্থলে, তন্ত্রের কামাচারী পূজা, বৌদ্ধের অহিংসা পরম ধর্ম্ম স্থলে, লক্ষ জীবের জীবন-নাশ, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা কিছু তাহার সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং অধিকন্তু তাহার স্থানে ঠিক্ বিপরীত ভাবের গঠন, তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইল। এই স্বাধীনতা পাইয়া অধীনতার আবির্ভাবেও আবার আমরা দুই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এইরূপ যে দিকে দৃষ্টি ফিরাইবেন, সেই দিকেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। সুতরাং কোন দেশে স্বাধীন ভাবের অভ্যুদয় দেখিলে উক্ত দুই শক্তির ক্রিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু পক্ষান্তরে উক্ত দুই শক্তির ক্রিয়া দেখিয়াই পরাধীনতার আবির্ভাব মনে করা যায় না, কারণ আবির্ভাব এবং তিরোভাবে ঠিক্ একইপ্রকার কার্য্য হয়; জড় জগতেও ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। তাপ-সমষ্টি দ্বারা জীব-দেহের চর্ম্মে যে ক্রিয়া হয়; আবার তাপের সম্পূর্ণ বিযোজনপরে বিমুক্ত-তাপ-প্রসূত শিলীভূত বরফখণ্ড দ্বারাও ঠিক্ সেইরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল অনুভব দ্বারা দুয়ের প্রভেদ বুঝা যায়। সেইরূপ পূর্ব্ব বিষয়েও স্বাধীনতার আবির্ভাব কি অভাব কেবল আনুমানিক অবস্থা হইতে বুঝিয়া লইতে হয়,—এরূপ অনুভব অধিকাংশ সময়ই প্রায় স্বতঃ প্রতীত এবং প্রায় সকল সময়ই প্রয়াসসাধ্য সুতরাং সমাজে, স্বাধীনতা, এবং উক্ত দুই শক্তির মধ্যে—যাহা নেত্রগোচর হয়—তাহা হইতেই সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনুভব করা যাইতে পারে।

পাঠককে আমরা একবার বর্ত্তমান ভারত-সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি—এ সমাজের দিকে চেয়ে কি দেখিলেন? আমরা জানি ভারত সমাজ—বলিলে সহজে বোধগম্য হয় না, ভারতবর্ষ শত শত সমাজে বিভক্ত, পাঠক এই শত শত সমাজের দিকেই একবার চেয়ে দেখুন যে কি ভাব দৃষ্ট হয়? যে বিশ্বাসী ভারতবর্ষের লোক গমনে কখন, শয়নে পদ্মলাভ, শয়নে দামোদর—আহারে, গমনে, শয়নে ঈশ্বরের নাম লইত, সে ভারতবর্ষে ঐ দেখুন এক দল লোক, পরমেশ্বরের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতেছে। যে ভারতবর্ষে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের অন্ন পর্য্যন্ত আঘ্রাণ করে নাই, সেই ভারতবর্ষে ঐ দেখুন একদল অন্নের বিচার করা কেবল আবশ্যকতা নয় বাস্তবিক মূঢ়তা বলিয়া মনে করে। যে ভারতবর্ষে বেদ এবং শাস্ত্রের বাক্য ব্রহ্ম বাক্য বলিয়া পরিগণিত হইত সেই ভারতবর্ষেই ঐ দেখ একদল, তাহারা মানবের কার্য্যকে কোন শাসনের অধীন বলিয়া মনে করে না। আর কত দেখাইব, এরূপ দেখিবার শেষ নাই, যে দিক চাও সেই দিকেই এই ভাবের দৃশ্য; ইহার মধ্যে

পাঠক কি দেখিলে? যে অবগুণ্ঠনবতী কামিনী লজ্জাবনতা হইয়া অন্তঃপুরে থাকিতেন, শ্বশুরের নাম, ভাসুরের নাম লইতে গিয়া সংসারের প্রায় সমুদয় পদার্থকে এক একটী কুৎসিত নাম দিয়া, মাতৃভাষায় এক নূতন অভিধান সৃষ্টি করিতেন, আজ তিনি স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্য সভা-গৃহে অনবগুণ্ঠিত বদনে উপবিষ্টা, সরল ভাবে স্বামীর নাম লইয়া ডাকিতেছেন; প্রকাশ্য রাস্তার বাহির হইতেছেন; ইহার মধ্যে বলি কি দেখিতেছ? ভারত-সমাজের পূর্ব্ব ভাব পূর্ব্ব সংস্কার আস্তে আস্তে নষ্ট হইয়া নূতন ভাব নূতন সংস্কার সমাজে প্রবেশ করিতেছে। এ জলন্ত দৃশ্য আমার চক্ষে ত আঘাত করে। এই দুই শক্তির কার্য্য যাহা দেখিলে তাহার মূলীভূত কারণ স্বাধীনতা বা অধীনতা কি ভারত-সমাজে দেখিতে পাওনা? অধীনতা দেখিতে পাওনা তাহা ঠিক, শাসনের নিকট অবনত মস্তক হওয়া অধীন স্বভাবের প্রধান লক্ষণ, ভারত সমাজ যখন ধর্ম্মের শাসন, সমাজের শাসন অতিক্রম করিতেছে তখন এ সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা দেখিতে পার। কিন্তু নূতন ক্রিয়া স্বাধীনতার নূতন আবির্ভাবের ফল—এ প্রশ্ন মীমাংসার নিমিত্ত তর্কের ও অবশ্যক করে না; নিজেই উচ্চ হইয়া নিজ মত রক্ষার্থ যিনিই যাহা বলুক না কেন, আপন আপন মনে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে পর-মুখাপেক্ষণ ভাবের অস্তিত্বের শেষ বহু কাল পর্য্যন্ত অতি অল্পকালমধ্যে চলিয়া যাইবে।

ভারত-সমাজে আমরা যে স্বাধীনতার আবির্ভাব দেখিতে পাই, এ স্বর্গীয় ভাবকে আমরা দেব-দত্ত অমূল্য নিধি বলিয়া মনে করি। যদি দুঃখতপ্ত ভারতের কোন আশা থাকে—সে এই ভাব হইতে, সুতরাং আমরা এ স্বাধীন-ভাবকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি বলিয়া একটী কথা বিস্মৃত হইতে পারি না;——যে ঔষধে রোগ বিনাশ করে, সেই ঔষধেরই আবার মাত্রাধিক্য হইলে রোগীর জীবন নাশ করে। সামাজিক স্বাধীনতার একটী সীমা আছে, সেই গণ্ডি রেখার মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আর কোন বিপদেরই আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু সেই রেখা অতিক্রম করিলেই, অনিষ্ট উপস্থিত হয়। সেই রেখাটী নির্দ্ধারণ করাই আমাদের এ প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা—এই কথাটী বলিলে সহজ ভাষায় বুঝা যায়—যে, যে অবস্থায় মানুষ নিজের মত দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে। যখন মানবের সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না, একের স্বার্থ বা অপকারের প্রতি অন্যের দৃষ্টি করা আবশ্যক মনে করিত না। সে সময়ে এইরূপ স্বাধীনতাই বোধ হয় সকলের অন্তরে বাস করিত; কিন্তু মানবের অবস্থার পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের বৃত্তি সকলের অবস্থারও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই উলঙ্গ আমমাংসাহারী অরণ্যবাসী মানব এবং বেশভূষা পরিচ্ছদাদি দ্বারা সজ্জিত, নগর-গ্রাম-বাসী মানব সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ; একের অবস্থায় যে সমুদয় ভাব জীবনরক্ষার নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক, অন্যের অবস্থায় সেই সমুদয় ভাব জীবন-নাশের অথবা কষ্টের কারণ। সুতরাং যে স্বাধীনতা মানবের অসামাজিক অবস্থায় তাহার চিরন্তন সহচর, সামাজিক অবস্থায় সে স্বাধীনতা আর তাহার পক্ষে সুখের হেতু হইতে পারে না। অনেকে তর্ক-কালে বলিয়া থাকেন, যাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ হৃদয়ে স্বতঃ জাত, তাহাই প্রশস্ত। এই শ্রেণীর তার্কিকগণ একবার ভ্রমেও দেখেন না, যে, প্রত্যহ স্বতঃ জাত কত-বৃত্তি পশুকে জ্ঞান-ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিতে হইতেছে। কাম ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কোন্টী, জিঘাংসা, পরহিংসা, আত্ম-সুখ-চেষ্টা ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কোন্টী, ইহার সকলেই স্বাভাবিক, অথচ ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে সামাজিকেরা উপদেশ দিতেছেন।

সমাজে বাস, নির্জ্জন-বাস—এই দুই অব-

ন্যায় মানুষের কি ভাব আবশ্যক? সমাজ বহু লোকের সমষ্টি, একের সহিত অন্যের এক বা বহু বিষয়ের একতা, এই একতাই সমাজের নিদানভূত কারণ। এই একতা রক্ষা করিতে অনেক সময় নিজের কোন বাসনাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, অনেক সময় নিজের কোন বিশ্বাসকে সময়ের অপেক্ষায় অপ্রকাশ রাখিতে হয়। সামাজিক অবস্থা মানবের ত্যাগ-স্বীকারের অবস্থা। এই অবস্থায় নিজের জীবন-মরণের ভার পর্য্যন্ত অন্যের হাতে দিয়া, সামাজিক বৃত্তির সাক্ষর করিতে হয়। নির্জ্জন-বাসীর কোন ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যক করে না। হৃদয়ে যখন যে ভাব সে সেই ভাবই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার কার্য্যের সততা বা অসততা সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করিবার কোন লোক নাই। এই দুজনের অবস্থায় এই প্রভেদ। ইহাদিগের মানসিক বৃত্তি প্রভৃতির পরিচালন-প্রণালীও সুতরাং তদনুযায়ী বিভিন্ন। আমি নিজের গৃহে অগ্নি প্রদান করিব। সে আমার সম্পত্তি। আমি নিজে পরিশ্রম দ্বারা তাহা প্রস্তুত করিয়াছি। তাহাকে দগ্ধ করিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সমাজের কোন শক্তি আপত্তি করিতে পারে না; কিন্তু আমি যদি আবার সেই গৃহকে এরূপ ভাবে দগ্ধ করি যে তাহা হইতে সমুত্থিত অগ্নি অন্যের অনিষ্ট করে, তবে আমি সমাজে দণ্ডনীয়। আমার নিজের জীবন আমি যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে ব্যবহার করিতে পারি; কিন্তু আমার এইরূপ কোন ব্যবহার দ্বারা যদি সমাজের অন্যের অনিষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ সমাজের তাহাতে আপত্তি করার অধিকার আছে। সংক্ষেপে এই বলিতে হইবে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানবের কোন কার্য্যে অন্যের অধিকার থাকিলে তাহাকে বঞ্চিত না করি, মানুষ ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে নিজের কার্য্য নিজে পরিচালন করিতে সক্ষম। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই তাহার নাম স্বেচ্ছাচার—অর্থাৎ এরূপ স্বাধীনতা যে, সমাজ তাহার অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারে না।

সমাজে মানুষের দুই শ্রেণীর কার্য্য, ধ্বংসকালেই হউক, আর গঠন-কালেই হউক, মানুষের কার্য্য মোট দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম, মতের প্রকাশ, ২য়, মতের কার্য্যে পরিণতি। এ উভয় শ্রেণীর কার্য্যই ঐ একই সূত্রের অধীন,—অর্থাৎ যদি কোন মতের প্রকাশ দ্বারা অথবা মতকে কার্য্যে পরিণত করা দ্বারা অপরকে তাহার অধিকার-ভোগে বঞ্চিত করা অথবা বাধা প্রদান করা হয় তবে সে কার্য্য করা বা সে মত প্রকাশের অধিকার কোন সামাজিক লোকের থাকিতে পারে না। এ মীমাংসা মানবের স্বাভাবিক জ্ঞান-সিদ্ধ; তুমিও যে শক্তি দ্বারা সৃষ্ট, আমিও সেই শক্তি দ্বারা সৃষ্ট, তবে তুমি তোমার মনের সমুদায় শক্তির বিকাশ সম্ভোগ করিবে আর আমার মনের শক্তি মনে থাকিবে। সমাজ এ অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হয় নাই, যাহার যাহার শক্তি-নিচয়কে যথোপযুক্ত রূপে কার্য্যে পরিণত করিয়া তৎপ্রসূত ফলভোগের অধিকার সকলেরই আছে; এবং কেবল ঐ একটী সূত্র বলিলেই মানবের পূর্ণাধিকারের মূল সূত্র বলা হয়। এই প্রকার অধিকার মীমাংসা আমরা কোন তর্ক দ্বারা সমর্থন করিতে চাহি না, কারণ শত শত তর্ক করিলেও, পরে যখন জিজ্ঞাসা করা যাইবে, যে অন্যের অধিকার এবং তোমার অধিকার যে সমান তাহা তুমি কিসে ঠিক করিলে? "আমার বিশ্বাস," এ কথা ব্যতীত তখন আর কোন উপায় নাই, এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে, অধিকার-জ্ঞান মানবের স্বাভাবিক জ্ঞান-সিদ্ধ। এই অধিকারের মধ্যে থাকিয়া মানুষ যতক্ষণ কার্য্য করিবেন, ততক্ষণ তিনি স্বাধীন। সমাজ তাহাকে সে সময়ে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, সমাজ অত্যাচারী, দস্যু। কিন্তু এই অধিকার অতিক্রম করিলে,

তিনি স্বেচ্ছাচারী, সমাজের যুক্তি-ভঙ্গকারী, সুতরাং সমাজও তাঁহার প্রতি তুল্যরূপ ব্যবহার করিবার অধিকারী।

১ম মত প্রকাশ,—আমি মনে মনে যাহা চিন্তা করি, তাহা অন্যের নিবারণ করিবার কোন সাধ্য নাই, সুতরাং আত্ম-বিচার দ্বারা মত গঠন করা সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে অন্যের সমাজের অনুগ্রহ বা নিগ্রহের উপর অল্পই নির্ভর করে। যখন নিজের মত নিজের মনে ঠিক বলিয়া বোধ হইল, সেই সময়ে সেই মত কোন্ কোন্ অবস্থায় সমাজের নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারে, এই বিষয় মীমাংসা করা সম্বন্ধে গুরুতর মত-বৈষম্য আছে। কেহ কেহ বলিবেন যে, যে অবস্থায় মত প্রকাশ করিলে, আশু অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সেই অবস্থাতে মত প্রকাশ করা যাইতে পারে না। মনে কর কোন দেশের পূর্ব্বের কোন শাসন-প্রণালীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত আন্দোলন চলিতেছে, কেবল আন্দোলন নয়, বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় যদি সেই শাসন-প্রণালীর অনাবশ্যকতা এবং দোষ লোকের নিকট প্রকাশ করা হয় তবে, সেই বিদ্রোহ-ভাব তৎক্ষণাৎ গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মত প্রকাশ করা অত্যন্ত অন্যায়, এবং সমাজের তাহাতে আপত্তি করার অধিকার আছে। এই মীমাংসা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ বলিলে কি বুঝা যায়, সমাজের মত বলিলে কি বুঝা যায়? তর্কস্থলে উদারনীতি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর কাল্পনিক অবস্থা হইতে পূর্ব্ব পক্ষ এবং পর পক্ষ গ্রহণ করিলে অতি অল্প বিষয়েরই যথার্থ মীমাংসার সম্ভব। পুরাতন পৃথিবীই বলুন আর নূতন পৃথিবীই বলুন সকল স্থানেই এখন পর্য্যন্ত সমাজ বলিলে এই বুঝা যায় যে কতকগুলি লোকের কোন বিশেষ বিশেষ ভাব হইতে সমষ্টি। এক অথবা দশ ব্যক্তি হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, আর ৯৯ জন অথবা বড় সৌভাগ্যবান্ দেশ হইলে ৯০ জনই সমাজের কিছু না; সুতরাং সামাজিক মত বলিলে যাহা যথার্থ বুঝা উচিত সেরূপ মতের অস্তিত্বই এ পৃথিবীতে নাই। আজ কাল সমাজের ১০ বা ১৫ জনের যে মত তাহাই সেই বিশেষ সমাজের মত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অসময়ে মত প্রকাশ করিয়া যে অনিষ্ট করা হইতেছে, এও এই দশ জনের মত। সমাজের অপরাংশের কণ্ঠ এত দুর্ব্বল যে এই দশ জনের গগনভেদী স্বর অতিক্রম করিয়া তাহা অন্য লোকের কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না; এ নিমিত্ত পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, যে কোন সময়—অত্যন্ত সুসময় উপযুক্ত সময়ে, অত্যন্ত কুসময় অনুপযুক্ত সময়ে যে কোন সময়ে, যে কোন দেশে, কোন মত প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সময় আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, এ মত প্রকাশ দ্বারা সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, সুতরাং প্রকাশক দণ্ডার্হ। সমাজের পরিবর্ত্তন নিমিত্ত যখন যে দেশে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে সেই দেশেই তখন এই সর্ব্বনাশক ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল। এই ধ্বনি পৌরাণিক মতের ছলনামাত্র, প্রকাশ্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ছলনায় শত্রুকে অভীষ্ট সাধনে বঞ্চিত করার নিমিত্ত এই ধ্বনি। ঐই ধ্বনি অনুসরণ করিলেও আজিও এ পৃথিবী এডাম ইভের পৃথিবী থাকিত; তার পর সমাজের যখন বাস্তবিক কোন একটী মত নাই, [illegible] ১৩০ জনের মধ্যে দশ জন আপত্তি করিতেছেন, প্রকাশকের একের মত বিরুদ্ধে আর দশ মত; সুতরাং প্রকাশকের মত সমাজের সমক্ষে উপস্থিত হওয়ার বিরুদ্ধে মত অধিক; সুতরাং এ মতের প্রকাশ রোধ করা সামাজিক প্রধান শক্তির কর্ত্তব্য। নয়ন মুদ্রিত করিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু উন্মীলিত নয়নে এ কথা বলা সম্ভবপর নহে। সমাজের পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে মতের বিরুদ্ধে বা কত,

স্বপক্ষে বা কত ঐ কথা কি নির্দ্ধারণ করিতে কেহ চেষ্টা করিয়াছে? তবে এরূপ তর্ক দ্বারা কেবল মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। তার পর এই উপযুক্ত সময় আর অনুপযুক্ত সময়ের বিচারক কে? সমাজ ত নয়? তবে বল এ বিষয় আমাকে কে বিচার করিয়া বলিয়া দিবে যে অমুক বিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের এই উপযুক্ত সময়, এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে যিনি যাহা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা সমাজের সমক্ষে প্রথম উপস্থিত করিতে পার; যদি কেহ জান তবে আমাকে বলিয়া দাও যে কোন্ দেশের কোন্ সমাজে এরূপ লোক কে বা কোন্ কোন্ জন আছেন, যাহাদের শক্তি অন্যাপেক্ষা এত অধিক যে তাহারা সকল সময়েই ঠিক করিয়া সকল বিষয় বলিয়া দিতে পারেন? যদি আইনকর্ত্তাদিগের কথা বল, সে তোমাদের অত্যন্ত ভ্রান্তি, প্রত্যেক পূর্ব্ব নিয়মের রাহিত্য, তাহার স্থলে পুনঃ আর একটী নিয়মের সৃষ্টি—প্রত্যেক আইনের প্রথমের "যেহেতু" এই ভ্রান্তির অকাট্য প্রমাণ, তবে তাঁহাদের মতে কিরূপে বল। সময় অসময় ঠিক্ করিয়া, তাহারা ও ভ্রান্ত, আমিও ভ্রান্ত এ সময় অসময় ইত্যাদিতে তর্কের কেবল সময় নাশের মূল; জগতে কোন একটী মত শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে তাহা দ্বারা পৃথিবী যে পরিমাণ উপকৃত হয় সেই মতকে রুদ্ধ করিয়া জগৎ সংসারকে সেই উপকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। আমরা স্বীকার করি যে, সমাজে কোন একটী মতের সৃষ্টি হইলেই এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়, যে সামাজিক বর্ত্তমান ভাব হইতে যখন এ মত এক জনের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তখন সমান অবস্থায় তুল্য ক্ষমতাশালী লোকের মনে আবার সেইরূপ উদ্দিত হইয়া বদ্ধমূল হওয়া অত্যন্ত সম্ভবপর। কিন্তু হইবেই যে এরূপ কোন প্রমাণ নাই; এবং হইলেও কাল সাপেক্ষ। সুতরাং যে অবস্থাতেই কোন মত প্রকাশের প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হউক না কেন, সেই অবস্থাতেই জগতের অনিষ্ট করা হয়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, যে কোন মত যে কোন সময়ে যদি সমাজে প্রচারিত হইতে দেওয়া যায়, তবে তৎসম্বন্ধে অকার্য্যকর আন্দোলনে, সমাজের কতকগুলি শক্তি এবং সময় বৃথা অপব্যয়িত হয়। কতক শক্তি এবং সময় ব্যয়িত হয় বলিয়াই আমরা মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মানব শক্তি যত পরিচালিত হইবে ততই তাহার বিকাশ, এবং কোন একটী বিষয় লইয়া আন্দোলন উত্থিত হইলে, তৎসম্বন্ধে অনেকের অনেকপ্রকার মত অবগত হওয়া যায়, সুতরাং সেই বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত মত অধিকাংশ পরিমাণে গঠিত হয়। এরূপ অবস্থায় সময়ের যে অপব্যয় হয় আমারা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের মতে যে কোন সময়েই যে কোন মত প্রকাশিত হইতে পারে, তাহাতে প্রতিবন্ধক জন্মান অত্যাচার মাত্র। আমরা অবার আমাদের তর্ক গুলির চুম্বক এখানে লিখিতেছি :—

মত-প্রকাশের সুসময় এবং অসময়, সমাজের ইষ্ট অথবা অনিষ্ট, এই সমস্ত সঙ্কট হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া যদি কোন মত প্রকাশ করিতে হয়; তবে সে বিষয় নির্দ্ধারণের কর্ত্তা থাকা আবশ্যক। কারণ সমাজের মত জানা যায় না, সমাজের মত জানিতে পারিলে, জিজ্ঞাসা করিতে পারিলে, বিষয় ত সমাজের গোচরই হইল। তবে আর প্রকাশের বাকী কি? সুতরাং বিচারক আবশ্যক, অভ্রান্ত বিচার আবশ্যক—তাহা অসম্ভব প্রথমতঃ অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা অধিকাংশ সম্বন্ধে কোন বিষয়ের মীমাংসা অন্যায়। ২—মত কোন অবস্থাতেই প্রকাশিত হইলে সমাজের অনিষ্ট করিতে পারে না, বরং ইষ্ট সম্পাদন করে। সুতরাং সকল অবস্থাতেই মত প্রকাশ করা যাইতে পারে।

——

২য় খণ্ড। চৈত্র। ১২৮৮। ৮ম সংখ্যা।

হিন্দুদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

শ্রীবিধুভূষণ মিত্র কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

৬২ নং পটুয়াটোলা লেন হিন্দুদর্শনকার্য্যালয় হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

ঝামাপুকুর [illegible] স থ্যাক ভবনস্থ

[illegible] হিন মুখোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৮৮ সাল।

দ্বিতীয় বর্ষের মূল্যপ্রাপ্তিস্বীকার।

বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবাজার পঞ্চানন তলা লেন ॥৹
„ কাশিনাথ দাঁ পটুয়াটোলা লেন ৸৹
„ গৌরচরণ দাস পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ॥৹
„ বিহারিলাল দাস পটুয়াটোলা লেন ৸/৹
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Commissariat office ॥৹
„ মহীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ।৹
„ হরকুমার রায় ঐ ।৵৫
„ ক্ষীরোদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ ॥/৹
„ সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ॥/৹
„ বিনোদবিহারী ঘোষ ঐ ।৵৹
„ কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় ঐ ।/৹
„ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ ।৹
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ।৹
„ শিবনাথ ঘোষাল ঐ ॥৹
„ ভূতনাথ নন্দী ঐ ॥৹
„ শ্রীকৃষ্ণ নাগ ঐ ॥৹
„ তারক নাথ জবদার বোর্ড অফ রেভিনিউ ৸৹
„ রাধানাথ মুখোপাধ্যায় Railway office ॥৹
„ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ॥৹
B. L. Gupta Esqr. Magistrate Calcatta police 2
„ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস সিতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ১৲
„ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের গলি ১৲
„ কালীপ্রসন্ন মিত্র বোর্ড অফ রেভিনিউ ১
রামচন্দ্র পাল—রামপুর বোয়ালিয়া ২৲
„ কালীমোহন দাস পিগ্ স্ট্রীট রোড ২৲
„ শ্যামাচরণ কর মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৲
„ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যা। নেবুতলা লেন ১
„ শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানবা... ১৲
„ গিরিশচন্দ্র ... বোর্ড অফ ... ১৲

বাবু বিপিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় চোরবাগান
„ ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ১৲
„ প্রসাদদাস মল্লিক—বড়বাজার ২৲
„ মাখন গোপাল দে পিট্রো কোটিন স্কোয়ার ১৲
„ হরিদাস নিয়োগী—শ্যামবাজার ১৲
„ জানকীনাথ নিয়োগী—মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৲
„ কালীমোহন চক্রবর্ত্তী গুড কোম্পানি লাইব্রেরি কেয়ার টাঙ্গাইল ২৲
„ চন্দ্রনাথ চৌধুরী ধুবড়ি ২৲
„ ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার প্রাইবেট সেক্রেটরী অফিস সিমলা পর্ব্বত ২৲
„ অক্ষয়কুমার সরকার ঐ ২৲
„ নন্দলাল সরকার ঐ ২৲
„ ভৈরবপ্রসাদ সিংহ ঐ ১৲
„ ভূতনাথ নন্দী ঐ ২৲
„ ডাক্তার নন্দলাল দে চিৎপুর রোড ১৲
„ নিস্তারচরণ বসু- চিৎপুর মশাবেদী ১
„ চণ্ডীচরণ সেন নিয়োগি পুকুর লেন তালতলা ১
„ ব্রজবন্ধু ডাক্তার জোড়া চিৎপুর রোড ২৲
মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর শোভাবাজার ২৲
বাবু শতীশচন্দ্র সেন পটুয়াটোলা লেন ১৲
„ কেশবচন্দ্র সরকার ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ১
„ যদুনাথ ঘোষ—মৃজাপুর এন্ ডি ইস্কুল ১৲
„ হরিশ্চন্দ্র ঘোষ পটুয়াটোলা লেন ১
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বোর্ড অফ রেভিনিউ ১৲
„ দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ১৲
„ অভয়চরণ বসু, বরিশাল ১
... মহিমারঞ্জন রায় কাকিনা ৸৹
... রায় দেরাডুন ২৲
„ কৈলাসচন্দ্র সরকার ... ১৵৹

সন্ন্যাসী ও ভিখারী *।

দেবী প্রসন্ন বাবু দুই রকমের দুই খানি চিত্র আনিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। একখানি স্বদেশানুরাগের সজীব চিত্র ও অন্য খানি ধর্ম্ম ও পাপ, স্বদেশহিতৈষীতা ও কপটতা, প্রেম ও কর্ত্তব্য, প্রলোভন ও আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি বাহিক ও মানসিক দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব বৃত্তিনিচয়ের ঘোরতর সংগ্রামের একটী সুন্দর ছবি। একখানি সিকিমের অতীত ইতিহাস ও অন্য খানি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের এক বিভাগের বর্ত্তমান সামাজিক ইতিবৃত্ত। দুই খানিতেই লেখক তাঁহার যথেষ্ট গুণপণা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা যে দুই খানি গ্রন্থের বিষয় বলিতেছি, তাহার একখানির নাম "সন্ন্যাসী" ও অপর খানির নাম "ভিখারী"।

"নভেল নাটক যথেষ্ট হইয়াছে আর প্রয়োজন নাই।" অনেকে আক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন। এ কথা বলিবার বাস্তবিক তাঁহাদের অধিকার আছে, এরূপ আক্ষেপোক্তির বিস্তর কারণও রহিয়াছে। আমাদের মুদ্রাযন্ত্র মধ্যে কএক বৎসর মাথা মুণ্ড ছাই ভস্ম নাটক নভেল এত প্রসব করিয়াছিল, সে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই তাহাদের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া গিয়াছিলেন। উপন্যাস নবন্যাসের ছড়া ছড়ী অথচ এক খানি ব্যতীত কোন খানিই সুপাঠ্য নহে। [illegible] গৃহে গৃহে গ্রন্থকার শব্দ একটা হেয় গালাগালির সামিল হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ লেখকদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল, কিন্তু নাটক নভেলের প্রতি অনেকের যে বিজাতীয় বিতৃষ্ণা তাহা আর গেল না। বিদ্যালয়ের তরলমতি বালক ও অন্তঃপুরের অল্পশিক্ষিতা অঙ্গনা ভিন্ন ইহাদের প্রতি আর কাহার তত আদর রহিল না। নভেল নাটক প্রণয়নের যে কি উদ্দেশ্য ও লেখকদিগের যে কি লক্ষ্য, গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া অনেকেই তাহা বিস্মৃত হইয়া যান। তাঁহারা মনে করেন বুঝি ঠাকুরুণ দিদির গল্প ও যুবক যুবতীর কথোপকথন লিপি-বদ্ধ করিতে পারিলেই নভেলে নাটক লেখা হইল। মানব-জীবন যিনি নিবিষ্ট-চিত্তে অধ্যয়ন না করিয়াছেন, উপন্যাসাদি লিখিবার জন্য তাঁহার লেখনী ধরা বিড়ম্বনামাত্র। নভেল নাটকাদি আর কিছুই নহে—মানবজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যামাত্র। ইহা যিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার লেখনী ধারণও সার্থক হইয়াছে। দেবী প্রসন্ন বাবু অনেক পরিমাণে মনুষ্যের হৃদয় বুঝিতে পারিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার লেখনী পরিচালনাও নিরর্থক হয় নাই। তাঁহার লেখনী ঠাকুরুণ দিদির গল্প প্রসব করে নাই।

দেবী প্রসন্ন বাবু যে চিত্রগুলি আঁকিয়া

* শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন, সোপান প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীদেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত।

আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা যে আগা-গোড়া কল্পনাপ্রসূত, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। পুস্তক দুই খানির মধ্যেই সত্য প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। যশোলালের চিত্র কাল্পনিক চিত্র নহে। যশোলাল সিকিমের প্রতাপসিংহ। তাঁহার অমানুষিক বিক্রম, জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ ও সিকিমের জন্য আত্মবিসর্জ্জন অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তিনি সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয় চিত্তে সিকিম সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আমরা যে বাঙ্গালী আমাদের নিস্তেজ অন্তরেও স্বদেশের জন্য প্রাণদানের বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। মরীচির পিতৃভক্তি স্বদেশানুরাগ ও নিঃস্বার্থ প্রেম অসাধারণ। হরিনারায়ণ অস্থির চিত্ত দুর্ব্বল বাঙ্গালী। তিনি লঘুচিত্ত পাপমতি ক্ষীণ মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। অসৎ সঙ্গে পড়িয়া বাল্যকাল হইতে তিনি অতীব যত্ন সহকারে হৃদয়ে কতকগুলি পাপ বীজ বপন করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার গুরুদেবের শিক্ষা ও উপদেশ প্রভাবে যখন তাঁহার চক্ষু ফুটিল, তিনি তখন নিজের হৃদয় পানে এক বার চাহিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন, যে পাপ বীজগুলি এক দিন হৃদয়ের এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল, সময়ে তাহারা অঙ্কুরিত ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলে পরিণত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয় ছাইয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ কিরণ ও প্রেমের পবিত্র জ্যোতিঃ সে বিষবৃক্ষ সমাকীর্ণ অন্তর মধ্যে প্রবেশপথ পাইতেছে না। গুরুদেবের কৌশলে সহসা অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। হুতাশন তাহার সহস্র জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক লক্ লক্ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়জাত বিষবৃক্ষগুলিকে ভস্মীভূত করিবার জন্য হৃদয়মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আগুন এত জ্বলিয়া উঠিল যে অশ্রুজলে তাহা আর নির্ব্বাপিত হইল না। এই সময় মরীচির প্রেম তাঁহার অস্থির হৃদয়কে আরও উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। তিনি উন্মাদের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

সন্ন্যাসী হরিনারায়ণ ও ভিখারী বেহারী উভয়ের চরিত্র কবি বিভিন্ন উপাদান সমষ্টিতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী পাপী, সন্ন্যাসী ভীরু ও সন্ন্যাসী দুর্ব্বল। তাই তিনি তরঙ্গ-সঙ্কুল-জীবন-সমুদ্রে ভয়ঙ্কর তুফান দেখিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় হালি ছাড়িয়া দিয়া অসময়ে দেহতরিখানি ডুবাইলেন। আমরা তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতে পারি না। তিনি বাঙ্গালী কুলের কলঙ্ক। গুরুদেবের শিক্ষা ও উপদেশের ফল কি কিছুই হইল না? সুরবালা যাহা পারিলেন, মরীচি যাহা পারিলেন, দুর্ব্বল সন্ন্যাসী তাহা পারিলেন না। তিনি যদি পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষা-হীন ও উপদেশ-বিহীন হইয়া পাপ-পূর্ণ অন্ধকারময় অবস্থাতে থাকিয়াই এই আত্মহত্যারূপ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার [illegible] আমরা দুঃখিত হইতাম, কিন্তু তাঁহার প্রতি [illegible]দের অশ্রদ্ধার উদ্রেক হইত না। গুরুদেবের শিক্ষা ও উপদেশ পাদ দলিত করিয়া নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞানের মূলে কুঠারা-

ঘাত করিয়া, সুরবালার আত্মত্যাগের পবিত্র দৃষ্টান্ত চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি কাপুরুষের ন্যায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু বেহারী সাহসী, বেহারী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, বেহারী স্বদেশ বৎসল ও ঈশ্বর পরায়ণ। তিনি নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকার মধ্যে থাকিয়াও নিজের পথ নির্ণয় করিয়া, কর্ত্তব্য পথে তরণী খানি চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেহারী লাল উপযুক্ত কর্ণধার। তিনি বিশ্বাস বলে তাঁহার হৃদ্ গগনের নিবিড় তিমির রাশি ভেদ করিয়া দেখিলেন ঈশ্বর-প্রেমরূপ ধ্রুব নক্ষত্র তথায় শোভা পাইতেছে। তিনি সেই ধ্রুব তারার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া জীবন-সমুদ্রে নৌকাখানি চালাইতে লাগিলেন। কত বজ্র পড়িল, কত উর্ম্মী নৌকা গ্রাস করিবার জন্য ভীমবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, কত হিংস্রক জন্তু বিকট বদন বিস্তারপূর্ব্বক তাহাকে উদরস্থ করিতে উদ্যত হইল, কত বিদ্যুৎ চমকিল, কত ঝড় বহিল, কিন্তু বেহারী অচলবৎ অটল ভাবে দাঁড়িয়া রহিলেন, তাঁহার কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। ধন্য বীরত্ব! হায়! বাঙ্গালীর মধ্যে এ চিত্র কে দেখিবে? বেহারীর হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া কে তাঁহার সহিত কাঁদিতে বসিবে? বেহারীর ন্যায় উন্নতহৃদয় পুরুষ এই অত্যাচার-পূর্ণ বঙ্গ দেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে অন্ততঃ এক একটী জন্ম গ্রহণ করেন, আমরা বেশ বলিতে পারি, বঙ্গের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহা অচিরে স্বর্গীয় সুখনিকেতনে পরিণত হয়। হায়! সে দিন কি হইবে? কল্পনা পদ্দিশ্বন সত্যে পরিণত হইবে?

পূর্ব্বে বলিয়াছি সন্ন্যাসী অপেক্ষা বেহারীর হৃদয় সমধিক উন্নত। সন্ন্যাসী দুর্ব্বল মনুষ্য, কিন্তু বেহারী মনুষ্য হইয়াও দেবতা। বেহারীর চরিত্রে আমরা কোন খুঁৎ পাইলাম না। যেমন তাঁহার ধর্ম্মনীতির প্রতি অনুরাগ, তেমনি তাঁহার স্বদেশের প্রতি অচলা ভক্তি, আবার তেমনি তাঁহার আত্ম-বিসর্জ্জনের অদ্ভুত ক্ষমতা। এক দিকে কুসুম ও গিরির স্বর্গীয় প্রেম, অন্য দিকে পরোপকার ও কর্ত্তব্য পালনের প্রবলা বাসনা, এক দিকে ধন মানের আকর্ষণ, অন্য দিকে বিবেকের অনুশাসন, মধ্যে বেহারী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। বেহারীই যথার্থ বীর পুরুষ, তাঁহার বীরত্ব অধ্যয়ন করিতে করিতে তিনি যে এক জন মনুষ্য একথা বিস্মৃত হইয়া যাই; সময়ে সময়ে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি কুসুমকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে সে কুসুমকেও হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুসুমের প্রেম উৎপাটন করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় যে সেই সঙ্গে জন্মের মতন ভাঙ্গিয়া গেল তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না। এ অত্যাচার-পূর্ণ মর্ত্ত ভূমি বেহারীর উপযুক্ত বাসস্থান নহে। তিনি যদি কোন দেব লোকে জন্ম গ্রহণ করিতেন, যেখানে দুর্ব্বলের উপর পীড়ন নাই, অন্যায় ও পাপ কার্য্যে প্রশ্রয় দিবার ক্ষমতা কাহার নাই, যেখানে মনুষ্য স্বর্গে যাইয়া বিবাদ বিসংবাদ করে না, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহই সুখী হইতে পারিতেন। পৃথিবী বেহারীকে চিনিল না, এ অত্যাচার-পূর্ণ পৃথিবী তাঁহার উপযুক্ত বাসভূমি হইল না।

কুসুম ও সুরবালা সম্বন্ধে দেশাচার-উপাসক সংকীর্ণ-হৃদয় মনুষ্যগণ যাহাই বলুন না কেন, তাঁহারা উভয়েই যে রমণী কুলের রত্ন ছিলেন ইহা আমরা নিঃশংসয়ে বলিতে পারি। যে শাস্ত্র* "শঙ্করাদপি বিধাতুর্বা পতিরেকোঽধিকঃ স্ত্রিয়াঃ" প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা পুরুষদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতেই সুদক্ষ, সে শাস্ত্র সুরবালাকে নিন্দা করে করুক, কিন্তু আমরা দেবী জ্ঞানে চির দিন তাঁহার পূজা করিব। সুরবালা পতির জন্য পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি পতি অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভালবাসিতেন। সুরবালা সহস্র চেষ্টা করিয়াও পাপপরায়ণ পতিকে পাপ-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তিনি কত বার কতপ্রকার ফাঁদ পাতিলেন, কিন্তু তাঁহার শিকলিকাটা পাখীটী কোন মতেই আর ধরা দিল না। হরিনারায়ণ ক্রমে দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিলেন। বিষয় সম্পত্তি অচিরে রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল। তিনি বিষপ্রয়োগে মাতার প্রাণনাশ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন। সাধ্বী সুরবালা কিসের আশায় আর সংসারে থাকিবেন? সংসারে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থানই বা কই? তাঁহার আর আশা নাই, ভরসা নাই, সহায় নাই, অবলম্বন নাই, তিনি যে দিকেই নেত্রপাত করেন, দেখেন সেই দিকেই ঘোর অন্ধকার; তিনি যে সকল ব্যক্তিকে তাঁহার স্বামীর অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্ বলিয়া জানিতেন, দেখিলেন তাঁহারা সকলে ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য সেই ভীষণ অন্ধকার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। যে রমণী দুই দিন পূর্ব্বে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন, ঘটনা-স্রোতের আবর্ত্তনে পড়িয়া, তিনি আজ পথের ভিখারিণী হইয়াছেন। কাল যাঁহার ইঙ্গিতে কত কত দাস দাসী ছুটিয়াছিল, আজ তিনি সকলের দ্বারে ২ গিয়া একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছেন। আজ সুরবালা যথার্থই কাঙ্গালিনী, মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িতা। গৃহ নাই, মাথা রাখিবার স্থান নাই। যখন বিষয় আশয় সকলি নিলাম হইয়া গেল, তখন তিনি গ্রামের প্রত্যেকের নিকট যাইয়া বলিলেন "আমাকে একটু স্থান দাও, আমার প্রতি সকলেই অত্যাচার করে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না, আমার উপায় নাই।" কিন্তু মনুষ্য এমনি কৃতজ্ঞ, যে এ দুঃখের সময় তাঁহার স্বামীর সুহৃদ্গণের মধ্যেও কেহ তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। অগত্যা সেই কিশোর বয়সে, সুরবালা সমস্ত আশা ভরসা ইহ জন্মের মতন পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসিনী হইলেন। সাধ্বী গৃহত্যাগ করিলেন, তাঁহার বাল-সহচরী কুন্দ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উভয়ে নীরবে অনেক দূর চলিয়া গেলেন, অনেক গ্রাম, অনেক ময়দান ছাড়িয়া গেলেন। সুরবালার হাতে লোহার ত্রিশূল। একটি পুষ্করণীতীরেউপনীত হইয়া তিনি সহচরীকে বলিলেন, "দেখত এ কেমন তোমার এ পুকুরের কথা মনে পড়ে?" কুন্দর যাহা মনে পড়িল সন্ন্যাসিনীকে তিনি তাহা বলিলেন। সুরবালা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কিছু মনে পড়ে?"

*স্ত্রীগণের পতি, শঙ্কর ও বিষ্ণু হইতেও অধিক পূজনীয়। স্কন্দপুরাণ।

"কুন্দ আরও মনে পড়ে এ পথ দিয়া এক দিন যাইবার সময় এখানে একটী মেয়ে কাঁদিতেছিল, তুমি তাহাকে স্বামিগৃহের কত সুখের কথা বলেছিলে।

সুরবালা। আজ তাহাকে পাইলে বলিতাম এস বোন্ তোমার সঙ্গে কাঁদি, বাল্য খেলা ছাড়িয়া কেন স্বামিগৃহে যাইতেছ? পৃথিবীতে বাল্য খেলার ন্যায় সুখকর আর কিছুই নাই।

কুন্দ। আরো মনে পড়ে এক দিন একটী স্বামিত্যজ্যা যুবতী এখানে বসে কাঁদিতেছিল, আর স্বামীকে কতপ্রকার তিরস্কার ও গালাগালি করিতেছিল, তুমি তাহাকে কত বুঝাইয়েছিলে যে, আমাদের দোষেই আমরা স্বামীর মন বিরক্ত করিয়া দি, নচেৎ স্বামীর ন্যায় পদার্থ এ সংসারে আর নাই; এ সকলই মনে আছ।

সুর। আজ তাহাকে দেখিলে বলিতাম, ভগ্নি! আইস তোমার সহিত আজ একটু কাঁদি।

কুন্দ। তুমি কোথায় চলিয়াছ? চলনা বাড়িতে যাবে না কি?

সুর। "বাড়ী গেলে আর এ বেশ পরিতাম না। আমার হৃদয় মন অস্থির হয়েছে, চল আমরা এই পাষাণের উপর গিয়া বসি।" সুরবালা আর গৃহে ফিরিলেন না। কুন্দ আর কি করিবে? সে বেচারী চখের জল মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর তাঁহার প্রাণের হরি প্রমোদ গেলেন সহিত তাঁহার এক বার সাক্ষাৎ হয়। তখন হরির হৃদয় অনুতাপাগ্নিতে পুড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, গুরুদেব সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীকে পুনরায় গৃহবাসী করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল না। যোগিনী গৃহে ফিরিলেন না। সুরবালা সংসারকে ভালরূপই চিনিয়া ছিলেন। তিনি ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্তা হইয়া ছিলেন। তাঁহার ভালবাসা চৈতন্যদেবের ন্যায় সাধারণ মনুষ্যের উপর ছড়াইয়া পড়িল। হৃদয় হইতে প্রভু পরমেশ্বরকে নামাইয়া স্বীয় পতিকে সেই স্থানে বসাইতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এই জন্য তিনি গুরু দেবকে এই রূপ এক খানি পত্র লিখিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। "দেব! আমি চিরকালের তরে এ গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম, কারণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, আপনার অনুরোধ প্রতিপালনে আমার ইচ্ছা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। আপনার অনুরোধ প্রতিপালন করিতে গিয়া সংসারের গরল পান আর অভিলাষ নাই। সংসারের মান, সংসারের সম্ভ্রম, সংসারের বিদ্যা, সংসারের বুদ্ধি, সংসারের সুখ ও শান্তি এ কিছুতেই আমার মন আর ধাবিত হয় না। এ সকল নিয়া আমি জ্ঞানহীনা কি করিব? * * * আপনি আমার স্বামীকে যে অপরূপ শোভায় শোভিত করিয়াছেন, তজ্জন্য অনন্তকাল ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আপনারা সুখে ও শান্তিতে থাকুন, ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।" তাহার পর সুরবালা যে কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ আর তাহার সন্ধান পাইল না।

সুরবালার ন্যায় কুসুমের হৃদয় অতদূর উন্নত না হইলেও, কুসুম আমাদের অশ্রদ্ধার পাত্রী নহেন। সুরবালা দেবী, কিন্তু কুসুম

অবলা মানবী। কুসুম অল্পবুদ্ধিমতী প্রেম-বিহ্বলা রমণী। তিনি বেহারীর লাভলালসায় এতদূর উত্তেজিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহার পরিণীত পতি ভবানীকান্তের মৃত্যুতে আনন্দিতা না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। যে নদীর স্রোতঃ খরধারে প্রবাহিত হইয়া,অগণ্য পাহাড় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া সমুদ্রের সহিত মিশিবার জন্য অক্লান্ত পদে ছুটিতেছে। মানুষ! তোমার কি সাধ্য যে তুমি সেই স্রোতোবেগ ফিরাইয়া একটা পঙ্কিল পুষ্করণীতে আনিয়া আবদ্ধ করিতে পার? অভাগিনী কুসুমের হৃদয় বেহারীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র ; স্বার্থান্ধ মনুষ্য তাহার গতি ফিরাইয়া ভবানীকান্তের হৃদয়ে আনিয়া বদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহার ফল এই হইল, ভবানী বা কুসুম কেহই সুখী হইতে পারিলেন না। দুঃখ, ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও অনুশোচনায় ক্লিষ্ট ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া ভবানীকান্ত অচিরে কাল-কবলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বেহারীর সহিত কুসুমের এক বার সাক্ষাৎ হয়। বেহারী বলিলেন,—"কুসুম!" তোমার গভীর ভালবাসার পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। জগৎ জানুক বা নাজানুক, তুমি ভালবাসায় সীতা সাবিত্রীর তুল্যা। আমাদের উভয়ের জীবনের বাসনা জীবনে আর পূর্ণ হইল না, হইবার আশাও নাই। তোমার ভালবাসার নিকট আমার ভাল-বাসা নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। আমি যখন তোমাকে যে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা তোমার জীবনের নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও তুমি তাহা অম্লান বদনে পালন করিয়াছ। তোমাকে আমার জীবনে আর কিছুই বলিবার নাই, আর কি বলিব? আমার হৃদয়কে আমি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। আমি পৃথিবীর সমস্ত ভালবাসা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। তোমাকে আর কি বলিব? আমার আর একটী অনুরোধ তুমি পালন কর, ইহাই তোমার নিকট এক-মাত্র প্রার্থনা ;—তুমি আমাকে ভুলিয়া ভবানীকান্ত বাবুর হও। আমার মমতা পরিত্যাগ করিয়া উঁহার জীবনের সহায় হইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর, জীবন আমার বাঁচাও।" এই কথা বলিবার সময় বেহারীর সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, দুনয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহির্গত হইয়া পড়িতে লাগিল। কুসুম বলিলেন—"পুরুষের পক্ষে সকলি সম্ভব। যদি তুমি পুরুষ না হইতে, তবে ঐ নিদারুণ কথা কখনই বলিতে পারিতে না। * * * পুরুষের সমাজ, পুরুষের আধিপত্য, তোমা-দের পক্ষে সকলি সম্ভব।" "কুসুম, তুমি ঠিক বলিয়াছ, পুরুষের সমাজ পুরুষের আধিপত্য। আরও সুন্দর হইত যদি তুমি বলিতে, স্বার্থপর পুরুষের স্বার্থপূর্ণ সমাজ, রমণী অবলা তাই তাদের উপর এত আধিপত্য। যদি পুরুষগণের ন্যায় রমণীগণ সমাজের শীর্ষস্থানে বসিত, সমা-জের অবস্থা তাহা হইলে বিভিন্নরূপ হইয়া যাইত।"

বেহারী সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ভবানীকান্তের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। কুসুম বেহারীর অভি-লাষ মত ভবানীর অতুল বিষয় সম্পত্তিতে ধর্ম্মতঃ নিজের কোন অধিকার নাই ভাবিয়া,

অচিরাৎ তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু অভাগিনী সেখানে আসিয়াও বেহারীর দেখা পাইলেন না। বেহারী যে কোথায় চলিয়া গেলেন কেহ আর তাঁহার সন্ধান পাইল না। কুসুম একাকিনী বসিয়া প্রিয় সুহৃদ্ কৃতান্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

লেখকের উপন্যাস দুখানি পড়িয়া বাস্তবিক আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। লেখকের স্বদেশানুরাগ ও ধর্ম্মনীতির প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তি বাস্তবিক প্রশংসার্হ। গ্রন্থ দুখানিতে অশ্লীলতা বা কুনীতির নাম গন্ধও নাই। পিতা কন্যার সমক্ষে, ও পুত্র মাতার সমক্ষে অবলীলাক্রমে পাঠ করিতে পারেন। ইহাতে প্রেমের ঢলাঢলি, বিচ্ছেদের হা হুতাশ, পত্রে পত্রে হা প্রেয়সী, হা প্রাণনাথ বা হতোঽস্মির ছড়াছড়ি নাই। প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে Burns ও Scott এর স্বদেশানুরাগ দীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে এই দুই খানি পুস্তককেই উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস মধ্যে পরিগণিত করিতে পারি। দেবীপ্রসন্ন বাবু প্রণীত উপন্যাস তাঁহার উন্নত ও পবিত্র হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ হইয়া বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে চির দিন শোভা পাইতে থাকুক।

প্রমোদকুমার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিষ্ঠুর তুমি।

আবার প্রভাত হইল, আবার পিক ডাকিল, আবার সূর্য্য উঠিল, আবার নলিনী হাসিল, কিন্তু সুহাসের প্রমোদ আর ফিরিল না। জমীদার-গৃহের সকলেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন। জমীদার কোন কার্য্যের জন্য ভৃত্য দ্বারা প্রমোদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্য প্রথমতঃ প্রমোদের গৃহ অন্বেষণ করিল, দেখিল প্রমোদ সেথা নাই; এঘর সেঘর করিয়া সমস্ত বাটী অন্বেষণ করিল, কিন্তু প্রমোদকে পাইল না—অগত্যা জমীদারকে সংবাদ দিল। জমীদার প্রতিবাসীদিগের বাটী অন্বেষণ করিতে বলিলেন। ভৃত্য সমস্ত পল্লী অন্বেষণ করিল, তথাপি প্রমোদকে পাইল না, পুনরায় জমীদারকে সংবাদ দিল। জমীদার ভাবিলেন প্রমোদ বেড়াইতে গিয়াছেন—কিয়ৎকালপরে আসিবেন। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, তথাপি প্রমোদের দেখা নাই। জমীদার উদ্বিগ্ন হইলেন, ভৃত্যকে ভৎর্সনা করিলেন—ভাল করিয়া প্রমোদকে অন্বেষণ করিতে বলিলেন। ভৃত্য পুনরায় সমস্ত পল্লী অন্বেষণ করিল—পূর্ব্বে যে স্থানে এক বার অন্বেষণ করিয়াছিল

এবার সে স্থানে দুইবার অন্বেষণ করিল, কিন্তু প্রমোদকে পাইল না—ভয়ার্ত্তচিত্তে জমীদারকে সংবাদ দিল।

হরিহর যোগেশকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রমোদ কোথায় ?" যোগেশ বলিলেন "জানি না।"—

হরিহরের মনে ভয় হইল। তিনি প্রমোদের গৃহে গমন করিলেন, শূন্য গৃহে "প্রমোদ" "প্রমোদ" বলিয়া ডাকিলেন। শূন্য গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল—কেহ উত্তর দিল না। যোগেশ দেখিলেন প্রমোদের শয্যার উপর তাঁহার "শকুন্তলা" পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি পুস্তক খানি লইয়া দুই চারি পাতা উল্টাইলেন। হঠাৎ তন্মধ্য হইতে এক খানি পত্র ভূমিতে পড়িয়া গেল। তিনি ব্যস্ততা সহকারে পত্রখানি উঠাইলেন—দেখিলেন তাঁহার পত্র, প্রমোদের হস্তলিপি। ভয়ে বিস্ময়ে হৃদয়ের উদ্বেগে পত্র খানি খুলিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"ভাই যোগেশ,

আমি সহসা গৃহ পরিত্যাগ করাতে তোমাদের মনে নানাপ্রকার ভাবনা আসিতে পারে। ভাই সে সকলকে মনে স্থান দিওনা। বহুদিবসাবধি আমার সংসার-বিরাগ—তাই আজ এ পাপ-সংসার পরিত্যাগ করিলাম। ভাই মনে বড় দুঃখ রহিল, তোমাদের ঋণ এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিলাম না। ভাই তোমার পিতা কি আমারও পিতা নন ?—তাঁহার চরণে প্রণাম জানাইও।

তোমার

প্রমোদ।"

"পুঃ—ভাই, আমার গৃহ পরিত্যাগের অন্য এক কারণ পিতা মাতার অন্বেষণ করা।"

যোগেশ মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রমোদের বাটী পরিত্যাগের যথার্থ কারণ বুঝিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল—যোগেশ সজল নেত্রে পিতার নিকট প্রমোদের পত্র প্রদান করিলেন। জমীদার কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে পত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সে কৌতূহল শীঘ্রই অশ্রুবিন্দুতে পরিণত হইল! বৃদ্ধ কিছু বুঝিতে পারিলেন না—বদ্ধ স্বরে যোগেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যোগেশ! সত্যই কি প্রমোদ বাটী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ?" যোগেশ বলিলেন "হাঁ।" স্নেহের উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধের নয়ন হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। জমীদার বলিলেন "যোগেশ ইহার কারণ কি ?" যোগেশ অন্যমনস্কতা সহকারে বলিলেন "জানি না।" জমীদার ভাবিলেন "প্রমোদ বালক, অধিক দূর যাইতে পারিবে না—হয়ত নিকটেই কোন গ্রামে অবস্থান করিতেছে।" এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কএক জন লোককে নিতটস্থ এবং দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। অন্তঃপুরে কুমুদ সর্ব্ব প্রথমে এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিল। স্নেহের কোমল রমণীহৃদয় এই দুঃসহ সংবাদে কাঁদিয়া উঠিল। কুমুদ চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সুহাসের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। কুমুদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, সুহাস হস্তোপরি গণ্ড সংস্থাপন করিয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিয়াছে। আর গণ্ড বহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে।—বিগত রাত্রের দুঃস্বপ্নের দুশ্চিন্তায় বালিকার মন আকুল।

কুমুদ ভাবিলেন, সুহাস কি এ সংবাদ পাইয়াছে?—পুনরায় ভাবিলেন—না বোধ হয় শোনে নাই; যাহা হউক কুমুদ দুঃখ-প্রপীড়িত স্বরে বলিলেন "সু—হা—স।"

সে স্বর শুনিয়া সুহাস চমকিত হইল। বালিকা ভয়-বিহ্বল-স্বরে বলিল "কুমুদ! কি হইয়াছে কুম—?" কথাগুলি হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইল। কুমুদ বুঝিলেন সুহাস এ পর্য্যন্ত এ ভীষণ সংবাদ শোনে নাই—অপর কোন কারণে কাঁদিতেছিল। যাহা হউক কুমুদ ভাবিল বালিকার আর যাতনা বৃদ্ধি করিব না: কিন্তু হৃদয়ের উদ্বেগে বলিলেন—"সুহাস, প্রমোদ দাদা বাটী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

সকল কথা বোধ হয় বালিকার কর্ণে স্থান পাইল না—সুহাস মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বুদ্ধিমতী কুমুদ অপর কাহাকেও ডাকিল না। সে মূর্চ্ছাভঙ্গের কৌশল জানিত—শীঘ্রই সুহাসের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল।

সুহাস চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"কুম—কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—আজ তাহা সত্য হইল।"

বালিকা ধীরে ধীরে পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিল—কুমুদ অনেক সান্ত্বনা দিল, কিন্তু তাহাতে তাহার কি হইবে? বালিকা শিশুর ন্যায় কুমুদের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুমুদ সুহাসকে শোয়াইবার জন্য শয্যা হইতে উপাধান টানিলেন। হরি, হরি তাহার নিম্নে এক খানা পত্র—চতুরা কুমুদ বুঝিলেন—'এ পত্র কাহার'—তিনি লুকাইতে যাইতেছিলেন কিন্তু হইল না,—সুহাস দেখিতে পাইল। সুহাস পত্র খানি চাহিল; কুমুদ কি করে অগত্যা সুহাসের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। সুহাস দেখিলেন প্রমোদের পত্র; কম্পিত হস্তে পত্র খানি কুমুদের হাতে দিয়া পড়িতে বলিলেন। কুমুদ ভাবিল বালিকা যদি পুনরায় মূর্চ্ছা যায়—সেই জন্য পত্র পড়িতে অস্বীকার করিল, বলিল "অপর কোন সময়ে পড়িব।" সুহাস সজল নেত্রে কুমুদের হস্ত ধরিয়া বলিল "পড়—কুম—পড়; অভাগী বলিয়া দয়া করিয়া পড়।" সে অদ্য প্রথম সুহাসের নিকট এরূপ কথা শুনিল। কুমুদ বুঝিলেন প্রণয় আজ বালিকার মুখ ফুটাইয়াছে। সে কথায় কুমুদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—পত্র না পড়িয়া থাকিতে পারিল না—কুমুদ পড়িল:—

"প্রাণের সুহাস,

এ পত্র যে সময় তোমার হস্তগত হইবে, অভাগা প্রমোদের প্রাণের সুহাস! তখন আমি কোথায়? উঃ তোমার ছাড়িয়া—প্রাণের সুহাসকে ছাড়িয়া—আমার সুহাসকে ছাড়িয়া তখন কত দূর গিয়াছি! সুহাস! তোমার পিতা আমার জন্য যাহা করিয়াছেন এ নিষ্ঠুর সংসারে দরিদ্রের নিমিত্ত তাহা কে করে? কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ—তাহার কি ফল দিলাম। সরলে! দুর্ভাগা বলিয়া তিনি কি আমায় ক্ষমা করিবেন? প্রাণের সুহাস, তোমার দাদা আমার নিমিত্ত যাহা করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যে করে না। সুহাস! যোগেশ দেবতা। যোগেশ তোমার পিতার নিকট আমাদের বিবাহের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, তোমার স্নেহময় পিতা শুধু

একমাত্র বাধা উত্থাপন করিয়াছিলেন—সে বাধা আমার কুল শীল। সুহাস! দুর্ভাগার অদৃষ্ট মন্দ, আমি নিজের কুল শীল জ্ঞাত নহি। সুহাস, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমার সুহাস! তুমি যদি আমার হইলে না তবে দুর্ভাগার এ জীবনে সুখ কি? ভাই তোমার অভাগা প্রমোদ আজ তোমায় ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবে। যদি কোন জন্মের পুণ্য থাকে তবে হিংস্র জন্তু এ দুর্ভাগা জীবনের শেষ করিবে। কিন্তু সে সুখ কি এ দুরদৃষ্টে ঘটিবে? সুহাস! তুমি দেবী—এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে তোমায় হৃদয়ে ধারণ করিব? সরলে! আমার জন্য দুঃখিত হইও না। তুমি সুখে থাকিলে জানিও তোমার প্রমোদও সুখে আছে। কুমুদকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিইও আর দুর্ভাগা ভ্রাতা বলিয়া এক এক বার স্মরণ করিতে বলিও—আর তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! দুর্ভাগা বলিয়া দিনান্তে এক বার স্মরণ করিও।

তোমার স্নেহের
প্রমোদ।"

কুমুদ পত্র পাঠ সমাপন করিলেন—অশ্রু-বিন্দুতে তাঁহার চক্ষু ভাসিয়া গেল। আর সুহাস?—তাহার দুঃখ, তাহার কষ্ট কি ক্রন্দনে প্রকাশ পায়? সে নিঃশব্দে সব শ্রবণ করিল—অস্ফুটস্বরে তাহার মুখ হইতে একটী কথা বাহির হইল। সে কথা——"নিষ্ঠুর প্রমোদ।"

প্রাচীন কালের সিংহল।

এই বিখ্যাত দ্বীপকে পুরাকালে ভারত-বর্ষের অন্তর্বর্ত্তী বলিয়া গণনা করা হইত না, এবং ভারতবর্ষের সহিত ইহার কোন সন্ধি-বিগ্রহাদি হয় নাই। তাহা বলিয়া কেহ যেন এই দ্বীপ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবিত বিবরণকে পৌরাণিক সিংহলের কথা মনে না করেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দ্বীপ "সিংহল"বংশের নামানুসারে "সিংহল" নামে অভিহিত হইত। কেননা সিংহবংশের পুত্র বিজয় খৃষ্টের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ দেবের মৃত্যুদিনে এই দ্বীপ জয় করেন। ইহার প্রাচীন নাম "পাউচু" কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় "রত্ন-দ্বীপ"। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় দ্বারা ইউরোপ মহাদেশে সর্ব্ব প্রথমে ইহা 'Taprobane' বলিয়া পরিচিত হয়। পার্সি ভাষায় ইহাকে "তাম্বপান্নী" বলিয়া থাকে—ইহার অর্থ "রক্ত হস্ত",—বিজয়ের পীড়িত সঙ্গীরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া ইহার রাঙ্গা মাটী স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া ইহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহার নাম "তাম্বপান্নী" নহে এবং ইহার অর্থ "রক্ত-হস্ত"ও নহে—সংস্কৃত ভাষায় ইহার যথার্থ নাম "তাম্র-পর্ণী"।* সুবিখ্যাত ল্যাসেন সাহেব ঐ নামের অর্থ করিয়া বলেন যে, এই দ্বীপে

* Turnour's 'Mahawanso,' P. 50.

"রক্তপদ্মবিশিষ্ট পুষ্করিণী" ছিল বলিয়া ইহার নাম ঐরূপ হইয়াছিল। পরে আবার এই দ্বীপ Simundu কিম্বা Palai-Simundu নামে পরিচিত হয়, কিন্তু ল্যাসেন সাহেব বলেন, এই নাম "পালি সামন্ত" অর্থাৎ "পবিত্র নিয়ামক" শব্দ হইতে উদ্ভূত। এই শেষোক্ত নামে মিশরদেশীয় গ্রীক শাসনকর্তা টলেমিদিগের রাজ-বাটী সহ নগর (Anaraj pura or Anura grammon) কে প্লিনী আখ্যাত করেন। টলেমিদের অখ্যাত Anaraj pura র বিপরীত দিকে—সিংহল দ্বীপের পশ্চিম উপকূলস্থ Andra Simundu নামক একটী অন্তরীপের কেবল নামমাত্র পাওয়া যায়। বোধ হয় এই অন্তরীপের নাম হইতে—সমস্ত দ্বীপের নাম Palai Simundu হইয়া থাকিবে। টলেমি এই দ্বীপকে Salike বলেন—ল্যাসেন সাহেবের মতে নাবিকগণ কর্তৃক Sinhalak নামের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া Salike নামে আখ্যাত হইয়াছে। আমিয়ানস (২) এবং কসবস দুই জনেই এক অর্থাত্মক Sieldiba এবং Serendivus নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—এই দুই কথাই পালী ভাষায় "সিংহল" দ্বীপের অপভ্রংশ মাত্র। আবুরিহান (৩) ইউরোপীয় বণিকদের ন্যায় ইহাকে Singaldib কিম্বা Sirindib বলিয়া আখ্যা দেন। সেই নাম হইতে বোধ হয়, আরবেরা ইহাকে জিলান (zilon) এবং ইংরেজেরা সিলোন (Ceylon) করেন। হিন্দুগণ ইহাকে "লঙ্কা দ্বীপ" নাম দিয়াছেন—এই নামও পালী ভাষা হইতে উৎপন্ন (4)।

প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিয়েন সাঙের মতে এই দ্বীপের বেষ্টন ৭০০০ লিগ্ অর্থাৎ ১১৬৭ মাইল। কিন্তু এমার্সন টেনেণ্টের মতে ইহার যথার্থ পরিধি ৬৫০ মাইল। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ইহার আকার সম্বন্ধে এরূপ অনেক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন যে তাহাতে আমাদের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। কসমাস নামক এক জন পরিব্রাজক এই দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া—এই দ্বীপকে দৈর্ঘ্যে ৩০০ (Gaudia) গডিয়া এবং প্রস্থে ৩০০ গডিয়া বলেন। * গাডয়াকে কেহ কেহ বলেন যে আমাদের দেশ-প্রচলিত

(2) Ammianus :—a Latin historian, who served in the army of Julien. B. at Antooch D. 390 A. D. He wrote the Roman history from the reign of Nerva to the death of Valens in 3 books of which only eighteen are extant.

Beeton's universal information.

(৩) মুসলমান ইতিহাস লেখক।

(4) Turnour's 'Mahawanso' P.P. 2, 3, 49.

* 'Sir Emerson identifies with that of a local measure named *gaon*, which he estimates at about 3 miles, thus making the island 900 miles long, and as and as many broad.'

Vide Cunningham's Ancient geography of India P.P. 558, 559.

"গোকোশ" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। একটী গাভী চীৎকার করিলে যত দূর পর্য্যন্ত শোনা যায় তাহাকে "গোকোশ" কহে—কানিংহাম সাহেবের মতে এক একটি "গোকোশ" এক সহস্র ধনু অর্থাৎ ১০১৩৬ মাইল। তাহা হইলে ৩০০ গডিয়া ৩৪০ মাইলের সমান অর্থাৎ যথার্থ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কেবল ৭০ মাইল অধিকমাত্র। প্লিনী ইহার দৈর্ঘ্যকে ১০০০০ ষ্টডিয়া (Stadia) অর্থাৎ ১১৪৯ ইংরাজী মাইল বলেন। টলেমি এবং মার্সিয়ানস যথাক্রমে ১০০০ মাইল এবং ১০৯১½ মাইল (9500 Stadia) ইহার দৈর্ঘ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন। প্রাথমিক চৈনিক পরিব্রাজক ফাহায়েন ৪১২ খৃঃ অব্দে (সোপাটারের ভ্রমণের এক শতাব্দী পূর্ব্বে) সিংহল পরিভ্রমণ করিয়া ইহাকে দীর্ঘে ৫০ যোজন এবং প্রস্থে ৩০ যোজন বলিয়াছেন।

স্যার এমার্সন টেনেণ্ট প্রণীত Ceylone নামক গ্রন্থে সিংহল দ্বীপের বর্ত্তমান বন্দর গণকে বাইবেলের টার্সিস (Tarshis) বলিয়া অনুমান করেন এবং ঐ টার্সিস আরব সাগর এবং অফিরের মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীন মালকার নাম অফির—কেন না মালয় ভাষায় অফির শব্দের অর্থ সুবর্ণখনি। কিন্তু টেনেণ্ট সাহেবের মত আমরা অনুমোদন করিতে পারি না—কেন না বাইবেলস্থ সলোমনের জাহাজ সিংহল হইতে যে সব দ্রব্য মিসরে লইয়া গিয়াছিল তাহাদের নাম বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার কথা। তিনি আরও বলেন যে বর্ত্তমান সিংহল দ্বীপে যে সকল কথা বস্তুর নামে ব্যবহৃত হয়, তাহা তামিল ভাষা হইতে গৃহীত। তামিল নাম—যেমন "সেনহাবিম" (হস্তিদন্ত), "কোফিম" (বানর) এবং টুকুম (তোতা পাখী)। কিন্তু "ইভ" "কপি" এবং 'শুক" বিশুদ্ধ সংস্কৃত—বাইবেলে এই কথা গুলির উপর কেবল হিব্রু বহুবচনের প্রত্যয় দিয়া রূপান্তর করা হইয়াছে মাত্র। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে, ঐ সকল সংস্কৃত শব্দ দাক্ষিণাত্য হইতে সিংহলে নীত হইয়াছে—এবং সিংহলবাসীরা ঐ সকল কথা যে প্রাচীন তামিল ভাষা হইতে গ্রহণ করে নাই তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। কেন না তামিল ভাষায় হস্তীকে "যনি" বানরকে "কুরঙ্গ" ময়ূরকে "মারিল" এবং তোতা পাখীকে "ফিলিপ পিলে" কহে। যখন দেখিতেছি, সলোমন সংস্কৃত শব্দ সিংহল দ্বীপ হইতে পাইয়াছিলেন—তখন আমাদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সলোমনের কিয়ৎ শতাব্দী পূর্ব্বে (খৃষ্ট জন্মিবার ১২০০ কিম্বা ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে) আর্য্যবংশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশ অবশ্য অধিকার করিয়া থাকিবে। কিন্তু অপর দিকে আর্য্যদিগের লিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাই যে আর্য্যগণ এই সময়ে নর্ম্মদা নদী ও অতিক্রম করেন নাই। ঐতিহাসিক অংশে এই স্থানে আমরা একটু ভ্রমে পতিত হইলাম—অথবা ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে আর্য্যগণ বাণিজ্যোদ্দেশে সিংহল দ্বীপে গমন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বোধ হয় অধিবাসিগণকে অসভ্যাবস্থায় দেখিয়া ঐ দেশকে বাণিজ্যের উপযোগী বিবেচনা করেন নাই। সিংহলীদের ইতিহাসেও জানা যায় যে বিজয় সিংহের সিংহল আক্রমণের পূর্ব্বে তাহারা অতিশয় অসভ্যাবস্থায় ছিল। মগধ-

রাজ অশোকের পুত্র মহেন্দ্রের রাজত্ব-সময়েও (খৃষ্টের ২৪২ বৎসর পূর্ব্বে) আর্য্যদিগের সহিত ইহার কোন বিশেষ সংস্রব ছিল না।

স্মীথ সাহেব Dictionary of the Bible নামক গ্রন্থে অফির-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে "হস্তিদন্ত" "বানর" এবং "ময়ূর" টার্সিস (বর্ত্তমান গল বন্দর) হইতে আমদানী হইত—অফির হইতে নহে। অফির হইতে কেবল স্বর্ণ ও আলগম বৃক্ষ আমদানী হইত। তিনি এই অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় হস্তী, বানর ও শুকের নাম দেখান—কিন্তু আলগম কাষ্ঠের কথা বাকি আছে—প্রফেসর ল্যাসন সাহেব ঐ শব্দটীকে সংস্কৃত "বল্গুক" (চন্দনকাষ্ঠ) শব্দের অপভ্রংশ বলেন। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে বর্ত্তমান আরব দেশে এখন স্বর্ণ পাওয়া যায় না—কিন্তু সম্ভবতঃ পূর্ব্বে পাওয়া যাইত। ইহা যদি সত্য হয় তথাপিও স্বর্ণের আমদানী বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল—কেন না সেবার রাণী (Sheba) সলোমনকে বিস্তর সুবর্ণ উপহার দিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় ঐ অফির হিন্দু ভূগোল শাস্ত্রের "সৌবির"—রাজপুতানার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। "সৌবির" কে আরও পশ্চিমের লোকেরা হোবির বলিত। প্লীনির মতে কাম্বে উপসাগরের উত্তরের দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যাইত—আজও ঐ স্থানে পাওয়া যায়। আর্ব্বলী-পর্ব্বত-জাত সুবর্ণের আদর্শ আজও এসিয়াটিক মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। খৃষ্ট জন্মিবার ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম ভারতবর্ষে আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সলোমনেরও বহু পূর্ব্বে আর্য্যভাষা ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

প্রলাপ।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(আরম্ভে)

(১)

প্রকৃতির শিশু আরাধি তোমায়
এস এস তুমি আমার কোলে,
ঘুমাবে চাঁদিমা আকাশ সুষমা
হৃদয়ের বেগে পড়্‌বি ঢলে।

(২)

আমিও অমনি লেখনী লইয়া
টানিব কতই কালির দাগ্,
ফোট ফোট মন ফুটিবে অমনি
বাহিরিবে ভাব লাগিলে চাপ্।

(৩)

আসিবেন দেবী হৃদয়ে আমার
গুণ গুণ স্বরে ধরিবে তান,
অঘোর ভাবেতে মাতোয়ারা হ'য়ে
ছিঁড়িয়া আনিবে আকুল প্রাণ।

(৪)

কল্পনার জোরে কত শত ভাব
ছুটিবে হৃদয়ে তাড়িত বেগে,
সরল প্রাণের বসাইয়া হাট
দেখিব স্বরগ হৃদয়-যোগে।

(৫)

আসিবে কোলেতে আমার আমার
ছুটিয়া ধরিতে মোহিনী মেয়ে,
আবার আবার ছুটিয়া পলাবে
কি যেন কি ভাবে লজ্জিত হ'য়ে।

(৬)

চাইনা অমন চাইনা তেমন
সংসারের ছাই ধূলার খেলা,
তোমাকে লইয়া কোলেতে আমার
রাখিয়া কেবল দিইব দোলা।

(৭)

নাচিবে দুলিবে হাসিবে খেলিবে
হাত পা নাড়িবে কেঁদোনা তুমি,
কাঁদ কাঁদ মুখ দেখিলে তোমার
মরমে মরিব দুখেতে আমি।

(৮)

আকাশের চাঁদ উঠিলে হৃদয়ে
সুধার কিরণে দিইব ফোঁটা,
"আই আই" ব'লে ডাকিয়া কতই
আনিয়া দিইব ধরিয়া বোঁটা।

(৯)

ছিঁড়িয়া আনিয়া নক্ষত্র রতন
গাঁথিয়া একটী সুরম মালা,
গলাতে পরায়ে কেবল দেখিব
ভুলিব সকল সংসার-জ্বালা।

কবি।

প্রথম প্রস্তাব।

জগতে মনই জ্যোতির্ম্ময় অমূল্য রত্ন। এই মনের বিকৃত অবস্থাকে লোকে বৈরাগ্য বলে; এবং চিত্ত লিপ্সাই ইচ্ছা। ইচ্ছাতেই ভাব। মনোভাব—স্ফূর্ত্তিতে অথবা বিকারে—যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন, এক অপূর্ব্ব, কিম্ভুত বস্তু। কবি এই বস্তুর অধিকারী, কাব্য তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস। যথার্থ কবি নামের সার্থকতা কয় জন করিয়াছেন? তোমার আমার ন্যায় কবিদিগকে আমি কবি বলি না। আজ কাল বঙ্গ দেশে যে কবিদিগের মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই, অধিকাংশকেই কবি-কলঙ্ক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কবি সিদ্ধ-পুরুষ। ভক্তিময়, শ্রদ্ধাময়,

দেবাভাময় জ্ঞানের সম্পূর্ণতা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রথম প্রস্তাবের কবি-শ্রেণীভুক্ত। চতুর্দ্দিকে আনন্দপুষ্প প্রস্ফুটিত, শান্তি প্রীতি প্রভৃতি বৃক্ষ লতা সজ্জিত, আত্মা অটল শৈল, কুলু ২ রবে স্রোত বহিয়া অনন্ত-অপার জ্ঞান নদ প্রবাহিত, চিত্তমুগ্ধকারী পঞ্চভূতময় কানন শোভিত, যাঁহার ভাগ্যে আত্ম দর্শন ঘটিয়াছে, সেই অনন্ত রাজ্যে, শোকশূন্য রাজ্যে, বিপ্লব-শূন্য রাজ্যে, শান্তিময় রাজ্যে, কবিই এক-মাত্র রাজ্যাধিকারী। জ্ঞান-নেত্রে দেহের সূক্ষ্মতম অংশকে যিনি দেখিতে পান, সরল অথচ গম্ভীর, মধুময় অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—যে দৃষ্টি তেজোময়, ভক্তিময়, সমদর্শী—সেই দৃষ্টি যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই পূজ্যপাদ কবি নামের উপযুক্ত পাত্র। কবি অন্তর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান-নয়নে দেখিলেন, হৃদয়-রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে, বিদ্রোহী প্রজাগণ স্ব স্ব স্থানে বশীভূত হইয়া আজ্ঞাবহ হইয়াছে, উন্নতির প্রায় উচ্চতম শিখরে আত্মা আরোহণ করিয়াছে, কল্পনার গুণ-গানে মন মাতিয়া গিয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ রাজার অভিলষিত মতে বৃত্তি চালনা করিতে তৎপর, রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে. সেই জগৎদুর্লভ, তেজস্বী কবি যে, সংসারে পৃথ্বীমাতার সার সন্তান, তাহা বোধ হয় প্রাণ খুলিয়া তার স্বরে সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু হায়! ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয় যে ইদানীং পৃথিবীতলে ঈদৃশ কবি নাই, এবং ভারত ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে যে ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

প্রেম-রাজ্যে কবিদিগের যত অধিকার, বিশুদ্ধ, স্বর্গীয়, বাঞ্ছনীয় প্রেমের দিব্য দৃশ্য কবি হৃদয়পটে যত উৎকৃষ্ট রূপে অঙ্কিত, সমগ্র পৃথিবীতে অন্য কেহই এত বিস্তৃত, দৃঢ় অধিকার কিংবা চিত্রিত করিতে পারেন না। মৃদু মধুর বসন্ত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় মলয়-মারুতে কল কল নিনাদিনী প্রেমোন্মত্তা নদীবক্ষে চন্দ্রমার দোলানীর ন্যায়—যে ভালবাসায় শশী নীরের সহিত বদ্ধ—যে পবিত্র প্রেমে পিতা পুত্র—জননী সন্তান—স্বামী স্ত্রী—বন্ধু—প্রেম ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পড়িয়া যতপ্রকার রূপান্তরই প্রাপ্ত হইতে পারে—এক কথায় প্রেমের রূপান্তর হউক আর এক মূর্ত্তিতে হউক প্রকৃতিকে যে প্রেম-পুষ্প উপহার প্রদান করা যায়—সেই গুণগ্রাহ্য ভালবাসার কবি এক মাত্র অধিকারী। যে প্রেমের যথার্থ মর্ম্ম জানিয়াছে সেই প্রেমিক। কবি প্রেমিক এবং প্রকৃতিকে ভাল বাসিতে জানেন। কবিদিগকে আমরা প্রকৃতির প্রিয় পুত্র বলি। প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞানে ইঁহারা যত জ্ঞানী, জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইঁহারা যত সিদ্ধ, ভুবনে অন্য কোন সম্প্রদায়ই তত নিপুণ নহেন। কবি মনশ্চক্ষে মনোহারিণী প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পান। এক মোহময় দেবভাব-পূর্ণ মানসিক বৃত্তি আসিয়া হৃদয় মন আয়ত্তাধীন করে। কবি বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে প্রবেশ করেন—দেখেন রিপু ষষ্ঠ বশীভূত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সমূহ দমিত হইয়াছে।

কবিত্ব-সংসারে কবি প্রবেশ করিয়া সুগন্ধি, ভুবন-মোহন পুষ্প সৃজন করিলেন। আহা! সেই দেব-বাঞ্ছিত, পারিজাত-বিনি-

ন্দিত কাব্য-পুষ্পের ঘ্রাণে সংসার আমোদিত হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলের ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে সে ঘ্রাণ স্পর্শ করে না। যিনি বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণ-ঘ্রাণ-বিশিষ্ট তিনিই মোহিত হয়েন। সৌরভ, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া ঘ্রাণককে ইহ জগৎ হইতে এক আমোদময়, আনন্দময় প্রদেশে লইয়া যায়। আর তাহার সে ভাব থাকে না, আর তাহার সে চিত্তচাঞ্চল্য থাকে না, তাহার চক্ষে সকলই প্রীতিকর, স্থির। এ পুষ্পের স্রষ্টা—কবি। যদি ঘ্রাণক কাব্য পুষ্পের ঘ্রাণে জগতকে ভুলিয়া যান, যদি দেবতাও কবির নিকট যোড়কর হয়েন, তবে কবি যে ত্রিলোকের পূজ্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কবি ঐশ্বরিক ভাবে মগ্ন। লক্ষ্য এক—মন এক—প্রাণ এক—জগতের প্রত্যেক পরমাণুর সহিত কবি মিশাইয়া যান। দেখেন জগতে কিছুরই প্রভেদ নাই, সবই একাকার, সকলেই ব্রহ্মরূপ। আমরা তখন তাঁহাকে দেবতা বলি। এ শ্রেণীর কবিগণ কল্পনার শান্তিময় ক্রোড়ে বিরাজিত থাকেন। অনন্ত সুখময়, উন্নততম স্বর্গ-রাজ্য ইঁহাদের বাসস্থান। যে বিমল আলোকে কবিত্ব-রাজ্য আলোকিত করে, অমরাবতী-লাঞ্ছিত যে কবিত্ব-রাজ্য পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, এই দলের কবিরা সেই রাজ্য-ভুক্ত। ইঁহাদের কাহারও মনে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই, ইঁহাদিগের রাজা নাই; ইঁহারা স্ব স্ব প্রধান। স্বাধীন ভাবেই এই কবিরা বিভোর। কেহ কাহার প্রতি ঈর্ষ্যা নেত্রে কটাক্ষপাত করেন না। রাগ, দ্বেষ, অসূয়া প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তিচয় ইঁহাদিগের মাহাত্ম্যময় জীবন দেখিয়া দূরে অপসৃত হয়। তুমি আমি এই আভিধানিক বাক্য ইঁহারা ভুলিয়া যান। তখন ব্রহ্মময় পৃথিবী তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অন্য কথা দূরেথাকুক, কবিত্ব-শক্তির প্রভাবে ইঁহারা আপনাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিস্মৃতির গভীর জলে ফেলিয়া দেন। যাঁহার আমিত্ব লোপ পায়, এমন কি আত্মদর্শন ঘটিয়া থাকে, তাঁহার আর দেবত্বের বাকি কি রহিল?

এই কবি শ্রেণীর গুরু ব্রহ্মা, প্রধান শিষ্য বাল্মীকি। জগজ্জন সমক্ষে মোহন ভাবে কবিত্বের বংশী বাজাইয়া এ শ্রেণীস্থ কবি পৃথিবীর সার রত্ন। যাঁহারা আত্মার বিভেদ দেখেন না, যাঁহারা জগতকে ব্রহ্মময় দেখেন, তাঁহারা যে ঐশ্বরিক-ভাবগত ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মনুষ্য ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিল, তাঁহার নিরাকার আত্মা পরমাণু দ্বারা আকর্ষিত হইয়া পরমাণুর সহিত মিশাইয়া যাইল, তখন তিনি ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার নামের অগ্রে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহৃত হইল। জীবদ্দশায় দেহমধ্যস্থিত আত্মাকে যিনি পরমাণুর সহিত মিশাইতে দেখেন, আত্মার শেষ দশা—যাহা অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না—সেই চরম দশা, যিনি জ্ঞান-নয়নে দেখিতে পারেন তিনি কি পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সক্ষম নহেন? পাষণ্ড নাস্তিকগণ যদি এই কবিদিগের সাক্ষাৎ পাইত, বোধ হয় সেই জগদীশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে তাহারা সন্দিগ্ধচেতা হইত না।

কবি স্বর্গের লোক। স্বীকার করি তাঁহাদিগের ভূতলে জন্ম, তথাপি তাঁহারা কল্পনার

প্রধান সেবক। মনুষ্য যদি কল্পনাকেই চিনিল, যদি কল্পনার নিরাকার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে পারিল, তবে তাহার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ কোথায়? ভাবিয়া দেখিলে, ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে শক্তিরূপিণী প্রকৃতি সতীই কল্পনার অন্যতর আখ্যা। স্বভাবের মূলেই যে কল্পনা বিরাজিত, ইহাতে কেহই সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে প্রকৃতির ব্যাখ্যা আমাদিগের বিবেচ্য বিষয় নহে। যিনি উপরি উক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বাস্তবিক তিনিই ব্রাহ্ম। সেই অনন্ত, অপরিমেয় ব্রহ্মকে এই কবিরা জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পায়েন, সুতরাং আমরা ইহাদিগকে ব্রাহ্ম বলিতে পারি। ব্রহ্মের উপাসনা—তাঁহাকে জ্ঞান-নেত্রে দর্শন করাই ব্রাহ্মের ধর্ম্ম। সবই এক, নিরাকার, ব্রহ্মময়-জগৎ নিয়ন্তার ঐশিক জ্যোতিঃ যাঁহারা দেখেন—যাহার নয়নে জগৎপিতার মহিমা ঠেকে, তিনিই ব্রাহ্ম নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। এক কথায় ঈশ্বর বাচ্য শব্দ ভিন্ন সকল গুণ বাচক শব্দই ইহাদিগের স্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কবিত্ব-কাননে কবি অক্ষয়, অদ্ভুত, মুগ্ধকর কাব্য কুসুম সৃজন করেন, ভাবুক পাঠক তাহার ঘ্রাণে বিমুগ্ধ হয়েন। ঐ পাঠকদলও সংসারে পূজনীয়। কবির উচ্ছ্বাস যাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া হৃদয়কে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আপ্লুত করাইতে পারেন তাঁহারাই প্রথমশ্রেণীস্থ কবি প্রণীত কাব্যের পাঠক। স্বর্গীয় হৃদয়োচ্ছ্বাস বিশুদ্ধ ভাবে আসিয়া যে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—কোন্ হৃদয়বান্ পাঠক এই বিভাগস্থ পাঠকবৃন্দকে,—ভাবুক চিন্তাশীল, জ্ঞানী পাঠক হইতেও—উচ্চতম সিংহাসনে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইবেন? কবি মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, সে মনোভাব স্রোতে স্বেচ্ছাক্রমে যে পড়িল সে জগতের আদরণীয়, আদর্শ। স্রোত সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হয়, ভাবুক বক্ষ পাতিয়া দেন, উচ্চোর্ম্মি-সমন্বিতা মনোহারিণী স্রোতস্বতী বক্ষে আসিয়া পড়ে—অন্তরে আসিয়া পড়ে, ভাবুক তখন ধারক হয়েন। উক্ত পাঠকগণকে আমি ভাবুক বলি।

এই ভাবুক অথবা পাঠকগণ কবির উচ্ছ্বাসে পড়িয়া মন তরীকে স্রোতোঽভিমুখে ভাসাইয়া দেন, স্রোতঃ যে দিকে বহিয়া যায় মনও সেই দিকে ধাবিত হয়। স্রোতঃ আপন মনে বহিয়া যায়, কিন্তু মন কিয়ৎ দূর গমন করিয়া আর যাইতে পারে না, কারণ বিবেক কাণ্ডারী তত বহুদর্শী নহে, তরীকে অধিক দূরে যাইতে দেয় না। সুতরাং ভাবুক, কবি হইতে নিম্নতর প্রদেশে স্থান প্রাপ্ত হয়েন। ভাবুক কল্পনাকে চিনিলেন—উপাসনায় রত হইলেন, কিন্তু সিদ্ধ হইতে পারিলেন না, কিয়ৎ দূর গমন করিয়া বুদ্ধিকে আর চালনা করিতে পারিলেন না। ভাবুক প্রকৃতির নিয়ম বুঝিলেন—আপনাকে চিনিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে আত্মদর্শন ঘটিল না। কাব্য-বীণার স্বর শুনিয়া ভাবুক মুগ্ধ, কিন্তু সুর চিনিলেন না। এবম্প্রকার সকল বিষয়ে কবি হইতে ভাবুক নিম্নতর সোপানে আরূঢ়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও কবি হইতে পাঠক নিকৃষ্ট, তথাপি নিঃসন্দেহ ভাবুক জগতের নিকট মাননীয়, পূজনীয়।

কি অশুভ ক্ষণে ঈদৃশ কবি ও ভাবুক ভূমণ্ডল হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, কি অশুভক্ষণে ভারত এই রত্ন বিহনে দিন ২ ক্ষীণকায়া হইতেছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। কবির কাব্য হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ আলোড়িত করিয়া কি যে এক রসভাবের সহিত হৃদয়ে মিশাইয়া যায়, দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, ইতিহাস বল, কিছুই হৃদয়—মন তত সুদৃঢ় রূপে আয়ত্তাধীন করিতে পারে না। কবির ন্যায়, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ইতিবেত্তা কেহই নিজ ভাব পরভাবের সহিত তেমন করিয়া মিশাইতে পারেন না। যে দিন ভারত এতাদৃশ রত্নে বঞ্চিতা হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ভারত অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। যে দিবস ভারত-অদৃষ্টাকাশে কবি সূর্য্য ও ভাবুক চন্দ্র অস্ত গিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তমোময় ঘোর অন্ধকার, স্বীয় কৃষ্ণাঞ্চলে ভারতের বদন আবৃত করিয়াছে। কবে পুনরায় সেই চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইবে, কবে দিব্যালোকে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে? আশার অম্বরে চাহিয়া আর কত দিন আমরা এ অবস্থায়—এ শোচনীয় পরাধীনাবস্থায় থাকিব? কবিদিগের উপর জগতের সুখ দুঃখের অধিকাংশ অংশ যে নির্ভর করে, ইহাতেই তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সংসারের সহিত কবি যে বিশেষ সম্বন্ধে বদ্ধ, কবির অস্তের সহিত সংসারের সুখের যে অস্ত হয়, তদ্বিষয়ে কাহার আর দ্বৈধ মত থাকিবে না। কবির সহিত ভারতের সুখ যে পলায়ন করিয়াছে, ইহাতেই স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। এ বিষয় গভীর, স্থির, শান্ত ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, যাঁহার মত অন্যপ্রকার বিকাশ পূর্ণ, তিনিও ইহা উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এ বিষয় অধিক আন্দোলন করিতে অধিক স্থানের প্রয়োজন। কিন্তু বিষয়টী যেরূপ দীর্ঘ সমস্ত মত প্রকাশ করিলে পত্রের সংখ্যা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যদি বিষয়টী শেষ করিয়া স্থান পাই, তাহা হইলে শেষাংশে সংসারের সহিত কবির সম্বন্ধ; এ প্রস্তাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিব।

আসামস্থ পার্ব্বত্য জাতির ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কৃষিকার্য্য।

এরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে যদি নিয়মিত রূপে শস্য রোপণ করা যায়, তাহা হইলে, তাহা হইতে যে অশেষ ফল লাভ করা যায় সে বিষয়ের আর সন্দেহ কি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদ্দেশীয় লোকেরা কৃষি কর্ম্মে নিতান্ত অপটু। যদি ভূমি ঈদৃশী উর্ব্বরা না হইত,

তাহা হইলে, উহারা নিজের অন্ন করিয়া খাইতে পারিত কি না সন্দেহ। এখনও বিদেশীয় সামগ্রী ব্যতীত সমস্ত প্রদেশের ব্যয় সঙ্কুলন হয় না। যদি এক দিন বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অনেককেই দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়। পূর্ব্ব কালে বিদেশীয় লোক ভয়ে কেহ এ প্রদেশে আসিত না, সুতরাং, দেশীয় উৎপন্ন বস্তু দ্বারা সকলের ব্যয় সম্পন্ন হইত। কিন্তু এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ও যত্নে, আসাম প্রদেশে গমনাগমনের সচ্ছলতা দেখিয়া, অনেকেই নির্ভয় মনে যাইয়া বাস করিতেছেন। মায়াবিনী রমণী, সিংহের গভীর গর্জ্জন আর কেহ দর্শন ও শ্রবণ করেন না। সে সকল কিংবাদন্তী এক্ষণে অলীকতায় পরিণত হইয়াছে। আসামও দিন ২ বিদেশীয় লোকে পরিপূর্ণ হইতেছে। এখন আর দেশোৎপন্ন অন্ন সামগ্রীতে ব্যয় সঙ্কুলন হয় না; সুতরাং তাহারা সকল বিষয়েই পর মুখাপেক্ষী হইয়া দিন যাপন করিতেছে।

আসামে যতপ্রকার কৃষিব্যবসায়ী লোক আছে তন্মধ্যে কাচারিরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহারা যেমন শ্রমশীল ও সবল তেমনি বুদ্ধিমান্, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে স্বীয় অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিতেছে না। ধান্য (আস, আমন, বোয়া) (১) মাটি কলাই, মাস, সোনা মুগ প্রভৃতি কতিপয় শস্যমাত্র কাচারিরা আবাদ করে; তন্মধ্যে ধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া আদৃত। তজ্জন্য উহা প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বত্র উপ্ত হয়। লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষিসম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তু বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের তুল্য, কিন্তু কার্য্যপ্রণালী তাহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে পৃথক্। সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত আমরা নিম্নে দুই একটী শস্যের আবাদ প্রণালী——বিবৃত করিলাম।

ধান্য চাস।

পর্ব্বতের নিম্নদেশস্থ জল-কর্দ্দমময় স্থল ও অন্যান্য তাদৃশ নিম্ন স্থান আমন ধান্য আবাদের উৎকৃষ্ট স্থান। বর্ষারম্ভে (বৈশাখ মাসে) (২) ঐ সকল ভূমি এক বার কর্ষণ

(১) এই প্রকার ধান্য রোপণ প্রভৃতি কিছু করিতে হয় না. সামান্য ঘাসের মত শস্য ক্ষেত্রে আপনা আপনি জন্মায়। ইহার চাউল তত উৎকৃষ্ট হয় না "বোয়া" এই কথাটী বোধ হয় "বায়ু" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া এই ধান্য ক্ষেত্র মধ্যে পতিত হয় ও তাহা হইতে গাছ হয়।

(২) বোধ হয় বৈশাখ মাসে বর্ষারম্ভের কথা শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কিন্তু বাস্তবিক আসাম-প্রদেশে বৈশাখ মাসেই বর্ষারম্ভ হয়। এ প্রদেশে অন্যান্য ঋতু প্রায় স্পষ্ট বুঝা যায়না, শীত ও বর্ষা এই দুইটীমাত্র ঋতু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বর্ষা, এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত শীত।

করিয়া আইসে। তহাকে "গরান" দেওয়া কহে। অনন্তর বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ঐ সকল ভূমি বর্ষার জলে নদীর প্লাবনে সারবতী হইলে, শ্রাবণ মাস হইতে প্রকৃত চাষ ও রোপণকার্য্য আরম্ভ হয়। কৃষক প্রত্যুষে উঠিয়া টকা মস্তকে ক্ষেত্রে গমন করিল, বর্ষার প্রবল ধারা-সম্পাত তাহার মস্তকে সায়ক-নিকরের ন্যায় পতিত হই-তেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, আনন্দে হল-চালনা করিতেছে ও গাইতেছে। কি গাইতেছে? সে সঙ্গীতের অর্থ নাই, ভাব নাই, কেবল চিৎকারমাত্র "হবে মা মা কৈ কৈ" ইত্যাদি। (৩)

এদিকে পতিপরায়ণা রমণীগণ প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহকার্য্যাদি সমাপনপূর্ব্বক বীচ (৪) মস্তকে ক্ষেত্রে গমন করে। কৃষকেরা কর্ষণ করিয়া ভূমি রোপণোপযোগিনী করিয়া দেয় উহারা রোপণ করিতে থাকে। এই রূপে যখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহিত হয়, তখন সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করে। আবার এদিকে বেলা তৃতীয় প্রহর হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত রমণীগণ বীচ উঠায়। পুরুষগণ কেহ বীচ-বপনে তৎপর হয়, কেহ বা প্রতিবাসি-গণ সমভিব্যাহারে মৎস্য বা তৃণ সংগ্রহার্থ গমন করে।

ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত এইরূপে রোপণকার্য্য চলিতে থাকে। অনন্তর শরদীয় কাশকুসুম দর্শন করিলে রোপণকার্য্য সমাপ্ত করিয়া মহা-হর্ষে সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ‡ আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাস বিশ্রামের সময়। এই সময় কৃষকের কুটীরে গমন কর, চারি-দিকে উল্লাস আমোদ ভিন্ন আর কিছুই দেখিবে না। এখানে দুইজন কৃষক বসিয়া মনের সুখে গাহিতেছে, ওখানে কৃষক পত্নী-গণ নাচিতে ২ গাহিতে ২ সকলে আমোদে মগ্ন।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে আবার পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বন্য জন্তুগণ রজনীযোগে নব জাত শস্য সকল ভক্ষণ করে, তজ্জন্য সকলে ক্ষেত্র মধ্যে এক একটী কুটীর (টং) নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সমস্ত রজনী হৈ হৈ শব্দে অতিবাহিত করে। ধান্য সুপক্ক হইলে সকলে ছেদন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই কার্য্য উহাদের অতিশয় চমৎকার; এবং উহা দর্শন করিলে বুঝিতে পারা যায় উহাদের মধ্যে কত দূর সহানুভূতি রহিয়াছে। যাহার ধান্য—ছেদনোপযোগী হয়, সে স্বগ্রামস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে সমবেত হইয়া যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে নিমন্ত্রণকর্ত্তার ধান্য ছেদন করিতে থাকে। যত দিন শেষ না হয় তত দিন এইরূপে চলিতে থাকে, অনন্তর এক

---

(৩) হবে—ঐ, মামা—কি কি, কৈ কৈ—আয় আয়।

(৪) আমন ধান আবাদের পূর্ব্বে শুষ্ক ভূমিতে বীজ বপন করে। অনন্তর ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বড় হইলে উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করে। কৃষকেরা ঐ সকলকে বীচ শব্দে অভিহিত করে।

‡ কাশ-কুসুম উহাদের একটী শুভসূচক পদার্থ, কারণ কাশ-কুসুম ফুটিলে আর উহা-দের পরিশ্রম করিতে হয় না। এক্ষণে উহা-দের বিশ্রামের সময়।

জনের শেষ হইলে অপর এক জন নিমন্ত্রণ করে, এক এক করিয়া গ্রামস্থ সকলের ধান্য এইরূপে ছেদিত হয়। নিমন্ত্রণকর্ত্তা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে এক দিন ভালরূপ মদ্য মাংস ভোজন করায়।

মাঘ মাসের মধ্যে প্রায় সকলের শস্য গৃহে আইসে। মর্দ্দনক্রিয়া ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত চলে। এদেশে সকল রকম শস্য গোরু দ্বারা মর্দ্দিত হয়, অন্য কোনরূপ মর্দ্দন-প্রণালী প্রচলিত নাই। মাঘ মাসে নূতন শস্য গৃহে আইসে বলিয়া কাচারিরা ঐ মাসে একটী উপাসনা করে—এইটী উহাদের সর্ব্বপ্রধান উপাসনা ও উহাকেই উহাদের—জাতীয় পর্ব্ব বলিলেও চলে। উপাসনার নাম "লাট-পূজা" উহা এক দিনে সম্পন্ন হয় না। ক্রমাগত ৫।৬ দিন উহার উৎসব চলিতে থাকে। গ্রামস্থ কোন মাতব্বর ব্যক্তির বাটীতে উপাসনার স্থান কল্পিত হয়। উক্ত বাটীর মনসা বৃক্ষের (১) মূলদেশ মৃত্তিকা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত করিয়া তথায় অভীষ্ট দেবের উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়।

উপাসনার বিশেষ কোন বিধি নাই, পুষ্প, তণ্ডুল, কদলী, অন্ন, ব্যঞ্জন, মদ্য, মাংস, প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে সজ্জিত করিয়া রাখে, এবং গ্রামস্থ ও পরগ্রামস্থ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তথায় সমবেত হইয়া ভক্তি সহকারে নৃত্য, গীত, ও বাদ্যাদি করিতে থাকে; যখন পরিশ্রান্ত হয় তখন প্রসাদস্বরূপ উপরোক্ত অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ ও মদ্য পান করে, এবং গানশূন্য হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। ৫।৬ দিন অতিবাহিত হয়, দিবা রাত্রি সমান, ক্ষণ কালের জন্যও বিশ্রাম নাই, ডাংশির (২) ধ্বিন২ শব্দে, মদ্যপায়ীদের ভয়ানক চিৎকারে গ্রাম তোল পাড় হইতে থাকে। ওদিকে দুই তিন জন পাচক রাশি ২ অন্ন ব্যঞ্জন, গামলা ২ মদ্য প্রস্তুত করিয়া রঙ্গস্থলে আনয়ন করিতেছে, উন্মত্তগণও ঐ সকল ভোজন ও পান করিয়া দ্বিগুণ উন্মাদ গ্রস্ত হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রমণীগণ উহাতে কদাচ লিপ্ত হয় না। উহারা এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া পুরুষদের লীলাখেলা দেখিতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে। এই রূপে "লাট-পূজা" শেষ হইলে কাচারিদের আমন ধান্যের আবাদ কর্ম্ম শেষ হয়।

আস আবাদ। কাচারিগণ আমন আবাদে যেরূপ পরিশ্রম করে, আস আবাদে তাহাও করে না। অতি অল্পমাত্র আস ধান্য কেহ কেহ বপন করে, তদ্দ্বারা সাংবৎসরিক ব্যয়ও নির্ব্বাহ হয় না, কিম্বা বিক্রয় করিয়া অধিক অর্থ লাভও হয় না। প্রতি গৃহে যদি ১০ মণ করিয়া আস ধান্য বৎসরে আইসে তাহা হইলে যথেষ্ট মনে করে। তবে যে সকল স্থানে আমন উৎপন্ন হয় না, সে

(১) আমরা যেরূপ তুলসী-বৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করি, কাচারিরা মনসা বৃক্ষকে তাদৃশ পবিত্র জ্ঞান করে, এজন্য প্রতি বাড়ী ২ একটী করিয়া মনসা বৃক্ষ উঠানের মধ্যে স্থাপিত হয়। উহাদের ভাষায় উহাকে "সিজুদেও" কহে।

(২) কাচারীদের বাদ্য যন্ত্র বিশেষ। দেখিতে অনেকাংশে ঢোলের মত, কিন্তু আকারে কিছু বড়।

সকল স্থানে আস কিছু অধিক পরিমাণে আবাদ করা হয়।

উচ্চ শুষ্ক ভূমি আস আবাদের প্রধান উপযোগিনী।

ভূমি এক বার কোন রূপে কর্ষণ করিয়া ধান্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষক গৃহে আগমন করে, আর তাহার সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক নাই।

আবার ভদ্রে আশ্বিনে যখন ধান্য সুপক্ক হয়, তখন ছেদন করিয়া গৃহে লইয়া আইসে ও মর্দ্দনাদি করে।

সরিষা আবাদ। সরিষা আবাদেও উহাদের তাদৃশ যত্ন দৃষ্ট হয় না। কার্ত্তিক মাসের শেষে অধিক বালুকাময় ভূমি সকল উপরি উপরি বার কতক চাষ করিয়া সরিষা নিক্ষেপ করে এবং পৌষ মাসের শেষ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রাখে না। নিক্ষিপ্ত বীজ, ভূমির আশ্চর্য্য সারবত্তায় ও হৈমন্তিক শিশিরের উৎপাদিকা শক্তি প্রভাবে দিন ২ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনন্তর মাঘ মাস উপস্থিত হইলে যখন সরিষা সকল সুপক্ক হয়, তখন উঠাইয়া গৃহে লইয়া আইসে ও পেষণাদি করে। এই অল্প পরিশ্রমে সরিষা যেরূপ উৎপন্ন হয়, যদি তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে উহা হইতে যে স্বর্ণময় ফল উৎপন্ন হইবেক তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিধাতার কি বিড়ম্বনা!! যোগ্যে যোগ্য মিলে না, উপযুক্ত কৃষক নাই, সদুপদেষ্টা নাই, এক ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কি করিতে পারে?

আজ কাল আমাদের বঙ্গীয় যুবকগণ অতি অল্পমাত্র বেতনের দাস হইয়া উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র বহিয়া দেশ-দেশান্তরে, দ্বীপ-দ্বীপান্তরে গমন করিতেছেন, চাকুরিকে ব্যবসার সার মনে করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশে যে সকল অর্থোপার্জ্জনের অত্যুৎকৃষ্ট উপায় রহিয়াছে, তাহার দিকে কেহ দৃষ্টিপাতও করিতেছেন না। উনবিংশ শতাব্দিতে বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষার কিনা উন্নতি হইয়াছে ; কৃষিবিদ্যার পুস্তক কি বঙ্গ ভাষায় অভাব? কেন যুবক গণ সেই সকল গ্রন্থ লইয়া আসামে গমন করে না ও রীতিমত কৃষি করিয়া উর্ব্বরা ভূমি সকল স্বর্ণপ্রসবিনী করে না? তাহা হইলেও বঙ্গের দুঃখ দেখিয়া কাহাকেও অশ্রু বর্ষণ করিতে হয় না। আসাম প্রদেশের ভূমি যেরূপ উর্ব্বরা, সুলভ তাদৃশ অতি উৎকৃষ্ট ভূমির (আউবল) বাৎসরিক রাজস্বের প্রতি বিঘা আট আনার অধিক নহে।

বাহুল্য ভয়ে আমরা অন্যান্য আবাদের বিষয় সবিশেষ উল্লেখ করিলাম না। পাঠকবর্গ এক্ষণে অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন যে কাচারিদের কৃষিবিষয়ে কিরূপ যত্ন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি আসামস্থ কৃষিজীবীদের মধ্যে উহারাই আবার সর্ব্বপ্রধান, সুতরাং উহাদের যত্ন দর্শন করিলে অপরাপর কৃষকদের যত্ন অক্লেশে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

সকলে একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বীজ বপন করে, ফলাফল দৈবের হস্তে। নিজের অবস্থা উন্নতি করিব, নিজে ধনী হইব, এ আশা কাহারও মনে স্থান পায় না। পরিবারবর্গের কোন রূপে ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। তদ্ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই

প্রার্থনীয় নাই।

বাণিজ্য উহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে, কৃষিলব্ধ শস্য, পরিবার বর্গের বাৎসরিক ব্যয় বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে রমণীগণ সে গুলি বাজারে বিক্রয় করিয়া অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল ক্রয় করে ও সময়ে ভোজনার্থ নিহত পশুচর্ম্ম এবং গৃহজাত দুই এক খানি বিক্রয় করিয়া আপনাদের আভরণাদি ক্রয় করে। এতৎ ব্যতীত আর কোনরূপ বাণিজ্য উহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

ক্রমশঃ

বসন্ত।

১

সরস বসন্তে সরস ধরা,—
প্রকৃতি নবীন বসন পরা ;
নবীন পাদপ নবীন শাখা—
সুধার অধরে হাসিটী মাখা,
নবীন মুকুল নবীন ফুল,
(নবীনার কানে দুলিছে দুল)
সকলি সুন্দর সকলি নব,
দেখিয়া জগৎ ভুলিছে সব।

২

নবীনা আকাশে নীরদা প্রায়,
নবীনা দামিনী নাচিছে তায়,
সরলা অবলা সুধার ধার,
দারুণ অশনি হৃদয়ে তার।
কভুবা গরজে ভীষণ বোলে,
মিশে যায় পুনঃ জলদ-কোলে,—
খেলিছে এ হেন শতেক খেলা,
সেই ত আকাশে সুখের মেলা।

৩

কুসুম-বাসরে রসিকরাজ,
ধরিয়ে নবীন মধুর সাজ,
এক ফুল ত্যজি অপরে যায়,
প্রণয়ের হুল টুটায় তায়
গুণ্-গুণ্-গুণ্ বললো সই,
আজি সে পামর পবন কই,
দেখিব এবেলা কেমন বীর,
কেমনে তোমার দোলায় শির ;
কেমনে সকলে প্রেমিক বলে,
মন্দারের মালা পরে যে গলে।
গুণ্ গুণ্ গুণ্ হৃদয় খুলি
মুছিব তোমার অঙ্গের ধূলি ;
হাস চারুহাসি হাসলো আজ,
সুখের বসন্তে সুখদ সাজ।

৪

'স্বন্ স্বন্ স্বন্' প্রেমিক-প্রাণ,
সুধীর সমীর ধরিল তান,
'স্বন্ স্বন্ স্বন্' মধুপ ধীর
সাজ রণবেশে দেখ কে বীর!
গুণ্ গুণ্ গুণ্ সুবাস ভোর,
দেখি কত বীর্য্য পবন তোর,
সুবাস হরিতে স্বভাব যার
মরি কিবা সাধ, আহবে তার!!

'স্বন্ স্বন্ স্বন্' রক্ষ হে প্রাণ,
বলিয়ে পবন টঙ্কারে বাণ;
গভীর গরজি বহিল ঘন,
কাঁপিল অবনী কাঁপিল বন।
সভয়ে গগনে উড়িল অলি,
লাজে ফুলবধূ পড়িল ঢলি।
এ হেন শার্দ্দূক করিছে খেলা,—
ফুলবনে সেই সুখের মেলা।

৫

বনের নিবিড়ে, বিহগ গায়;
বিহঙ্গিনী পাশে নাচিছে তায়,—
কাটে চঞ্চু পুটে মুকুল সাজ,
স্বর্গ হ'তে যেন বরষে লাজ
শীতলা সলীলা সরসী-বারি,
ললিত সে তানে মোহিত মরি;
মোহিত ভূলোকে মোহিত বন,
মোহিত দ্যুলোক দিতিজগণ।
মোহিত সেখানে নরেশবালা,
মোহিত সে করে কুসুমমালা।

৬

শ্যামল প্রকৃতি শ্যামল ধরা,
বন বল্লী শ্যাম বসন পরা,
উজল চৌদিকে উজল বিভা;
সুখদ সে বেশ বসন্তে কিবা।
সুখের বসন্তে সুখদ সব,
নবীন শোভায় সকলি নব,
শুনিছে ত্রিদিব অতুল ফল
বসন্তে প্রকৃতি নয় কি তুল?

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মাতৃস্নেহ। শ্রীরাজ কুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য /১০ আনা।

লেখক পুস্তিকাখানি আদ্যোপান্ত কবিতা-ছন্দে লিখিয়াছেন। পুস্তিকার নাম পাঠ করিলেই উহার উদ্দেশ্য জানা যায়। রাজকুমার বাবুর কবিতা লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। তাঁহার এই প্রথম উদ্যম। ভবিষ্যতে তাঁহার লেখনী ইহা অপেক্ষা ভাল কবিতা উদ্গিরণ করিবে, ইহা আশা করা যায়।

হেমলতা। উপন্যাস। শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। আমরা এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। সাধারণতঃ আজ কাল যে সকল উপাদানে উপন্যাসমালা গ্রথিত হয়, উহা সে ধাতুর নহে। লেখক কোন একটী জীবন্ত দৃশ্য অবলম্বন করিয়া উহা পুস্তকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। লেখকের ভাষার উপর ভাল দখল থাকিলে, উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

পুস্তকস্থ চরিত্রগুলি অতি উত্তম রূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এক ২ খণ্ড ক্রয় করিয়া লেখককে উৎসাহিত করেন।

২য় খণ্ড। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৯। ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

হিন্দুদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীবিধুভূষণ মিত্র কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

৬৬ নং পটুয়াটোলা লেন হিন্দুদর্শন কার্য্যালয় হইতে
শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক ভবনস্থ
সরস্বতীযন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা। ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ বার আনা। পশ্চাদেয় বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা।

দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য-প্রাপ্তি-স্বীকার।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দয়াল চাঁদ সোম সিমুলিয়া ২,
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ পাল বেনারস ২,
" আদিত্য প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সিমুলাশৈল ২,
" চণ্ডীচরণ রায় ঢাকা ১।০
" কৃষ্ণ সুন্দর রায় জলপাইগুড়ি ২,
মুনসি মহম্মদ ইষা তালতলা ১,
শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ জমিদার ভান্ডাড়া ২,
Prince Mohamed Rohimodin ২,
শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা রাজসাই ২,
শ্রীযুক্ত বাবু অভয় চরণ সরকার মাদরিপুর ২,
" " হরি নাথ বসু বাদুর বাগান ১,
" " ক্ষেত্রনাথ সরকার মাদারিপুর ২,
" " বিনোদ বিহারী রায় দিনাজপুর ১,
" " রাধিকাপ্রসাদ মোহন্ত সাথারিটোলা ১,
মজহবল হক্ যশোহর ১॥৵০
শ্রীযুক্তবাবু মনোমোহন কর গুপ্ত পুটিয়া ২,
" " হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর ২,
" " হরিদাস ভট্টাচার্য্য জামালপুর ১৷৵০

নববর্ষ।

দেখিতে দেখিতে ১২৮৮ সাল চির-দিনের জন্য বিদায়গ্রহণ করিল; ১২৮৯ সাল আসিয়া সমুপস্থিত। এই সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের অমূল্য জীবনের একটি বর্ষ অনন্তকাল-গর্ভে প্রোথিত হইল। এই রূপে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে; মনুষ্যের জীবনও সেই সঙ্গে নূতন জীবনে প্রবেশ লাভ করিতেছে ও পরিত্যক্ত বৎসরের মত চলিয়া যাইতেছে। সময়স্রোতের বিরাম নাই। দিন নাই—রাত্রি নাই ক্রমা-গত নূতন সময় উপস্থিত হইতেছে ও ক্রমা-গত তাহা বিলয় পাইতেছে। মনুষ্যও তাহাই; তাহার অমূল্য জীবনও সেইরূপ নিত্য নূতন কালে সমুপস্থিত হইতেছে ও পরক্ষণেই তাহার ধ্বংস হইতেছে। গত কল্য যে সময়ে কোন কার্য্য করিয়াছি, আজি সে সময় আর নাই। আগামী কল্য তাহা আর দেখিতে পাইব না—মাসান্তেও নয়—বৎসরান্তেও নয়, আর কখনই পাইব না। তাহা কালস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া ক্রমে অনন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। সমুদায় জগৎ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, তাহার অস্তিত্ব আর কোন স্থানেই সূচিত হইবে না। যাহা যায় তাহা আর আইসে না—বিশ্বের ইহাই নিয়ম। যে দিকে দেখিবে—যাহার বিষয় শুনিবে সমুদায়ই এই বিশ্ব-জনীন মূল নিয়মের অধীন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ইহার অন্যথা কুত্রাপি নয়ন-গোচর হয় না। আবার যাহা আইসে, তাহার ধ্বংস হইবেই। যাহা অদ্য সৃষ্ট হইল কল্য তাহার ধ্বংস হইবে—তাহা কখনই চিরদিন থাকিবে না; চিরস্থায়ী কেহ নহে—এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর সংসারে চির-স্থায়ী কিছুই নাই; সুতরাং পৃথিবীতে ক্রমা-গত নূতন জীবের সঞ্চার হইতেছে ও ক্রমা-গত তাহার বিলয় হইতেছে। কত নূতন জীব আসিতেছে—কত নষ্ট হইতেছে। এইরূপ সৃষ্টির প্রাক্কালাবধি আসিতেছে ও যাইতেছে; কিন্তু কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় যাইতেছে তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না; এবং জানি না বলিয়াই দুঃখ; নহিলে দুঃখ কিসের? মানুষ মরিলে কি হয়, যদি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর দুঃখ কি? যদি জানিতাম মনুষ্য মরিয়া পরকালে স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মরিতে ভয় কি? সে ত সুখের বিষয়; কিন্তু স্বর্গ যে আছে এ কথা কে বলিল? কেহ কখন স্বর্গে যাইয়া ফিরিয়া আইসে নাই। যে মরিয়াছে তাহার অস্তিত্ব আর কোথাও দেখিতে পাই না। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, মানুষ মরিয়া ভূত হয়। সেই স্মৃতি আজিও বিলুপ্ত হয় নাই; এবং বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়াই সময়ে সময়ে অনুসন্ধান করি; ঘোর গভীর অন্ধকার রাত্রে একাকী নির্জ্জন স্থানে

বসিয়া থাকিয়াছি, কিন্তু কই কখন ত ভূত বলিয়া কোন পদার্থ দেখি নাই। দেখি নাই বলিয়াই দুঃখ—যদি দেখিতাম, তাহা হইলে সমুদায় আপদ মিটিয়া যাইত। জানিতাম, মনুষ্যজীবনই শেষ জীবন নহে; ইহার উচ্চে আরও জীব আছে এবং সম্ভবতঃ আরও উচ্চতর জীব থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিয়াও মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবের দর্শন পাই নাই; সুতরাং তাহার অস্তিত্বে আমার অবিশ্বাস; তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস বলিয়াই ঘোর দুঃখ। স্বর্গস্মৃতি যদি আমাদের সুখের কারণ হয়, তাহা হইলে ভূতস্মৃতির অভাব আমাদর দুঃখের কারণ বই আর কি বলিব? ভূতস্মৃতি আছে বলিয়াই আমরা পরলোক স্বীকার করি। পরকাল স্বীকার না করিলে মন কি ভয়ানক মর্ম্মযাতনানুভব করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরলোক স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মনুষ্যজীবনই যদি চরম জীবন হয়; মনুষ্যের মৃত্যুর পর যদি তাহার কোন-প্রকার অস্তিত্ব না থাকে; যদি তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমুদায় ফুরায়, তাহা হইলে এই মনুষ্যজীবন কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার নিদান, এই সংসার কি বিষময়। প্রণয়াস্পদ মৃত আত্মীয়গণ যদি চির দিনের জন্যই বিদায় গ্রহণ করেন—যদি দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবার পর আর তাঁহাদের সহিত সন্দর্শন না হয়; যদি মনুষ্যের আত্মা ও দেহের একেবারেই ধ্বংসসাধন হয়, তাহা হইলে মনে কি অননুভূত যাতনার উদ্রেক হয় তাহা আর বলিতে পারা যায় না। পরলোক-স্মৃতি আছে বলিয়াই মনুষ্যজীবন সুখের বলিয়া মনে হয়। পরলোক না থাকিলে মনুষ্যজীবনের ন্যায় দুঃখময় জীবন আর নাই। সেই জন্যই সর্ব্ব দেশে সকল সময়ে সকল ধর্ম্মই পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন—ইহ জীবনে পরলোকের জন্য কিছু না কিছু কার্য্য করিতে উপদেশ দেন। আবার তাহাও বলি, পরলোকে বিশ্বাস আছে বলিয়াই এই সংসার এরূপে চলিতেছে। উহাতে অবিশ্বাস করিলে সংসারের গতি কিপ্রকার হইত কে বলিতে পারে? তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবী তিলার্দ্ধ সময়ের জন্য চলিতে পারিত না; দিন দিন পাপের স্রোত বৃদ্ধি পাইত। পরলোকে বিশ্বাস আছে বলিয়াই লোকে সকল সময়ে সকল স্থানেই পাপ কার্য্য করিতে বিরত হয়। আপনার নীতিমার্গানুযায়ী হইয়া চলিতে কয় জন সক্ষম? যদি পৃথিবী-শুদ্ধ লোকে নীতিপথানুসারে চলিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আর ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে না. এবং স্বর্গ থাকিলে তাহাও কাহারও অপ্রাপ্য হয় না। এই মর পৃথিবীই তখন স্বর্গের আকার ধারণ করে; তখন পৃথিবী ও স্বর্গের কোন বিভিন্নতাই পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু কয় জন আপনার নীতিপথে চালিত হইয়াছেন? পৃথিবীতে এরূপ লোকের অসদ্ভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কত? দুই চরি জন এরূপ লোক থাকিতে পারেন, কিন্তু পৃথিবী-শুদ্ধ লোকের শীঘ্র এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং নানাবিধ ধর্ম্মে বিশ্বাস—নানা

প্রকারে স্বর্গের প্রতি বিশ্বাস থাকা আবশ্যক।

আমরা ইহলোকে যদি কোন কার্য্যে হতাশ্বাস হইলাম, পরলোকে তাহা পাইবার আশা করিয়া থাকি, ইহলোকে যাহা পাইবার নয় জ্ঞান করিলাম, পরলোকে তাহা পাইবার জন্য লালায়িত; সুতরাং পরকালে তাহা যাহাতে পাই তাহার জন্য ইহ জীবনেই কার্য্য করিতে লাগিলাম। ইহলোকে কষ্ট স্বীকার করিয়া কোন কার্য্য করিলে পরলোকে আমাদের ভাল হইবে; এই আশা জন্যই পৃথিবী ক্রমশঃ উন্নতির দিকে দৌড়াইতেছে, বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—মনুষ্যকুল ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া ছুটিতেছে। আমি এই কার্য্যের ফলভোগ করিতে পারি আর নাই পারি পরলোকে আমার আত্মা নিশ্চয়ই তাহার ফলভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে; এই আশাই মানবীয় উন্নতির প্রধান সহায়। সেই আশার জন্যই কোন কোন লোক আজীবন সন্ন্যাসী; এই জন্যই অনেকে সকল বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া পরলোকে একমাত্র আত্মার তৃপ্তি-সাধনের জন্য সাংসারিক সকল কার্য্যেই নির্লিপ্ত। ইহলোকে থাকিয়া পরলোকের জন্য সেই কার্য্যটি সাধন করাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। যে কার্য্যে তাঁহাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে জ্ঞান করেন তাঁহারা সেই কার্য্যেই জীবনোৎসর্গ করিয়া থাকেন; সুতরাং সংসারে আমরা যে কেবল ধর্ম্মসন্ন্যাসীই দেখিয়াছি তাহা নহে; জ্ঞানসন্ন্যাসী, বীর-সন্ন্যাসী সকলও আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের লক্ষ্য হয়েন। কেহ ধর্ম্মের জন্য কেহ জ্ঞান-বিস্তারের জন্য—কেহ বা অসাধারণ বীরত্বে আপনাপন জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। পরলোকে সদগতির জন্য স্বার্থত্যাগের জীবন্ত উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা স্বার্থত্যাগের যে সকল জলন্ত শিখা দেখিতে পাই, তাহা কি তাঁহাদের নিজের জন্য, না পরলোকের জন্য? অবশ্যই পরলোকের জন্য।

যে ব্যক্তি পরলোকের হিত সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তিনিই স্বার্থশূন্য মহাযোগী। ইহলোকে তিনি জগৎকর্তৃক তিরস্কৃত—লাঞ্ছিত—অপমানিত ও বিতাড়িত হইলেও পরলোকে তিনি আদৃত—পূজিত—উপাসিত দেববিশেষ। সত্যের অপহ্নব কখনই হইবার নহে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি তাহা কখন হয় নাই। যাহা সত্য, তাহা চিরকাল পূজ্য। যাহা অসত্য তাহা কোন সময়ে পূজিত হইলেও ঘৃণ্য। আবার যাহা সত্য, তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে সহসা লোকে অপারগ; সুতরাং যিনি সত্যের আবিষ্কারক, তিনি ইহলোকে ঘৃণ্য হইয়া পড়েন; কিন্তু সত্যের বিমল জ্যোতিঃ কখনই গোপন ভাবে থাকিবার নহে; সময় হইলে আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়ে; এই জন্যই সত্যের অপলাপ কখন হয় নাই—কখন হইবারও নহে। যিনি স্বার্থশূন্য মহাযোগী, তিনি তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে ইহলোকে অপারগ হইলেও পরলোকে তাহাতেই মত্ত। তিনি যাহা বলেন, ইহলোকে তাহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও পরলোকে তাহার অভ্যন্তরে সত্যের বিমল জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে হৃদয়ের দেবতা করিয়া রাখিয়াছেন। ইহলোকে যাহার প্রত্যেক বর্ণ ভ্রমময় প্রতি-

পন্ন করিয়া তাহা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, পরলোকে সেই প্রত্যেক বর্ণেই সত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। পৃথিবীর সৃষ্টিকালাবধি এইরূপ চলিয়া আসিতেছে ; সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, যে সকল মহাযোগী স্বার্থশূন্য মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহলোকে অতিশয় ঘৃণ্য হইলেও পরলোকে পূজ্য হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা ইহলোকের উদ্দেশ্যে নহে, পরলোকের জন্য। তাঁহাদের বিশাল হৃদয় ইহলোক পরলোক উভয় লোকেরই শক্তির ধারণা করিতে পারে। এই জন্যই তাঁহারা ইহলোকের সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরলোকের জন্য সচেষ্ট। বুদ্ধদেব আপনার না পরলোকের জন্য পূজ্যতম পিতা-মাতা, প্রেমাস্পদ প্রণয়িনী, স্নেহভাজন পুত্র ও বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? পরলোকের উপকারপ্রয়াসী স্বার্থশূন্য মহাযোগীর অভাব নাই। যীশু, লুথর, নানক, চৈতন্য, সক্রেটিস, গালিলিও, প্রতাপ, মাৎসিনি ও এইরূপ কতশত মহাপুরুষ আমাদের নয়নপথের পথিক হন। বুদ্ধদেব জীবিতাবস্থায় নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী লোকে তিনি নারায়ণের অবতার বলিয়া পূজিত—এক্ষণে তিনি হৃদয়ের দেবতা। যীশু কি কেবল পরলোকের জন্যই সেই ভয়ঙ্কর ক্রুশে—সেইরূপ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন নাই ? যে যীশুকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার সমসাময়িক লোকে বিব্রত হইয়াছিল, পরলোকে সেই যীশুর পবিত্র নাম—প্রতি লোকের প্রতি নিশ্বাসে বহির্গত হইতেছে। রামমোহন এই পরলোকের ইষ্ট জন্যই গৃহ হইতে বিতাড়িত —আজি তাঁহার নাম পৃথিবীর সকলেরই জপস্বরূপ হইয়াছে। চৈতন্য, নানক, লুথার সকলেই এইজন্য মহাযোগী। তাঁহাদের মত সন্ন্যাসী আর কই ? এই সত্যের অনুরোধেই সক্রেটিসের পরিণাম সেইরূপ ভয়ানক ; আজি লোকের মুখে তাঁহার নাম আর ধরে না। গালিলিওর শেষ দশার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ ; তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার জন্য দরবারে উপস্থিত করা হইয়াছে—লোকে বলিল "গালিলিও! তোমাকে এখনই কারাগারে নিক্ষেপ করা হইবে ; এখনও বিবেচনা কর—এখনও সময় আছে।" গালিলিও ক্ষোভ সহকারে বলিয়া উঠিলেন "পৃথিবী এখনও ঘুরিতেছিস্ ; স্থির হ' ; নচিলে কি প্রকারে আমি সত্যের অপহ্নব করিব।"

ইহাঁরা সকলেই মহাসন্ন্যাসী, সকলেই পরলোকের কামনায় মুগ্ধ। সক্রেটিস ও গালিলিও নিশ্চয়ই বুঝিতেন ইহলোকে তাঁহাদের জীবন সেইরূপেই অভিনীত হইবে—কিন্তু পরলোক তাঁহাদের কথা বুঝিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে। প্রতাপ ও ম্যাজিনী কি আপনাদের জন্যই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন ? কখনই নহে; পরলোকে সদ্‌গতিই তাঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল। পরলোকের জন্য এইরূপ আত্মোৎকর্ষের শত শত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরলোকের জন্য কার্য্য না করেন, পৃথিবীতে এমন লোক অতি বিরল। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, মহৎ-ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই এই পারলৌকিক কার্য্যের জন্য তৎপর। যাহারই বিষয় পর্য্যালোচনা করি না, দেখিতে পাইব, সকলেই স্বতঃ

হউক পরন্তঃ হউক পরলোকের কোন না কোন কার্য্য সাধন করিবার জন্য যত্নবান্। এই পারলৌকিক চিন্তা না থাকিলে পৃথিবী বিংশতিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল আজিও তাহাই থাকিত; ইহার কোন পরিবর্ত্তন— কোন উন্নতিই পরিলক্ষিত হইত না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্য যেমন ছিল আজি এবং সহস্র বৎসর পরেও তাহাই থাকিত; ইহার কোন পরিবর্ত্তনই ঘটিত না। পরাগত লোকের প্রতি স্নেহ মনুষ্যের স্বাভাবিক; এই স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইলে মনুষ্যের নাম এত দিন এই জগতীতল হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

পরলোকের প্রতি স্নেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই পিতা তাহার প্রতি স্নেহময় হন, ইহা স্বাভাবিক। আবার সেই পুত্রের সুখোৎপাদনই তাঁহার প্রধান কার্য্য। নিজে দুঃখে নিপতিত হইলেও পুত্রের সুখ কামনা তাঁহার অন্তরের রম্য অভিলাষ। তিনি সেই জন্য নিজে বিপন্ন হইয়াও পুত্রের মঙ্গলসংসাধনে ব্রতী। পুত্রের মঙ্গল কামনা—পুত্রের উন্নতি চিন্তা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব ক্ষণ পর্য্যন্তের চিন্তা। পুত্রকে সমুদায় গুণে বিভূষিত দেখিলেই তিনি আপনাকে মহাপুণ্যবান্ জ্ঞান করেন। সেই পুত্রকে রাখিয়া মরিলেই তাঁহার স্বর্গ। পুত্রের এইরূপ মঙ্গল কামনা সার্ব্বজনীন; অতি অসভ্য এস্কুইমো হইতে সুসভ্য ইংরাজ পর্য্যন্ত সকলেরই ইহা অন্তরের প্রিয় অভিলাষ; সুতরাং পরলোকের মঙ্গল চিন্তন সার্ব্বজনীন। এই বিশ্বজনীন চিন্তাই সকল উন্নতির মূল। মানবীয় উন্নতির ইহাই প্রধান সহায়। পিতা, পুত্রের মঙ্গলকামনায় বিভোর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের উন্নতির জন্য তৎপর। বন্ধু, বন্ধুর জন্য ব্যস্ত। উদারচেতা সকলেরই জন্য উন্মত্ত। আত্মোন্নতি ও তৎসঙ্গে অন্যের উন্নতি চেষ্টাই সমাজিক উন্নয়নের মূল মন্ত্র।

পিতা পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। পুত্রই তাঁহার পরবর্ত্তী লোক বা পরলোক। এই পরলোকের উন্নতিচেষ্টা কাহার নাই? ধনকুবের হইতে কপর্দ্দকহীন পর্য্যন্ত এই কামনা কাহার হৃদয়ের রম্য অভিলাষ নহে? তবে ক্ষমতানুসারে ইহা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। কেহ স্বীয় পুত্রের জন্য ব্যস্ত—কেহ বা পুত্র-কলত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির জন্য নিবিষ্টচিত্ত; কাহারও বা সমুদায় পৃথিবীই কুটুম্বসদৃশ। সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটানু পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিশাল হৃদয় কন্দরের বিষয়ীভূত। সকলেই তাঁহাদের সমান কৃপার পাত্র। তাই বিশালহৃদয় শাক্যসিংহ সামান্য পশু-হত্যা-দর্শনে বিগলিতচিত্ত হইয়াছিলেন;—তাই প্রতাপসিংহ রাজপুতমাত্রেরই মানরক্ষার নিমিত্ত বনে-বনে, পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

এক্ষণে সেই শাক্যসিংহ, সেই যীশু খ্রীষ্ট, সেই প্রতাপসিংহ, সেই ম্যাজিনী, সক্রেটিস্, গ্যালিলিও কোথায়? সকলেই এই ভূতলে অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী সমুদায় লোকেরই হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে সুখে বাস করিতেছেন—দিন দিন লোকের মানসিক-কুসুম-নিচয়ে পূজিত হইতেছেন। কে ঐ সকল সুধাময় নাম

ক্ষণকের তরে বিস্মৃত হইতে পারে? বাল্মীকি—ব্যাস, ভবভূতি—কালিদাস, রাম—ভার্গব, কৃষ্ণার্জ্জুন কে এই সকল পবিত্র নাম তিলেক সময়ের জন্য ভুলিয়া যাইতে পারে? রাম-ভার্গব, বাল্মীকি-ব্যাস যাহার কণ্ঠে সতত কেলী না করেন সে মানুষ নহে। যদিও কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ-ভারবী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়াছে, তথাপি আমরা কি তাঁহাদিগকে সতত দেখিতে পাইতেছি না? তাঁহারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কি আমাদের প্রীতিপুষ্প উপহার লইতেছেন না? তাঁহারা কি মৃত? পৃথিবীর এমন সকল লোক কি কখন মরিয়া যান? বুদ্ধ-যীশু, নানক-চৈতন্য, প্রতাপ-ম্যাজিনী, সক্রেটিস্-গালিলিও, বাল্মীকি-ব্যাস, আর্য্য-ভাস্কর, কণাদ-গৌতম ইহাঁরা যদি মরিয়া গিয়া থাকেন, তবে যে জীবিত কাহারা, আমরা ত বুঝিতে পারি না। দুটি দুটি মৎস্যান্ন ভক্ষণ করিলেই বাঁচিয়া থাকা হয় না। এরূপ বাঁচিয়া থাকা মরণ তুল্য—মরণই আরামস্থান। দুদিন শাকান্ন আহারে বাঁচিয়া থাকার ফল কি? যাহাতে চিরজীবী হও, তাহার চেষ্টা কর; কখন করিয়াছ কি? যে উপায়ে উপরি উক্ত প্রাতঃ-স্মরণীয় মহানুভবগণ চিরজীবন লাভ করিয়াছেন, সে পথ কি অপরের নিকট অবরুদ্ধ? কখনই নহে। পথ সকল সময়ে সকলের জন্যই উন্মুক্ত; সকলকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছে; কিন্তু কয় জন তাহাতে প্রবেশ করে? এমন সুপ্রশস্ত বর্ত্ম বিদ্যমান থাকিতে লোকে সাধারণতঃ অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ বর্ত্মের প্রয়াসী। প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই প্রশস্ত বর্ত্ম দিয়া যাইবার চেষ্টা করা সকলের পক্ষেই উচিত; তবে কি তাহা সকলেরই সুসাধ্য? তাহা নহে। অনেকে পথহারা হইতে পারেন—অনেকে অল্প পথ পরিক্রমণ করিয়াই জীবন পাত করিতে পারেন—বোধ হয় অধিকাংশই পথের শেষ সীমায় যাইতে সম হইবেন না; কিন্তু তাহা বলিয়া গমনের চেষ্টার কেন ক্রটি করা হয়? অধিকাংশ বঙ্গবাসী তাহা করেন না বলিয়াই বাঙ্গালীর চির-দুঃখ—তাই বাঙ্গালী প্রতি পদবিক্ষেপেই নৈরাশ্যের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়েন। আবার চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই—যত্ন করিলেও যদি তাহা সিদ্ধ না হয়, তবে আর দোষ কি? কিন্তু যত্ন না করিয়া দোষ পাও কেন? প্রিয় ভ্রাতৃগণ! এই যে একটি বৎসর তোমাদের চোখের উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, ইহার ভিতরে কি তোমরা প্রশস্ত বর্ত্ম দিয়া যাইবার জন্য একবারও চেষ্টা করিয়াছিলে? ভাই! এই যে বছরটি তোমার দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া চলিয়া গেল, ইহাকে ধরিবার জন্য একবারও কি প্রয়াস পাইয়াছিলে? যদি বল, সময় কি কখন ধরিয়া রাখা যায়? সময়, সময় হইলেই পালাইয়া যায়। ছি! ও কথা মুখে আনিও না; সময় চলিয়া যায়, কখন থাকে না সত্য বটে, কিন্তু ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে কিছু থানা না রাখিয়া যাইতে পারে না। তুমি কোন কার্য্য সম্পাদন কর, সময় তাহার সহিত অলক্ষিত ভাবে জড়াইয়া

থাকে। কোন বিশেষ কার্য্য করিলেই সময়কে তাহার সহিত কোন রূপে ধরিয়া রাখা যায়।

ভাই! এই যে বৎসরটি হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল, ইহার একটুকুও কি এই রূপে ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলে? তাহা কর নাই, তাই ঐ দেখ ভূতবর্ষ তোমায় দেখিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল—আর যেন বিদ্রূপের সহিত বলিয়া গেল, "কেমন তোমাকে ফাঁকি দিলাম—কই আমাকে কি ধরিয়া রাখিতে পারিলে?" বাঙ্গালীর এইরূপ সহস্র সহস্র বৎসর বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; কই স্মরণ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত এমন সময় কি মনে হয়? এই যে বৎসরটি অঙ্গুলি হেলাইয়া চলিয়া গেল, ইহার ভিতর ঘোরান্ধকার ভিন্ন বাঙ্গালীর দেখিবার আর কিছু আছে কি? বৎসরটির যে সময়ের কথা মনে কর তাহাতেই দেখিবে সেই দুঃখ—যে দুঃখ অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সেই দুঃখ ভিন্ন বাঙ্গালী জীবনে দেখিবার জিনিষ আর কি আছে? বঙ্গবাসী! ভারতবাসী এই সম্বৎসর ধরিয়া সেই অনন্ত দুঃখের কিঞ্চিন্মাত্রও ভার লাঘব করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছ কি? মনে ত হয় না।

একবার পুণ্যভূমি ইয়ুরোপ বা আমেরিকার দিকে দৃষ্টিপাত কর। মানবীয় দুঃখের লাঘব চেষ্টায় কত কার্য্য হইয়াছে—মানবজাতির অভাব মোচন জন্য কত দিকে কত প্রকার উদ্যোগ হইয়াছে। উচ্চতর বিষয় সকলের অভাব পূরণে বঙ্গবাসী অনেক দিন হইতেই অক্ষম হইয়াছেন সত্য, কিন্তু যে সকল অভাব মোচন তাঁহাদের সাধ্যাতীত নহে তাহার জন্য কি এই সম্বৎসর ধরিয়া কোন চেষ্টা করা হইয়াছে? কিছুই নহে। বাঙ্গালীর প্রকৃত অভাব বাঙ্গালী বুঝে না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই বঙ্গবাসী—ভারতবাসী অনন্ত কাল হইতে সমান ভুগিতেছে। সেই অনন্তের অংশস্বরূপ ১২৮৮ সালও তাহাদিগকে কেবল ভুগিতেই দেখিয়াছে, আর কিছুই দেখে নাই। তাই বলিতেছিলাম, এই যে বৎসরটি নবীন ভাবে সমুদিত হইতেছে ইহাতে কি বঙ্গবাসী একবার নবীন উৎসাহে মাতিয়া সেই সেই অনন্ত অভাবের সামান্য কণিকামাত্রও মোচন করিতে সচেষ্ট হইবে না? ১২৮৮ সাল যেমন কিছুমাত্র ভূত স্মৃতি রাখিয়া যাইতে পারিল না, ১২৮৯ সালও কি সেই ভাবেই চলিয়া যাইবে? ভাই! যাহাতে এই নবীন বৎসরে কিছু কার্য্য করিয়া ঐহিক অমরতা লাভে সমর্থ হও, তাহার চেষ্টা কর। প্রতাপ—ম্যাজিনী, সক্রেটিস—গালিলিওর অনুসরণ করা ধৃষ্টতার কার্য্য নহে। একবার ম্যাজিনীর ন্যায় স্বার্থত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশের মঙ্গলকামনায় ব্রতী হও। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, যত্ন কর, সুফল অবশ্যই ফলিবে। ইংরাজরাজ আমাদের প্রতিকূল নহেন। আমরা যে সকল ফল লাভের কখন আশা করি নাই, ইংরাজরাজ তাহা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে দিয়াছেন—যাহা দেন নাই, তাহার জন্য চেষ্টার কেন ত্রুটি করা হয়। চেষ্টা কর অবশ্য ফললাভ হইবে। আমাদের

অভাব সকলের এই নূতন বৎসরে এক বার আন্দোলন কর ; সর্ব্বত্র আন্দোলিত হইলেও অনেকটা পূরণ হইতে পারে। তাই আমি বলিতেছিলাম, এই নূতন বৎসরটিও কি দীন ভাবে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ?

ব্রজপতি।

ভারতীয় ভূগোল শাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নদী।

ভারতবর্ষের বৃত্তান্তে অনেক নদ নদীর উল্লেখ আছে। যথা—ভাগীরথী, কালিন্দী, বিদিশা, বেন্না, নর্ম্মদা, তাপী, বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, দেবনদী, সিন্ধু, গোদাবরী, কৃষ্ণবেন্না, কাবেরী, কিম্পুনা, বিশল্যা, বৈতরিণী, তৃতীয়া, আত্রেয়ী, লৌহিত্য, লঘত্রী, জোষ্টিলা, শোণ, মহাশোণ, চর্ম্মণ্বতী, পর্ণাশা, সরযূ, বারবত্যা, লাঙ্গলী, করতোয়া, গোমতী, সন্ধ্যা, ত্রিস্রোতসী, বেদস্মৃতি, মুথা, সুরমা, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, ভীমরথী, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, ত্রিসমাচার্য্যা, ঋষিকুল্যা, কুমারী, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, গণ্ডকী, সদানীরা, পম্পা, মন্দাকিনী, দৃশদ্বতী, পৌনঃপুনঃ, ফল্গু, সুলক্ষ্মী বা চন্দ্রাবতী, কোকা, রাধা, দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, অজাবতী, দারু, কেশী, শৈলবতী, কংশবতী, রূপনারায়ণ, শুক্তিমতী, ব্রাহ্মণী, ধূম্রবতী, শিপ্রা, পার্ব্বতী, বেত্রবতী, ক্রিয়া, শরবতী, গৌরী, নারায়ণী, বঙ্গমতী, কমলা, কৌষিকী, শ্বেতবাহিনী, সর্ব্ববরা, কর্ণফুলী, যমুনা, দামোদর ইত্যাদি।

ভাগীরথী—অধুনা ভাগীরথী বা হুগলিনদী।

কালিন্দী—এই নদী হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী। কমোগ্গার নিকট ইহা গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। কালিন্দীকে পূর্ব্বকালে শালিনী নদীও বলিত।

বিদিশা—এই নদীর অপর নাম বেত্রবতী। বিদিশা নগরী এই নদীর উপর সংস্থাপিত ছিল।

নর্ম্মদা—অধুনা নর্ম্মদা।

তাপী—অধুনা তাপী বা তাপ্তী।

বিপাশা—অধুনা বিপাশা।

শতদ্রু—অধুনা শতদ্রু।

চন্দ্রভাগা—অধুনা চন্দ্রভাগা।

সরস্বতী—সরস্বতী নদীর এক্ষণে লোপ হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের একটি সীমা ছিল।

ইরাবতী—অধুনা ইরাবতী ; সিন্ধুনদের একটি উপনদী।

বিতস্তা—অধুনা বিতস্তা।

দেবনদী—দৃষদ্বতী নদীর নিকট পূর্ব্বকালে যে একটী সামান্য প্রবাহ প্রবাহিত ছিল তাহারই নাম দেবনদী।

সিন্ধু—অধুনা সিন্ধুনদ।

গোদাবরী—অধুনা গোদাবরী। ইহার তীরে পঞ্চবটী-বন ছিল।

কৃষ্ণবেণ্ণা—অধুনা কৃষ্ণা।

কাবেরী—অধুনা কাবেরী।

কিম্পুনা } কাবেরীর উপনদীদ্বয়। এক্ষণে
বিশল্যা } ইহাদের নামান্তর হইয়াছে।

বৈতরিণী—অধুনা বৈতরিণী। ইহা উড়িষ্যা-দেশে। ইহার অপর নাম কোকিলা। বৈতরিণী নামে দুইটী নদী বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে একের নাম বড় বৈতরিণী। ইহা পুরাণে চিত্রোৎপলা নদী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী ও বৈতরিণী নদী ছোট নাগপুর প্রদেশ হইতে উৎপন্ন। এই দেশকে পূর্ব্বে মন্দ দেশ বলিত।

আত্রেয়ী—অধুনা ত্রিনদী; ব্রহ্মপুত্রের করদ নদী।

লৌহিত্য—ইহা আসাম দেশে। এই নদীকে এক্ষণেও সেই দেশের লোকেরা লোহিত নদী বলিয়া থাকে। আসামে আর একটী নদীর নাম লোহিত নদী; এই জন্য আসামীরা বৃহৎ লোহিত ও ক্ষুদ্র লোহিত বলিয়া দুইটীকে পৃথক্ করিয়া থাকে।

লবন্তী—লৌহিত্যের নামান্তর বলিয়া বোধ হয়।

শোণ—অধুনা শোণনদ। পূর্ব্বকালে ইহাকে হিরণ্যবাহুও বলিত। গ্রীকেরা এই নদীকে (Erranaboas) বলিয়া থাকে।

মহাশোণ—ইহা গঙ্গার উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

চর্ম্মণ্বতী—পুরাণাদিতে ইহাকে চর্ম্মবল ও শিবনদ বলে। মেঘদূতে এই নদীর উল্লেখ আছে। এক্ষণে ইহার নাম চম্বল।

পর্ণাশা—ইহা তাপ্তীনদীর উপনদী; অধুনা পর্ণানদী।

সরযূ—অধুনা সরয়ূ বা ঘর্ঘরা। ইহারই উপর প্রাচীন অযোধ্যানগরী সংস্থাপিত ছিল। সরয়ূর অপর নাম দেবিকা, ঘর্ঘরা এবং প্রেমবাহ; অযোধ্যাবাসিগণ বলেন দেবিকা অপর একটী স্রোতস্বতীর নাম; এই দেবিকাই মহাসরয়ূ বলিয়া উক্ত হয়। ইহার একটী উপনদীর নাম তমসা নদী।

বারবত্যা—বেত্রবতী বা বিদিশা নদী।

করতোয়া—বঙ্গদেশের উত্তরে। পৌরাণিক মতে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ-কালে তাঁহাদের যুক্তকর দিয়া যে বারিধারা নিপতিত হয়, তাহা হইতেই এই করতোয়া নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

গোমতী—অধুনা গোমতী।

ত্রিস্রোতসী—অধুনা তিস্তামতী নদী। তিনটী স্রোতে ইহা বিভক্ত হওয়াতেই উহাকে ত্রিস্রোতসী বলিত। ইহা ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

সুরমা—ইহা তিলাদ্রি হইতে নিঃসৃত হইয়া শ্রীহট্টের মধ্য দিয়া অন্যান্য নদীর সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদ বা মেঘনার উৎপত্তি করিয়াছে।

পয়োষ্ণী— } —ইহারা তাপ্তীনদীর উপ
নির্ব্বিন্ধ্যা— } নদীদ্বয়। এক্ষণে ইহাদের ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে।

ভীমরথী—অধুনা ভীমা নদী।

কৃতমালা—গোদাবরীর উপনদীমাত্র।

তাম্রপর্ণী—কৃষ্ণার উপনদী বলিয়া বোধ হয়।

ত্রিসমাচার্য্য—মান্দ্রাজ অঞ্চলে। ইহার এক্ষণে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ঋষিকুল্যা—অধুনা ঋষিকুল্যা। ইহা দাক্ষিণাত্যে। এই নদীর উপরেই গঞ্জাম নগর অবস্থিত।

কুমারী—এই নদী এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। ইহা ঋষিকুল্যার দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইত।

গঙ্গা—অধুনা গঙ্গা। ইহার অনেক নাম। তদুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ব্রহ্মপুত্র—অধুনা ব্রহ্মপুত্র। ইহাকে হ্রদিনী, হস্তিমালা ও কোপল নদও বলিত।

মহানদী—অধুনা মহানদী।

গণ্ডকী—অধুনা গণ্ডকী। ইহাকে কুতকী নদীও বলে; কেননা ইহা নারায়ণের কুণ্ডস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদীর বক্ষে শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই জন্য ইহার অপর নাম শালগ্রামনদী ও নারায়ণী।

সদানীরা—গঙ্গার নামান্তর।

পম্পা—অধুনা পোনাব নদী।

মন্দাকিনী—ছুটিয়া নাগপুরের নিকট দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

পৌনঃপুনঃনদী—ইহা মগধ দেশে। পুনঃপুনঃ ইহা লোকের পাপক্ষালন করে বলিয়া ইহার নাম পৌনঃপুনঃ নদী।

ফল্গু—অধুনা ফল্গু। ইহা অন্তঃসলিলা নদী।

সুলক্ষী বা চন্দ্রাবতী—এই নদীকে এক্ষণে চন্দন-নদী বলে; কেননা ইহা চন্দনকাননের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহার অপর নাম কৌকা নদী।

ব্রাহ্মনদী—ক্ষেত্র সমাসের মতানুসারে এই নদী জঙ্গিপুরের নিকট গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী—গঙ্গায় করদ নদীদ্বয়। ইহারা অতি বক্রগতিতে আসিয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

বক্রেশ্বর—বক্রেশ্বরনামক মহাদেবের উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম বক্রেশ্বর হইয়াছে। এক্ষণে ইহাকে বাঁকা নদী বলে। ইহা কাটোয়ার নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

অজাবতী—সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে ইহাকে অজয়ী নদী বলে। ইহার অপর নাম অজ্ৰী, অজামতী। এক্ষণে ইহাকে অজয় নদী বলে। ইহা কটদ্বীপের (কাটোয়ার) নিকটে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

দারুকেশী—এক্ষণে ইহাকে দ্বারকেশ্বর বলিয়া থাকে। ইহা বিষ্ণুপুর, জাহানাবাদের নিকট দিয়া যাইয়া রূপনারায়ণে মিলিত হইয়াছে।

শৈলবতী—এই নদীকে শিলাবতী ও সুমতীও বলে। এই নদী সম্বন্ধে বৃহৎ কথায় অনেক আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে শৈলবতীনাম্নী যুবতীর জন্ম এই নদীতীরেই হইয়াছিল বলিয়া উক্ত আছে।

কংশবতী—অধুনা কাঁশাই নদী। ইহা মেদনীপুর অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত।

রূপনারায়ণ—দারুকেশী, শৈলবতী ও কংশবতী এই নদীত্রয় মিলিত হইয়া ইহার উৎপত্তি করিয়াছে।

শুক্তিমতী—ইহাকে এক্ষণে হিরণ্যরেখা বা সুবর্ণরেখা বলিয়া থাকে। ইহা ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে উৎপন্না।

ব্রাহ্মণী—চুটিয়া নাগপুর প্রদেশ হইতে উদ্ভূত।

ধূম্রবতী—যমুনার একটী উপনদীমাত্র।

শিপ্রা—ইহার অপর নাম অবন্তী। ইহা বক্র-গতিতে আসিয়া চর্ম্মণ্বতীতে মিলিত হইয়াছে।

পার্ব্বতী—ইহা সিন্ধু-নদের উপনদী। ইহা বিজয়গড়ের নিকটে সিন্ধুতে পতিত হইয়াছে; এক্ষণে ইহার নাম পার্বনদী।

বেত্রবতী—ইহা অতি পবিত্র নদী। ইহা বিদিশা দেশ দিয়া প্রবাহিত; ইহার অপর নাম বিদিশা নদী। এই নদীর নামানুসারে দেশের নাম বিদিশা হইয়াছে। কাদম্বরীতে এই নদীর কথা উক্ত হইয়াছে।

ক্রিয়ানদী—ইহাকে এক্ষণে কৃষ্ণগঙ্গা বলিয়া থাকে।

শরবতী—শরবতী নদীকে রামগঙ্গা বলে। মহাভারতে এই নদী সুবামা ও শ্রীমদ্ভাগবতে সুসোম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। টলেমী ইহাকে শারবোণ বলিয়াছেন। এই নদীর তীরে শরবনে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। এক্ষণে ইহাকে রামগঙ্গা বলে।

গৌরী—ইহা গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

নারয়েণী—গণ্ডকী নদীর নামান্তর। পৌরাণীক মতে ভগবান্ নারায়ণ শালগ্রাম শিলারূপে ইহার জলে বাস করেন।

বঙ্গমতী—এক্ষণে বাঘমতী।

কমলা—অধুনা কমলা। ভুবনকোষমতে ইহা দ্বারভাঙ্গার নিকট দিয়া প্রবাহিতা।

কৌষিকী—ইহার বর্ত্তমান নাম কুশী। যে স্থানে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তথায় ভগবান্ বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল।

শ্বেতবাহিনী—ইহার বর্ত্তমান নাম ধবলা নদী। মৎস্যপুরাণে ইহার নাম মহোদা। ইহার অপর নাম বাহুদা ও অর্জ্জুনী। ইহার দুই শাখা আছে। পূর্ব্বকালে তাহাদিগকে সীতাপ্রবাহ ও সীতাকণ্ঠী বলিত; হিমালয় হইতে মহাদেব সীতাপ্রবাহ ও ব্রহ্মা সীতাকণ্ঠী আনয়ন করেন। ইহাদের বর্ত্তমান নাম বড় ও ছোট ধবলা।

কর্ণফুলী—অধুনা কর্ণফুলী। ইহা চট্টগ্রামে।

যমুনা—অধুনা যমুনা। এই নদী সূর্য্যের কন্যা ও শেষ মনুর ভগ্নী। টলেমী এই নদীকে ডায়মুনা (Diamuna) নদী বলিয়াছেন। ইহাকে কালিন্দী নদীও বলিয়া থাকে। তাহার কারণ ইহা কালিন্দা দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহাভারতে এই দেশকে কুলিন্দ দেশ বলিয়াছে। টলেমী ইহাকেই (Culindrine) কুলিন্দ্রাইন বলেন।

বেদস্মৃতি—বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া আরব্য সমুদ্রে পড়িয়াছে।

মৃগা—ইহাও বিন্ধ্য-পর্ব্বত হইতে নির্গতা।

দামোদর—অধুনা দামোদর নদ।

ভারতবর্ষের বৃত্তান্তে আরও নানা নদ-নদীর বিষয় উল্লিখিত আছে; কিন্তু তৎসম্দায়েরই আধুনিক নাম ও সংস্থান নিরূপণ করা অতীব দুষ্কর; সেই জন্য অদ্য তাহাতে নিরস্ত হইলাম।

পর্ব্বত।

ভারতবর্ষে অনেকগুলি পর্ব্বতের নাম পাওয়া যায়। যথা—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ-পর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিপাত্র,

হিমালয়, মন্দর, দর্দুর, গন্ধমাদন, ইন্দ্রকীল, রৈবতক, চিত্রকূট, ত্রিকূট, ঋষ্যমুখ, সুনাভ, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উপগিরি, তিলাদ্রি, ময়ূরাদ্রি, যাম্য পর্ব্বত ইত্যাদি।

মহেন্দ্র—পূর্ব্বঘাটের দক্ষিণাংশ মহেন্দ্র-পর্ব্বত নামে অভিহিত হইত।

মলয়—পূর্ব্বঘাটের উত্তরাংশ।

সহ্য—অধুনা সহ্যাদ্রি ; পশ্চিম ঘাটের উত্তর।

শুক্তিমান্—বিন্ধ্য পর্ব্বতের সর্ব্ব-পূর্ব্বাংশ এই নামে অভিহিত হইত।

ঋক্ষ-পর্ব্বত—বিন্ধ্যাচলের মধ্য-পূর্ব্বাংশ।

বিন্ধ্য—অধুনা বিন্ধ্য-পর্ব্বতের মধ্যস্থল।

পারিপাত্র—বিন্ধ্যাচলের সর্ব্ব-পশ্চিমাংশ উক্ত নামে অভিহিত হইত।

হিমালয়—অধুনা হিমালয় ; ইহাকে হিমাচল, হিমাদ্রি, ও হিমবান্ প্রভৃতিও বলিত।

মন্দর—অধুনা রাজমহলের পাহাড়। পূর্ব্বকালে এই রাজমহলের নিকটেই সমুদ্র বর্ত্তমান ছিল। তখন বঙ্গ-দেশের অস্তিত্ব ছিল না ; কেননা পুরাণে দেখা যায়, দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন-সময়ে তাঁহারা এই মন্দর-ভূধরকেই মন্থন-দণ্ড স্বরূপ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেই মন্দর গিরি তৎকালে সমুদ্রের উপকূলেই ছিল বলিয়া বোধ হয়।

দর্দুর-পর্ব্বত—ইহা পূর্ব্বঘাটের অংশবিশেষ।

গন্ধমাদন—এই নামে অনেকগুলি পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী ভারতবর্ষের উত্তরে ও অপরটী ইহার মধ্যে।

ইন্দ্রকীল—অধুনা আবু পর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়।

নীলগিরি—অধুনা নীলগিরি।

রৈবতক—ইহা মগধদেশে। ইহার পাঁচটী শৃঙ্গ ছিল। যথা—বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি, চৈত্যক। এই পাঁচটী শৃঙ্গের মধ্যস্থিত স্থানে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল।

চিত্রকূট—চুটিয়া নাগপুর। ইহার নিকটে দণ্ডকারণ্য।

ত্রিকূট—অধুনা ত্রিকূট ; পূর্ব্ব ঘাটের উত্তরাংশে স্থিত।

ঋষ্যমূক—ইহা পূর্ব্ব ঘাট পর্ব্বতের মধ্যস্থলের নিকটে ; ইহার উপরি হইতেই সুগ্রীবাদি পঞ্চজন রাবণ-কৃত সীতাহরণ ব্যাপার দেখিয়াছিল।

অন্তর্গিরি—
বহির্গিরি—
উপগিরি— } —ভোটান-দেশের নিকটবর্ত্তী হিমালয়ের অংশবিশেষ।

তিলাদ্রি—ইহা ত্রিপুরা অঞ্চলে।

যাম্যপর্ব্বত—আসামে। অধুনা যামধেরা বা যামদ্বার।

উদয়াচল—আমাদের পূর্ব্বদিকে। টলেমী ইহাকে শীমন্তিনী (Semanthini) পর্ব্বত বলিয়াছেন।

গৃধ্রকূট—অধুনা গিদোর। ইহা গোরক্ষপুর অঞ্চলে।

শারদা-পর্ব্বত—কল্কিপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। ইহা আসাম-দেশে।

দেবগিরি—অপর নাম ময়গিরি। ইহা মথুরার পশ্চিমে।

খড়্গাদ্রি—ইহার নামানুসারেই খড়কদিয়া জেলার নামানুকরণ হইয়াছে।

রঘুনন্দন-পর্ব্বত—ক্ষেত্র সমাসের মতে চট্টগ্রামে। (ক্রমশঃ)

প্রমোদ-কুমার।

নবম পরিচ্ছেদ।

মুকুলে কুসুম শুকাইল।

"এই কিরে ফল ফলে প্রেমতরু শাখে ?"

বীরঙ্গনাকাব্য।

প্রমোদের বিরহে জমীদার-গৃহের সকলেই শোকাকুল হইলেন। যোগেশ জমীদারকে কিয়ৎদিনের নিমিত্ত সুহাসের বিবাহ স্থগিত রাখিতে বলিলেন—কেননা এত শোকের পর "আনন্দ" মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। জমীদারের ইচ্ছাও তদনুরূপ, কিন্তু কি করেন বরপক্ষীয়েরা এই মাসেই বিবাহ দিতে চাহে. সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধ জমীদার এত শোকের সময়েও আনন্দে মত্ত হইতে উদ্যত হইলেন। যোগেশ মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন।

অদ্য সুহাসের গাত্র-হরিদ্রা। নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বের আনন্দ-কোলাহলে আজ জমীদারগৃহ পূর্ণ। যাহারা পূর্ব্বে সুহাসকে দেখিয়াছিল—আজ সুহাসকে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। যে প্রফুল্ল সুন্দর ওষ্ঠ কেহ কখন শুষ্ক দেখে নাই—আজ তাহা শুষ্ক। সুহাস শীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সুন্দর চক্ষে কালিমা পড়িয়াছে। যাহা হউক, সুহাসকে প্রাঙ্গণে আনা হইল। পুরনারীগণ হরিদ্রা লইয়া সুহাসের ললাটে স্পর্শ করাইলেন। চতুর্দ্দিকে উলুধ্বনি হইল—বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—অদ্য প্রমোদের সুহাস অন্যের হইতে চলিল। ক্রমে বেলা অগ্রসর হইতে লাগিল। সূর্য্য পশ্চিম গগনে আশ্রয় লইবার উদ্যোগ দেখিলেন। বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত সকল নিমন্ত্রিতা স্ত্রীগণ বিদায় হইলেন। কুমুদ—অভাগিনী সুহাসের যথার্থ ব্যথার ব্যথী কুমুদ—সুহাসকে শান্তনাকরণার্থ উদ্যানের মধ্যে লইয়া গেলেন। উভয়ে পুষ্করিণীর ঘাটের উপরি বসিলেন। সুহাসের মুখে আজ হাসির চিহ্ন-মাত্র নাই। তাহার মুখ সাতিশয় পরিষ্কার—কিন্তু অতিশয় গম্ভীর। কুমুদ সন্দেহসঙ্কুল সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারংবার সুহাসের মুখ দেখিতেছে। কুমুদ অদ্যাবধি সুহাসকে এরূপ গম্ভীর দেখে নাই। সুহাস ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল "আচ্ছা কুমুদ! এই পুকুরে মানুষ ডুবিলে কি মরে?—বোধ হয় মরে না।" সে হাসি দেখিয়া কুমুদের প্রাণ শুকাইল। কুমুদ সুহাসের হাতদুটী ধরিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল "সুহাস—সুহাস! কি স্থির করিয়াছ ভাই? ও কথায় তোমার কি আবশ্যক?"

সুহাস পরিষ্কার স্বরে বলিল, কুমুদ! "কি বলিতেছ ভাই—আমি পুকুরের জল অল্প বলিয়া কথা বলিতেছিলাম;—তুমি কি ভাবিয়াছ?" কুমুদ বিস্মিত নেত্রে সুহাসের প্রতি চাহিল,—দেখিল, বালিকার সরল প্রতিমূর্ত্তি। কুমুদ মনে মনে ভাবিল, সে অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিল,—হাসিয়া বলিল, "না সুহাস! কিছু নয়—আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, কি বলিতে কি বলিয়াছি।"

উভয়ে কিয়ৎ কাল নীরবে অবস্থান করিল। সুহাস সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল কুম! দেখ, কেমন সুন্দর গোলাপ ফুটিয়াছে—আজ প্রায় পনর দিন হইল, তিনি ওই গাছের একটী ফুল লইয়া এই জলে ভাসাইয়াছিলেন।

কুমুদ সুহাসের হস্ত দুটী ধরিয়া বলিল, "ভাই! একটী কথা বলিব—কথাটি বড় ভয়ানক—আমায় অনেক কষ্টে সে কথা বলিতে হইবে।"

সু—"কি কথা?—বল।"

কু—"আগে বল রাগ করিবে না?"

সু—"তোমার উপর কি কখন রাগ করিয়াছি?—যে আজ তাই করিব?"

কু—"সুহাস! এক্ষণে তুমি পরস্ত্রী হইতে চলিলে—প্রমোদের চিন্তা পর্য্যন্ত এক্ষণে তোমার পক্ষে দূষণীয়। ভাই! প্রমোদকে বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর।"

সুহাস কুমুদের প্রতি চাহিল। অস্ফুট ঈষৎ-হাস্য-রেখা তাহার অধরে দেখা দিল—সুহাস কোন উত্তর করিল না। সে হাসি যেন কুমুদকে বলিল, "কুমুদ সংসারের আর সকলকে বিস্মৃত হইতে বলিলে না কেন?"

উভয়ে বহু ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। অদ্য অমাবস্যা—সুতরাং পল্লীগ্রামে সন্ধ্যাকেই গভীর রাত্রি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কুমুদ সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "অন্ধকার হ'য়ে এল, চল ঘরে যাই।" উভয়ে উঠিলেন। কুমুদ সুহাসকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন। সুহাসও কুমুদের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ধীরে চলিলেন। উভয়ের মধ্যে সে দিন কাহারও ক্ষুধা ছিল না—কেহই আহার করিল না। সুহাস কুমুদকে লইয়া স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিল। উভয়ে বহু ক্ষণ অবধি নানাবিধ গল্প করিল। তাহার কিয়দংশ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

সু। "ভাই! যার মা নাই তার এজগতে কেউ নাই—আজ যদি মা থাকৃতেন।"—সুহাস এই বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

কু—"আর যার পিতা, মাতা, ভাই কেউ নাই—তার মত অভাগিনী কে আছে?"

সু। "আচ্ছা কুমুদ! তোমার পূর্ব্বেকার কথা কি মনে পড়ে?"

কু। "মনে পড়ে, কিন্তু সে সকল এখন মনে হ'লে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। পিতা মাতাকে দেখিলে বোধ হয় এখন চিনিতে পারি; কিন্তু আমার ভাইকে খুব অল্প মনে পড়ে। প্রমোদ দাদাকে দেখিলে আমার ভাইকে মনে পড়িত।"

উভয়ে বহু ক্ষণ নীরবে অবস্থান করিল। অবশেষে কুমুদ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "যাই ভাই! রাত্রি অনেক হইয়াছে।

সুহাস বলিল, "একটু দেরীতে যাইও, এস

তোমায় একটু আদর করি।" এই বলিয়া সুহাস সযত্নে কুমুদকে বক্ষের উপর টানিলে সেই রক্তাক্ত সুন্দর ওষ্ঠের উপর স্বীয় কম্পিত উষ্ণ ওষ্ঠাধর স্থাপন করিয়া স্নেহের চুম্বনে তাহা সিক্ত করিল। কুমুদ দেখিল, আদর আর ফুরায় না। সে অত্যন্ত অধীর হইয়া বলিল "ছাড় ভাই, রাত্রি অনেক হইয়াছে, ঘরে যাই।"

সুহাস কুমুদকে বক্ষের উপর আরও চাপিয়া ধরিল, আরও একটী স্নেহের চুম্বনে সেই প্রফুল্ল গণ্ড অঙ্কিত করিল।

কুমুদ অবশেষে আপনাকে সেই স্নেহের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া বলিল "যাই।"

সুহাস বলিল, "যাবে"——

কুমুদ যদি অধীরা না হইতেন তাহা হইলে বুঝিতেন কি স্বরে "উক্ত কথা" উচ্চারিত হইল। যে পর্য্যন্ত কুমুদকে দেখা গেল, সুহাস স্থির দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। যখন কুমুদ দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, সুহাস ধীরে ধীরে আপনার মস্তক ফিরাইল। নীরবে নিঃশব্দে দুইবিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড দিয়া বহিয়া গেল।

প্রেমই নারীর জীবন। এ জগতে এমন কি কিছু আছে, প্রেমের জন্য রমণী যাহা করিতে বিমুখ? প্রেমের জন্য রমণী সকলপ্রকার অসংসাহসিক কার্য্য করিতে পারে। যে প্রেমের এত দূর ক্ষমতা, জানি না সে প্রেমে হতাশ হইলে অবলা রমণী কি করে। সুহাসের হৃদয় ত আজি হতাশ হুতাশে জ্বলিতেছে—জানি না সে অভাগিনী অদ্য কি স্থির করিয়াছে। সুহাস স্বীয় কক্ষের বাতায়ন খুলিয়া আকাশের প্রতি চাহিল—দেখিল, অসীম অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রমালা জ্বলিতেছে; নিম্নে চাহিল—দেখিল, দুর্ভেদ্য গভীর অন্ধকার উদ্যান বাটী, সমস্ত পুষ্করিণী আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। কতসহস্র ঘটনা বালিকার মনে উদয় হইল—আবার ধীরে ধীরে মনের মধ্যে মিশাইয়া গেল। উঃ আজ দুই বৎসর গত হইল, সে দিনেও এইরূপ নক্ষত্র ছিল—সে দিনেও এরূপ অন্ধকার ছিল। সেই অরণ্যে দস্যুর কথা মনে হইল—বালিকা শিহরিয়া উঠিল—আবার তৎক্ষণাৎ সেই সুমধুর আশ্বস্ত কথা মনে হইল—বালিকার তনু রোমাঞ্চিত হইল। নীরবে একবিন্দু অশ্রু বালিকার কপোল বহিয়া পড়িল।

তাহার পর জীবনের সেই দিন—সেই সুখের দিন—সে আনন্দের দিন বালিকার মনে পড়িল—যে দিন সে জানিতে পারিল সে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহারই। সুহাস ভাবিল, সেই দিনটী তবু কেন পৃথিবীর একমাত্র দিন রহিল না? এক দিন প্রমোদ কোথায় গিয়াছিলেন—বাটী আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাতে সুহাস কাঁদিয়াছিল। প্রমোদ যখন একথা শুনিলেন, প্রেমোন্মত্ত যুবক স্নেহের উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকার হস্ত ধরিয়া কি সুমধুর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বালিকার মনে হইল। সুহাস ভাবিল, সে স্নেহ কি করিয়া এতদূর নিষ্ঠুরতা করিল। এক দিন সুহাসকে বিষণ্ণ দেখিয়া প্রমোদ সজল নেত্রে বালিকার হাত দুটী ধরিয়া কি কথা বলিয়াছিলেন—তাহা সুহাসের মনে হইল। সুহাস ধীরে পুষ্করিণীর প্রতি চাহিল—বালিকার মস্তক ঘুরিয়া গেল। সেই দিন

প্রমোদের সহিত তাহার শেষ দেখা—সেই দিন সে জন্মের মত প্রমোদের হস্ত ধরিয়াছিল। উঃ সেই দিন তাহার জীবনের দুর্দ্দিন—না সে দিন দুর্দ্দিন নয়—সেই দিন বালিকা প্রমোদের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিল। "হে দেবতা! অভাগিনী কি আর সে সুন্দর বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিবে না?" বালিকা আর ভাবিতে পারিল না। সে ধীরে শয্যার উপর বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সুহাস মনে মনে বলিল, "প্রমোদ! হৃদয়েশ! আজ অভাগিনী সুহাসের জীবলীলা ফুরাইবে। হৃদয়েশ! তোমার সুহাস অবিশ্বাসিনী নহে। তুমিই এজগতে আমার স্বামী ছিলে। তোমার সুহাস অপর কাহাকে স্বামী বলিয়া জানে না —জানিবেও না। তাই আজ অভাগিনী সুহাস দামোদরগর্ভে প্রবেশ করিয়া সকল যন্ত্রণা এড়াইবে। হৃদয়েশ! যদি ভালবাসার পুরস্কার থাকে তবে তুমি। আমার ছিলে আমারই হইবে।"

উঃ অভাগিনী আত্মহত্যা করিবে? প্রেম! ধন্য তোমার ক্ষমতা! তুমি সরলা বালিকাকেও এতদূর উত্তেজিত করিয়াছ। কুমুদ! তুমি অন্যায় সন্দেহ কর নাই। সুহাস উদ্দেশে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবা! আজ তোমার স্নেহের সুহাস জন্মের মত চলিল—অভাগিনী বলিয়া তাহার অপরাধ গ্রহণ করিও না।" সুহাস ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল—সতর্কতাসহকারে গৃহের কবাট খুলিয়া উদ্যানাভিমুখে গমন করিল। সুহাস দেওয়াল অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে চলিল। কত বার পদস্খলন হইল, কত বার শব্দ হইল —কতবার সুহাসের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। যাহা হউক, অনেক কষ্টে সুহাস উদ্যানের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইল। (এখানে বলা উচিত যে, জমীদারের পুষ্করিণীতে গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক জল লইতে আসিতেন, সুতরাং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহার দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিত। তৎপরে উদ্যান-রক্ষকে তাহা বন্ধ করিত, কিন্তু উদ্যান-রক্ষকের অনুপস্থিতি হেতু অদ্য এই দ্বার বন্ধ হয় নাই।) সুহাস অক্লেশে দ্বার উত্তীর্ণ হইলেন, এক বার তবু তাহার হৃদয় কাঁপিল, এক বার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সুহাস দেবতাকে স্মরণ করিয়া দ্রুত পদে চলিলেন। জমীদারের বাটী হইতে সোজা পথ ধরিয়া গেলেই—দামোদর—সেই জন্য সুহাসের কোন কষ্ট হইল না। সে শীঘ্রই দামোদর কূলে উপস্থিত হইল। সুহাস আকণ্ঠ জলে নামিল —কৃতাঞ্জলি পুটে ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিল, "দেবতা! এজন্মে তাঁহাকে পাইলাম না—পুনর্জন্মে তিনিই যেন আমার স্বামী হন।" উঃ সে মূর্ত্তিতে তখন কি স্বর্গীয় ভাব সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সে সুন্দর বদনে তখন ক্লেশের, কষ্টের, দুঃখের রেখামাত্র ছিল না। সে মুখ তখন শান্তি, প্রেম ও স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ! সুহাস ধীরে একপদ বাড়াইল—সেখানে অতল জল—বালিকার চরণ স্থান পাইল না। অভাগিনী অতল জলে ভাসিয়া গেল। এ সংসার-আকাশের অসংখ্য তারকারাজির মধ্যে একটীমাত্র নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। কয় জন তাহার সংবাদ লইল। এ সংসার-সমুদ্রের মধ্যে একটী জলবুদ্বুদ্ উঠিয়াছিল, আজ তাহা জলে মিশাইয়া গেল—মুকুলে কুসুম শুকাইল।

বঙ্গনারী।

তৃতীয় প্রস্তাব।

সতীত্ব
বা
প্রেম ও ভক্তি।

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা। মহাভারত।

সতীত্বের যে প্রকৃত অর্থ কি, আজিও আমরা তাহা সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পুরুষকে আমরা যে অর্থে সৎ বলি, রমণীকে আমরা ঠিক্ সেই অর্থে সতী বলি না। পুরুষের সততার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বাঁধাবাঁধি ভাব বর্ত্তমান নাই, কিন্তু রমণীর সতীত্বের মধ্যে তাহা বিলক্ষণরূপই রহিয়াছে। কুপথগামী পুরুষ যদি প্রকৃত অনুশোচনার পর, সৎপথাবলম্বী হয়, আমরা তাহার পূর্ব্বকৃত তাবৎ অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহার গুণের প্রশংসাই করিয়া থাকি, কিন্তু রমণীর একটী বার পদস্খলন হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। অভাগিনী-কে সাহায্য করা দূরে থাক্, আমরা চেষ্টা করি ইহ জন্মে সে যেন আর কখন উঠিয়া দাঁড়াইতে না পারে। যাহাতে সে অধঃপতনের সোপান দিয়া শীঘ্র নরকাবর্ত্তে পৌঁছিতে পারে, আমরা কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকি। বঙ্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর, এমন কি ভারতেরও, কুত্রাপি সতীত্বের এরূপ অস্বাভাবিক বন্ধন পরিদৃষ্ট হয় না। সতীত্বের এরূপ কদর্য্য ব্যাখ্যা আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। এক সময়ে এই ভারতেই সতীত্বের ব্যাখ্যা ভিন্ন রূপে হইত। অহল্যা প্রমুখা যে পঞ্চ রমণীগণ এক সময়ে সতী রমণীগণের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন, আজও অনেকে প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিবার সময়ে ভক্তিসহকারে যাঁহাদের পবিত্র নাম উচ্চা-রণ করিয়া থাকেন, প্রচলিত ধারামতে যদি তাঁহাদের সতীত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই তাঁহারা অসতী প্রতি-পন্ন হইয়া পড়েন। ইহার অর্থ কি? আমরা

যাহাকে সতীত্ব বলি, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ তাহাকে সতীত্ব বলিতেন না কেন? তাঁহারা আমাদের ন্যায় পুরুষ জাতিকে এক চক্ষে ও রমণী জাতিকে অন্য চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা উভয় জাতির পদস্খলন সমান রূপে মার্জ্জনা করিতেন, ও উভয় জাতিকে সমান চক্ষে দেখিতেন, এই জন্য, শ্বেতকায় মহাপ্রভুর ধর্ম্মাধিকরণে, শ্বেতচর্ম্মী ও কৃষ্ণ-চর্ম্মী অপরাধিগণের বিচারের ন্যায়, উভয় জাতির বিচারকার্য্য পৃথক্ রূপে ও পৃথক্ ভাবে সম্পাদিত হইত না।

জাতিগত বিচার-বৈষম্য বঙ্গদেশে ওতঃ-প্রোত ভাবে বিরাজিত। আমাদের শাস্ত্রকার-গণ একদেশদর্শী ছিলেন। তাঁহারা নারী-জাতির শাসনের জন্য যে সকল বিধি প্রণ-য়ণ করিয়া যান, পুরুষজাতির শাসনের জন্য সেরূপ বিধির নাম গন্ধও উল্লেখ করেন নাই। সত্য বটে, মদ্যপায়ী দুর্বৃত্তগণকে শাসনে রাখি-বার জন্য দুই একটী বিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অকর্ম্মণ্য অস্ত্রের ন্যায় তাহারা কোন কার্য্যেই আইসে না। ভূমিতে পড়িয়া থাকিয়া এমনি মলিন হইয়া গিয়াছে যে, কখন যে তাহাদের ধার ছিল সহসা এ-রূপ বোধ হয় না। স্ত্রীজাতির উপর শাস্ত্র-কারগণের যত কিছু আধিপত্য। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের শাস্ত্রকারগণ এক-দেশদর্শী ছিলেন; যদি, তাঁহারা একদেশদর্শী, এ কথা স্বীকার না কর, তাহা হইলে তাঁহারা যে ঘোর স্বার্থপর ছিলেন, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

শাস্ত্রপত্নীকে পতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম শিক্ষা দেয় না। প্রেমের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র পতিভক্তিই শিখাইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রীর একটী দেবতা, দেবতার মনস্তুষ্টির জন্য শাস্ত্র নারীকে বার বার উপদেশ দিতেছে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, আমরা যাহা উপরে বলিলাম, তাহা কত দূর সত্য।

"সতী স্ত্রী প্রাতরুত্থায় ত্যক্তা চ রাত্রিবাসসং।
ভর্ত্তারঞ্চ নমস্কৃত্য করোতি স্তবনং মুদা ॥
গৃহকার্য্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা ধৌতে চ বাসসী।
গৃহীত্বা শুক্লপুষ্পঞ্চ ভক্তিতঃ পূজয়েৎ পতিং ॥
স্নাপয়িত্বা সুপূতেন জলেন নির্ম্মলেন চ।
তস্মৈ দত্বা ধৌতবস্ত্রং তৎপাদৌ ক্ষালয়েন্মুদা ॥
আসনে বাসয়িত্বা চ দত্বা ভালে চ চন্দনং।
সর্ব্বাঙ্গলেপনং কৃত্বা দত্বা মালং গলেঽপি চ ॥
সামবেদোক্তমন্ত্রেণ ভোগদ্রব্যৈঃ সুধোপমৈঃ।
সংপূজ্য ভক্তিতঃ কান্তং স্তুত্বাচ প্রণমেন্মুদা ॥"
ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ দেখ।

শুদ্ধ ইহাই নহে। স্ত্রী পতিকে কি মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবেন, পাঠকগণ তাহাও শুনুন।

"নমঃ কান্তায় শান্তে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ ॥
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ ॥
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দরূপিণে ॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তু তে ॥
ক্ষমস্ব ভগবন দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসীদোষক্ষমস্ব চ ॥
ইত্যাদি।

এইরূপ পতিভক্তি ও পতিপূজা নারীমহলে

বলপূর্ব্বক প্রচলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে ভক্তির আধিপত্যই পরিদৃষ্ট হয়, প্রেমের আভাসমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তি যে হেয় সামগ্রী ও সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ভ্রমেও একথা আমরা কখন বলি না। আমরা বলি, যেখান হইতে মনুষ্য প্রেমের প্রত্যাশা করে, যেখান হইতে ভক্তি ও পূজা প্রাপ্ত হইলে তাহার মন উঠে না। প্রেমের তৃষ্ণা ভক্তি দ্বারা নিবারিত হয় না। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির নিকটে গঙ্গার একগণ্ডূষ জল যেমন উপাদেয়, বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন পরিশোভিত বহুমূল্য স্বুবর্ণপাত্রও তেমন নহে। আমরা স্ত্রীর নিকট হইতে ভক্তি চাহি না, চাহি কি? না প্রেম। প্রেম-সরোবরের একগণ্ডূষমাত্র জল চাহি, শত সহস্র ভার ক্ষীর নবনীতের প্রত্যাশী নহি। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ যে মূলেই প্রেম শিক্ষা দেন নাই, এমন কথা বলি না, খুঁজিয়া দেখিলে দুই এক স্থানে প্রেমশিক্ষার আভাসমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ভক্তিশিক্ষার ন্যায় প্রেম শিক্ষার তত গভীরতা পরিদৃষ্ট হয় না। যে নারীর পতিই একমাত্র ব্রত, তিনিই পতিব্রতা। যিনি তাঁহার পতিকে গতিমুক্তির একটীমাত্র উপায় জানিয়া দেবতা জ্ঞানে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তিনিই সতী। আমাদের দেশে ভবভূতির সীতার ন্যায় সাধ্বী রমণী অতীব বিরল, কিন্তু খুঁজিলে পতিভক্তিমতী সতী নারী বঙ্গদেশে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সতীর সতীত্বের মধ্যে ভক্তি অপেক্ষা প্রেমের স্বর্গীয় ভাব সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি রাম হইতে চির বিচ্ছিন্ন হইয়াও একমাত্র প্রেমের উত্তেজনায়, অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে সেই ভীষণ যন্ত্রণাময় অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বরের নিকটে অকপট হৃদয়ে রামের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সীতারামকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসিতেন। স্বার্থপরতা তাঁহার পবিত্র প্রেমের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে পারে নাই, কিন্তু কয়জন হিন্দুরমণী সীতার ন্যায় স্বামীকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসিয়া থাকেন? নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসেন, এরূপ রমণী অতি অল্প, কিন্তু অক্ষয় স্বর্গ কামনায় পতির প্রতি যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এরূপ রমণীর সংখ্যা অনেক। অনেক রমণী দায়ে পড়িয়া পতিভক্তি শিক্ষা করেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, পতিপ্রেম যে কি পদার্থ বঙ্গাঙ্গনাদিগের মধ্যে অনেকে তাহা আদৌ অবগতই নহেন, তথাপি তাঁহারা অসতী নহেন, কেননা পতিভক্তি তাঁহারা শৈশব হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। সামাজিক শাসন জোর করিয়া তাঁহাদিগকে সতী করিয়া তুলিয়াছে। প্রেম জোর করিয়া কোন রমণীকে সতী হইতে বলে না, কিন্তু ইহার এমনই মোহিনী শক্তি যে প্রেমমুগ্ধা রমণী আত্মহারা হইয়া আপনা হইতেই স্বামীর পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হয়। পতি পত্নীর স্বার্থ দুইটী তখন আর স্বতন্ত্র থাকে না, প্রেম দুইটীকে জোড়া দিয়া এক ও অভিন্ন করিয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় রমণী সতী না হইয়া বাঁচিতে পারে না এবং স্বামীও স্ত্রীর অধীন না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ভক্তির এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। ভক্তি বলপূর্ব্বক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পরলোকের লোভ ও নরকের ভয় দেখাইয়া,

নারীকে সাধ্বী করিয়া দেয়। পতি ভিন্ন আর তাহার গতি নাই, এই জন্য সে অনন্যগতি হইয়া পতিকে ভালবাসে ও পতির সেবা না করিলে ইহ লোকে সুখগতি ও পরলোকে মুক্তি নাই, এই জন্য সে অনন্যোপায় হইয়া পতির সেবা করে। অক্ষয় স্বর্গবাসের লোভে যেমন খৃষ্টানগণ ঈশ্বরের পূজা করে, বঙ্গনারীগণও তেমনি স্বর্গসুখলাভের আশায় পতিপূজায় প্রবৃত্ত হয়। যিশুর কৃপা ভিন্ন যেমন খৃষ্টানদিগের ত্রাণ নাই, পতির প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ভিন্ন বঙ্গনারীগণেরও তেমনি মুক্তি নাই। পতিগুলি হিন্দুরমণীর এক একটী যিশু-অবতার। খৃষ্টানগণের ঈশ্বরপূজার মধ্যে জ্বলন্ত স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হয়, অস্মদ্দেশীয় ললনাগণের পতিপূজার মধ্যেও তেমনি স্বার্থপরতার ছায়া স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের মধ্যে আত্মোৎসর্গের ভাব দেদীপ্যমান, ভয়ের নাম গন্ধও নাই, কিন্তু ভক্তির সহিত ভয় অনেকটা বিজড়িত। প্রেম বলে, "স্বামীর পাছে কোন কষ্ট হয়, এই জন্য আমি তাঁহার সেবা করি, আমি তাঁহার ক্লেশ দেখিতে পারি না।" ভক্তি বলে, "স্বামী পাছে রাগ করেন, এই জন্য আমি তাঁহার সেবা করি, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে আমি বড় ভীত হই।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অস্মদ্দেশীয় রমণীগণ শাস্ত্রের শাসনে সতী হইয়া থাকেন, প্রেমের জন্য নহে। অনেকে আবার লোকনিন্দা-সংগ্রহভয়ে সতী হইতে বাধ্য হয়েন। আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে, যে সকল রমণী স্বামীর জীবদ্দশায় নানারূপ কুৎসিত ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিত, তাহারাই আবার স্বামীর মৃত্যুর পর সমাজের তাড়নায় সতী-নাম ক্রয় করিবার জন্য মৃত পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে।

কিন্তু তাও বলি, আমাদের দেশে যেরূপ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত, তাহাতে পত্নীর নিকট হইতে প্রেমের আশা করা দুরাশামাত্র। বঙ্গনারীর নিকট তাহার স্বামী কেবল পতিভক্তিরই আশা করিতে পারেন। দশ বৎসরের জ্ঞানহীনা বালিকা আবার প্রেম কি বুঝিবে? বঙ্গদেশে প্রেমের কথা বঙ্কিমী নবন্যাস উপন্যাসের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকুক, সংসারে আর তাহার আসিয়া কাজ নাই, কুন্দনন্দিনী চিরদিন কল্পনার সামগ্রী হইয়াই বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিরাজ করুক। যত দিন না বঙ্গদেশের বিবাহপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তত দিন প্রেমের স্থান মাজাঘসা ভক্তি দ্বারাই অধিকৃত হইয়া থাকুক। বঙ্গনারী পতিভক্তিই শিক্ষা করুন। এখন আমরা তাহার কার্য্যে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না, কেননা আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, যদি বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গনারীর হৃদয় হইতে পতিভক্তি কাড়িয়া লই, তাহা হইলে অভাগিনীর হৃদয় শূন্য হইবে, সংসার ও সমাজের তাহাতে ক্ষতি বই মঙ্গল হইবে না। বঙ্গনারীর এই শোচনীয় অবস্থার সময়ে পতিভক্তিই তাহার একমাত্র সম্বল ও আরামস্থল। ইহা যিনি তাহার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবেন, আমরা তাঁহাকে নারীকুলের পরম শত্রু জ্ঞান করিব। আগে রমণীকুলের উন্নতি হউক, আগে তাহাদের কদর্য্য বিবাহ-

প্রণালী পরিবর্ত্তিত হউক্, আগে তাহারা মনের মত স্বামি-বরণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হউক্, তবে তাহাদিগকে প্রেমশিক্ষা প্রদান করিতে হয়, করিও।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ পাকড়াসী।

নিন্দুকগণের পৈশাচিক আমোদ।

"Do not be hasty in coming to conclusions. Young men generally err more by being precipitate, than from want of judgment. If they will only give themselves time to weigh the matter, their conclusions will usually be correct."

Todd's Mannual.

অর্থ বল, সামর্থ্য বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, মিষ্ট কবিতাই বল, আর সুমধুর সংগীতই বল, মানুষের মন কিছুতেই তত আকৃষ্ট হয় না, যেমন হয় পরনিন্দায় ও পরচর্চ্চায়। শিকার দেখিলেই ব্যাঘ্র যেমন দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া ঝটিতি তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে, নিন্দুকগণও তেমনি যে—সে একটা কিছু বিষয় পাইলেই অমনি আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরে এবং অসূয়া-রূপ তীক্ষ্ণ দন্তপাতি বাহির করিয়া সমালোচনা-স্থলে তাহার বুকের শোণিত-পানে প্রবৃত্ত হয়। খাদ্য দ্রব্য পাইলে কাক-গুলা যেমন, মনুষ্যের ভয়ে, কোন নিভৃত স্থানে উড়িয়া যায় এবং দশ জনে মিলিয়া কাড়াকাড়ি করিতে থাকে, নিন্দুকগণও তেমনি প্রকৃত হৃদয়বান্ মনুষ্যের সাক্ষাতে কোন কথার উল্লেখ না করিয়া, শিকার লইয়া অন্তরালে গমনকরে এবং এক এক বার পশ্চাতে যায় ও এক এক বার ঠোকর মারিয়া তাহার নাড়ী-ভুঁড়ী-ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। নিন্দুকগণ বকগণের মাতৃ-স্বস্-পুত্র। হে বকরূপী নিন্দুক! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তোমার মুখশ্রী বেশ তো সুন্দর, বাক্যালাপ বেশ তো সুমধুর, কিন্তু হৃদয়ে অত হলাহল কেন? আমার ন্যায় ক্ষুদ্রমতি জীব তোমার তত্ত্ব কি বুঝিবে? তোমাকে আজিও আমি চিনিতে পারিলাম না। দেখিতেছি, আমার ন্যায় কত ক্ষুদ্রমতি ব্যক্তি চন্দনতরু-ভ্রমে বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, কুসুমহারজ্ঞানে আশীবিষগুলিকে গলায় জড়াইতেছে এবং অমরসেবিত সুধাভ্রমে তোমার বাক্যালাপরূপ হলাহল পান করিতেছে। তোমার ঐ কুন্দবিনিন্দিত দন্ত-গুলিতে কি ভয়ানক বিষ! তুমি দংশন করিয়া হৃষ্টচিত্তে হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতে থাক, কিন্তু দষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে জীবন্মৃত হইয়া বিষের জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে। অয়োবিনির্ম্মিত তোমার অন্তর; দয়ার তো

কথাই নাই, কৃতজ্ঞতার একবিন্দু বারিও তথায় স্থান প্রাপ্ত হয় না। তুমি ভীষক্-কুলতিলক মানবহিতৈষী মহাত্মা হানিমানকে স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলে, কবিবর শেলীকে উন্মাদ-গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলে এবং রাজা রামমোহন রায়কে অপদস্থ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছিলে। তোমাদের হস্তে পড়িয়া রামময়-জীবিতা সরলা সীতাকে কি যন্ত্রণাই না সহ্য করিতে হইয়াছিল। আর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সত্যানন্দ যে প্রাগুক্ত মহাত্মগণের বামচরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখাগ্রও স্পর্শ করিবার যোগ্য নহে, হে নিন্দুক! তুমি তাহাকেও যম-মন্দিরে পাঠাইবার উদ্যোগ দেখিয়াছিলে। ধন্য তোমার ক্ষমতা!

সজ্জনগণের সরলতাপূর্ণ সত্যময় বাক্য হইতে, হে নিন্দুক! তুমি যেরূপ অলৌকিক অতিবুদ্ধিবলে কূট ভাব সকল অবলীলাক্রমে টানিয়া বাহির করিয়া আন, তাহা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি ও বার বার তোমার অসামান্য ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি। তোমার তর্কশক্তি কি তীক্ষ্ণ! সজ্জনগণের নির্ম্মল চরিত্র তদুপরি পড়িবামাত্র অচিরে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। তোমাদের অত্যাশ্চর্য্য কল্পনাশক্তি ও কবি-সুলভ যুক্তিপ্রণালী দেখিয়া তোমাকে আমার কখন কখন কবি বলিয়া ভ্রম হয়। তোমার অভিজ্ঞতা ও কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া কখন কখন তোমাকে চানক্য বলিয়া মনে হয় ও তোমার অসামান্য দূরদর্শিতার বিষয় স্মরণ করিলে তোমাকে বিষমার্ক বা ডিস্‌রেলী বলিয়া অভিবাদন করিবার বাসনা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইয়া মদীয় চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। সত্য করিয়া বল, তুমি কি? তুমি কবি নও, কেননা তোমার কল্পনা-বিজৃম্ভিত শ্লেষ-পূর্ণ কবিতাগুলি উদারহৃদয় মহাত্মগণের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে সাহস করে না। তোমার কল্পনা যুক্তি অন্তরের চতুঃসীমার মধ্যেই সংবদ্ধ থাকে। তুমি রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিতও নও; কেননা, চানক্যের ন্যায় তুমি চন্দ্রগুপ্ত-সম কোন সজীব রাজাকেই করধৃত পুত্তলিকাবৎ ইচ্ছামত উঠাইতে, বসাইতে, হাসাইতে বা কাঁদাইতে পার না। তোমার যাহা কিছু প্রকোপ তাস ও দাবার নির্জ্জীব রাজা উজীরের উপর ও সত্যানন্দের ন্যায় বে রঙ্গের গোলাম বা দাবার বা দাবার বড়ের প্রতি। তবে তোমার দূরদর্শিতাকে অবশ্য আমি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিব। তুমি সুদূরস্থিত—শকুনী গৃধিনীর ন্যায় কল্পনার অনুচ্চ গগন-মার্গে বিচরণ করিতে করিতে শিকার সুস্পষ্ট দেখিতে পাও এবং শ্মশানক্ষেত্র হইতে তোমার ভক্ষ্য অনায়াসে চাহিয়া লইতে পার। সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি এরূপ দূরদৃষ্টি কাহার কাছে শিখিলে? শকুনীগণ কি তোমার উপদেষ্টা? শ্মশান কি তোমার বিহারী ক্ষেত্র?

আমার অল্প অল্প মনে পড়ে বাল্যকালে যখন আমরা "কানা মাছি" খেলিতাম, এক জনের চক্ষু দুইটীর উপর বস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইত ও আর দশ জনে তাহার মাথায় অবিশ্রান্তে কিল মারিত। বেচারী কাহাকেও ধরিতে না পারিয়া কষ্টে সারা হইয়া যাইত,

কিন্তু আর আর সকলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া টপাটপ তাহার মাথায় ঠোকর মারিতে থাকিত। বাল্যকালে যাহা দেখিয়াছিলাম, এখন বড় হইয়া তাহাই দেখিতেছি। দেখিতেছি, পৃথিবীর সকল স্থানেই নিন্দুকগণ এক এক জনের চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া সেই রূপ "কানা মাছী" খেলিতেছে। তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তকগুলিতে বালকগণের ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র কিলগুলি পড়িত, এখন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হৃদয়ে ষণ্ডামার্কগণের প্রকাণ্ড হস্তের প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাতগুলি কে জানে কোথা হইতে অবিশ্রান্ত পড়িতেছে। মহিলারাও অন্তঃপুর হইতে এখেলায় যোগ দিতেছেন। ক্রীড়ায় তাঁহারাও সুদক্ষা। পুরুষদিগের অপেক্ষা দেখিতেছি, অনেক স্থলে তাঁহারাই অধিক কৃতকার্য্য হইতেছেন। এখেলায় যে কি বাহাদুরী আছে, হে নিন্দাপ্রিয় নর নারীগণ! তোমরাই তা বেশ জান। বেচারীর চক্ষের কাপড় খুলিয়া দাও, সে দেখুক কে তাহার হৃদয়ে আঘাত করে। যদি সে প্রতিকার করিতে পারে করুক না কেন? যদি সে আত্মরক্ষণে সমর্থ হয় হউক না কেন? অন্ধীকৃত বেচারীর বক্ষে দশ জনে মিলিত হইয়া এইরূপ মুষ্ট্যাঘাত বা সপাদুকা পদাঘাত করা কি নির্দ্দয় ও পাষাণহৃদয়ের কার্য্য নহে? এ কি ধর্ম্মসংগত না ন্যায়ানুমোদিত? এ পৈশাচিক কার্য্যে তোমরা আমোদিত হইতেছ সত্য, শশিমুখে মধুর হাসি হাসিয়া বন্ধুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছ সত্য, কিন্তু এক জনের হৃদয় যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না? তাহা দেখিবে কেন? তাহা দেখিলে আর তোমাদের আমোদ হয় কৈ? বুঝিতাম তোমাদের পুরুষত্ব, বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব, হে কাপুরুষগণ! যদি তোমরা তাহার চক্ষু হইতে বস্ত্র সরাইয়া দিয়া এইরূপ পৈশাচিক খেলায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতে? বলিতে কি পার, প্রকাশ্যে, এরূপ খেলা খেলিতে তোমাদের ভয় হয় কেন? আমি বুঝিতে পারি না, এরূপ মতি তোমাদের কেন হইল?

বাল্যকালে পিতামহীর নিকট গল্প শুনিতাম, প্রাচীন কালে কোন কোন দেশের রাজারা, এক জন অপরাধ করিলে তাহাকে কিছু না বলিয়া তাহার স্থানে অন্য এক নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে শূলে চড়াইয়া দিত; তার না হইত কোন বিচার, না হইত অনুসন্ধান, না হইত মাথা মুণ্ডু, না হইত পিণ্ডী শ্রাদ্ধ। রাম ঘর চাপা পড়িলে বেচারী কুম্ভকার-শ্যামকে শূলে যাইতে হইত। জিজ্ঞাসা করি, হে নিন্দুকগণ! সত্য করিয়া বল দেখি, তোমরাই কি সেই সকল রাজবপু পরিত্যাগ করিয়া কলিযুগে নিন্দুকদেহ ধারণ করিয়াছ? পূর্ব্ব জন্মের সূক্ষ্ম বিচারপ্রণালী, হে রাজন্! আজিও কি বিস্মৃত হইতে পার নাই, নহিলে শত শত নিরপরাধী ব্যক্তিকে তোমাদের ঘরগড়া-বিচার ও মনগড়া প্রমাণে বিন্ধিয়া প্রতিনিয়ত শূলে চড়াইবার উদ্যোগ দেখিতেছ কেন? একটা বড় অশুভ সমাচার আজি আমি তোমাদিগকে শুনাইব। এজগতে যাহা করিতে পার কর, কিন্তু পরজগতে আর তোমাদের হাত নাই। আমি ভাবিতেছি, সেখানে তোমরা কি লইয়া আমোদ করিবে? আমোদ? হা! কি বলিতেছি? সেখানে

দেখিবে যাহার বক্ষে পদাঘাত করিয়া যাহাকে কৃমিময়-নরক-বাসের ব্যবস্থা দিয়াছিলে, সেই এখন অনাবৃত হৃদয়ে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিতেছে "বড় দুঃখ ছিল, চর্ম্মাবৃত হৃদয় পূর্ব্বজন্মে চিরিয়া দেখাইতে পারি নাই। এ লোকে হৃদয়ের কোনরূপই আবরণ নাই, দেখ ভাই, দেখ এবং দেখিয়া বল এ হৃদয়ে কয়টী কলঙ্করেখা —ভুরপনেয় কয়টী কলঙ্ক রেখা—বর্ত্তমান রহিয়াছে? কেন ভাই আমাকে নারকী ভাবিয়া ত্যাগ করিয়াছিলে? এস আজি দুই বক্ষ একত্রিত করিয়া, পূর্ব্ব জন্মের সকল কথা ভুলিয়া যাই।" তখন তোমাদের ভ্রমশূন্য হৃদয়ে যে কি তুমুল ঝটিকাই বহিতে থাকিবে কল্পনাতেও এখন তাহা আনিতে পারি না। যখন এক একটা অত্যাচারের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইবে, তৎক্ষণাৎ শত শত বৃশ্চিক যেন এক সঙ্গে দংশন করিতে থাকিবে—অত্যাচারিত ভ্রাতার কলঙ্করেখা-পরিশূন্য পবিত্র-হৃদয় পানে যত বার দৃষ্টি পড়িবে চক্ষু ফাটিয়া তপ্ত বারিধারা তত বারই তোমাদের গণ্ডদেশ প্লাবিত করিবে। যেখানে কপটতা নাই, অত্যাচার নাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের বিনিময়ে নিষ্ঠুর পদাঘাত নাই দুর্ব্বলের উপর প্রবলের পীড়ন নাই, হে নিন্দুক! তোমারও সেখানে কোন ক্ষমতা নাই। এই এক আশা, এই একমাত্র ভরসা। সত্যানন্দ এই আশায় জীবিত থাকিবে, সংসার-ক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ করিবে ও প্রভু পরমেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত পদাঘাত হেলায় সহ্য করিতে শিখিবে।

সত্যানন্দ।

ম্যাট্‌সিনির সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কার্বোন্যারিযম্ নামক গুপ্তসভার প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ১৮২১ খৃঃ একদা জেনোয়া নগরে পরিভ্রমণ করিবার সময়ে কতকগুলি পীড্‌মণ্টিস্ বিদ্রোহীদিগের সহিত ম্যাট্‌সিনির সাক্ষাৎ হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি গোপনে সাম্য ও সাধারণ তন্ত্র প্রণালীর শিক্ষাকে জীবনের সার ভূষণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা মাতা সর্ব্বদাই দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেন, ম্যাটসিনির অন্তরেও সেই ভাব ক্রমে ক্রমে স্ফুরণপ্রাপ্ত হয়। যে দিন বিদ্রোহীদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে এই কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হইল, ইটালীবাসী সর্ব্বসাধারণ মিলিত হইয়া চেষ্টা করিলে কি ইটালীর উদ্ধার-সাধন সম্ভবপর নহে? সম্ভবপর হউক বা না হউক

সকলে মিলিত হইয়া চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।* তাঁহার বয়স যখন শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে এই জটিল প্রশ্নটী তাঁহার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ করিবার সময় তিনি এই একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, চিন্তা করিবার সময় এই একই বিষয় চিন্তা করিতেন, লিখিবার সময় এই একই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। সংক্ষেপে অই চিন্তায় তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। পিডমণ্টিস বিদ্রোহে কেন সুফল ফলিল না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে তাঁহার অনেক সময় গত হয়। সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, সকলে যদি প্রাণপণে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে কখনও এ বিদ্রোহ অকৃতকার্য্য হইত না। ইহাতে তিনি আরো মর্ম্মাহত হইলেন। কি করিলে ইটালীর জনসাধারণ স্বদেশ উদ্ধারের জন্য একত্রিত হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার শরীর মন জর্জ্জরিত হইল। এই সময় সৌভাগ্যবশতঃ রফিণি নামক ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তাহাদের সহিত অধিক সময়েই ধর্ম্মসম্বন্ধে, এবং কি উপায়ে ইটালীর পুনরুদ্ধারকার্য্য সাধিত হইবে, এই সম্বন্ধে আলোচনা প্রভৃতিতে কিয়দ্দিবস সুখে অতিবাহিত করেন। ক্রমে আরো কয়েকটী যুবক তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে মিলিত হইলেন। তাঁহারা ম্যাট্‌সিনির হৃদয়ে একটু শান্তি আনায়ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেন। এই সময় হইতে স্বদেশের দুঃখ দেখিয়া তিনি শোকবস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় যে সকল বন্ধু ম্যাট্‌সিনির সহিত স্বদেশ উদ্ধারের জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সময়ে পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হন; মাত্র একজন বন্ধু জীবনের শেষ পর্য্যন্ত দেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এই সময়ে তিনি বিবিধ পত্রিকায় স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রবন্ধ সকল এত চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ যে ম্যাট্‌সিনির জীবনচরিত লিখিতে যাইয়া সে সকলের উল্লেখ না করিলে, জীবনের কিছুই ব্যক্ত করা হয় না। ম্যাট্‌সিনি বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট জীবনে যে সকল উপদেশপূর্ণ পত্রাদি লিখিতেন, সংবাদপত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং পুস্তকাকারে যাহা প্রকাশ করিতেন, তাহাই তাঁহার জীবন, তাহাই তাঁহার সকল। ম্যাট্‌সিনি স্বাধীনতাকে কিপ্রকার আদর করিতেন, কিপ্রকার ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন, জনসাধারণের প্রতি কিপ্রকার গভীর ভালবাসা তাঁহার অন্তরকে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল রাখিত, এ সকল তদীয় প্রবন্ধাদি পাঠ ভিন্ন কোন মতেই জানা যায় না। তিনি স্বয়ং এ সম্বন্ধে বলিয়া

* "That day was the first in which a confused idea presented to my mind—I will not say of country or of liberty—but an idea that we Italians *could* and therefore *ought* to struggle for the liberty of our country."

গিয়াছেন আমার সাধারণ জীবনী আমার লেখার মধ্যেই সংগৃহীত রহিয়াছে, ইত্যাদি।* কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ম্যাট্‌সিনির সংক্ষিপ্ত জীবনীতে মূলতঃ তাহার কিছুই প্রকাশ করিতে পারিব না। এই সময়ে পন্থিনীয়ার দ্বারা প্রকাশিত জেনোয়ার ইণ্ডিকেটোর নামক পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় অতি অল্প কাল মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের আদেশে উক্ত পত্রিকার প্রচার রহিত হইল। স্বাধীনতা অভ্যুদয়ের সর্ব্বপ্রথম সোপান জাতীয় ভাষার উন্নতি, এই ভাষার স্বাধীনতা না থাকিলে জাতিসাধারণের অন্তরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রতি এক অভূতপূর্ব্ব বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, ইহা ম্যাটসিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে ইণ্ডিকেটোর পত্রিকার প্রচার রহিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে ম্যাট্‌সিনি এবং তদীয় বন্ধুবর্গের উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি হইল। তাঁহার লেখনীর নবোৎসাহপূর্ণ প্রবন্ধ সকল প্রচারিত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। এই সময়ে গোয়েরাট্‌সি নামক জনৈক সুবিখ্যাত নাটককারের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। তিনি [illegible] আর কয়েকটী বন্ধু ম্যাট্‌সিনির সহিত একত্রিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে লেগহারণে তাঁহারা পুনঃ ইণ্ডিকেটোর প্রচার করিবেন। ম্যাট্‌সিনি, গোয়েরাট্‌সি, এবং কালোবিনি এই পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প কাল মধ্যে তাঁহাদিগের রাজবিরোধী ভাব অভ্রান্ত রূপে পরিব্যক্ত হইল। ইঁহাদিগের উৎসাহপূর্ণ জ্বলন্ত লেখনীর ভাবে নিদ্রাভিভূত টসকান গবর্ণমেণ্টের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ; এবং এ পত্রিকার প্রচারও রহিত হইয়া গেল। এই পত্রিকার প্রচার স্থগিত হওয়ায় ইটালীর ভাবী মঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত হইল। ইতিপূর্ব্বেই ম্যাট্‌সিনির লেখায় ইটালীবাসীর হৃদয়ের তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল, এই পত্রিকার প্রচার রহিত হওয়ায় সকলে আরো বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইল। সর্ব্বসাধারণে উত্তম রূপে বুঝিতে পারিল যে, গবর্ণমেণ্ট সকলপ্রকার জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সুতরাং তাহার উচ্ছেদ ভিন্ন উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই এবং ইটালীর আর মঙ্গল নাই। সকলের হৃদয়তন্ত্রী এই প্রকারে এক তানে বাজিয়া উঠিল। এই সময়ে কার্ব্বোন্যারিজম নামক গুপ্ত সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ম্যাট্‌সিনির একান্ত ইচ্ছা জন্মিল। এই সম্প্রদায়ের সহিত ম্যাট্‌সিনির অনেক বিষয়ের মিল ছিল না, কিন্তু স্বদেশের উদ্ধারের জন্য অন্য কোনপ্রকার সভা সংস্থাপন করাও তখন ম্যাটসিনি অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাতে যোগ দিলেন। এই সম্প্রদায়ের শত শত দোষের মধ্যে বিশেষ গুণ এই ছিল যে, নির্ব্বাসন বা প্রাণদণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিয়া কেহ কখন ইহাদিগকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। ইহাদের আর একটী

* "What public life I have had is all summed up and contained in my writings, and how far those writings may have influenced present events, is a question to be judged by the public, not by me."

বিশেষ গুণ এই ছিল যে, অধ্যবসায়কে জীবনের সার লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত ইহারা ছিন্ন জালকে নূতন করিয়া প্রস্তুত করিত। ম্যাট্‌সিনি আপনি বলিয়াছেন যে,এইগুণে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি এই সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইলেন। রায় মন্‌ডো ডোরিয়ার দ্বারা যখন তিনি দীক্ষিত হইলেন, তখন তিনি যে সকল প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হইলেন, তাহার কোনটীরই গূঢ় অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। আদেশমাত্র কার্য্য করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হইবে। কাহার আদেশ পালন করিতে হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য, কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এবং উন্মুলিত করিয়া কিপ্রকার শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিতে হইবে,এসকল বিষয়ে কোন উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। যাহা হউক এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সভ্যকে দীক্ষাকালে কুড়ি ফ্রাঙ্ক এবং মাসে পাঁচ ফ্রাঙ্ক (দুই টাকার কিছু অধিক) করিয়া চাঁদা দিতে হইত। ম্যাট্‌সিনির পক্ষে এই ব্যয়ভার বহনকরা অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও তিনি আহ্লাদের সহিত ইহা প্রদান করিতেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"মন্দ উদ্দেশ্যে পরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা পাপ বটে, কিন্তু যে কার্য্যে একটী মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ কার্য্যে অর্থ দান করিতে সঙ্কুচিত হওয়া আরো পাপের কার্য্য। সাধারণ লোকের বর্ত্তমান সময়ে এই একটী বিষম রোগ যে, তাঁহারা সৎকার্য্যে একটী পয়সা দিবার সময় শত শত তর্ক উপস্থিত করিবে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বিলাসের সেবা করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইতে একটুও কুণ্ঠিত হইবে না। দেশের উন্নতির জন্য, স্বাধীনতার জন্য যাঁহাদের শরীরের রক্ত অম্লানবদনে পাত করা উচিত,তাঁহারা কিনা সামান্য স্বার্থ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিবেন না! তাহার পরিবর্ত্তে বরং মান সংভ্রম এবং জীবন পর্য্যন্ত বিপদরাশিতে নিমগ্ন করিবেন, স্বদেশীয়গণের—ভ্রাতৃগণের আত্মাকে দাসত্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন, তবুও কোষ ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন না।" *

কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ম্যাট্‌সিনি এই সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকার পাইলেন,

---

*"It is a great sin to collect money for any bad purpose; but it is a still greater sin to recoil from pecuniary sacrifice when the probabilities are in favour of thereby aiding a good cause. One of the saddest signs of the all pervading deep-rooted egotism of the present day is the fact that men will argue and discuss about a franc, while they willingly throw away large sums to procure comforts or enjoyments—for the most part rather imaginary than real,—that men who should be ready to coin their very blood to create a country, and found true liberty, will bewail the impossibility of frequent sacrifice, and peril life, honour, the dignity of their own souls, and the souls of their brother men, rather than unloosen the strings of their purse."

এক্ষণ হইতে তিনি স্বয়ং অন্যকে দীক্ষিত করিবার অধিকারী হইলেন। কিন্তু এই সম্প্রদায় দ্বারা কোনপ্রকার কার্য্য হইতেছে, তাহার এ বিশ্বাস আদৌ জন্মিল না। যাহা হউক তিনি প্রকাশ্য-বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন না এবং মনে মনে ভাবিলেন যে কালক্রমে মদীয়-মতাবলম্বীর সংখ্যা এত অধিক হইতে পারে, যে তখন অনায়াসে একটী নূতন সমাজ স্থাপনে কৃতকার্য্য হইবেন। এই সময়ে ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রিদলের অধিনায়ক গিজো, লাফেট্টি ও বার্থ প্রভৃতি দশম চার্লসের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ইহাদিগের সহিত কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। ইহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই সম্প্রদায়দলের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সঙ্কল্প করিয়া ম্যাট্‌সিনিকে সভ্য-সংগ্রহার্থ টস্‌কানীতে প্রেরণ করেন। এই স্থানে কার্লোবিনি নামক জনৈক উদার ও পবিত্রচেতা বুদ্ধিমান্ যুবক ম্যাট্‌সিনির বিশেষ সাহায্য করেন। বিনি ও ম্যাট্‌সিনির ন্যায় এই সম্প্রদায়ের সঙ্কেতাদির প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। এই সময়ে কোন সাহসিক সৈনিক পুরুষের গুণ গান করার অপরাধে গোয়েরাটসি টস্‌কানীর নিকটবর্ত্তী মণ্টিজনসিয়ানো নগরে কারারুদ্ধ ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি এবং বিনি উভয়ে মিলিত হইয়া গোয়েরাটসির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেশের গবর্ণমেণ্টের এই ভয়ানক অত্যাচারেও ভীত না হইয়া গোয়েরাটসি কারাগারে বসিয়াই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। গোয়েরাটসির লেখনী অত্যন্ত তেজস্বিনী; কিন্তু কি উপায়ে ভাবী উন্নতি হইবে, তিনি এবিষয়ে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন না। ম্যাট্‌সিনি গোয়েরাট্‌সির মনকে সুস্থ করিবার জন্য ঐতিহাসিক দার্শনিক গিজো ও কুজিনের উপদেশ সকলের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "উন্নতিই মানবজাতির ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রধান প্রসাদ, ঈশ্বরের দুর্লঙ্ঘ্য বিধি। এই বিধির অনুসরণেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হইয়া থাকে।" ঈশ্বরের কথা শুনিয়া গোয়েরাটসি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না; ইহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ম্যাট্‌সিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং ভাবিলেন, গোয়েরাটসির সহিত তাঁহার হৃদ্যতার স্থায়িত্বের কোন সম্ভাবনা নাই; ইহা ভাবিয়া ম্যাট্‌সিনি জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইলেন। তিনি জেনোয়ায় আসিয়া দেখিলেন তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার দীক্ষাগুরু ডোরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, এবং সম্প্রদায়ের লোকেরাও ডোরিয়ার উপর বিরক্ত। এই সময় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ফরাশি বিপ্লব উপস্থিত হইল, এবং সম্প্রদায়ের সকল সভ্যেরা সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উৎসুক হইল। ম্যাট্‌সিনি এই সময়ে সেভয়বাসী কটিন নামক জনৈক সভ্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিবার জন্য লায়নরুন নামক হোটেলে যাইবার আদেশ পাইয়া তথায় গমন করিলেন। যাইবার সময়ে তাঁহার মনে দৈবশক্তিবলে কোন ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা উপস্থিত হইল, এবং তিনি তদীয় কোন কোন বন্ধুর নিকটে লিখিলেন যে, যদি আমার কারাবাসের আজ্ঞা হয়, তবে

জননীর যেন কোন কষ্ট না হয়। বাস্তবিকও তাহাই হইল। কটিনকে যখন তিনি দীক্ষিত করেন, সেই সময়ে কোন মুক্ত জানালা দিয়া পুলিসের গুপ্তচর ম্যাট্‌সিনির কার্য্য দেখিয়া গেল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই তিনি পুলিসের হস্তে পতিত হইলেন। পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবার সময়ে তাঁহার প্রতি অনেকগুলি অভিযোগ ছিল:— প্রথমতঃ গুলী প্রস্তুত করণ, দ্বিতীয়তঃ বিনির নিকট হইতে সাঙ্কেতিক পত্র প্রাপ্তি, তৃতীয়তঃ ত্রিবর্ণ কাগজে জুলাই মাসের তিন দিবসের ইতিহাস লেখন, চতুর্থতঃ কটিনকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করণকালে মন্ত্রোচ্চারণ, পঞ্চমতঃ অসিপউযষ্টি ব্যবহার করণ। বিপদের সময়ে কিপ্রকার শান্ত ভাবে থাকিয়া বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হয়, এ শিক্ষাই ম্যাট্‌সিনির জীবনের ভূষণ; যে সকল বিপদে অন্য ব্যক্তিকে একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত, সে সকল বিপদকে ম্যাটসিনি নির্ভয়ে সামান্য বিপদের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। স্বীয় স্থৈর্য্যগুণে তিনি পুলিসের সময়, অভিযোগের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইলেন; কিন্তু তত্রাচ পুনঃ পরীক্ষার্থ তিনি পিয়াটল 'বিজেন্সোর শিবিরে নীত হইলেন। সেখানে একজন প্রাচীন কামিশনর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন আর কোন প্রকারে ম্যাট্‌সিনিকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না, তখন কমিশনর ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন—"তোমার সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। তুমি অমুক দিন, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে কটিনকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিয়াছ।" একথা শুনিয়া ম্যাট্‌সিনির শরীর রোমাঞ্চিত হইল; কিন্তু তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন—"কল্পনাপ্রসূত মিথ্যাপবাদ প্রমাণের চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। আচ্ছা, আপনার কথা যদি সত্য হয়, তবে উক্ত কটিনকে আমার নিকটে উপস্থিত করুন।" কমিশনর তাহা করিলেন না, কারণ কটিন যখন বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করেন,তখন গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিজ্ঞায় তাঁহার নিকটে আবদ্ধ হন যে, তাঁহাকে কখনও ম্যাট্‌সিনির সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে না।" ম্যাটসিনি কিছু দিন সেই শিবিরেই আবদ্ধ অবস্থায় সৈনিকদিগের রহস্য এবং ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া রহিলেন। শিবিরে অবস্থানকালে প্রত্যহই গৃহ হইতে আহারের দ্রব্যাদি আসিত। তাঁহার জননী এক দিন উহার সহিত একটী পেন্সিল লুকাইয়া দিয়াছিলেন। তদ্দারা ম্যাট্‌সিনি আপন মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইতেন। এই প্রকারে তিনি এমন কতকগুলি কাগজ ধ্বংস করিয়া ফেলিতে উপদেশ দিলেন, তাহা প্রকাশিত হইলে সম্প্রদায়ের অনেক সভ্যের প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন বা কারারোধ হইত। এই সময়ে প্যাসালো, মরেলি, ডোরিয়া নামক আরও কতিপয় সভ্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন, ম্যাট্‌সিনি সংবাদ পাইলেন।

এক দিন ম্যাট্‌সিনির পিতা, পুত্রের কারাবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে উপস্থিত হইয়া গবর্ণরকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'তোমার পুত্র অত্যন্ত প্রতিভাশালী এবং চিন্তাশীল, এবং সর্ব্বদাই রজনীতে নির্জ্জন প্রদেশে ভ্রমণ করে; ইহার কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না। গবর্ণমেণ্ট এপ্রকার প্রতিভাশালী যুবকবৃন্দের মনের ভাব না জানিতে পারিলে কখনই স্থির থাকিতে পারে না। পিতা কি করিবেন, ইহা শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন।" এক দিন রজনীতে ম্যাট্‌সিনি শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ দুই জন সৈনিক আসিয়া বলিল,—"তোমাকে এখনই যাইতে হইবে, বস্ত্রাদি সঙ্গে করিয়া আমাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হও।" ম্যাট্‌সিনি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যইব।" তাহারা বলিল, "সে বিষয়ের উত্তর পাইবে না, চল।" ম্যাট্‌সিনি মাতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, পরদিন জননী যখন আমার নিরুদ্দেশের কথা শুনিবেন, তখন তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িবেন; এইজন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জননীর নিকটে পত্র না লিখিয়া কখনই যাইবেন না। সৈনিকেরা অবশেষে পরামর্শ করিয়া পত্র লিখিতে দিতে সম্মত হইল। ম্যাট সিনি সংক্ষেপে জননীর নিকটে লিখিলেন—"আমি স্থানান্তরে যাইতেছি বটে, কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই।" এই কয়েকটী কথা লিখিয়া তিনি সৈনিকপশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। শিবিরের দ্বারে তাঁহার জন্য একখানি সিডান চেয়ার প্রস্তুত ছিল। আদেশক্রমে ম্যাট্‌সিনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই সৈনিকেরা ইহা অবরুদ্ধ করিল। এই সময়ে হঠাৎ অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। নিমেষমধ্যে অশ্ব নিকটবর্ত্তী হইলে ম্যাট্‌সিনি শুনিলেন,—তাঁহার পিতা আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিবার জন্য আসিয়াছেন। ম্যাটসিনির পিতা সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সৈনিকেরা নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে দূর করিয়া দিতে প্রস্তুত হইল, এবং ম্যাট্‌সিনি পাছে পিতার করস্পর্শজনিত সুখ ভোগ করেন, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সিডান চেয়ার হইতে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক বন্দি-শকটে তুলিয়া শকট ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে সেণ্ট আণ্ডিয়া কারাগারের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সেই কারাগার হইতে আর একটী বন্দী শকটে আনীত হইলে শকট পুনঃ চলিতে লাগিল। নবাগত বন্দীর নয়ন আবৃত থাকিলেও ম্যাট্‌সিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; তাঁহার নাম ল্যাসানো। বন্দি-শকট সেভোনার দুর্গসমীপে উপস্থিত হইল। ম্যাট্‌সিনিকে অন্য বন্দীর সহিত পৃথক করিয়া একটী অন্ধকারময় গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। দুর্গের গবর্ণর ফডিমেরি আসিয়া ম্যাট সিনিকে অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন,—বলিলেন,—"তুমি অনেক রজনী গুপ্ত সভায় জাগরণে অতিবাহিত করিয়াছ, চিন্তায় ও অনিদ্রায় তোমার শরীর এমন ক্লান্ত হইয়াছে, এখন এই নির্জ্জন প্রদেশে বিশ্রাম লাভ করিয়া সুস্থ হও।" ম্যাট্‌সিনি তাঁহার নিকটে একটি চুরট পাইতে প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জেনোয়ার গবর্ণরের নিকটে অনুমতি চাহিব; তাঁহার অনুমতি পাইলে আমার দিতে কোন আপত্তি নাই। ম্যাট্‌সিনির জীবনে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, পিতা মাতার অঞ্চল হইতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করা হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার চক্ষু হইতে এপর্য্যন্ত জল নির্গত হয় নাই; কিন্তু আজ এই সামান্য ঘটনাতে তাঁহার

হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এমন পাষণ্ড-দিগের হস্তে পড়িয়াছেন স্মরণ করিয়া নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই দুর্গের উপরে ছোট একটী গৃহে তিনি নীত হইলেন। সেখান হইতে নিম্নে অনন্ত সাগরের লহরীলীলা, এবং ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ম্যাট্‌সিনি এই স্থানে আসিয়া অত্যন্ত শান্তি লাভ করিলেন। যখনই গবাক্ষপথ দিয়া বাহিরে দৃষ্টি করিতেন তখনিই অনন্ত মহান্ ঈশ্বরের দুই নমুনা অনন্ত সাগর ও অনন্ত আকাশ তাঁহার নয়নসমক্ষে পতিত হইত। সে স্থান হইতে মৃত্তিকা দৃষ্ট হইত না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বায়ুপ্রবাহে ধীবরদিগের আনন্দ-গীতি তাঁহার কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিত। এই কারাগারে ম্যাট্‌সিনি একমাত্র কারাসহচর একটী ক্ষুদ্র পাখীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হন। তাঁহার জীবন পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি পশু পক্ষীদিগকে সর্ব্বদাই হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। তাঁহাব জীবনের এই একমাত্র সুখ ছিল। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই কারাবাসে থাকিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন,—বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু পক্ষীদিগের গতি কেহই রোধ করিতে পারিত না; তিনি ইহা-দিগকে লইয়া জীবনের ভালবাসার সুখ সম্ভোগ করিতেন। প্রথম মাসে তিনি কোন পুস্তক প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু পরে ডিমেরীর উত্তরাধিকারী কণ্টানার অনুগ্রহে তিনি একখানি বাইবেল প্রাপ্ত হন। কণ্টানা একজন ইটালীবাসী, তাঁহার মনেও ইটালির উদ্ধারের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কার্ব্বোন্যারিয়াইদের উদ্দেশ্য কেবল লুণ্ঠন, প্রকাশ্যে না বলা ইত্যাদি বলিয়া তাহার ধারণা ছিল, এবং ম্যাট্‌সিনিকে তজ্জন্য তিনি এই অসৎপথ হইতে ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে জেনোয়ার বন্ধুদিগের সাহায্যে ম্যাট্‌সিনি কার্ব্বোন্যারিজম সম্প্র-দায়ে জীবনসঞ্চারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ম্যাট্‌সিনি জননীর নিকটে পত্রাদি লিখিতে অনুমতি পান, কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, গবর্ণর তাঁহার চিঠি পত্র দেখিয়া দিবেন। ম্যাট্‌সিনির জননী দশ দিন অন্তর একখানি পত্র লিখিতেন। ম্যাট্‌সিনির এরূপ সঙ্কেত ছিল যে, তিনি জননীকে যে পত্র লিখিবেন, তাহার একটী অন্তর প্রত্যেক পদের প্রথম অক্ষরগুলি একত্র করিলে যে লাটিন পদগুলি প্রস্তুত হইবে, সেই গুলিই মনোযোগের বিষয়। এই উপায়ে তিনি বন্ধুদিগের নিকট কার্ব্বোন্যারিজম সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিতেন; কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন এত ভীত হইয়াছিল যে, ম্যাট্‌সিনির কথায় কর্ণপাতও করিত না। ম্যাট্‌সিনির মনে ক্রমেই বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে কার্ব্বোন্যারিজম সম্প্রদায় দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা অত্যন্ত অবিবেচকের কার্য্য, ইহা মনে করিয়া তিনি স্থির করিলেন, জীবিত ব্যক্তিদিগকে উত্তেজিত করিয়া নব ভিত্তির উপর নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিলে অধি-কতর মঙ্গল ফল প্রসূত হইবে। এই প্রকারে ম্যাট্‌সিনির মনে এই ক্ষুদ্র গৃহে ইটালীর ভাবী উন্নতির মূলভিত্তি নব্য ইটালী নামক

সমাজ সংস্থাপনের কল্পনা উদিত হইল। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে এই সমাজ সংস্থাপনের বিষয় সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

ভারতের ইতিহাস ও ইংরাজ ঐতিহাসিক সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা।

"Not extenuate or aught set-down in Malice."

যাহা অতীত হইয়াছে তাহা যাহাতে পরিরক্ষিত হয় তাহারই নাম ইতিহাস; এবং তদ্রক্ষণে যিনি চেষ্টিত তাঁহারই নাম ঐতিহাসিক। যথার্থ যাহা ঘটিয়াছে তাহার অক্ষুণ্ণ চিত্র যিনি পরিরক্ষণে প্রয়াসবান্ তিনিই এই মহামন্য নামের যোগ্য; কিন্তু যাঁহারা অতীত ঘটনার কাটছাঁট বাদ দিয়া আপনাদের মনোমত একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া বসেন, তাঁহারা ঐতিহাসিকের মহান্ আসনের অযোগ্য, তাঁহারা ঐতিহাসিক-কুলের কলঙ্ক। ভারতে ব্রিটিস শাসন-কালের ইতিবৃত্ত লিখিতে গিয়া অনেকগুলি ঐতিহাসিক এই কলঙ্কস্পৃষ্ট হইয়াছেন। অদ্য আমরা সংক্ষেপে তাহারই দুই একটি উদাহরণ দিব।

প্রথমতঃ—হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র চিত্রণ। সাধারণতঃ ঐতিহাসিক-বর্গ বলিয়া থাকেন "পৃথিবীতে এমন কোন পাপ কার্য্য নাই যাহা সিরাজউদ্দৌলার পরিদৃষ্ট হয় নাই। সংক্ষেপতঃ সিরাজ একটি নররূপী রাক্ষস জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিল।" কিন্তু তাঁহার কতকগুলি অসম্বদ্ধ, অপ্রামাণ্য উপন্যাস ভিন্ন তদীয়-নৃশংসত্বদ্যোতক কোন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ঘটনারই উল্লেখ করিতে পারেন না। সিরাজ যে একজন ভাল লোক নহেন তদ্বিষয়ে কে সন্দেহ করিবে? কিন্তু তিনি নরশোণিতলোলুপ একটি রাক্ষস ছিলেন কি না তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ। মহামান্য ঐতিহাসিক টরেন্স্ সাহেব তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—"তিনি (সিরাজ) অগণ্য পাপে কলঙ্কিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; এবং এ সকলে তাঁহার যে কিছু অংশ ছিল তাহাও সম্ভবপর; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, তাঁহার শত্রুগণের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার দোষসকল প্রমাণীকৃত হয় নাই। তাঁহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে।" (১) সংক্ষেপে আমরা এই হতভাগ্যের জীবনের কএকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া, দেখিব এই দোষরাশি তাঁহার প্রতি কতদূর অর্শে।

(১) Torrens' Empire in Asia. Ch. III. p. 25. উপরে আমরা এই পুস্তকের দুই একটি পংক্তির ভাব সঙ্কলন করিয়া দিলাম। প্রত্যেক ভারতসন্তানের এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য।

উদারচেতা ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন "বাল্যকাল হইতেই সিরাজ-উদ্দৌলা ইংরাজ বণিক্‌দিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন; তবে আলিবর্দ্দি খাঁর রাজ্যকালে কিছু করিতে না পারিয়া "মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য" ফণীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে কালানল বহন করিতে ছিলেন; এবং বৃদ্ধ নবাব সম্মুখ হইতে অপসারিত হইলেই—সামান্য ছুতা ধরিয়া তাহা উদ্গিরণ করিয়া বসিলেন।" সিরাজের বাল্যজীবনের যথার্থ ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত দুরূহ; যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও তদীয় সংহারকগণ কর্ত্তৃক অতি রঞ্জিত। তবে কলিকাতার তাৎকালিক গবর্ণর সাহেব ডিরেক্টরদিগের কোর্টে এক সময়ে একটি ডিসপ্যাচ (Despatch) পাঠান। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে "ফ্রেঞ্চ, ওলন্দাজ এবং ইংরাজ গবর্ণরগণ সিরাজের সহিত হুগলী নগরে সাক্ষাৎ করিলে, শেষোক্ত ব্যক্তি অধিকতর মান্যের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন।" (২) ইহাতে সিরাজের ইংরাজদের প্রতি ঘৃণার কতদূর নিদর্শন আছে, তাহা সেই সত্যবাদী ঐতিহাসিকগণই তাঁহাদের দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন; আমাদের এই চর্ম্মচক্ষু তাহা দেখিতে অক্ষম।

অল্প দিন পরেই আলিবর্দ্দির মৃত্যু হইল, সিরাজ বাঙ্গলা বেহার এবং উড়িষ্যার গদিতে বসিলেন। এই সময়ে ফ্রেঞ্চদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদের সূত্রপাত হওয়াতে শেষোক্ত জাতি কলিকাতার জীর্ণ দুর্গের সংস্কার আরম্ভ করিল। সিরাজের মনে সন্দেহের আবির্ভাব হইল। এ দিকে আবার একজন অপরাধী কর্ম্মচারী দণ্ডের ভয়ে কলিকাতার ইংরাজদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সিরাজ কহিলেন "ইংরাজেরা দুর্গগঠনকার্য্য বন্ধ করুক এবং উপরি-উক্ত অপরাধী কর্ম্মচারীকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করুক।" ইংরাজ গবর্ণর কেবল যে এই দুইটি অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন এমন নহে, নবাব-দূতের যথোচিত অপমান করিলেন। (৩) এই সকল কারণে নবাব ক্রোধ করিয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহার জন্য কোন্ হতভাগ্য মহাপাতকাক্রান্ত তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি।

(২) ঐ ঘটনা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন :—

"We flatter ourselves that the expense we have been at on this occasion has procured you great favour, and will be the means of your honours' business being conducted without any interruption. From the Government for some time to come." Despatch to court, Sept. 18, 1752, par. 3, quoted by "Torrens in his Empire in Asia."

(৩) "The activity then being shown in fortifying Calcutta aroused his suspecions which the explanation that they were intended to keep out the French did not allay. In the midst of this distrust, an officer of rank, who had been detected in malversation, sought and found protection at the English town. Suraj demanded the extradition of the fugitive; the Governor not only refused, but treated his envoy with open contumely."

Torrens' Empire in Asia. III. 27

তৎপর কি হইল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠকমাত্রেরই জানা আছে। এই সময়ে যে সকল ইংরাজকে তিনি বন্দী করেন তাহাদের সকলকেই তিনি অনুগ্রহের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; কেবল অন্ধকূপের ভীষণ হত্যাকাণ্ডে কতকগুলি ইংরাজ হত হন; কিন্তু তজ্জন্য নবাবের ততদূর দোষ দেওয়া যায় না। তদীয় সুপ্তির সময় এই ভীষণ কাণ্ড সাধিত হয়; তাঁহার ইহাতে কিছুমাত্র মত ছিল না। তবে তিনি শেষে অপরাধীর দণ্ড বিধান করেন নাই এই তাঁহার দোষ। তবে ভীষণ গ্লেন্‌কো হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত সুসভ্য ইংরাজ সেনাপতিগণ যদি দণ্ডের যোগ্য না হন, তবে অপেক্ষাকৃত অসভ্য, অশিক্ষিত, বালক সিরাজ কি প্রকারে নরশোণিতলোলুপ রাক্ষস আখ্যা পাইবার যোগ্য হইবেন তাহা আমাদের সামান্য কলুষিত বুদ্ধি বুঝিতে অক্ষম।

সিরাজের দুর্ভাগ্যের বিষয় সবিস্তারে লিখিতে গেলে "পুঁথী বেড়ে যায়।" সংক্ষেপতঃ চতুরচূড়ামণি ক্লাইব কিরূপে কলিকাতা অধিকার করিয়া, সিরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, সিরাজ কিরূপে সন্ধির সরত কার্য্যে পরিণত করেন, ক্লাইব নবাবের অতুল ধনসম্পত্তি উদর-সাৎ করিবার অভিপ্রায়ে চক্রী মিরজাফর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, কি রূপেই বা তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করেন তাহা অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে, সিরাজের পরিবর্ত্তে ইংরাজ বণিক্‌গণই আমাদের নিকট নরশোণিতপিপাসু লুব্ধ রাক্ষস বলিয়া প্রতীয়মান হন। এবিষয়ের অতি-রঞ্জন-শূন্য চিত্র যাঁহারা দেখিতে চান তাঁহারা মিল, টরেন্স প্রভৃতি প্রতিভাশালী ঐতিহাসিকের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

এই সকল ঐতিহাসিক এতৎপ্রদেশে ব্রিটিস-শাসন-বিস্তারের কিরূপ দৃশ্য দিয়াছেন, আমরা দ্বিতীয়তঃ তাহারই আলোচনা করিব। তাঁহারা পাকতঃ বলেন "বঙ্গদেশ দুরাত্মা নবাবের ভীষণ অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দয়ালুহৃদয় ব্রিটিস-সিংহের আশ্রয়ে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।" আমরা দেখিব বঙ্গ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল কি না। হতভাগ্য সিরাজ মিরণপ্রেরিত কৃতান্তের হস্তে হত হইলেন, মিরজাফর তৎসিংহাসনে বসিলেন। আসনপ্রাপ্তির মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে সর্ব্বসমেত ১৩৮৮৭৫০ টাকা বিক্রেতৃগণকে দিতে হইল। রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইয়া আসিল। বৎসর বৎসর রাশি রাশি অর্থ. ইংরাজ বণিক্‌গণকে উৎকোচ দিবার জন্য রাজকোষ হইতে জলের মত বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। রাজার ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্রজাশোষণ দিন দিন অধিকতর হইতে লাগিল। এদিকে ইংরাজগণ দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বিনা শুল্কে কোম্পানির ও কোম্পানীর নামে আপনাদের বাণিজ্যদ্রব্য সকল আমদানী রপ্তানি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপনাদের দ্রব্য বেচিলেন অধিক মূল্যে, হতভাগ্য প্রজাদিগকে বাধ্য করিয়া দেশজাত দ্রব্যজাত কিনিলেন অল্প মূল্যে। বঙ্গ রত্নপ্রসূ হইলেও আর কত সহ্য করিবে?

ক্রমে প্রজাবর্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল, আর অর্থ নাই, কি দিয়া রাজার "দেহি দেহি" শব্দ নিবারণ করিবে। রাজ্যের আয় কমিয়া আসিল, রাজকোষ বস্তুতই শূন্য হইল; মিরজাফার ইংরাজগণকে উৎকোচ দিতে অসমর্থ হইলেন। শিশু যেরূপ পুরাতন ক্রীড়নক ছাড়িয়া আগ্রহের সহিত নূতনকে আলিঙ্গন করে; ইংরাজেরাও সেইরূপ মিরজাফরকে সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মিরকাসীমকে তাঁহার স্থানে বসাইলেন। ইনিও তিনটী চাকলা এবং বিপুল অর্থ ইংরাজগণকে উপহার দিলেন। অর্থগৃধ্নু ইংরাজ মুহূর্ত্ত থামিল, কাসিম মুহূর্ত্ত সুশাসন স্থাপন করিলেন, প্রজাগণ মুহূর্ত্ত হাঁপ ছাড়িল। কিন্তু হতভাগ্য কাসীমের সুশাসন প্রভৃতিই তাঁহার কাল হইল। "দেশে বিনা শুল্কে ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া অন্যায়; অতএব তাহা হইবে না।" তিনি এই মর্ম্মে আদেশ প্রচার করিলেন। ইংরাজগণ তাহা অমান্য করিল এবং কৃতঘ্ন বলিয়া তাঁহার অযশ ঘোষণা করিতে লাগিল। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি একেবারে আমদানী রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইংরাজেরা মহা খাপ্পা। তাঁহারা বলিলেন, বাহবা! এ কিপ্রকার বিচার! অমাদের উপর শুল্ক উঠাও, কিন্তু Native দের উপর উঠান হইবে না; তাহা আবার পুনঃ স্থাপিত কর। (৪) নতুবা "একেবারে যাবে বাছা ডেমার্টিনের বাড়ি।"

হতভাগ্য কাসীম অসম্মত হইয়া "কালাপানি" পার করিলেন। আবার একটি নূতন ক্রীড়নক সৃষ্ট ও গদিতে স্থাপিত হইল। ইংরাজগণ আবার একটি দাঁও মারিলেন। কিছু দিন পরে ইংরাজেরা দেওয়ান হইলেন। অনেক ইংরাজের একরাত্রে "আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হইল।" এই দেখিয়া ইংরাজগণ দলে দলে পঙ্গপালের মত ভারত গগন ছাইয়া ফেলিল। পদ্মার মহানার মত অর্থ ইংলণ্ডের দিকে ছুটিল। এই সময়ে শ্বেত দ্বীপের লোকের মনের ভাব কিরূপ তাহা একজন স্কচমাতার পুত্রের প্রতি বিদায়কালের পরামর্শে প্রকাশ পাইবে। বিদায়কালে মাতা সাশ্রুলোচনে বলিতেছেন "পুত্র, অর্থ উপার্জ্জন করিবে, সৎপথে থাকিয়া পার ভালই; কিন্তু যেরূপে পার অর্থ উপার্জ্জন করিবে।" (৫)

এইরূপ অবিশ্রান্ত শোষণে বঙ্গীয় প্রজাবৃন্দ নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে; যাহা কিছু পুঁজি পাটা ছিল সব ভাঙ্গাইয়া মান বজায় করিয়াছে। যে কয়টা ধান্য ছিল তাহা উদরসাৎ করিয়াছে। এখন উদরের ভরসা জমির উপর। ১৭৬৮ অব্দে শস্য কিছু কম হইয়াছিল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়াছেন, চাল রপ্তানি যেমন পূর্ব্বে ছিল এখনও তেমনি আছে। এবৎসর বর্ষার প্রারম্ভে যেমন বৃষ্টি হওয়া উচিত তেমনি হইয়াছে, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল কই। শেষে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইল, মাটি শুকাইয়া

(৪) Torrens' Empire in Asia. Ch. III. p. 48.

(৫) "Mak' money, my son; honestly if you can, but mak' money."

কাঠ হইল, জমির ধান জমিতেই শুকাইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রজার হৃদয়ের শোণিতও শুকাইল। ভীষণ ৭৬ মন্বন্তরের দৃশ্য অভিনীত হইবে বলিয়া যবনিকা উত্তোলিত হইল। প্রথমে হতভাগ্য প্রজা গবাদি বিক্রয় করিল, লাঙ্গল ফাল বান্ধা দিল, বিচের ধান থাইল। ক্রমে এ সকল ফুরাইলে পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে লাগিল; প্রথমে ক্রেতা পাওয়া গেল না। হতভাগ্যগণ সহস্রে সহস্রে শমন-ভবনে গিয়া ক্ষুধার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। কত লোক মরিল কে তাহার তালিকা করে, কত পশু মরিল কে তাহার গণনা করে, কত অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী অন্তঃপুরে ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করিল, তবু বাহিরে আসিয়া একমুষ্টি অন্নের অন্বেষণ করিল না তাহার কে খবর লইল, কত কুসুমপেলব সোনার পুতুল শিশু নিরবে তাহাদের পার্শ্বে শায়িত হইয়াছে তাহা কে লক্ষ্য করিয়াছে। ক্ষুধায় অস্থির হইয়া হতভাগাগণ দলে দলে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল, সঙ্গে অসংখ্য রোগ লইয়া আসিয়া নগর সকল উৎসন্ন করিল। জীবিতগণ মৃতের মাংস উদরসাৎ করিয়া রাক্ষসের আকার ধারণ করিল। কে কাহার সৎকার করে; যে যেখানে মরিল সে সেই থানেই পড়িয়া রহিল, শৃগাল, কুকুরে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস গেল, ক্রমে শৃগাল কুকুরও পোষ মানিয়া আসিল। সহস্র সহস্র শব ভাগীরথী বহিয়া ইংরাজদিগের বারাণ্ডার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মহামতি সোর সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন "কোনপ্রকার বর্ণনাই এই ঘটনার অতিরঞ্জিত চিত্র হইতে পারে না।" (৬)।

কিন্তু বদান্য ইংরাজ বণিক্‌গণ এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সর্ব্বসমেত ৪০০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন; ইহার কত কর্ম্মচারিগণ অপহরণ করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে। কত জমিদার এই দুর্ভিক্ষে অন্ন বিতরণ করিয়া উচ্ছিন্ন হইয়াছেন, কে তাহার সংবাদ রাখে! কেমন দয়ালুহৃদয় ব্রিটিস-সিংহের রক্ষা দেখিলে?

(৬) "Dire scenes of horror, which
no pen can trace,
Nor rolling years from memory's
page efface."

এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে উপরিধৃত পংক্তিদ্বয় পদ্য হইলেও, যথার্থ ঘটনার অনুযায়ী চিত্র; একথা Hunter সাহেব বলিয়াছেন। Vide Hunter's Annals Rural Bengal.

আমি বিধবা।

সহৃদয় পাঠক! আজি আপনার কাছে মন খুলিয়া আত্মপরিচয় দিতে বসিলাম। আমি বিধবা। এই যে সুখ-দুঃখ-ভোগের আগার-স্বরূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহার দুঃখপূর্ণ অর্দ্ধাংশে আমার এক চেটিয়া অধিকার। যে স্থানে মলয়-সমীরণ প্রস্ফুটিত ফুলগুলির

বুকের ভিতর গিয়া সুগন্ধ আকর্ষণ করে, যেখানে পল্লবিত তরুশাখায় পাখী গায়, পাতা নাচে, ফুল হাসে, যেখানে পাপিয়ার ললিত ও কোকিলের পঞ্চম তানে জড় জগৎ মুগ্ধ হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, সেখানে আমার দুঃখের অশ্রু খসিয়া পড়ে, যেখানে নদীর কল্লোল পবনের হিল্লোল হাসিয়া হাসিয়া খেলা করে, যেখানে উপবনের ও চন্দ্রমার আভা ফুটিয়া ফুটিয়া পড়ে, সেখানে আমার শোকের ঝড় বহিতে থাকে। মূলকথা যেখানে সকলের আনন্দ, সকলের উচ্ছ্বাস, সেখানেই আমার রোল কান্না। কেহ হয়ত মনে করিতেছেন, আমি আমার স্বামীকে কেমন ভাল বাসিতাম, আজ তাই জীবন-সর্ব্বস্বকে হারাইয়া এত কাঁদিতেছি। যাহারা প্রাণের ধনকে হারাইয়া কান্দে, তাহাদের কান্নার আরম্ভ আছে, শেষ আছে কি না জানি না। কিন্তু আমার এ কান্নার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এ মরুময় জীবনের দুঃখের আরম্ভ শেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিধবা পতি হারাইয়া কাঁদে, আমি পতি পাইলাম না অথচ হারাইলাম। সেই অদ্ভুত কাহিনী আজি আমি আপনাদের সমক্ষে বলিব।

এক দিন জীবনের প্রাতঃকালে আনন্দের উচ্চ হাসি হাসিয়া আমি পিতা মাতার মনে আনন্দের ঢেউ তুলিতে ছিলাম, এমন সময়ে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা সেই খানে আসিয়া বলিলেন, "বলত আমি তোমার কে হই?" আমি ঠাকুরদাদার বড় বাধ্য ছিলাম, মায়ের কোল হইতে ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে পড়িয়া বলিলাম, "তুমি আমার বর হও" (এ কথা ঠাকুরদাদা পূর্ব্বে আমাকে এক দিন শিখাইয়া রাখিয়া ছিলেন)। ঠাকুরদাদা আমার বাবার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কবে মরি কবে বাঁচি এক বার আদরিণীর বিবাহ দিয়ে যাই"—আমার নাম আদরিণী। আমি বিবাহের কথা শুনিয়া ঠাকুরদাদার দাড়ি ধরিয়া বলিলাম, "দাদা আমার পুতুলের বিবাহ দেখিতে যাইবে? আমি আজি দুটী পুতুলের বিবাহ দিব।" দাদা বড় ভাল বাসিতেন, আমাকে লইয়া আমার পুতুলের ঝাঁপির কাছে গিয়ে বসিলেন। আমি আমার পুতুলের ঝাঁপি হইতে দুটী কৃষ্ণ ঠাকুর বাহির করিয়া বলিলাম "এস দুটীতে বিবাহ দি।" দাদা বলিলেন, "দুটি ছেলেতে কি বিবাহ হয়?" আমি বলিলাম, "কেন হবে না?" দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার কোন্‌টী বর, কোন্‌টী কনে?" আমি বলিলাম "একটি বর, একটী কনে।" দাদা তর্কে পরাস্ত হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমি আনন্দে পুতুল সাজাইয়া বিবাহ দিলাম। এই রূপে হাসিতে খেলিতে দিন কাটিতেছে; এমন সময় এক দিন মা আমাকে বলিলেন "আদরিণী তুমি আজি পাড়ায় যেও না, আজি তোমার বিবাহ।" বিবাহ? আমার বড় আনন্দ হইল। আমি ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যেখানে বাজনা বাজিতেছে, আমি সেই দিকে যাইতেছি, আমার মত সুখী কে? যখন বাজনা বাজাইয়া বর আসে, তখন আমি সকলের সঙ্গে বর দেখিতে ছুটিলাম। মা আমাকে যাইতে দিলেন না—আমার বড় কষ্ট হইল; সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিলাম না, এই

দুঃখে বরণের রাঙ্গা কাপড়খানি ফেলিয়া দিলাম, মনে করিলাম, আমার বিবাহ হইয়া কাজ নাই। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। চারি দিকে মহাকোলাহল পড়িল, আমি ভাবিতে ছিলাম, আবার গিয়ে সকলের সঙ্গে মিশি, কিন্তু মায়ের কথা মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকিলাম। ক্ষণ কাল পরে আমাকে বিবাহ দিতে লইয়া গেল। আমি রাঙ্গা কাপড় পরিয়া দাদার কোলে বসিয়া থাকিলাম। দাদা একটী বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আদর! এই তোর বর। "আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হাঁগা তুমি কি আমার বর?" সে কথা কহিল না। চারি দিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। বালকটী চুপ করিয়া রহিল। এই রূপে আমার শুভ বিবাহ জীবনের প্রভাতকালে নির্ব্বিঘ্নে মিটিয়া গেল। আমার বড় ইচ্ছা হইত যে, আমার বরকে আমি দাদা বলিয়া ডাকি। দাদা পরামর্শ জিজ্ঞাসায় পূর্ব্বেই এ বিষয়ের উপদেশ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাকে অধিক দিন খেলার সঙ্গী করিয়া রাখিতে পারি নাই।

দিন যাইতেছে এক সময়ে যখন আমার সেই বর তাহার নিজের বাটীতে তখন এক দিন পাড়া হইতে খেলা করিয়া আসিতেছি (এই আমি সবে ৭ বৎসরের) এমন সময় পথ হইতে বাড়ীর দিকে কেমন একটা গোল শুনিতে পাইলাম। আমার বুকের মধ্যে একটু ভয় হইল; তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলাম— যাহা দেখিলাম তাহা অতি ভয়ঙ্কর। আমার মা কাটাছাগীর মত ছট্ ফট্ করিয়া কাঁদিতে ছেন। আত্মীয় স্বজনেরা সেই কান্নায় যোগ দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া মায়ের শোকবেগ যেন আরো উথলিয়া উঠিল। মা বলিতে লাগিলেন, "তোর কি হল গো, কি হল গো।" তখন মায়ের চক্ষের জল সহ্য করিতে পারিতাম না, কিছুই জানি না, অথচ সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আহা! আমার একটা ময়না পাখী ছিল। তাহার মৃত্যুতেও আমি এত কাঁদি নাই। দিনে দিনে সমস্ত কান্নার হাটি থামিয়া গেল; কিন্তু, মা, মধ্যে মধ্যে সজল নয়নে আমার মুখ ধরিয়া বলিতেন "বাছা! তোমার কি হবে?" আমি ভাবিয়া পাইতাম না, মা কেন আমাকে এ কথা বলেন। এক দিন একজন খেলার সঙ্গিনীর সহিত অসদ্ভাব হওয়াতে সে আমাকে বিধবা বলিয়া গালি দিয়াছিল। আমি উলটাইয়া তাহাকে গালি দিলাম, বলিলাম, তুই বিধবা, তোর ভাই বিধবা। বাড়ীতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! বিধবা কাহাকে বলে? মা কাঁদিলেন।

ক্রমে ক্রমে ঘুমের অজ্ঞান সময় গত হইতে চলিল—ক্রমে ক্রমে কৌমারে পদার্পণ করিলাম। খেলা গেল, বেড়ান গেল, এই সময় হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। মা সরস্বতীর সঙ্গে আমার কোন অসদ্ভাব ছিল কি না জানি না। পোড়া কপালে কিছুই লেখা পড়া হইল না। সে পরিচয় না দিলেও এত ক্ষণ হয়ত বুঝিতে পারিয়াছেন। ধীরে ২ নভেলই পাঠ একটি রোগ হইয়া দাঁড়াইল। আমি এই পুস্তক হইতে আর কিছু শিখি আর না শিখি প্রণয় বলিয়া একটা জিনিস মানুষের বুকের মধ্যে ফুটিয়া থাকে ইহা বুঝিতে পারিলাম। কৌমার চলিয়া গেল; দুঃখের যৌবনকালে পদার্পণ করিলাম। প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা শুষ্ক তৃণ

পাইলেই গ্রাস করে, দ্বিগুণিত হাইড্রোজেনে অক্সিজন মিশিলেই জল হয়, এই সমুদয় প্রাকৃতিক ধর্ম্ম লোপ করিবার কাহার সাধ্য নাই। তৃণ তুমি অগ্নিগ্রস্ত কেন? অক্সিজন তুমি জল রূপে পরিণত হও কেন? এ কথা বলিয়া কে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে? আমি যখন যুবতী, যখন এহৃদয়ে প্রেমের ভাব বিকশিত হইয়াছে, তখন অভীপ্সিত পুরুষরত্ন স্পর্শে তাহাতে ফলোৎপত্তি কেন না হইবে? আমি পুরুষরত্ন দেখিলাম, আমার হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বল দেখি এখন, দোষ কার? প্রণয়ীর না প্রণয়ের? বসন্তের সান্ধ্য সমীরণে নবকিশলয় দুলিতেছে, সুগন্ধি পুষ্প গুলি নাচিতেছে আর গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। পোড়া পাখীর পাল এ মুগ্ধ জগতে যাহাকে সুন্দর বলে, তাহারই ছড়াছড়ি করিতেছে। তখন সেই সকলেই সুন্দর সকলেই মনোহর পদার্থের মধ্যে আরও সুন্দর আরও মনোহর সেই পুরুষ-রত্নের মুখখানি দেখিলাম কেন? যৌবনের উচ্ছ্বাসে প্রেমের আবেশে ঢল ঢল বিশাল, বিস্ফারিত জ্যোতিঃপূর্ণ সেই নয়নদ্বয় জগৎ ভুলিয়া দেখিলাম কেন? বলিতে পার, এ চারি চক্ষের মিলন হইল কেন? সে প্রাণকে আমার করিয়া ঘরে ফিরিলাম কেন? এ দগ্ধ হৃদয়ের স্তরে সে মনোমোহন মূর্ত্তি আঁকিয়া আনিলাম কেন? সে আমার ক্রীড়ার সঙ্গী। কত দিন আমি তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে আত্মবিক্রয় করিয়া আসিলাম কেন? তাই বলিতেছিলাম এই সন্দর্শন এই ভাব যদি প্রণয় ফুটাইবার হেতু হয়, তবে দোষ কার? প্রণয়ীর, না প্রণয়ের। অন্ধকারময় হৃদয়গহ্বরে প্রেম-প্রসূনের কুঁড়িটী আপনার হইয়া আপনি লুকাইয়া ছিল, কোন্ জোৎস্নায়, তাহার মুখ ফুটিল? প্রেমের আগুন নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতেছিল, কিসের স্পর্শে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল? অন্তঃশীলা স্রোতস্বতী বেগবতী হইল কেন? কেন, ঐ পুরুষ-রত্নের সন্দর্শনে সকল আঁধার সকল শুষ্কতা উহারই গুণে চলিয়া যায়। যাহাকে ভাল বাসিলাম, সে আমাকে ভাল বাসিল কেন? যদি হৃদয়ে দুইটী প্রেমের উৎসকে যুক্ত না হইত; হয়ত আমার হৃদয়ের প্রেম-উৎস এক দিন শুকাইয়া যাইত! কৃপাময় হে! যাহাকে ভাল বাসিলাম, তাহার সহিত যদি মিলিত হইতে না পারিব, তবে তাহাকে দেখিলাম কেন? তাহাকে আমার প্রাণ টী চির দিনের মত করিয়া দিয়া আসিলাম কেন?

"কাহে লাগি সজনি! দরশন ভেল।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেল॥"

এ দুঃখ এ সন্তাপ চির দিনের মত অন্তর্হিত হইবে না। কি সুবিধা! আমি বিধবা বলিয়া জগতের মানুষ নহি? আমি বিধবা বলিয়া আমার কি হৃদয়ও নাই? নীতির সূক্ষ্ম তত্ত্বের মহিমা প্রচার করিয়া কেহ বলিতে পারেন যে, "ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি মিলনের মুখ্য সাধনা যদি না হয়, তবে তুমি চুপ্ করিয়া বসিয়া থাক না কেন?" নীতির অবজ্ঞা করিতে চাই না, কিন্তু যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, যে আমার চক্ষুর পরিতৃপ্তি মনের শান্তি, সে অমার পার্শ্বে না বসিলে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মেটে না।

"যে যাহারে ভাল বাসে, কে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে?"

যাহাকে ভাল বাসি, এ হৃদয়ের অস্তিত্ব

যাহার প্রেমের উপর নির্ভর করে, আমার অন্তরের প্রতি উচ্ছ্বাস জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক যাহার চরণে গিয়া লাগিতেছে, যাহার তেজঃপুঞ্জ সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে আমি আমাকে ভুলিয়া যাই, তাহাকে এক বার দর্শন করিবার ক্ষমতাও আমার নাই! আমি অন্তরে অন্তর লুকাইয়া কাঁদি, আর বলি, "ভাল করি পেখন না ভেল।" তাঁহার উচ্চারিত এক একটী অক্ষর ছত্রিশ রাগিণীর মিলিত ভাবের বিকাশ; প্রতি শব্দে কত অক্ষর, প্রতি বাক্যে কত শব্দ বিন্যস্ত!! উঃ, শ্রবণ-শক্তি পাইলাম, শ্রবণেন্দ্রিয় পাইলাম, কেবল সমাজের দায়ে কর্ণ ভরিয়া শুনিতে পাইলাম না?

"এ প্রাণের পরিতৃপ্তি, তোমারই অমিয়গাথা,
প্রেমের সে গাথাগুলি কেন না শুনিব?"

আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে বসিলাম; কাহারও প্রাণে একটুকুও দয়া হইল না?
"আনি দেহ মোর পিউ, রাখহ আমার জীউ,
হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়।"

সমাজ তোমার শাসন জাল গুটাইবে না? তোমার ও নেড়া মাথার একগুচ্ছ কেশ তুলিয়া তুলিয়া অনেক শাসন জারি করিয়াছে, আর কেন? নরঘাতক! আর কেন? অনেক অবলা মরিয়াছে, তোমার মনস্কাম সিদ্ধি হইয়াছে।

পাঠক! আমি তাই তোমার কাছে দুঃখের কান্না কাঁদিতে বসিয়াছি। তাই তো বলিতেছিলাম, যেখানে ফুল ফোটে, পাতা নাচে, পাখী গায়, আমি সেই স্থানে হস্তাবরণে চক্ষু ঢাকিয়া বিষাদের কান্না কাঁদি। তাই বলিতেছিলাম, এ কান্নার আরম্ভ ও শেষ কিছুই বুঝিলাম না। অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম। জগদীশ্বর! সুখ-ভোগের বাসনা দিয়া ভোগ করিবার পথ রাখ নাই কেন? তৃষ্ণা দিলে, জল দিলে, তবে পান করিয়া চরিতার্থ হইতে দাও না কেন? প্রণয় দিলে, প্রেমিক দিলে, সুখের নিদান যে সম্মিলন তাহা ঘটিতে দেও না কেন? অথবা যেখানে হৃদয় রাখিয়াছ, হৃদয়ের কার্য্য রাখিয়াছ, সে স্থানে এমন মূর্খ নির্দয় সমাজ রাখিয়াছ কেন? কেন, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। হে অগম্য! অপার! তোমার শুভ ইচ্ছায় কি এক দিন এ সমাজ চূর্ণীকৃত হইবে না?

প্রণয় জন্মিল, প্রেমিক পাইলাম, প্রেমের উপহার দিতে পারিলাম না! আমার প্রেমরস-পূর্ণ হৃদয় অকালে মরুভূমি হইয়া গেল!

"নব দরশন সুখ বিহি কৈল বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ।
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল।
অনেক লহিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥"

আমার জীবন কাঁদিতে২ আরম্ভ হইয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে শেষ হইবে। সমাজের দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণের বিচারে আমি ব্যাকরণ অনুসারে বিধবা হইয়া রহিলাম। আমার এই দুঃখের কাহিনীতে যদি এক জনেরও অশ্রুপাত হয়, তাহা হইলে এ বিষাদদগ্ধ হৃদয়ে আনন্দ আসিবে।

চিরদুঃখিনী।

এসংসারে কি আছে আমার ?

বল আর কোন্ সুখে থাকিব সংসারে, সখে,
এ সংসারে কি আছে আমার ?
গতস্মৃতি অগ্নিজ্বালা, উপস্থিত বিষময়,
ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার !
সংসার কুহক সখে ;—শিশুর অস্ফুট বাণী,
মাতৃস্নেহ, পিতার আদর,
প্রণয়ের নিত্যহাসি, প্রেয়সীর ভালবাসা,
রোগশূন্য সুস্থ কলেবর,
সমাজে সম্মান সখে, প্রতিপত্তি বিদ্যাধনে,
দীন-দুঃখ-মোচনীয় ধন,
নিঃস্বার্থ দয়ালু মিত্র, হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত
সরলপ্রকৃতি জ্ঞাতিজন।
কিন্তু কি বলিব সখে, মরম-বেদনা মম
অবিদিত নাহি তব স্থানে,
যে অনলে পোড়ে প্রাণ দিবস যামিনী, সখে,
তোমা বিনা আর কেবা জানে ?
হৃদয়-দুয়ার খুলে এক বার দেখ সখে,
পুড়ে সব হইয়াছে ছাই !
উদ্যোগ, উদ্যম, আশা, জীবনে উন্নয়মিষা,
আর সেথা বিন্দুমাত্রে নাই !
মধুমাখা আধকথা শুনেছি শ্রবণে সখে,
স্বরগের অপ্সরঃ-সঙ্গীত,
যত বার শুনিয়াছি সুস্বনলহরী সেই
তত বার হয়েছি মোহিত।
জীবনে কি আর কভু স্নেহগীত শুনিব সখে,
স্বর্গ-বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি ?

তবে আর কোন্ আশ, এখন(ও) রয়েছে সখে,
অৰ্দ্ধমৃত এ পোড়া পরাণি !
এ নয়ন হেরিয়াছে সুধাপূর্ণ স্নেহ হাসি
যে হাসিতে জগত হাসিত,
এত যে সুধার হাসি পূর্ণিমার চাঁদ হাসে
তার কাছে কোথায় লাগিত !
স্নেহের সাগর সখে সে হাসিতে উথলিত
বিকসিত হৃদয়-কুসুম
অকালে ডুবিয়া গেল জগত আঁধারি সখে,
অকলঙ্ক শশী অনুপম !
সে জীবনে দেখিতাম সুখের শৈশব সখে,
বাল্যকাল পুন মনে হত,
শৈশবের ধূলিখেলা, চাঁদ ধরা, মিছে হাসি,
কে যেন রে মনে এনে দিত !
মনে হত এক দিন আমিও রে ওইরূপ
বেড়ায়েছি নাচিয়া নাচিয়া,
অমনি নির্ভর হৃদে অমনি নিশ্চিন্ত মনে
গেছে দিন হাসিয়া হাসিয়া।
আমিও রে এক দিন মাতৃ-অঙ্কে বসিয়াছি,
করিয়াছি মাতৃদুগ্ধ পান,
আসি পিতা এক দিন আমারেও সমাদরে
করিছেন এ শির আঘ্রাণ।
অমনি পুতুল লয়ে নধর অঙ্গ দুলায়ে—
আনন্দেতে সদাই বিভোর—
আমারেও কোলে লয়ে মুখ মুছায়েছে পিতা
এবে আমি করি বৃথা ভোর।

কোথা গেল সেই ধন?—বলিতে কি পার সখে,
কোথা গেলে তারে পাওয়া যায়?
সেই যদি গেল ভাই যার তরে এ জীবন
এও তবে কেন নাহি যায়!
সেই দিন হতে সখে পাগল হয়েছি আমি,
আমি যেন আমি আর নাই,
তাই বলি কোন্ সুখে থাকিব সংসারে সখে
সংসার-বন্ধন মম কই!

প্রণয়ের সুখ?—ছি! ছি! ও কথা বলো না সখে
প্রণয় ত যন্ত্রণা-আধার!
তুষিতে যাহার মন যায় সখে নিশি দিন
তার মন পাওয়া অতি ভার!
যাহারে করিতে সুখী দিবস রজনী যায়
সুখ তার কিছুতে না হয়,
মর্ম্মভেদি বাক্যে তার পাষাণ(ও) ফাটিয়া যায়
কোন্ ছার মানব-হৃদয়!
বলেছিনু এক দিন স্মরণ কি হয় সখে,
পরিণয়-মাত্র প্রেম নয়,
"চন্দন না মিলে ভাই খুঁজিলে সকল বনে
গজে গজে মৌক্তিক না রয়।"
স্বভাব-সঞ্জাত প্রেম নহে শিক্ষা-সমুদ্ভূত
সে যে কথা অলীক প্রলাপ,
ঘসিয়া মাজিয়া রূপ ধরিয়া বাঁধিয়া প্রেম
সে কি প্রেম?—দারুণ সন্তাপ!!
প্রণয়-বন্ধন বটে শিক্ষায় সুদৃঢ় হয়
প্রেম দীপ্তি সুপ্রকাশ পায়—
উজ্জ্বল অগ্নির শিখা আরো সমুজ্জ্বল হয়
ঢাল ঘৃত অনল-শিখায়।
সত্য বটে ভূসংসর্গে অঙ্কুরিত হয় বীজ
কিন্তু ভাই তাতে কিবা হয়?
অঙ্কুর-কারণ বীজ—মৃত্তিকা ত নয়।

কে জানে কেমন ভাই অঙ্কুর বীজেই থাকে
কেন লৌহ চুম্বকে কর্ষিত
কার সনে কি সম্বন্ধে, কার সাধ্য কেবা জানে
আমাদের জ্ঞানের অতীত।
জানিমাত্র এই মোরা আর কিছু নয়
শিক্ষাতে (ও) না জন্মে প্রেম পরিণয়ে(ও) নয়
কি-জানি-কেমনে প্রেম আপনি(ই) হয়।

নামমাত্র কভু যার শুনিনি শ্রবণে সখে,
কভু যায় দেখি নাই চখে,
কেমন প্রেমের ভাব মুহূর্ত্তে উদ্ভব হয়
এক বার তিলমাত্র দেখে।
প্রথম দর্শনে সখে, হৃদয়ে স্থাপনা করি
পূজি তায় যাবত জীবন,
সুখ যেন তারে(ই) দেখে, দুঃখ তার অদর্শন
ক্ষণমাত্রে সে হয় আপন,
এক তিলে ভেসে যায়, কুল, শীল, মান, সখে—
ভেসে যায় আত্মার গৌরব,
আমি তার সে আমার এই জ্ঞান হয়, সখে,
মনে হয় তারি জন্যে সব।
অতুল প্রণয়-সুখ সত্য সখে, এ সংসারে
যদি প্রেমে সুখোদয় হয়
ছায়াদানে মহীরুহ সুশীতল করে প্রাণ,
যদি না সে অঙ্কুরে শুখায়।
হায়! মম ভাগ্য-দোষে বঞ্চিত এ ভবে সখে,
সেই সুধারস আস্বাদনে,
প্রাণের পিপাসা সখে আজীবন প্রাণে র'ল
তৃপ্তিসুখ হল না জীবনে!
অপূর্ণ প্রাণের আশা যৌবনের মৃগতৃষা
প্রণয়ের সাধ না মিটিল,
কাঁদিয়া এসেছি সখে, অদ্যাপিও কাঁদিতেছি
কাঁদিতেই সব দিন গেল!

কেমন সংসার সখে নারিলাম বুঝিবারে
সব যেন জটিলতাময় !
স্বভাব লুকায়ে সব বাহ্যমাত্র প্রকাশিয়ে
আভাসেতে ছায়াটি দেখায় !
কেমনি বিজলি-খেলা এ সংসার খেলে সখে,
প্রাণ যেন ঝলসিয়ে যায়,
এক বার যে অনলে পুড়ে প্রাণ ছারখার
পুনর্বার পড়ে গিয়ে তায় ।
হারায়ে একটি ধন, অন্তরে, সকলি পুড়ে,
দেখ সখে হইয়াছে ছাই,
কেমন মোহিনী গুণে মুগধ পাগল মন
আবার তেমনি ধন চাই !
আজ যারে ভাল বলে আদর করেছি সখে.
কাল তারে বিষ বোধ হয়,
আজ যে স্বপনে সখে, আমা বই জানেনাক
কাল আর সে আমার নয় !
দেখ ঐ কল্লোলিনী—মরি কি সুন্দর ছবি !
বুকখানি শান্তির নিলয় !
দেখ না পাদপশ্রেণী—ফলভরে অবনত,—
প্রকৃতিতে আদর্শ বিনয় ।
জোছনা-মণ্ডিত সখে ঐ যে সিকতা-ভূমি
কি অপূর্ব্ব মাধুরী ধরেছে !
আকুল-প্রমদা-কুল ফুল ফুল, অনুকূল
পবনেতে কেমন দুলিছে !
উন্মত্ত অলির দল বেড়ি ফুল কুমারীরে
অনুরাগে কেমন গুঞ্জিছে !
দেবের মন্দিরে সখে, শুন শুন ঐ শুন,
আরতির বাজনা বাজিছে !
ছোট ছোট বীচিগুলি নেচে নেচে হেসে হেসে
দেখ ভাই কেমন খেলিছে !
সুদূর-গগন-পটে দেখ সখে তারানাথ
তারামাঝে কেমন ভাসিছে !

এক বার খুলি মুখ আবার বসনে ঢাকি
তারাগুলি কি রঙ্গে খেলিছে !
বসিয়ে পতির পাশে সতী সাধ্বী পতিব্রতা
পতিমন কেমন তুষিছে !
দেখ সখে চারি দিকে সকলি আনন্দময়
প্রকৃতির প্রাণখোলা হাসি,
স্মরণ কি হয় ভাই পৌষের সেই দিন
সে দিন ত দেখেছিলে আসি ?
যে দিকে ফিরাও আঁখি সকলি সুন্দর আজ
যাই দেখ তাহামত তাই,
সেই দিন এই সব কেঁদে কেঁদে বলেছিল
"তোমাদের যোগিধন নাই ।"
শুনিয়ে মরমভেদী নিঠুর বারতা সেই
আকুল কতই কেঁদেছিলে !
প্রকৃতিতে সব আছে—কৈ ঐ মায়াবিনী
আমাদের "যোগী" ফিরে দিলে ?
কুহকিনী পিশাচীর মর্ম্মভেদী সেই বাণ
আজি(ও)ত হৃদে বিদ্ধ আছে
বিষম বেদনে তার আজি(ও)ত দুনয়নে
ঝর ঝর ঝরণা ঝরিছে ।
একটী বৃন্তেতে সখে তিনটী কুসুম কিবা
দিক্‌শোভি ফুটে রয়েছিল,
প্রবল কালের বায়ু অকালে বহিয়া সখে,
কেন তার একটী ভাঙ্গিল ?
কেন তার তরে ভাই আজিও পরাণ কাঁদে
স্মৃতি তার এখন বিমল.
আমি ত দরিদ্র সখে—পরণ-কুটীর-বাসী
তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ ছিল ?
প্রণয় কি মানে ভাই উচ্চ নীচ হীন দশা.
অবস্থার বৈষম্য সুসম ?
তা হলে কি সে আমারে বাসিতে পারিত ভাল
আপনার সোদরের সম—

না।—তা হইলে তার তরে তাজিও অজস্রধারে
ঝরিত নয়ন দুটী মম।
এক বার স্থির মনে ভাব দেখি কি হইল
সাধের মোদের যোগিধন,
বল দেখি কোন্ প্রাণে আবার আমারা ভাই,
সংসার-খেলায় নিমগন !!
তাই বলি এ সংসারে উপরেতে যাহা দেখ,
ও সকল কিছুমাত্র নয়,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা প্রকৃতি স্বভাব-সিদ্ধ
পাকচক্রে কেবল ঘুরায়।
বলিতে পারি না সখে কেন দেয় কেন নেয়
কেন আসে কেন চলে যায়,
কালপূর্ণ হইতে কি এতই সময় লাগে
বিধাতার বিলম্ব না সয় ?
আছে যদি জগতের নিয়ন্তাই কেহ সখে,
কেন এত অনিয়ম তবে ?
অথবা স্বকর্ম্মোচিত ফল ফলে এ সংসারে
প্রাক্তনের ফল ভুগি সবে ?
বুঝিতে পারিনাই বুঝাতেও পারি নাই
এই দুঃখ চিরদিন মনে,
আমি কাঁদি তুমি কাঁদ সংসারে সকলে কাঁদে
কেন কাঁদে কেহ নাহি জানে।
হাস্যময়ী প্রকৃতির সান্ত্বময়ি মুখখানি
দেখে যদি ক্ষণসুখী হই,
প্রাণের ভিতর হ'তে কি অমনি হুহু করে
বলে উঠে "কি আছে কি নাই।"
আর কত দিন সখে এই ভাবে কাটাইব ?
কত দিন এ সংশয়ে যাবে ?
ছায়ের এ স্তূপ সখে সার-হীন এ জীবন
কাল-বায়ু কবে উড়াইবে !

চতুর্দশপদী।

"কল্পনা।"

বড় ভাল বাসি আমি তোরে রে কল্পনে,
বালসখি মোর ; বসিয়া বিজনে কত
দেখায়েছি ভালবাসা তোরে ; বহে যবে
গঙ্গাতীরে স্নিগ্ধ বায়ু মধুর প্রদোষে—
জাগাইয়া ভাবুকের চিন্তার তরঙ্গ—
ভ্রমিয়াছি কত বার আলাপি দুজনে।
তুষিয়াছ কত বার, সখি, পশি মোর
শয়ন-আবাসে ; বিনোদিনি তুমি মোর
চিত্তবিনোদিনী,—মানস-মন্দিরে তুমি
একটি মুরতি। বহু দিন করি নাই
প্রেম-সম্ভাষণ,—তাই কিরে সখি তুমি
ভ্রমিছ মানের ভরে সে মন্দির ত্যজি।
প্রেমে তোর, সহচরি, মুগ্ধ যার মনঃ
ত্যজিতে সে পারে, কিরে, যাবত জীবন।

ভ্রমণ।

১

কুঞ্জ ভাগীরথী-তীরে
ঝির্ ঝির্ বহত সমীরে
মানস দোলত ধীরে
একদা ভ্রমণে চলি,
যব্ তম প্রবেশ পর
বোলত হি পিকবর
তোষি করণ-বিবর
কি এক মধুর বোলি।

২

"মা পশ কোহি কিশোর্
বনমে সরপ ঘোর
তনু তোর কাটব জোর
পরাণ দহব বিখে;
পেখি রূপ মনোহারী
এহি কুঞ্জমে নর-নারী
প্রবেশত না বিচারি
পাছে জ্বলত অনল শিখে।"

৩

শুনই কোকিল-বাণী
চল-চকিত-পরাণী
পুছই বিস্ময় মানি
চাহই কুঞ্জ-বিহারী:
"কোকিল কাকিল গাওয়ে
কহত সমঝাওয়ে
মানস-নয়ন দাওয়ে
খুলিয়া হমারি।"

৪

শুন্ কয় পিকবর
কহতহি সে উত্তর
"এহি কুঞ্জ মনোহর
প্রণয়-কানন বোলত নরে;"
শ্যাম-শোভা ঢল ঢল
বিকসত ফুলদল
মকরন্দ অবিরল,
গিরত মারুত-ভরে।

৪

এহি কানন-মাঝারে
তরল-রজত বারে
রাজহংস-শত-হারে
শোভত মানস-সরসী;
এহি সরোবর-মাঝে
শোভা-শত-দল-সাজে
প্রণয়-কমল রাজে
সমীরণ-পরশি।

৫

লভতু কমল-হারে
সরোবর-উভপারে
অপেখত অনিবারে
কত যুবক কামিনী;
ফুল লাভ-হত-আশে
পুনঃ ফিরত আবাসে
বৃথা হি শ্রম-আয়াসে
যাপই দিন-যামিনী।

৬

কোই মানস-অধীরে
গিরয়ই সরোনীরে
যাওয়ত গভীরে
প্রণয়-কুসুম-আসে,

সরস-সলিল পর
লোলজিউ বিষধর
গরজই ভয়কর
ঘুমত-স্ফুরত-ভাসে।

গীতি।

(আত্মশাসন উপলক্ষে)

(১)

আর কত কাল এ ঘুমের ঘোরে
রহিবিরে তোরা মগন হয়ে ?
আর কত কাল জাপিবি জীবন
নির্জ্জীব অসাড় জড়ের প্রায় ?

(২)

সপ্তশত বর্ষ চেতনা ত্যজিয়ে
দিবা বিভাবরী ঘুমায়ে ঘুমায়ে
অসাড়ের প্রায় করিয়ে হৃদয়ে
নিশ্চিন্ত হইয়া রয়েছে হায় !

(৩)

ঘুমাবার সাধ তবু মিটিল না ?
তবু কিরে ভাই না হ'লো চেতনা ?
দেহে সে জীবনী তবু ফিরিল না ?
স্মরিলে হৃদয় বিদরি যায় !

(৪)

কি সুখ-শয়নে শুয়েছ রে ভাই,
স্মরিলে তা মন কাঁদে রে সদাই,
বৈরিগণ সবে দলি পদতলে
নির্ভয়ে উল্লাসে যাইতেছে চলে,
তবু না তোদের চেতনা হয় !

(৫)

তোরা না প্রাচীন আর্য্যের সন্তান,
সমগ্র পৃথিবী করে যশোগান
এখনো যাঁদের, ঐ হিমগিরি
ঝর ঝর ঝরে ফেলি অশ্রুবারি
এখনো যাঁদের মহিমা গায়।

(৬)

ঐ দেখ্ তোদের ঘুম ভাঙ্গাবারে,
সস্নেহে বৃটন দাঁড়ায়ে দুয়ারে
ডাকিছে সঘনে, বলিছে বদনে
"ভারত নিবাসী যত ভ্রাতৃগণ
উঠ উঠ, করি স্নেহ আলিঙ্গন,
বৃথায় যে দিন বহিয়া যায় !"

(৭)

ত্যজ নিদ্রা ভাই মেল রে নয়ন,
দেখ রে গগনে উঠেছে তপন,
তিমির রজনী বহু দিন পরে
হ'য়েছে প্রভাত, বহু দিন পরে
সুখ তপনের কররাশি ধ'রে
হয়েছে ভারত সুসমাময় !

(৮)

ত্যজি নিদ্রা ভাই উঠ রে সত্বর
কর্ম্মক্ষেত্রে এবে হও অগ্রসর,
ভ্রাতা ভগ্নি মিলে পৃথিবীমণ্ডলে
পুনঃ উন্নতির কীর্ত্তিস্তম্ভ তুলে,
উন্নতির স্রোতে দেহ ছাড়ি দিয়া
সুখের তরঙ্গে ভাস রে হায়!

(৯)

তা হ'লে আবার দুঃখিনী ভারত
ত্যজি দীন বেশ হাসিবে নিয়ত,
ঐ হিমাদ্রির দুঃখ অশ্রুজল
ঘুচিয়া বহিবে আনন্দ তরল,
জগৎ হইবে আনন্দময়!

কবিকল্পনা।

যিনি পয়ারাদি ছন্দে মনোহর গীত গাইয়া—জনসাধারণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন তিনি কি কবি? তাহা হইলেত জগতে সকলই কবি হইতে পারেন। আমাদের দেশে যাঁহারা কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ,—যাঁহারা কবিপদবীতে আরোহণ করিয়া সময়ে২ দেশ কাঁদাইয়াছেন, হাসাইয়াছেন, মানবপুঞ্জের মন মুগ্ধ করিয়াছেন, যুক্তিযুক্ত অর্থ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে তাঁহাদিগকে কবি বলা যাইতে পারে না।

"কে বলে শরদ শশী সে মুখের তুলা,
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।"

জানিনা কি জন্য দেশশুদ্ধ লোক এই দুইটি কথায় ভারতচন্দ্রের কবিত্ব রসে গলিয়া পড়েন এবং ভারতচন্দ্রকে এক জন কবি বলিয়া পরিচয় দেন।

"ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু-
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥"

আর ইহাতেও বা কালিদাসকে কবি বলিয়া আখ্যা দেন কেন। একটি রূপবতী রমনীর মৃদু হাসি-খুসি-ভরা মুখখানি দর্শন করিয়া কে না বলিয়া থাকে, "আহা! মুখখানি দেখ্‌লে পূর্ণ চাঁদ ও লজ্জা পায়"; এবং কেই বা একটী নবযুবতীকে কণ্টকাকীর্ণ পথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মনে না বেদনা পায়? রূপসী শকুন্তলার ঐপ্রকার অবস্থা অবলোকন করিয়া তদ্রূপ সাধারণের মনে কষ্ট অনুভব হয়, তাঁহার হৃদয়কবাটে তাহাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট হওয়ার সম্ভব কি,—তবে তিনি শিক্ষিত—শাস্ত্রজ্ঞ এজন্য সুমধুর ছন্দ কথায় তাহার সে কষ্টটী প্রকাশ করিতে পারগ হইয়াছিলেন। এখন এমত অবস্থায়, ভারতচন্দ্র ও কালিদাসকে কবি বলা যাইতে পারে কি না। এই বিষয়ের যথার্থ উত্তর দিতে হইলে তাঁহাদিগকে কবি না বলিয়া খুব এক এক জন ভাল পাকা রসিক বলিলে বেশ হয়, কেননা, তাঁহারা রূপসী কামিনীকে খুব ভাল বাসিতে জানিতেন। যাঁহারা কমিনী-রঙ্গ-রসে

মনঢালিয়া সমাজে কবি বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন তাঁহারা বাস্তবিক কবি নয়। রূপসী-রমণী কল্পনা করিয়া তাহার সহিত পরিণয় ইচ্ছা—এভাব কি কবিদিগের মনে উঠা ভাল দেখায়। যাঁহারা প্রকৃত কবি,তাঁহাদের হৃদয়ে এ সমস্ত ভাবের নামমাত্রও নাই; কিন্তু যুবতী শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাসের সে ইচ্ছাটী বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যথা :—

"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা
যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥"

এস্থলে কালিদাসের নিতান্ত ইচ্ছা যেএমত কল্পনাপ্রসূতা অন্য হস্তে সমর্পণ না করিয়া নিজেই যাহা ইচ্ছা তাহাই করি, তবে নিতান্ত লজ্জার অনুরোধে পড়িয়া অন্য একটা নায়কের উপর দিয়া দোষ এড়াইতে গিয়াছেন, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে মহারাজ দুষ্মন্ত কেবল কালিদাসের স্বভাবের দোষে কলঙ্কিত হইয়াছেন। সত্য বটে একটী রূপসী সতী রমণী রাজা রাজড়ার মুখসেব্যা এবং মন আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু এস্থলে রাজা দুষ্মন্ত অপেক্ষা কালিদাসের মন আরও অধিকতর চঞ্চল হইয়াছিল। নতুবা শকুন্তলা-বিবাহের জন্য অত নাছোড় হইয়া বলিতেন না।

এরূপ জঘন্য যত্ন রাজ-চরিত্রে কলঙ্ক-স্বরূপ।

কালিদাসের চরিত্র অতি জঘন্য। অতএব যে বেশ্যাসক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রত্যেক বাক্যতেই প্রকাশ পায়। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন,———

"ইদমপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে
স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।
বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং
কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ॥"

এখানে কবিত্বের কি পরিচয় পাওয়া যায়? শকুন্তলা যদি বেশ্যা হইতেন তাহা হইলে এ রসিকতা বেশ্ ভাল লাগিত। শকুন্তলার এপ্রকার দশা অবলোকন করিয়া রাজার মুগ্ধ ভাব বর্ত্তমান থাকিলে মাধুর হইত। কালিদাস রসিক বটে, কিন্তু সে রসিকতার বা গম্ভীরতা কৈ? আমরা কালিদাস অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের রসিকতা ভাল দেখিতে পাই, কেননা, সে রসিকতার গম্ভীরতা আছে। মালিনীর মুখে বিদ্যার রূপমাধুরী শ্রবণ করিয়া সুন্দরের মন যেপ্রকার চঞ্চল হইয়াছিল, কালিদাস হইলে এস্থলে যে কি করিয়া বসিতেন তাহা বলা যায় না। রূপ দেখা অপেক্ষা শোনায় আরও মন চঞ্চল হয়। এখন শকুন্তলার রূপ দেখায় এবং বিদ্যার রূপ শোনায় তুলনা করিতে গেলে ভারতচন্দ্রের রসিকতার যে গম্ভীরতা আছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

(ক্রমশঃ)

২য় খণ্ড। আষাঢ়। ১২৮৯। ১১শ সংখ্যা।

হিন্দুদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীবিধুভূষণ মিত্র কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

৬৬ নং পটুয়াটোলা লেন হিন্দুদর্শন কার্য্যালয় হইতে
শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যাক ভবনস্থ
সরস্বতীযন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।



[আমি এই প্রস্তাবটী "Pataldanga Reform Association" নামক সভায় পাঠ করি। সে দিনকার সভাপতি হিন্দুদর্শন সম্পাদক অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ মিত্র মহাশয় আমার ও আমাদের সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য ইহা কোন প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া আমি ইহা বাহিরে প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। প্রস্তাবটীর অনেক স্থল আবশ্যকমত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে।]

আজি আমরা যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, যাহা আমাদের অদ্যকার সভার বিবেচ্য বিষয়, যে সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য সভ্যগণ এখানে সমবেত হইয়াছেন তাহা অত্যন্ত আবশ্যকীয়, আবশ্যকীয় বলিয়াই গুরুতর এবং গুরুতর বলিয়া আমরা এবিষয় উত্থাপন করিয়াছি। আমার শেষ কথাটী শুনিয়া হয় ত অনেকে হাসিবেন, বাহিরে না হাসুন মনে মনে হাসিবেন, বলিবেন, আবশ্যকীয় বলিয়াই এ বিষয়ের অবতারণা। বাস্তবিক কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বিশেষতঃ আমাদিগের অদ্যকার বিবেচ্য বিষয়ের অনুরূপ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অন্যের পক্ষে না হউক আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ও অর্ব্বাচীন লোকের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ; এমন কি, অসম্ভব বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।

সভ্যগণ যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা কি? যাহার সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে না, যাহার সকল রহস্য উদ্ভেদ হইবে না তাহা লইয়া গণ্ডগোল করিয়া মিছামিছি মাথা বকান কেন? আমরা বলি, ইহার কারণ আছে। সে কারণটী এই:—আমাদের অদ্যকার বিবেচ্য বিষয়ের গূঢ় প্রকাশ অন্য দ্বারা তত হয় না, পুস্তক পাঠ দ্বারা তত হয় না আর কোন বিষয় দ্বারা তত হয় না, যতটুকু স্বীয় ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যাহা বলি সভ্যগণ তাহা কেবল বাহ্য কর্ণে শ্রবণ না করিয়া অন্তর্নেত্রে অবলোকন করিবেন; আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, সভ্যগণ এ বিষয়টী বিশেষরূপে বিবেচনা করুন, মন স্থির ও চিত্ত সংযত করিয়া যাবদীয় ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিয়া পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে এই বিষয়টী বিবেচনা করিয়া দেখুন, আর অনুভব করুন, আমাদের এ বিষয় আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা কি। আমরা হাত মুখ নাড়িয়া প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গলাবাজীর জোর দেখাইয়া প্রশংসা লইবার উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হই নাই, কিম্বা আমাদের সে ক্ষমতাও নাই। আমাদি-

গের সমাজে যে সকল শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, যে সকল বীভৎস কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য।

সভ্যগণ! সমাজ—এই কথাটী দ্বারা যে কি বুঝায় তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ আমরা যখন কেহই সমাজ ছাড়া নই, সমাজের দৃঢ় শৃঙ্খলে যখন আমাদের মধ্যে সকলেই সংবদ্ধ, তখন আর ইহা বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবে সংক্ষেপে বলিতে গেলে সমাজ জাতীয় সম্মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে, আর সেই সম্মিলনই জাতীয় উন্নতির প্রশস্ত পথ। বাস্তবিক সমাজের সুশৃঙ্খলা যে কত আবশ্যক তাহার ইয়ত্ত করা যায় না। পুরাকালে যে সকল দেশ সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল এবং এক্ষণে যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিচিত, তাহাদের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে,তাহাদের মূলে সমাজ রহিয়াছে, সমাজের উন্নতিতে তাহারা উন্নত। ভারত বল, মিসর বল, এথেন্স বল, স্পার্টা বল, রোম বল, কার্থেজ বল, কাহারও উন্নতি যে সমাজের উন্নতি ছাড়া ছিল না, ইতিহাস তাহার প্রমাণ দিতেছে। অনেকে হয় ত প্রাচীন ভারতের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া বলিবেন, প্রাচীন কালে তথায় সমাজ-বন্ধন ভাল ছিল না এবং সেখানে জাতিভেদ ছিল। আমরাও স্বীকার করি, সেখানে জাতিভেদ ছিল. কিন্তু এক্ষণে যেরূপ জাতিভেদ প্রচলিত, সেরূপ জাতিভেদ ছিল, আমরা স্বীকার করি না। সকলেই জানেন, আর্য্যগণ ভারতের আদিম নিবাসী নহেন। তাঁহারা হিন্দুকুশ-গিরির নিকটবর্ত্তী মধ্য আসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ভারতের তদানীন্তন অধিবাসীদিগকে পরাভব করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। এ সময়ে আর্য্যগণের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু ক্রমে এই আর্য্যসম্প্রদায় ব্যবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরের উপাসনায়, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ বিগ্রহে, বৈশ্যেরা বাণিজ্যব্যবসায়ে এবং শূদ্রগণ শ্রমজীবীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কার্য্য বিভাগ ভিন্ন এ সম্প্রদায়ভেদের অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এ সময়ে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির যেরূপ অত্যাচার, সে সময়ে সে সকল কিছুই ছিল না; কিন্তু সম্প্রদায়ভেদের যত কেন মহৎ উদ্দেশ্য থাকুক না, এই সময় হইতেই আর্য্যজাতির অধঃপতনের বীজ রোপিত হয়। কারণ যে উদ্দেশ্যে সম্প্রদায়ভেদ হইল, ফলে তাহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ বিদ্বান্, ক্ষত্রিয়গণ সাহসী, বৈশ্যগণ ধনী, সুতরাং এ তিন সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ অনিষ্ট হইল না। যত ঝোঁক গিয়া নিরীহ শূদ্রদিগের উপর পড়িতে লাগিল। এই রূপে কিছু কাল কাটিয়া গেল। সম্প্রদায়ভেদের যে বীজ রোপিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে জাতিভেদরূপ বৃক্ষে পরিণত হইল। দিন যায়, বৃক্ষটীও বদ্ধমূল হয়। এই রূপে

বৃক্ষটী পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া কিছু কাল দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ঐশ্বর্য্য কখনই চিরস্থায়ী হয় না, সকলের অবস্থা কখন একরূপ যায় না, সুতরাং বৃক্ষটীও সমভাবে থাকিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধধর্ম্মবায়ু মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল। এদিকে ব্রাহ্মণগণের অত্যাচাররূপ যে মেঘ উঠিয়াছিল তাহা বায়ুর অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। তুমুল ঝড়ের আরম্ভ। সেই ঝড়ের সহিত বৃক্ষটী বাহু নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঘোর যুদ্ধ, বিরাম নাই। অবশেষে বৃক্ষটী বায়ুর বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু এককালে উৎপাটিত হইয়া গেল না, আশা রহিল; দিন দেখিয়া আবার এক সময়ে মস্তক উত্তোলন করিবে।

সভাগণ! আসুন, আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিলাম সেই সময়ে হিন্দু-দিগের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি। কারণ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত আদিম অবস্থার এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে, একটীকে ভাবিতে গেলে অন্যটীকে না ভাবিয়া থাকা যায় না।

যখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন তাঁহারা এক সম্প্রদায় উদ্যোগী অধ্যবসায়শীল কষ্টসহ সমরকুশল জাতি ছিলেন। এ সময়ে ভারতের উর্ব্বরা শক্তি ভিন্ন তাঁহাদিগের অনুকূলে আর কিছুই ছিল না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদিগকে যাবদীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া লইতে হইবে। অতএব তাঁহারা সমস্ত কার্য্যের ভার স্বহস্তে লইয়া জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন; সুতরাং তাঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহাই যে সুচারু রূপে সম্পন্ন হইত এ কথা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ও সমদর্শী ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহাদের এরূপ আস্থা ছিল যে, প্রাণান্তে তাঁহারা কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না। তাঁহারা স্বীয়-প্রতিজ্ঞা-পালনে এত দূর অগ্রসর ছিলেন যে যতই বিপদ হউক না কেন, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা-পালনে কখনই পরাঙ্মুখ হইতেন না। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের শরীরে এক-বিন্দুমাত্রও রক্ত থাকিত, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রতিজ্ঞা-পালনে যত্নশীল হইতেন। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের উপর তাঁহাদের এত দূর ঘৃণা ছিল যে, যদি কেহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে চতুর্দ্দশ পুরুষ নিরয়-গমনের বিভীষিকা প্রদর্শিত হইত। প্রাচীন হিন্দুগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহারা এক ব্রহ্মের আরাধনা ভিন্ন অন্য দেব দেবীর পূজা করিতেন না। উপরে যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করা গেল, প্রাচীন হিন্দুগণ তদ্ভিন্ন বহুবিধ সৎগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। বিদ্যার চর্চ্চা আদিম হিন্দুগণের মধ্যে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কি পুরা কালে, কি বর্ত্তমান সময়ে কোন জাতির মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, সাহিত্য বল, গণিত বল, কাব্য বল, অলঙ্কার বল, ন্যায় বল, জ্যোতিষ বল এ সমস্ত বিষয়ে ভারত যেরূপ উন্নতি করিয়াছিল

সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আর্য্যগণ বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, পরশ্বমাত্র তাহা ইউরোপ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। মিল, কম্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে সকল কথা বলিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর শিরোভূষণ হইয়া গিয়াছেন, প্রাচীন ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও হিন্দুদিগের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহারা পৃথিবীর মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ গণনায় তাঁহারা বিলক্ষণ পটু ছিলেন। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে সময়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার হয় নাই।

প্রাচীন হিন্দুগণ বাণিজ্যবিষয়েও নিতান্ত উদাসীন ছিলেন না। তাঁহারা যে, ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যাদি লইয়া সুমাত্রা, জাবা প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, অদ্যাপিও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরাকালে হিন্দুরমণীগণের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল না। সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে অবলোকন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুরমণীগণ অপেক্ষাকৃত অনবরুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতেন। তাঁহাদিগকে ইতর জন্তুর ন্যায় ব্যবহার করা হইত না, বরং তাঁহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হইত। আর একটী কথা, এ সময়ে হিন্দুমহিলাদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হইত। চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যাকে অনূঢ়া রাখিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকে গমন করিবেন, এ বিভীষিকায় হিন্দুগণ ভীত হইতেন না। এ সময়ে হিন্দুসিমন্তিনীগণের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা ক্ষণা প্রভৃতি বিদুষী রমণীর বিষয় চিন্তা করিলে কতক বুঝিতে পারা যায়। এই রূপে প্রাচীন হিন্দুসমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বত্রই মূর্ত্তিমতী উন্নতি বিরাজ করিতেছে।

সভ্যগণ! আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য, তবে ইহার সহিত প্রাচীন সমাজের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল। আমরা এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

সভ্যগণ!—আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা যে এক্ষণে কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা ভাবিলে মন এক কালে দুঃখভারে অবনত হইয়া পড়ে। আমাদের অবস্থা কি ছিল, এক্ষণে কি হইয়াছে। যে মিহির অংশুমালা বিস্তার করিয়া জগতীতলে আনন্দের লহরী ছড়াইতে ছড়াইতে বিমল আকাশে হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া যাইতে ছিল, সেই মিহির এক্ষণে জগৎকে অন্ধকার করিয়া দুরন্ত রাহুর ভীষণ কবলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমরা এক্ষণে ঘোর তামস জালে জড়িত, পথহারা, কোন্ পথে যাইলে সুপথে যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমরা কখন কর্দ্দমমধ্যে, কখন কোন পঙ্কিল সরোবরে, কখন কোন ভীষণ অরণ্য-মধ্যে পড়িয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছি। বাস্তবিক যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের অবস্থা অত্যন্ত

অবনত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে আমরা আর পূর্ব্বের ন্যায় একটী স্বাধীন জাতি নহি। আটশত বৎসর কাল পরের জুতা মাথায় করিয়া বহিয়া আসিতেছি। বহু কাল অবধি অন্য জাতির অধীনে থাকিয়া আমাদের মনোবৃত্তি সকল এক কালে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। বন্দীর যেমন কোন কার্য্যে স্বাধীন ভাব থাকে না, আমাদেরও সেইরূপ হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা অধীন হইয়া বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমাদের স্বাধীন হইবার চেষ্টাও নাই, কিম্বা সে ইচ্ছাও নাই। একটী পক্ষীকে যদি বহু কাল অবধি পিঞ্জর-বদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সে আদৌ হয় ত বাহিরে আসিতে চায় না কিম্বা বাহিরে আসিয়া ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় পিঞ্জর-মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের প্রধান দোষ আমাদের কার্য্যে স্বাধীন ভাব নাই। আমরা চেষ্টা করিলে যে কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা অনেক সময়ে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। ইহার কারণ আমরা অত্যন্ত অলস হইয়া পড়িয়াছি। আটশত বৎসর অন্যে আমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। এখন আমরা যদি কোন কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে চাই, উহা আমাদের নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং আমরা একটু অগ্রসর হইয়া পুনরায় পশ্চাতে ফিরিয়া আসি। বাস্তবিক যে সকল দোষ উন্নতির একান্ত প্রতিবন্ধক, সেই সমস্তই আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে। কোন বিজ্ঞ ঋষি এক স্থলে বলিয়াছেন,—

ষড় দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

পৃথিবীতে যাঁহারা সম্পদ লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের অতি নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ ও দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করা উচিত। সভ্যগণ! আমাদিগের মধ্যে একাধারে উক্ত দোষগুলির মধ্যে কোনটীর অভাব আছে কি? আমি বলি কোনটীরও না, তবে আমাদিগের নিদ্রা নাই ব্যসনে নিযুক্ত হইবার সময়, আলস্য নাই পরের অনিষ্ট করিবার সময়, ভয় নাই জগদীশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ করিবার সময়, ক্রোধ নাই প্রবল অনিষ্টকারীর কাছে, আর আলস্য নাই দুষ্কার্য্যে রত হইবার সময়। কিন্তু আমরা এই সকল দোষের জন্য তত ঘৃণার পাত্র হইতে পারি না, তবে আমাদের দোষ সকল জানিয়াও আমরা যে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করি না, এই আমাদের মহৎ দোষ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বহুকালাবধি বৈদেশিকদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া আমাদের মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ মুসলমানেরা আমাদিগকে যেরূপ কঠোরতার সহিত ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। বাস্তবিক মুসলমানদিগের ন্যায় দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী ও ক্রোধান্ধ বিজেতা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ আদিম মুসলমান-আক্রমণকারীদিগকে অনেক পরিমাণে অসভ্য ও নিরক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে অভ্রান্ত

বলিয়া জানিত এবং সেই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাহারা প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করে। তাহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, বিধর্ম্মী-দিগকে যে কোন কৌশলে স্বধর্ম্মে আনিতে পারিলে তাহারা পরলোকে পরম সুখভোগ করিতে পারিবে। আর যদি তাহাতে কাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে সে এক কালে স্বর্গধামে নীত হইয়া অপ্সরোগণের সহিত সুখে বাস করিতে পারিবে। একেই মুসলমানগণ দুর্দ্দান্ত ও সমরপ্রিয়, তাহাতে ইহলোকে শত্রুর ধনলুণ্ঠনে পরলোকে পরম সুখে স্বর্গবাসের আশ্বাস। এই সমস্ত তাহাদিগকে এক কালে মাতাইয়া তুলিল। এসময়ে তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় কাহার সাধ্য। অতএব সভ্যগণ! ভারতের যে কি দুর্দশা হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। তাহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াই হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তি সকল চূর্ণ করিতে লাগিল এবং তাহাতেই যে ক্ষান্ত হইল এরূপ নহে, নরহত্যা, লুণ্ঠন, কীর্ত্তিস্তম্ভ ও গৃহ ধ্বংস, এবং হিন্দুদিগের যাবদীয় পুস্তক সকল নাশ করিতে লাগিল। এ দিকে হিন্দুরা এই রূপে প্রপীড়িত হইয়া যে তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না একথাই বা কে বলিতে পারে? যাহা হউক হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে চির বিদ্বেষ থাকিয়া যায়। কিন্তু দুর্ব্বল ও প্রবলের মধ্যে বিবাদ যেরূপ দুর্ব্বলের মহান্ অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে, এক্ষেত্রেও সেইরূপ হইল। হিন্দুগণ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। মুসলমানগণ কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। দুর্ব্বল হিন্দুগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরমধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিতে বাধ্য হইলেন। এখান হইতে আমাদের মহিলাগণের এরূপ দুরবস্থার সূত্রপাত। এদিকে হিন্দুদিগের বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া যাওয়াতে তাহারা ক্রমশঃ অনুদারচিত্ত হইয়া নানা প্রকার কুক্রিয়ায় আসক্ত হইতে লাগিল। এক কথায় বলিতে গেলে তাহাদের যাবদীয় উন্নতির পথে কণ্টক পড়িয়া গেল। সভ্যগণ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, আমাদের অবস্থা এত নীচ হইয়া পড়িয়াছে কাহার দোষে? আমাদিগের দোষে, না দুর্বৃত্ত বিজেতাদিগের দোষে? তবে আমরা এরূপ বলিতে চাহি না যে, হিন্দুসমাজ এক্ষণে এককালে বিশুদ্ধ ছিল, তাহাতে কোন দোষ ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার প্রভৃতি দোষ হিন্দুসমাজমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে যে অনিষ্ট হইয়াছিল, মুসলমানদের কৃত অনিষ্টের সহিত তুলনা করিলে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। আর একটী কথা, এ সময়ে সমাজের প্রধান বন্ধন একতা-শৃঙ্খল শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, নচেৎ দুর্ম্মতি পাঠানেরা স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমে কখনই প্রবেশ করিতে পারিত না, অভাগা হিন্দুদিগকে দলিত করিতে পারিত না। যাহা হউক এই সময় হইতে অবনত হইতে আরম্ভ হইয়া হিন্দুসমাজ এক্ষণে অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আমাদের দুরবস্থার

কারণ যে কত, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা উপস্থিত হয় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, সাম্যের অভাব। সহজ কথায় আমি বড় তুমি ছোট, আমি মহৎ তুমি ক্ষুদ্র, আমি ধনী তুমি দরিদ্র ইত্যাদি প্রভেদ এবং তন্নিবন্ধন সমাগত বৈষম্য। বাস্তবিক সাম্যের অভাব যে, জাতীয় উন্নতির কত দূর অনিষ্টকারক তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইশা বল, কুশ বল, লুথার বল, রামমোহন রায় বল, যে কোন মহাত্মা অবনত সমাজকে উন্নত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারাই সাম্য সংস্থাপনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গিয়াছেন। সাম্য না থাকিলে যে কোন জাতি কোন মহৎ ও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জাতিভেদ সাম্যের এক প্রধান প্রতিযোগী। এমন কি যেখানে জাতিভেদ সেখানে কখনই সাম্য থাকিতে পারে না। আমাদিগের মধ্যে এক জাতিভেদ নিবন্ধন সাম্যের এত দূর অভাব যে, পৃথিবীতে কোন জাতির মধ্যে সেরূপ লক্ষিত হয় না। জাতিভেদ যে আমাদের কত অনিষ্ট করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা আমাদের সমাজের বন্ধন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে একটী বিদ্বেষ ভাব আনিয়া প্রবেশ করাইয়াছে। প্রকৃত সমাজ যাহাকে বলে আমাদের সমাজ তাহা হইতে অনেক ভিন্ন। জাতীয় সম্মিলনই যখন সমাজ তখন যেখানে তাহার অভাব তাহাকে সমাজ বলিব কেমন করিয়া? অতএব সভ্যগণ! যদ্দ্বারা প্রকৃত সমাজের অস্তিত্বের পর্য্যন্ত লোপ হয় তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, একতার অভাব। আমাদের মধ্যে যে একতার অভাব হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা ও অনাবশ্যক। সভ্যগণ একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, আর ইহার অনিষ্টকারিতা কত দূর তাহাও জানিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ, স্ত্রীশিক্ষার অভাব। ইটী জাতীয় অবনতির একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আমাদের দেশে শিশুগণ মাতার নিকটে লালিত পালিত হইয়া থাকে। মাতা যদি শিক্ষিতা হন তাহা হইলে পুত্রের অনেক উপকার হইতে পারে। জর্জ ওয়াসিংটন প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের মাতার গুণেই তাঁহাদের উন্নতি। স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক অনিষ্ট। কারণ শিক্ষিতের সহিত অশিক্ষিতের মিলন অতি বিসদৃশ। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে কখনই মনের মিলন হইতে পারে না। একজন লোক যখন স্বদেশের হিতানুষ্ঠানের একটী কল্পনা করিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী হয় ত সে সময়ে অলঙ্কারাদির চিন্তাতেই ব্যস্ত। এরূপ স্থলে যদি তাঁহার স্ত্রীর নিকট অভিমত প্রকাশ করেন, তাঁহার স্ত্রী তাহাতে যোগদান করা দূরে থাকুক, হয় ত হাসিয়াই উড়াইয়া দেন অথবা তাহার প্রতিকূলে নানাপ্রকার অযৌক্তিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া

থাকেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী যদি তাঁহার সহিত যোগ দান করিতেন, তাঁহা হইলে, তাঁহার উৎসাহ কত দূর বর্দ্ধিত হইত বলা যায় না। বোধ হয়, তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছুই হইল না। তিনি হয় ত মনে মনে কিছু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিলেন না। কারণ তিনি জানেন যে, মানিনী মানে বসিলে তাঁহার মান ভঙ্গ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে, অধিকন্তু লাভ হইবে যে, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব জাতীয় উন্নতি করিতে গেলে স্ত্রীশিক্ষার উপর বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। * স্ত্রীলোকের চরিত্র উন্নত হইলে সমাজের যে মহান্ উপকার হয়, তদ্বিষয়ে আমরা একটী প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ লইয়া যে এত আন্দোলন করিতেছেন তাহার কারণ শুনিলে সভ্যগণের মধ্যে অনেকে চমকিত হইবেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা একটী বালবিধবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ঈশ্বর! তোমাদের শাস্ত্রে সকলেই লিখে আর এই অভাগিনী বালবিধবাদিগের বিবাহের কথা কি কিছুই লিখে না? এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং সংস্কৃত কালেজের পুস্তাকাগারে অন্বেষণ করিয়া মনুসংহিতা হইতে এই শ্লোকটী বাহির করিলেন।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতির ন্যো বিধীয়তে॥

ইহা ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থসকল হইতে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে অনেক বচন বাহির করিলেন। এই কয়েকটী শ্লোক সম্বল লইয়া তিনি তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ঘোর আন্দোলন পড়িয়া গেল। কেহ বিধবাবিবাহের সপক্ষে, কেহ বিপক্ষে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। চারি দিকে তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। অবশেষে বহু বাক্‌বিতণ্ডা ও বহু তর্কবিতর্কের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই জয় হইল। আর এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন যে দীন (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) কোথায় বিধবাবিবাহ দিতে গিয়াছিল, দুষ্ট লোকে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা বলেন, অনেকের পুত্র নানাপ্রকার অসৎ কার্য্য করিতে গিয়া হত হইয়া থাকে। আমার পুত্র ত তাহা কিছুই করিতে যায় নাই। সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যদি তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই; ইহাতে আমাদের গৌরব ভিন্ন অগৌরব নাই। এক্ষণে সভ্যগণ দেখুন, রমণীচরিত্রের মহত্ত্ব কত দূর, আর তাহা দ্বারা কত মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব স্ত্রীলোক-দিগকে যদি রীতিমত শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহা হইলে যে, নানা সুফল উৎপন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

* আমরা এই বিবরণটী বামাবোধিনী পাঠে অবগত হইয়াছি।

চতুর্থতঃ, বাল্যবিবাহ। সভ্যগণ! এই প্রথা যে কিরূপ ঘৃণাকর ও সমাজের অমঙ্গলদায়ক তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। বিবাহ যে কি, ও তাহার উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে যেন একটী স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়। কিন্তু আমাদিগের হস্তে পড়িয়া সেই বিবাহের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছে। মনুষ্যমাত্রেরই জগতে একটী বন্ধন চাই; নচেৎ তিনি ইহ জগতে সুখী হইতে পারেন না। বিবাহ সেই বন্ধন। কিন্তু এই বন্ধনে বাল্যকাল হইতে বাঁধা পড়িয়া আমাদিগের যুবকদিগের যে কি দুর্দ্দশা হয় তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের যে বিবাহ তাহা মাতা পিতার ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল মাতা পিতা মনে করেন, পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তাঁহাদিগের পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের চূড়ান্ত হইয়া গেল। অতএব সে কার্য্য যত শীঘ্র সমাধা করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল? কিন্তু এই বিবাহে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। এ দিকে পুত্র বাল্যকাল হইতে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া লেখা পড়ার বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। ও দিকে আবার নব দম্পতীর বয়োবৃদ্ধি অনুসারে দেশের অধিবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যত দিন পিতা বর্ত্তমান রহিবেন তত দিন পর্য্যন্ত পুত্রের লালন-পালনের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইল না বটে, কিন্তু যখন তাঁহার পিতা ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখনই বিষম বিভ্রাট; যত ভার আসিয়া এককালে পুত্রের ঘাড়ের উপর পড়িল। তিনি সংসার-স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। কেরাণীগিরিরূপ তৃণ যাহা সম্মুখে পড়িতে লাগিল তাহাই আশ্রয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ভারে তাহারা সকলেই ডুবিয়া যাইতে লাগিল। তিনি নিরাশ্রয় হইয়া কূল উদ্দেশে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যদি কূল নিকট হইল তাহা হইলেই মঙ্গল। নচেৎ সেই প্রবল স্রোতে জলবুদ্বুদের ন্যায় কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। ইহার উদাহরণ অন্বেষণ করিলে বোধ হয় প্রতিগৃহেই দৃষ্ট হইবে। আবার ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অপক্ব বীর্য্যে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা প্রায় দীর্ঘজীবী হয় না কিম্বা তাহাদের বুদ্ধিশক্তি তাদৃশ মার্জ্জিত হইতে পারে না। অতএব এই প্রথাটী শীঘ্র রহিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

পঞ্চমতঃ, বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হওয়া। ইহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদিও কোন অনিষ্ট হইতেছে না, তথাপি পরোক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। ভারতমাতা সতীত্বের যে গৌরব করিয়া থাকেন, ইহাতে সেই সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কত কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতেছে এবং পাপস্রোতে ভারত ভাসিয়া যাইতেছে।

ভ্রাতৃগণ! স্মরণ করিয়া দেখ দেখি, যে

সকল বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে পিতৃহীন হন তাঁহারা তোমাদের কাছে কোন্ অপরাধে অপরাধিনী? তোমার স্ত্রীবিয়োগ হইলে তুমি সপ্তম পক্ষের সংসার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হও না! কিন্তু তোমার কন্যা বাল্যকালে পতিহীনা হইলে তাহার ইহ জগতে সকল সুখ ফুরাইল। তখন তাহাকে থান পরাইয়া অলঙ্কারবিহীন করিয়া একটী কিম্ভূত কিমাকার জন্তু করিয়া গৃহে রাখিয়া দাও। আহা! সেই অবলাগণের নিশীথ-সময়ের অস্ফুট ক্রন্দন ও তাহাদের সেই মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণার বিষয় স্মরণ করিলে কোন্ পাষাণ হৃদয় না দ্রবীভূত হয়। উঃ! ভারত এককালে অধঃপাতে গিয়াছে। সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করে না। নিরাশ্রয় নিরুপায় শক্তিহীন বলিয়া তাহাদিগের প্রতি কেহ একবার চাহিয়াও দেখে না। সকলে আপন২ সুখ-চিন্তায় রত। এত অত্যাচারে দেশের কখন মঙ্গল হয় না। সেই যে অবলাগণের চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে তাহা বারিধারা নহে; জানিও, তাহা তরল অনল। সেই অগ্নিতে ভারত ছারখার হইয়াছে; আরও যদি বিমোচনের চেষ্টা না কর, তাহা হইলে ভারত আরও ছারখার হইবে, তোমাদের এক্ষণে যে দুর্দ্দশা হইয়াছে আরও তাহার শতগুণ দুর্দ্দশা হইবে, তোমাদিগের দুঃখে শৃগাল কুকুর পর্য্যন্ত কাঁদিবে। তোমরা বিধবাদিগের বিবাহ দেও না কেন; কত কাল আর দেশাচারের দাস হইয়া অবলাগণকে তাহাদের হৃদয়ানলে দগ্ধ করিবে; এক বার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পাপে ভারতমাতা টলমল করিতেছেন এবং তোমাদিগের ভার তাঁহার অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। আর মহামায়ার মুগ্ধ হইয়া থাকিওনা; শাস্ত্রে যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অনুষ্ঠান করিতে কুণ্ঠিত হইও না; শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য কর; আপনাদিগের মনুষ্যত্বের পরিচয় দেও; পূরাকালীন আর্য্যগণের ন্যায় আপনাদিগের কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে যত্ন কর। তোমরা নিশ্চয় জানিও, যত দিন পর্য্যন্ত তোমরা দেশাচারের দৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে সক্ষম না হইতেছ, তত দিন কখনই তোমাদিগের উন্নতি হইবে না। আমরা কারণান্তর উল্লেখ করিয়া অগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মগণকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি, তাঁহাদের সাধু চেষ্টায় শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি, আর যে সমস্ত মহাত্মগণ এই সাধু চেষ্টার পৃষ্ঠপোষক তাঁহাদিকেও শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

ষষ্ঠতঃ, বহুবিবাহ। এই কথাটী মনে হইলেই যেন কৌলীন্য-প্রথার কথাটী মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাস্তবিক এই প্রথাই বহুবিবাহের প্রধান কারণ। বহুবিবাহ কুলীনদিগের মধ্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ শুনা গিয়াছে যে, একটী কুলীন যুবক একশত কিম্বা ততোধিক পর্য্যন্ত বিবাহ করিতেন, কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত তাঁহার বড় সাক্ষাৎ হইত না। বঙ্গীয় বিধবা ও কুলীন মহিলা এই উভয়ের

অবস্থাই প্রায় সমান; তবে প্রভেদ এই যে, কুলীন মহিলাগণ পতি সত্ত্বেও পতিসুখে বঞ্চিতা। বল্লালসেন এই প্রথার প্রবর্ত্তক। সমাজের গুণী ও সচ্চরিত্র লোকদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি এই প্রথার সৃষ্টি করেন; কিন্তু কালে কৌলীন্য গুণ-জ্ঞাপক না হইয়া বংশজ্ঞাপক হইয়াছে। কুলীন বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে এই কয়টী গুণ থাকা চাই।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥

কিন্তু আধুনিক কুলীনদিগের মধ্যে এ নব গুণের কোনটীও বোধ হয় দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু তাহাদের মধ্যে অনেককে নানাপ্রকার কুক্রিয়াসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এই প্রথাটী যে-রূপ অনিষ্টকর ও অরুচিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহা যত শীঘ্র রহিত হয় ততই মঙ্গল। আর একটী কথা কুলীন ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে, এপ্রকার বিবাহ এক কালে নাই ইহা আমরা বলিতে চাই না। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এপ্রকার জঘন্য বিবাহ প্রচলিত আছে; কিন্তু তাহা সচরচার সংঘটিত হয় না। যাহা হউক, আনন্দের বিষয় এই যে, বহুবিবাহের প্রকোপ এক্ষণে অনেক কমিয়া আসিয়াছে। অনেকে কুলমর্য্যাদার ভয় না করিয়া বংশজঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। বহুবিবাহের দোষ যে কত, বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষের বিষময় ফল যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি তাহা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন।

সপ্তমতঃ, বালকগণের নীতিশিক্ষার অভাব। এ অভাবটী আমাদের দেশে যেরূপ লক্ষিত হয় সভ্য জগতের কোন স্থলে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় সর্ব্বত্রই বালকদিগকে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় আছে, কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ কিছু নাই। বালক-দিগকে নীতি শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কারণ বাল্যকালে মন অতি সরল ও নির্ম্মল থাকে; সে সময়ে যাহা অভ্যাস হয় তাহা চীর জীবন থাকিয়া যায়; সুতরাং এসময়ে বালকদিগকে নীতিশিক্ষা দিলে তাহারা আজীবন যে নীতিপরায়ণ হইয়া চলিবে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে অনেক পিতা মাতা মনে করেন, পুত্রকে লেখা পড়া শিক্ষা দিলেই তাহার প্রতি তাঁহাদের যাবদীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা হইল; কিন্তু বাস্তবিক এরূপ সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। পিতা মাতার এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কার নিবন্ধনই অনেক যুবক অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে। তাই বলি, পুত্রকে কেবল লেখা পড়া শিক্ষা দান করিয়া ক্ষান্ত থাকা পিতা মাতার উচিত নহে। তাহাদের নীতিশিক্ষা ও অভ্যাসের উপর দৃষ্টি রাখা তাঁহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

অষ্টমতঃ, উৎসাহরাহিত্য। এই অভ্যাসটী সংক্রামক পীড়ার ন্যায় অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ হইতে পঞ্চমবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত সকল ভারতবাসীকেই সংক্রামিত করিয়াছে। কালসহকারে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস

না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের কোন একটী হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে মনে করেন যে, তিনি একক চেষ্টা করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন না। অতএব তাহা করিতে তাঁহার চেষ্টা পাওয়া বৃথা। এইরূপ মনে করিয়া তিনি ঈপ্সিত বিষয়ের চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া পড়েন। বাস্তবিক জগতে এরূপ অনেক কার্য্য আছে যাহা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না; কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, আমরা এক কালে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইয়া থাকিব এরূপ নহে; যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, যাহা স্বদেশের উন্নতিবিধায়ক বলিয়া জানিতে পারিব, জীবন মন সমর্পণ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিব; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে তাহা ঘোষণা করিয়া বেড়াইব; তাহার সারবত্তা সকলের নিকট প্রতিপন্ন করিয়া সকল স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিব। সত্যের নিমিত্ত জীবন দান অপেক্ষা মনুষ্যজীবনের প্রশস্তবর চরম আশা আর কি হইতে পারে? আবার কতকগুলি এরূপ কার্য্য আছে যাহা আমাদের স্বাধীন চেষ্টার উপর নির্ভর করে। তজ্জন্য অন্যের সাহায্য আবশ্যক হয় না। এরূপ স্থলে বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের কার্য্য করা উচিত। এইরূপ করিতে গেলে সমাজের নিকট আত্মীয় স্বজনের নিকট নিন্দনীয় হইতে হইবে স্বীকার করি; কিন্তু সত্যের অনুরোধে সহ্য করিতে পারা যায় না এমন কিছু জগতে আছে কি না সন্দেহ। প্লেটো সত্যের অনুরোধে জীবন দিলেন। লুথার সত্যের অনুরোধ কি অত্যাচার সহ্য না করিয়াছিলেন। ম্যাটসিনি সত্যের অনুরোধে কারাগারে আজীবন ঘোর নরকযন্ত্রণা সহ্য করিলেন। কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন প্রাণান্তেও তৎপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। আর একটী কথা, আমাদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় এ কথাটী বলিয়া থাকেন "এখন এ কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই; সময় আসিলে এ সব কার্য্য আপনা আপনি সম্পন্ন হইবে" কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, সময় কি একটী হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট জন্তু যে, হামাগুড়ি দিয়া ক্রমে উপস্থিত হইবে? সময় আইসে নাই, এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। রামমোহন রায় যখন প্রথম বিলাত গমন করেন তখন কি সময় তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল? মধুসূদন গুপ্ত যখন প্রথমে শবচ্ছেদ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন তখন কি সময় তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল? বাস্তবিক "সময় আইসে নাই" এ কথার যে কিছু অর্থ আছে আমার বোধ হয় না।

এতদ্ভিন্ন বহুবিধ দোষ আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই দোষ প্রভাবে অনেকেই প্রায় "সুরাপান-নিবারিণী" "অত্যাচার-নিবারিণী" প্রভৃতি সভা প্রায় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেখিতে পাইতেছেন। যাহা হউক এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের সমাজে একটী বিপ্লব-স্রোত বহিয়াছে। আমাদের একজন বিজ্ঞ সম্পাদক বলিয়াছেন "কালকৃত বিপ্লব-স্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যিনি তাহার বিপরীতগামী হইবেন তাঁহাকে হাবুডুবু খাইয়া বিষম

কষ্ট পাইতে হইবে"। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যে এককালে নিরর্থক আমরা তাহা বলি না, কিন্তু যদি সেই স্রোতে গা ঢালিয়া এককালে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি, তাহা হইলে সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়া অনন্ত সাগরের মধ্যে কোথায় লীন হইয়া যাইব তাহার চিহ্নমাত্রও পাওয়া যাইবে না। তাই বলি, বিপ্লব-স্রোতে গা ঢালিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকিয়া সাধ্যমত কূলের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। এরূপ করিলে এক দিন না এক দিন আমরা স্রোত হইতে উঠিতে পারিব। যাহা, হউক সুখের বিষয়, ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এক্ষণে আমাদের উন্নতির নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদের যাবদীয় কুসংস্কার দূর করিয়া সংস্কৃত বৈদিক ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে যত্ন পাইতেছেন। কিন্তু সভ্যগণ! কেবল তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। যদি সমাজের উন্নতির নিমিত্ত আমাদিগের কিছুমাত্র যত্ন থাকে, যদি সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া আমরা কিছুমাত্র কাতর হইয়া থাকি, তাহা হইলে, আসুন, আমরা এই সমস্ত ভার আপন আপন হস্তে লইয়া সমাজের দোষ সকল বিদূরিত করিতে চেষ্টা করি, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করি, ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করি। সভ্য গণ! নিশ্চয় জানিবেন, যদি আমরা সমাজ-সংস্কারে যত্নবান্ না হই, যদি সত্যের অনুধাবনে বিমুখ হই, শাস্ত্রকে পদে দলিত করি, দেশাচারের দাস হইয়া থাকি, তাহা হইলে, যুগ যুগান্তর কাটিয়া যাইবে, জগতে নৈসর্গিক অনৈসর্গিক কত পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু ভাগ্যদেবী আমাদিগের উপর আর প্রসন্ন হইবেন না, আমাদিগের গৌরব-রবি আর কখন দেখা দিবে না।

উপসংহারে আমরা মহাত্মা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ডেভিড হেয়ার ও মিস্ কার্পেণ্টার প্রভৃতি আমাদের সমাজের হিতৈষিগণকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বিদায় হই।

দুর্গাপূজা। *



১

সুখদা এলে মা বঙ্গে সুখী বঙ্গবাসী;
　তিন দিবসের জন্য
　কৈলাস করিয়া শূন্য
ধরণী হইল ধন্য চরণ পরশি।

২

প্রবাসী আসিছে বাসে কতই আমোদে,
　চির নির্ব্বাসিত যারা
　আসিবে না আর তারা
তবে কি মা চির দিন যাপিব বিষাদে?

* লেখিকার স্বামীর মৃত্যুর পর এই কবিতাটী লিখিত হয়। প্রকাশক।

৩

তবে কি আনন্দময়ি! এ আনন্দ দিনে
মলিন বদনে হায়
দুটী চক্ষু ভেসে যায়
দুখিনীর বেশে বাসভূষণ-বিহীনে।

৪

স্বর্ণ অলঙ্কারে তুমি ভূষিতা জননি!
তোমার সম্মুখে গিয়ে
পদযুগে প্রণমিয়ে
দাঁড়াইলে অনাথিনী তোমার নন্দিনী

৫

তখন মা কি কথা বলিয়ে প্রবোধিবে?
তুষিবে কি আশীর্ব্বাদে
কি বর দিয়ে বরদে!
বল গো মা অন্তরের জ্বালা নিবাইবে?

৬

যে দিন স্বর্ণ-প্রতিমা হবে বিসর্জ্জন
যাব গো তোমার সঙ্গে
ভাসিব সিন্ধু তরঙ্গে
ও চরণে এই ভিক্ষা মাগে আকিঞ্চন।

৭

লইব না ব্রহ্মময়ি তোমার স্মরণ
দেখিব না দশভুজা
করিব না আর পূজা
চাহিব না আর ধন মনের মতন।

৮

আর আমি করিব না মঙ্গলাচরণ
সাজায়ে বরণ-ডালা
ধূপ দীপ ফুলমালা
জবা বিল্বদল শুভদল সচন্দন।

৯

বাজাব না শঙ্খ তব আগমনকালে,
দিব না জলের ধারা
ওগো হর-মনোহরা
লিখেছ অশুভ সব অভাগীর ভালে।

১০

দিব না অঞ্জলি পদে বিপদনাশিকে
আহ্বান করিয়া দ্বিজে
কুমারী সধবা পূজে
চাহিব না শুভ ফল আর গো অম্বিকে!

১১

করিব না গৃহদ্বার সিন্দূরে রঞ্জন,
বারিপূর্ণ ঘট রেখে
সাজাইয়ে আম্র শাখে
মঙ্গল কদলীবৃক্ষ করিয়া স্থাপন।

১২

শঙ্খবারি লৌহ-রুলি দিব না মা আর
সিন্দূরে তোমার ভালে
দিব না মা এই কালে
এই কালে এই হ'ল কপালে আমার।

১৩

করিব না আর মহাষ্টমী মহাব্রত
আশা পূর্ণ কর ব'লে
হাতে মাথে ধুন জ্বেলে
তোমার সম্মুখে বসে ভক্তিযুক্তচিত।

১৪

সঙ্কটে শঙ্করি তোরে মানিব না আর
রক্ষা কর রক্ষাকালি!
এ কথা কি আর বলি
বুক চিরে রক্ত দিয়ে শুধিব না ধার।

১৫

সমর্পিয়ে সন্ধি নবমীর মহোৎসব।
　　জ্বালিয়ে নূতন বাতি
　　তোমার আরতি সতি!
দেখিতে উৎসুক বঙ্গ-পুর-নারী সব;

১৬

সে আমোদে আমোদিতা হবে না দুখিনী
　　ভূষি নব অলঙ্কারে
　　নূতন বসন পরে
অলক্তে রঞ্জন করে চরণ দুখানি।

১৭

নূতন দর্পণে মুখ দেখিব না আর
　　নূতন চিরুণি ধরে
　　কেশের সংস্কার করে
সাজাব না আর তাতে কুসুমের হার।

১৮

গন্ধদ্রব্য এ শরীরে মাখিব না আর
　　বলে কি জানাব আমি
　　অন্তরে মা জান তুমি
অন্তর্যামী অন্তরের জ্বালা বিধবার।

১৯

কাঁদিব না আর মা গো দক্ষিণান্ত হলে।
　　ভয়ে হব না উতলা
　　ভেবে মন্দ অশ্ব দোলা
হব না নির্ভয় হস্তী তরণীতে এলে।

২০

পঞ্চগুড়ি আসনে মা বসাব না আর,
　　আলিপনা চিত্র তুলি
　　বিল্বমূলে এস বলি
করিব না ষষ্ঠী বেল বরণ তোমার।

২১

হে সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি মঙ্গলদায়িকে
　　দেশের মঙ্গল লাগি
　　মা গো এই ভিক্ষা মাগি
দাও চতুর্ব্বর্গ বাঞ্ছা পুরাও কালিকে!

২২

আগামী বৎসরে শিবে! এস মা আবার
　　থাক লক্ষ্মী কৃপা করে
　　অন্নপূর্ণা তব বরে
পূর্ণ হ'ক অপূর্ণা গো এ-বঙ্গ ভাণ্ডার।

২৩

চিরদুঃখী বঙ্গ, মা গো জগত-ভিতরে
　　সর্ব্ব জাতি নিন্দে অতি
　　দয়া কর তার প্রতি
দুর্ভিক্ষ মরক-ভয়ে রাখ কৃপা করে।

২৪

আমাকে ত ভেজেছ মা জনমের তরে;
　　সহুক সে ফের প্রাণে
　　দেখো মা বঙ্গের পানে
সমভাবে চির দিন করুণ অন্তরে।

২৫

শুভ অমাবস্যা বঙ্গে আসিবে মা তুমি
　　স্থাপি ঘট চণ্ডীপাঠ
　　বিবিধ বাজনা নাট
সর্ব্ব সুখে পরিপূর্ণ এ ভারতভূমি।

২৬

নবমীর মহোৎসব তোমার উদ্দেশে
　　তোমার ভকত সবে
　　জাগে রাত্রি মহোৎসবে
অভাগিনী জাগে নিশি চক্ষুজলে ভেসে।

২৭

এস লক্ষ্মী থাক ঘরে বলিব না আর
সুমঙ্গল-সন্ধ্যাকালে
সঙ্খধ্বনি দীপ জ্বেলে
কমলা কমলফুলে চরণ তোমার।

২৮

সাজাব না দয়াময়ি! আর মনসাধে
শ্রীহীনা কুৎসিতা বেশে
যেতে লক্ষ্মি! তব পাশে
লজ্জা হয় দুখে বুক ফাটে মনখেদে।

২৯

পঞ্চ উপাচারে পূজা পঞ্চ দীপ জ্বেলে
অপর বাসনা নাই
কেবল পঞ্চত্ব পাই
এই ভিক্ষা চাই মা গো চরণ-কমলে।

৩০

মর্ত্তে কেউ নাই তত্ত্বকরে এক বার
দুর্গোৎসব মহাদিনে
দিন পায় অতি দীনে
চির দিন সম দীন রহিল আমার।

বঙ্গীয় সমালোচক।



ভিষক্‌, বিচারক ও সমালোচক এই তিন জনই এক শ্রেণীর ব্যক্তি। রোগ-সঙ্কুল মানব-দেহ, অত্যাচার-বিধ্বস্ত মানব-সমাজ ও নিয়ত উন্মার্গগামী মানব-সাহিত্যের মঙ্গলের জন্য এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তির অস্তিত্বই ইহ সংসারে আবশ্যক, নহিলে মানুষের শরীর, সমাজ ও সাহিত্য সকলই অচিরে অধঃপাতে যায়; কিন্তু যদি ইহারা স্থূলবুদ্ধি ও অবিবেচক হন, ইহাঁদের দ্বারা উপকার সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত সময়ে সময়ে শরীর, সমাজ ও সাহিত্যের সমূহ অপকারই সংসাধিত হইয়া থাকে। যমই বা কি নিষ্ঠুর, শয়তানই বা কি অপকারী ও রাক্ষসই বা কি ভয়ঙ্কর! ইহাঁরা যম, শয়তান ও রাক্ষস অপেক্ষায় সহস্রগুণ নির্দ্দয়, অত্যাচারী ও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ান। তখন ভিষক্‌ তাঁহার তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া, স্ফোটকের পরিবর্ত্তে, রোগীর অক্ষত বক্ষঃস্থলে আমূল বসাইয়া দিয়া তাহাকে ভবযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার করিয়া দেন; বিচারক দোষীকে চিনিতে না পারিয়া নিরাপরাধী বেচারীর জন্য ফাঁসিকাষ্ঠের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে কৃতান্তের হস্তে অর্পণ করেন এবং; সমালোচক নিজের নির্বুদ্ধিতা-জনিত ভ্রম না দেখিয়া গ্রন্থকারের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রসাতলের তিমিরময় গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। হে ঈশ্বর! তুমি দয়া করিয়া এইরূপ ভিষক্‌ বিচারক ও সমালোচকের হস্ত হইতে আমাদের প্রিয় বঙ্গভূমিকে রক্ষা কর।

কুৎসা, বিদ্রূপ ও সমালোচনা এ তিনটী

এক জিনিস্ নহে। পরীবাদ-প্রিয় ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কতিপয় সত্য বা কাল্পনিক দোষের বাজরা মাথায় করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বিদ্রূপ-প্রিয় ব্যক্তি ভ্রাতার শিরঃস্থিত আধার হইতে সেইগুলি, গ্রহণ করিয়া হাস্য-তামাসা-সংযোগে এক অভিনব উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করেন, এবং তাহাতে বিবিধপ্রকার রং মাখাইয়া, প্রবঞ্চক দোকানদার যেমন বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ করিয়া নিরীহ খরিদদারের চক্ষে ধূলি প্রদান করে ও স্বেচ্ছামত নিজের পচা জিনিস্ পাচার করিয়া থাকে, ইহাঁরাও তেমনি অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আহ্লাদে নৃত্য করে। বোকা খরিদদার উপাদেয় ভাবিয়া কতকগুলা হেয় সামগ্রী গৃহে আনিয়া প্রতারিত হয়। কিন্তু যিনি সমালোচক, এরূপ ঘৃণিত কোন কার্য্যেই তিনি ব্রতী হইতে পারেন না। নিন্দুকগণের ন্যায় সাধারণকে প্রতারণা করিবার তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তিই হয় না। তিনি মনুষ্যের চক্ষে ধূলি দিয়া সাহিত্য-বাজারের হেয় দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিতে চাহেন না, এবং ভাল জিনিস্‌গুলিকেও বিদ্রূপের খোলায় চড়াইয়া, কোন অপরূপ পদার্থে পরিণত করিবার জন্য অগ্রসর হন না। স্থূল কথা এই, তাঁহার দোকানে কৃত্রিমতা নাই। তিনি ভালকে মন্দ বলেন না ও মন্দকেও স্বর্গে তুলিয়া দেন না। তিনি বিচক্ষণ জহরীর ন্যায় ঝুঁটা হইতে আসল প্রস্তর সকল বাছিয়া লইতে পারেন এবং কোন্ খানি কোন্ খানে বসাইলে বেশ মানাইবে তাহাও সহজে বুঝিতে পারেন। কিন্তু এরূপ বিচক্ষণ জহরী বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে অতীব বিরল। কেহ আপনার প্রিয়তম সুহৃদকে সুখ্যাতি করিবার জন্য, কেহ বা শত্রুকে নিন্দা করিবার জন্য, কেহ বা অপরকে বিদ্রূপ করিয়া বাহবা লইবার জন্য, সমালোচনারূপ দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন। ভারতী-বান্ধবাদি সম্পাদকগণের ন্যায় ন্যায়বান্ সমালোচক বঙ্গদেশে কয় জন বর্ত্তমান? কেহ বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের ন্যায়, পুস্তক না পড়িয়াই তাহার সমালোচনা করিয়া বসেন, কেহ বা পুস্তকখানি বড় হইয়াছে বলিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠেন, কেহ বা ব্রহ্মাকে নিবেদন করিয়া পুস্তক ভাল কি মন্দ পরীক্ষা করেন, কেহ বা পুস্তকের নাম দেখিয়াই কেমন পুস্তক বলিয়া দিতে পারেন, কেহ বা লেখকের নামমাত্র শুনিয়া কেশ ডিগ্রি বা ডিস্‌মিস করিয়া ফেলেন, কেহ বা বিজ্ঞাপনটী পড়িয়াই গ্রন্থকারের শ্রাদ্ধের উদ্যোগ দেখেন, কোন রসিক সমালোচক বা স্ত্রীলোকের লেখা পাইলেই আপনার বিদ্রূপের দোকান খুলিয়া বসেন, কেহ বা সমালোচ্য পুস্তকে আপনার মতের বিপরীত উল্লেখ দেখিয়া তেলে বেগুনে জলিয়া উঠেন এবং সমালোচনা-রূপ তরবারি উত্তোলন করিয়া, ধর্ম্মান্ধ মহম্মদ-শিষ্যগণ কাফর দেখিলেই যেমন মস্তকচ্ছেদনোদ্দেশে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়, তেমনি স্বাধীনচেতা লেখকের পশ্চাৎ ছুটিতে থাকেন এবং একটু সুবিধা পাইলেই তাহার মাথাটি কাটিয়া ফেলেন। অন্য কতিপয় মেধাবী সমালোচক ছোট আদালতের বিচারপতির ন্যায় দুই চারিমিনিটেই আপনাদের কার্য্য হাসিল করিয়া দেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিদিন রাশি রাশি পুস্তকাদি প্রসব করিতেছে। সমালোচক সেই রাশীকৃত গ্রন্থগুলি হইতে কোন্ খানি সুপাঠ্য ও কোন্ খানি অপাঠ্য, সাধারণ পাঠকগণের নিমিত্ত বাছিয়া দিবেন। প্রতিদিন যে সকল পুস্তক, প্রবন্ধ ও পত্রিকা বাহির হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, পাঠকগণ যদি এক এক করিয়া অভিনিবেশ সহকারে সকলগুলি পড়িতে যান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পুস্তক কোলে করিয়া স্থাণুবৎ বসিয়া থাকিতে হয়। এরূপ করিয়াও তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হয় কি না সন্দেহ। সমালোচক যদি মন্দ হইতে ভাল গ্রন্থগুলি বাছিয়া দেন, পাঠকগণকে তাহা হইলে আর অনর্থক সময় নষ্ট করিতে হয় না। এক জনমাত্র ব্যক্তির এ কার্য্যে ব্রতী হওয়া অসম্ভব। সকল সম্পাদকের এই বিষয়ে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

প্রতিভাসম্পন্ন লেখকগণকে উৎসাহ প্রদান করা সমালোচক মাত্রেরই জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হৃদয়বান্ সমালোচক সুলেখকগণকে উৎসাহ দান ও বিপথগামী দুর্ব্বলপ্রকৃতি লেখকগণকে সাহায্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সাহিত্যক্ষেত্রের সরল পথ দেখাইয়া দেন। বাষ্পীয় শকটের দ্রুতগতি ও কার্য্যকারিতার পক্ষে যেমন উপযুক্ত বাষ্পের আবশ্যকতা, লেখকগণকে উন্নতির পথে দৌড় করাইবার জন্য তেমনি উৎসাহের প্রয়োজন। কিন্তু সাবধান! অধিক পরিমাণে ষ্টিম্ পূরিও না, কল বিকৃত হইবে, অথবা প্রশংসা করিয়া নব্য লেখকের অধঃপতনের সোপান প্রস্তুত করিয়া দিও না। দুর্ব্বলতা বশতঃ যে সকল লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ছুটিতে ছুটিতে পড়িয়া যাইতেছেন, সমালোচকগণ যেন বন্ধুর ন্যায় তাঁহাদের সাহায্য করেন। তাঁহাদের মাথায় লাঠি না মারিয়া যদি সুপরামর্শরূপ একগাছি যষ্টি তাঁহাদের হস্তে প্রদান করা যায়, বলা বাহুল্য, পদ-স্খলিত এই বিপন্ন লেখকগণের, তাহা হইলে, যথেষ্ট উপকার করা হয়; কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, আমরা দেখিয়াছি, অনেক সমালোচক এই সময় এরূপ লেখকগণকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, লাঠি মারিতে২ তাঁহাদিগকে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিয়া আসেন, কেহ কেহ বা, কাক যেমন মৃত জীবের নাড়ী ভুঁড়ি খাইয়া সন্তুষ্ট হয়, তেমনি সেই পতিত লেখকের মুণ্ড ভক্ষণ করিয়া উল্লসিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পথ চিনিতে না পারিয়া বিপথে পদার্পণ করে, তাহাকে সাধু-স্নুন্ন সরল পথ প্রদর্শন করা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এরূপ বেচারীকে বলপূর্ব্বক নৈরাশ্যের গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া আমোদ উপভোগ করাকে আমরা পাপ মনে করি। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কুনীতি ও কুরুচির দুর্গন্ধময় পথে বিচরণ করে,

সমালোচকগণ যদি সকলে মিলিত হইয়া তীব্র সমালোচনারূপ বংশখণ্ড দ্বারা তাহার গ্রন্থের মাথা ভাঙ্গিয়া দেন, তাহা হইলে, তাহাতে আমাদের আহ্লাদ বই কিছু মাত্র দুঃখ হয় না। সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে বিষতরুগুলির চারা সমূলে উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। অশ্লীলতাপূর্ণ কুরুচিসম্পন্ন পুস্তকগুলি বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিষবৃক্ষ। সুকুমারমতি বালক ও তরলমতি যুবকগণ এই বিষবৃক্ষগুলির সেবা করিতে গিয়া অকালে প্রাণে মারা যায়। ইহাদের কেমন যে একটা আকর্ষণ আছে, আমোদপ্রিয় অজ্ঞান নর-নারীগণ ইহাদিগকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া ইহাদের তলায় বসিতে যায়, মনে করে, বুঝি প্রাণ মনঃ এই বার জুড়াইবে; কিন্তু প্রাণ মনঃ জুড়ান দূরে থাকুক, বিষতরুর সংসর্গে তাহাদের চরিত্রে এমনি ভয়ানক ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়, যে, তাহার জ্বালায় শেষে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, চরিত্র ক্রমে পচিতে আরম্ভ হয়, দুর্গন্ধে সে স্থান ভরিয়া যায়। সাধুগণ সে পূতিগন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যত্র পলায়ন করেন। কিন্তু বিষের চারাগুলি অঙ্কুরিত হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দিলেই যদি সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে, আর কোন গোলযোগ থাকে না। এই জন্য বলিতেছি, যাহাতে অশ্লীলতাপূর্ণ কদর্য্য পুস্তকগুলির প্রচার বন্ধ হইয়া যায়, সমালোচকমাত্রেরই সেই বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতিরিক্ত সমালোচকের আরও কতিপয় কর্ত্তব্য কার্য্য আছে। অনাবশ্যক বোধে এ স্থানে সে গুলির উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। সমালোচনা-কার্য্য গুরুতর কার্য্য। সমালোচক যদি পণ্ডিত, বহুদর্শী, ও সুবুদ্ধি হৃদয়বান্ ব্যক্তি হন, তাহা হইলেই সাহিত্য-সংসারের মঙ্গল। অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমালোচনার ভার, আর বানরের হস্তে খড়্গ, এই দুইই আমরা সমান বিবেচনা করি।

প্রমোদ-কুমার।



দশম পরিচ্ছেদ।



যোগিনী-চরণে।

"দেবি! এসেছি যোগিনী হব'
পাষাণে হৃদি বাঁধিয়া সংসারে ত্যজিব।
যোগধর্ম্ম দীক্ষা দিয়ে তুমি মা!
রাখ গো! দুখিনী এ জনে,
দলিত এই জীবনে সঁপিনু চরণে তব।"

বসন্ত উৎসব।

বৈদ্যনাথ হইতে প্রায় পাঁচক্রোশ অন্তরে একটী অরণ্যে আমরা উপস্থিত হইলাম। যত দূর দৃষ্টি চলে, কেবল বৃক্ষের পর বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কাছাকাছি, ঘেঁসাঘেসি, মেশামেশি করিয়া কেবল অনন্ত বৃক্ষশ্রেণী চলিয়াছে। দিবসেও এ অরণ্যে ক্বচিৎ সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে। অদ্য পঞ্চমীর চন্দ্রের ক্ষীণালোক সেই দুর্ভেদ্য বৃক্ষাবরণ ভেদ করিয়া অরণ্য-মধ্যে স্বীয় ক্ষীণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু পারিতেছে না।

অরণ্যের পাদমূল দিয়া শুভ্রসলিলা বারুণী নদী হেলিয়া দুলিয়া, গজেন্দ্রগমনে, মনের উল্লাসে বহিয়া চলিয়াছে। এই নিবিড় অরণ্যের একমাত্র অধিবাসিনী একটী যোগিনী। বারুণী নদী হইতে কিয়দ্দূরে যোগিনীর কুটীর। সে স্থানে অরণ্য তত নিবিড় নহে। যোগিনীর কুটীরটী পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। কুটীরের সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি ফলমূল, একছড়া রুদ্রাক্ষমালা, গৈরিক বসন ও একটী কমণ্ডলু। কুটীর মধ্যে যোগিনী উপবিষ্টা। তাঁহার পদতলে পড়িয়া একটী সুন্দরী বালিকা রোদন করিতেছে। যোগিনীর দেহ সচরাচর মনুষ্যদেহাপেক্ষা উন্নত। তাঁহার বর্ণ—লাবণ্যহীন গৌরবর্ণ, ললাট অতিশয় প্রশস্ত এবং গভীর চিন্তারেখায় অঙ্কিত, চক্ষু দুটি অতিশয় উজ্জ্বল। তাঁহার বয়স অনুমান ৩৬। ৩৭ বৎসর। যোগিনী বালিকাকে হস্তদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক বলিলেন—"সুহাস! কাঁদিও না, উঠ মা!—যোগিনীজীবন অতিশয় কষ্টকর। তুমি সে সকল কষ্ট সহিতে পারিবে না।

—চল, তোমায় হরিপুরে রাখিয়া আসব।”

বালিকা যোগিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল—“যোগিনী গো! আর আমাকে সে পাপ-সংসারে প্রবেশ করিতে বলিও না। তোমার মতন গৈরিক বসন পরিয়া বনের ফল খাইয়া আমি বনে বনে বেড়াইব। যোগিনি! সে সংসার বড় নিষ্ঠুর।”

যোগিনীর উজ্জ্বল নয়ন অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বালিকাকে বক্ষে টানিয়া সস্নেহে সোৎসাহে বলিলেন “জানি মা! সে সংসার বড় নিষ্ঠুর; কিন্তু ও সুন্দর অঙ্গে গৈরিক বসন পরাইতে প্রাণ যে কাঁদিয়া উঠে সুহাস!”

যাহাকে হরিপুরে জলমগ্ন হইতে দেখিয়াছিলে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া পাঠক! তুমি হয় ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ; কিন্তু আমরা আশ্চর্য্যের কোন কারণ দেখি না। সৌভাগ্য বশতঃই বল কিম্বা দুর্ভাগ্য বশতঃই বল, অভাগিনী বালিকা স্রোতের মুখে পড়িয়াছিল। সেই রাত্রিতে সেই সময় দামোদর বক্ষ দিয়া এক খানি নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল। সেই নৌকারোহী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা যোগিনী। সে দিন আকাশের দ্বিতীয়ার চন্দ্র নদীবক্ষে পতিত হইয়া ভাসিতেছিল। তরণী-কক্ষে গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ তৎবহির্ভাগে যোগিনী বসিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিতেছেন—আর কখন অনন্যমনে তীরভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এমন সময় নৌকার ২।৩ হাত দূরে হস্ত-পদ-সঞ্চালন-জনিত শব্দ তাঁহার চিন্তাশ্রেণী ভেদ করিয়া হৃদয়ের কক্ষে আঘাত করিল। তাঁহার সতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনুষ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। যোগিনী তৎক্ষণাৎ মাঝীদিগকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া উহাকে নৌকায় তুলিতে আজ্ঞা করিলেন। মাঝী পুরস্কারের লোভে জলে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক বালিকাকে নৌকার মধ্যে আনয়ন করিল। দীপালোকে বালিকাকে দেখিয়া যোগিনী বিস্মিতা হইলেন—দেখিলেন, বালিকা অচেতনা। তিনি নানা কৌশলে বালিকার উদর হইতে জল উদ্গারণ করাইয়া জ্ঞান সম্পাদন করিলেন। তাঁহার নৌ-যাত্রা কয়েক-দিবস-ব্যাপিনী বলিয়া নৌকায় সর্ব্বদা অগ্নি থাকিত। তিনি সেই অগ্নির উত্তাপ দিয়া ম্রিয়মাণা বালিকাকে সজীব করিলেন। সুহাস দুই দিবস যোগিনীর সহিত নৌকায় অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার পরিচয়-সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা বলেন নাই। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সুহাস নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিত, কেবল বলিত “যোগিনি! আমায় কেন বাঁচাইলে?” ক্রমে যোগিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সরলা বালিকা অরণ্যে আসিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু জল-মগ্নের কারণ গোপন করিয়াছিল। এখন সুহাস আরও হতাশ-হইয়া যোগিনীর পদতলে পড়িয়া যোগ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিলেন। যোগিনী তাঁহাকে হরিপুরে রাখিয়া আসিতে চাহিলেন, কিন্তু সে সুন্দর অঙ্গে গৈরিক বসন পরাইতে অস্বীকার করিলেন। একথা আমরা জানি। অবশেষে সুহাসের কাতরোক্তি তাঁহার পূর্ব্ব সংকল্পকে দূরীভূত করিল—সুহাসেরই জয় হইল। যোগিনী সুহাসের মস্তক স্বীয় উরুদেশে সংস্থাপিত করিয়া বলিলেন “সুহাস! আমি তোমায় সপ্তাহ পরে দীক্ষিত করিব।”

সুহাস যোগিনীর হস্ত ধরিয়া বলিল “যোগিনি! শৈশবকালে মাতৃহীনা হইয়াছিলাম—আজ হইতে তুমি আমার “মা” হইলে।”

যোগিনী সস্নেহে সুহাসকে চুম্বন করিয়া বলিলেন “সুহাস! আমায় মা বলিয়া মধুময় ‘মা’ নামের মধুরত্ব হারাইও না। যোগে আমার হৃদয় কঠোর হইয়াছে—তাই আজ আমি পাষাণীর, চণ্ডালিনীর কার্য্য করিতে উদ্যত হইতেছি। ও সুন্দর অঙ্গে গৈরিক বসন পরাইতে কাহার প্রাণ

মা কাঁদিয়া উঠে? সুহাস! তোমায় দেখিয়া আমার পুনরায় সংসারে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। আমারও এক দিন সকলই ছিল।"

উভয়ে বহু ক্ষণ নীরবে অবস্থান করিলেন। অবশেষে যোগিনী সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন "সুহাস! একটী কথা তুমি আজও আমায় বল নাই। তুমি কেমন করিয়া জলমগ্ন হইলে, আর তোমার এ বালিকাবয়সে সংসারের উপরই বা এত বিরাগ কেন?"

সুহাস কিয়ৎকাল নীরবে রোদন করিল এবং যোগিনীর উরুদেশ হইতে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া উৎসাহের সহিত বলিল, "আমার সংসারের উপর এত বিরাগ কেন? মা গো! সে কথা তুমি কি শুনিবে? মা! সে সংসার বড় নিষ্ঠুর। সেখানে ভালবাসার পুরস্কার———"

সুহাসের কথা শেষ না হইতে হইতে যোগিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু অধিকতর উজ্জ্বল হইল—তাঁহার উন্নত দেহ আরও উন্নত দেখাইল। তিনি সবলে সুহাসের হস্ত ধরিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "বালিকে! ভাল বাসিয়া ভালবাসা পাও নাই,—সেই দুঃখে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলে? নির্ব্বোধ! পুরুষজাতিকে বিশ্বাস করিয়াছিলে? তাহাদের মত শঠ কে আছে? তাহারা ভাল বাসার কি জানে?

সুহাস যোগিনীর পদপ্রান্তে মুখ লুকাইয়া কাতর স্বরে বলিল "মা গো! ভালবাসিয়া ভালবাসা পাইয়াছি, কিন্তু ভালবাসার ধনকে পাই নাই—নিষ্ঠুর সংসার সে অমূল্য রত্ন আমাকে দেয় নাই। মা! পুরুষ জাতি শঠ হইতে পারে, কিন্তু তিনি—সে স্নেহ, এ জগতে কয় জনের? উঃ! প্রমোদ———।"

যোগিনী এত ক্ষণ দাঁড়াইয়া বালিকার কথাগুলি শুনিতেছিলেন, এক্ষণে ধীরে ধীরে বসিলেন; বালিকার মস্তক পুনরায় স্বীয় উরুদেশে সংস্থাপিত করিয়া বলিলেন, "কি সাহস! প্রমোদ বড় সুন্দর নাম। প্রমোদের বয়স কত মা?"

সুহাস বলিল ১৯। ২০

যোগিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রমোদ দেখিতে কি খুব সুন্দর?"

সুহাস মুখ নত করিল,—কোন উত্তর দিল না।

যো—"তাহার শরীরে কি কোন বিশেষ চিহ্ন আছে—সুহাস?"

সু—"হাঁ আছে। তাঁর বাম স্কন্ধের উপরি একটী কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন আছে।"

যোগিনী সজোরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। একবিন্দু অশ্রু তাঁহার গণ্ড বহিয়া পড়িল। সুহাস তাহা দেখিতে পাইল না। যোগিনী সুহাসকে বলিলেন "মা! শোও, অনেক রাত্রি হইয়াছে।" সুহাস অনেক দিন ভালরূপ নিদ্রা যায় নাই—অদ্য শয়ন করিবামাত্র গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইল। যোগিনী তাহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন—নিদ্রাবেশে স্বপ্নে দেখিলেন, একটী দেবাকৃতি পুরুষ একটী সুন্দর যুবকের হস্ত ধরিয়া তাঁহার শিয়রদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যোগিনী নিদ্রিতাবস্থায় উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিলেন "দেব—প্রমোদ।" সুহাস নিদ্রায় অভিভূত ছিল। সে তাহা শুনিতে পাইল না।

"মানদার চারি নিশা"।

১

প্রাণ-নাথ,
বারে বারে চারি নিশা পাড়িতেছে স্মরণে;
বিষম বিরহ পরে
তোমা পেয়ে হৃদি পরে
কত মত সুখ-ভরে
চারি নিশা ভোগিনু;
সে নিশা কি ভুলি নাথ জীবনে কি মরণে?

২

কে ডরিত আগে বিরহের তরে রে?
এতো দিন ছিনু বালা
না জানিনু প্রেমজ্বালা
করি কত হাসি-খেলা
কাটাইনু এতো কাল হরষিত অন্তরে:
মিলিতাম নাথ সনে
খেলিতাম ফুল্ল মনে
পুনরায় ভুজনায় যাইতাম অন্তরে
কভু তো এমন ভাব উদিত না অন্তরে।

৩

হায় হেন প্রেমে কেন হেন জ্বালা হইল?
তৃষা নিবারণ জলে
কেন হেন পূর্ণ মলে?
জীব প্রাণ সমীরণ
তাহে কেন বালু-কণ?
সুবাস কুসুমে কীট কেন বিধি গড়িল?
মণি কেন ফণি-শিরে রহিল?

৪

নাথে কত মানা কত্তু করিনু বিনয়,
দলি মোরে পদতলে
করী যথা পদ্ম-দলে
বাহিরিল প্রাণনাথ সুকঠিন অন্তরে;
ভাসাইল অভাগীরে বিরহের সাগরে।
ঝরিল নয়নজল
ভাসাইয়া উরুস্থল
এলাইল কেশদল
অবশ হইল কায়, যেন অচেতন হইনু
দেখিলাম অনিমেষ বাতায়ন দিয়া
বারেক না প্রাণনাথ চাহিল ফিরিয়া;

প্রাণনাথ চলে যায়
পাছে মোর মনো ধায়
কায় পাছে যেন ছায়—
তবু তো চলিল নাথ যেন বজ্রময়
না জানি কি পুরুষের কঠিন হৃদয়।

৫

প্রাণনাথ দেশান্তরে
প্রাণে প্রাণে যেন মরে,
হৃদয়ে পাষাণ ধরে
যে যাতনা সহিনু,
গিরি যথা বায়ু ধরে
সিন্ধু যথা জলচরে
ধরিনু অন্তর তরে
অপরে না কহিনু।

৬

বরিষা নীরদ-মালা
পরিয়া তড়িত-মালা
গগন করিয়া কালা
দর দর বহিল,
বিরহ-আঁধার মনে
বসি এই বাতায়নে
শ্রাবণের ধারা সনে
অধিনীর নীরধারা যুগপৎ বহিল।

৭

অধিনী লিখিতে না জানে
যাচিল ব্যাকুল প্রাণে
বরিষার জলধরে,
"কৃপা করি ধারাবহ
অধিনীর বার্ত্তা বহ
প্রাণনাথে দেশান্তরে,
সবিনয়ে কহ তাঁরে
নয়ন-নীহার-হারে
এ অধিনী ভাসে অনুক্ষণ"
অবলা বঙ্গের বালা
কে বোঝে তার মনোজ্বালা
ব্যঙ্গ করি মেঘবর উঠিল গগন;
না বুঝিল বালিকার বিরহ কেমন।

৮

বরিষা হইল শেষ
ধরিয়া মোহন বেশ
অভাগীরে দিতে ক্লেশ
শরতের শশধর উদিল;
ও-মুখ-শশাঙ্ক-করে
যে কুমুদী হৃদে ধরে
দেখি, নব শশধরে
সে কুমুদী মুদিল।

৯

একদা হাসিছে শশী
আছিনু শয়নে বসি
সহসা অঙ্গনে পশি
জিজ্ঞাসিনু ব্যস্ত মনে
"মানদার হৃদাকাশে
যেই পূর্ণ চন্দ্র বাসে
কোথা আছে কেমনে ?"

১০

শশধর !
মনে করি ভুলি-বারে
পোড়া প্রাণ নাহি পারে,
জীবন-আধার তারে
কভু কি ভুলা যায় রে
নাথ—প্রেম-সুধা-পানে
এ-অভাগী বাঁচে প্রাণে
তাঁরি রূপ-গুণ-ধ্যানে
অধিনী যে স্বর্গসুখ পায় রে।

১১

গুরু গুরু ঘন ডাকে
তুলিয়া চিকণ পাখে
গিরিচূড়ে শিখী নাচিছে;
ফুটিছে কদম্বকলি
মন্দ আলাপিয়া অলি
মকরন্দ যাচিছে;
সরসে নলিনী-দল
খুলি চারু-বক্ষঃস্থল
রবি সহ খেলিছে;
কাণে ঢালি সুধারাশি
নিকুঞ্জ-কানন-বাসী
পিকবর গাহিছে;
শশধর এ পরাণ দ্বিগুণ যে দহিছে
কে জানিবে যে যাতনা দিবারাতি সহিছে।
শশধর !
প্রাণনাথে করে ধরি
কহ রে বিনয় করি
এ দাসী তাঁর সমাগম যাচিল;
দেখিতে দেখিতে শশী
জলদ-আড়ালে পশি
চারু তনু ঢাকিল;
অভাগীর বিরহ-প্রলাপ না শুনিল।

১২

কাঁদি কাঁদি প্রাণনাথ।
বরিষা শরত চলে,
একদা প্রদোষ ক্ষণে,
বসি কক্ষ-বাতায়নে,
ভাবিতেছি দীন মনে
কি যেন আকাশে চাহিয়া;
পূর্ব্ব-প্রেম-কথা স্মরি
নয়ন পড়িল ঝরি,
মুছিয়া দেখিনু পাশে
নাথ আছে দাঁড়াইয়া।
কি যেন স্বপন-প্রায়,
অবশ হইল কায়,
অচেতন হেন পড়িনু ভূতলে
ভূমি হতে প্রেমভরে
ধীরে তুলি হৃদি পরে
প্রাণনাথ চুমিলে অধর-যুগলে।
ক্ষণ কাল ভুলিলাম মর ধরাতলে।

১৩

উভয়ে বাঁধিয়া করে
হৃদয় হৃদয় পরে
মুখে না বচন সরে
এই ভাবে কত ক্ষণ রহিনু;
তদবধি সুখ-ভরে
তোমা লয়ে হৃদি পরে
চারি নিশা অবিরল ভোগিনু;
সে নিশা নাথ আজিও না ভুলিনু।

প্রমোদ-কুমার।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"প্রিয়ে! হৃদয়ের ধন রাখো চরণে তোমারি।
আমি দোষী, অপরাধী, ক্ষমার ভিখারী॥"

বসন্ত উৎসব।

আমরা বলিতে ভুলিয়াছি, যোগিনী ব্যতীত সে অরণ্যে অপর দুইটী লোক বাস করিত। কিন্তু সে দোষ আমাদের নহে; কারণ ইহাঁরা নব অধিবাসী। ইহাঁদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী, অপরটী আমাদের প্রমোদ। অরণ্য এত বিস্তীর্ণ যে ইহাঁদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের এক দিনও সাক্ষাৎ হয় নাই।

প্রমোদ জমীদারগৃহ পরিত্যাগ করিয়া দামোদর-তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই নৌকা ঠিক করিয়াছিলেন, সুতরাং যথাসময়ে নৌকা তথায় উপস্থিত ছিল। তিনি নৌকারোহণপূর্ব্বক "বৈদ্যনাথের" উদ্দেশে চলিলেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী, আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বৈদ্যনাথ-গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া জীবন কাটাইবেন। তথায় অধিরোহণপূর্ব্বক নৌকা বিদায় করিলেন। প্রমোদ বৃক্ষপত্র দ্বারা একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। যে দিন সুহাস যোগিনী কর্ত্তৃক অরণ্যে নীতা হয়েন, সেই দিবস প্রমোদের অরণ্যবাসের এক মাস পূর্ণ হয়। এই এক মাসের মধ্যে জীবনের লিখনোপযোগিনী কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। প্রাতঃকালে বিহঙ্গেরা সৃষ্টিকর্ত্তার গুণগানে সেই নির্জ্জন কানন পূর্ণ করিত। সন্ধ্যাকালে বনফুলেরা স্বীয় স্বীয় সুন্দর মুখ খুলিয়া মধুর সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিত। রাত্রিকালে চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মি বৃক্ষের ভিতর দিয়া উঁকি মারিত—আবার কখন কখন অনাবরিত স্থানকে স্বীয় কৌমুদী-কিরণে প্লাবিত করিত। মনুষ্য-হৃদয় যখন প্রণয়-সুখ, আশা, ভরসায় পূর্ণ থাকে, তখনই প্রকৃতি তাহার চতুর্দ্দিকে হাসিতে থাকে। সে তখন মনের উল্লাসে গাহিয়া জগৎকে বলিতে পারে——

"ঘন হ'লো আর'ও হরিত বরণ,
নীল নভ হ'লো সুনীলতর,
চাঁদিমা-কিরণ ভাতিল দ্বিগুণ,
মলয় অনিল মাতিল আরো।"

কিন্তু যে দুর্ভাগার হৃদয় নিরাশার অনন্ত অনলে, দুঃখ কষ্টের তীব্র দংশনে জ্বলিতে থাকে—তাহার নিকট প্রকৃতি হাসে না। প্রমোদের হৃদয়ও আজি তদ্রূপ। প্রকৃতি তাহার নিকট বিষণ্ণ বলিয়া প্রতীত হইত। এক্ষণে প্রমোদের নিকট,——

"বিহগও গাহে না,
সৌরভও ছোটে না,
চাঁদিমাও হাসে না,
জোছনাও ফোটে না।"

অথচ সেখানে বিহগও গাহিত, সৌরভও ছুটিত, চাঁদিমাও হাসিত, জোছনাও ফুটিত। তুমি প্রণয়ী মনুষ্য! যাহার 'মনের মানুষটী' পরের হয় নাই—যে চন্দ্রের সহিত আপনার প্রণয়িনীর মুখশোভা তুলনা করিয়া মনে মনে স্বর্গীয় সুখ কল্পনা করে, সেই চন্দ্রকে দেখিলে অভাগা প্রমোদের পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠে—অশ্রু-জলে বক্ষ সিক্ত হয়। প্রমোদ বিষণ্ণ বদনে স্বীয় কুটীরের নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছেন। হায়! হতভাগ্য জানে না, সে যাহার জন্য ভাবিতেছে সে তাহার নিকটেই রহিয়াছে। প্রমোদের এ জগতে এমন কি কেউ সুহৃৎ নাই, যে এ সংবাদ তাহাকে প্রদান করে? মৃদুমন্দ-প্রভাত-সমীরণ ধীরে ধীরে বহিয়া প্রমোদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল করিতেছে; কিন্তু তা! অন্তরে যে আগুন জ্বলিতেছে তাহা নিভাইবার ক্ষমতা বায়ুর নাই—বরং সহযোগে তাহা আরো প্রজ্বলিত হইল। প্রমোদ অদূরে একটী মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জানিতেন, এই নির্জ্জন অরণ্যের তিনিই একমাত্র অধিবাসী। আকস্মিক আজ অরণ্যে মনুষ্য দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। আগন্তুক যতই অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, প্রমোদ তাঁহার প্রতি তত ঔৎসুক্য সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি, প্রতিপাদ-বিক্ষেপ, প্রমোদের নিকট পরিচিত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। অবশেষে আগন্তুক প্রমোদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

হরি, হরি, এ মূর্ত্তি যে প্রমোদের পরিচিত! প্রমোদ মন্ত্র-মুগ্ধ-বৎ সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী উন্মত্তের ন্যায় বিস্মিত নেত্রে প্রমোদের প্রতি সোৎসুকে চাহিয়া রহিলেন। এক বার প্রমোদের বামস্কন্ধের উপর চাহিলেন—আপাদমস্তক বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া শীঘ্রই প্রমোদকে চিনিলেন। যে পুত্রের সুন্দর মুখ দেখিয়া সংসারের দুঃখ, যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেন, সে মূর্ত্তি সন্ন্যাসী বিস্মৃত হন নাই। বামস্কন্ধের সেই কৃষ্ণ চিহ্ন পিতার হৃদয়ে অঙ্কিত—সে মূর্ত্তি ত ভুলিবার নহে!

সন্ন্যাসী কিয়ৎ কাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিষ্পন্দ শরীরে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে যেন কোন মন্ত্রবলে চালিত হইয়া তিনি ধীরে ধীরে প্রমোদের নিকট উপস্থিত হইলনে। কথা কহিতে যাইবেন, কিন্তু ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল—বাক্য নিঃসরণ হইল না। যাহা হউক অনেক কষ্টে, রুদ্ধ-কণ্ঠে অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে প্রমোদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমোদ সন্ন্যাসীর অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—ধীরে ধীরে আপনার নাম বলিলেন। সন্ন্যাসী স্বীয়-বাহু-প্রসারণ করিলেন, কিন্তু কি জানি, কি ভাবিয়া পুনরায় অপসারিত করিলেন। সন্ন্যাসী প্রমোদকে পিতার নাম ও বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমোদ হরিপুরের জমীদারের নিকট যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, সংক্ষেপে সন্ন্যাসীর

নিকট তদ্রূপই বলিলেন। প্রমোদ যে অপরিচিতকে বলিবামাত্র পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা লিখিলাম—সে দোষ আমাদের নহে।

সন্ন্যাসী "প্রমোদ! হতভাগ্য পিতাকে চিনিতে পার নাই?" বলিয়া পুত্রকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিলেন। সে স্বর শুনিয়া প্রমোদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। যে মূর্ত্তি প্রমোদ এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন—তাহার স্বর শুনিয়া প্রমোদ তাঁহাকে চিনিলেন। যদিও প্রমোদ প্রায় আট বৎসর পিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তাহা বলিয়া কি প্রমোদ সে মূর্ত্তি বিস্মৃত হইয়াছেন? না—স্নেহের মূর্ত্তি ভুলিবার নয়। প্রমোদ "পিতা" "পিতা" বলিয়া সন্ন্যাসীর চরণে পড়িলেন। সন্ন্যাসী "প্রমোদ" "প্রমোদ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রমোদ "পিতা" "পিতা" বলিয়া সে ক্রন্দনের উত্তর প্রদান করিলেন। উভয়ে বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে অবস্থান করিলেন। অবশেষে অপর একজন উপস্থিত হইয়া পিতা পুত্রকে সুখের আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ইনি আমাদের পরিচিতা যোগিনী। পিতা পুত্রে চকিতবৎ যোগিনীর প্রতি চাহিলেন। হরি হরি এ মূর্ত্তিও যে তাঁহাদের পরিচিত! সন্ন্যাসী ছিন্নতরুর ন্যায় যোগিনী-চরণমূলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "সতি, সাধ্বি! না জানিয়া তোমায় অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম—এক্ষণে আপনার ভ্রম বুঝিয়াছি। বল পাপীকে ক্ষমা করিলে?"

যোগিনী সযত্নে সন্ন্যাসীকে হস্ত দ্বারা তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমি ক্ষুদ্র নারী তোমায় কি করিয়া ক্ষমা করিব—তুমি আপনার ভ্রম বুঝিয়াছ ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আমি তোমায় কত যন্ত্রণা দিয়াছি—সে অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করিবে?" এই বলিয়া যোগিনী সন্ন্যাসীর চরণে পড়িলেন।

সন্ন্যাসী ত্রস্তে স্বীয় পদ অপসারণ করিলেন, সযত্নে যোগিনীকে তুলিয়া বলিলেন "তুমি সতী, তুমি সাধ্বী, তুমি দেবী, পাপীর চরণ স্পর্শ করিয়া আপনার পবিত্র দেহ কলুষিত করিও না। বল পাপীকে ক্ষমা করিলে—আমি তোমায় কত কষ্ট দিয়াছি। উঃ! তোমার যোগিনী বেশ দেখিলে জীবন রাখিতে ইচ্ছা করে না। বল, এক বার বল, আমায় ক্ষমা করিলে?"

যোগিনী বলিলেন "তুমি যদি ক্ষমার পাত্র হও, তবে তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" তৎপরে প্রমোদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "বৎস প্রমোদ! অভাগিনী জননীকে চিনিতে পার?" প্রমোদ "মা" "মা" বলিয়া যোগিনীর চরণে পড়িলেন।

অনন্ত পুরুষের অনন্ত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্য নহে। অভাবনীয় অচিন্তনীয় অপূর্ব্ব ঘটনা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্রের অপূর্ব্ব মিলন। যে সোনার সংসার এক দিন ছার খার হইয়া গিয়াছিল, কত দিন পরে তাহা আবার মিলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাখ্যানে পরিচয়।

আনন্দের প্রথম বেগ প্রশমিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুর বেগও থামিল। সকলেই নিস্তব্ধ; আনন্দে আহ্লাদে সকলেই নির্ব্বাক্—কাহারও মুখে বাক্য নাই। কেবল দুই এক বিন্দু নীরব অশ্রু হৃদয়ের সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। অবশেষে যোগিনী সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত প্রমোদকে বলিলেন "প্রমোদ! ৯ নয় বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম আজিও সেইরূপ দেখিতেছি—তোমার কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কেবল একটু বড় হইয়াছ। সন্ন্যাসী সেই কথার পোষকতা করিয়া বলিলেন "আমি প্রমোদকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলাম কিন্তু প্রমোদ বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারে নাই। উঃ! অনেক দিনের কথা, প্রমোদ তখন বালকমাত্র। আবার সেই সুখের স্থানকে দুঃখের ছায়ায় আবৃত করিল। যোগিনী কাঁদিয়া বলিলেন "উঃ! কুমুদ আজ কোথায়, সে কি আজও জীবিত আছে? সে এ আনন্দ ভোগ করিতে পারিল না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "সে কি আর জীবিত আছে?—সেই দেবাদিদেব অনন্ত পুরুষকে ধন্যবাদ দাও যিনি আমাদিগকে মিলাইয়াছেন কে জানিত, আবার তোমার সহিত এ জীবনে। দেখা হইবে? কে জানিত আবার প্রমোদ আমায় পিতা বলিয়া ডাকিবে? এস সেই মহেশ্বরের চরণে সকলে প্রণাম করি।" সকলে গলবস্ত্র হইয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন।

আবার সকলে নিস্তব্ধ হইলেন। এবার সন্ন্যাসী সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন "চল আমরা আজই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব, আবার মধুপুরে যাইয়া সেই সোনার সংসার-গঠন করিব—আর—"

যোগিনী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "সে পাপ মধুপুরে আর যাইব না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "যাহার ভয় করিতেছ সে আর এ জগতে নাই। তুমি যে দিবস গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাও তার কিছু দিন পরেই আমি তাহার ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলাম। সে, যাহাই করুক না কেন, তাহার হৃদয় অতিশয় উদার ও মহৎ ছিল। বোধ হয় আমার কষ্ট দেখিয়া তাহার দুঃখ হইয়াছিল। সে তাহার কিছু দিন পরে স্বয়ং আপনার ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিল ও আমার চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। আমি তাহাকে বলিলাম 'তুমি যাহা করিয়াছ তাহা মনুষ্যে করে না। আমি তাহার উদ্দেশে চলিলাম। যদি কখন তাহাকে পাই তবে সংসারে ফিরিব—নচেৎ নহে। আমার পুত্র কন্যাকে ইচ্ছা হয়ত পালন করিও, না হয় গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিও। আমি সেই দিনই গৃহ পরিত্যাগ করি। তার পর এক বার মধুপুরে

গিয়াছিলাম; শুনিলাম ব্রাহ্মণ সে স্থানে নাই—সে প্রমোদকে লইয়া কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। কিন্তু কুমুদিনীকে একটী দরিদ্র আত্মীয়ের নিকট রাখিয়া যায়—সে অর্থাভাবে তাহাকে প্রতিপালন করিতে না পারিয়া কোন জমীদারের নিকট প্রদান করে। সে যদি জীবিত থাকে—তাহা হইলে তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে।"

শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া প্রমোদ বিস্মিত হইলেন; তাঁহার কুমুদিনীকে মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন হরিহরের পুত্র-বধূ কি তাঁহার ভগ্নী? তিনি কত দিন দেখিয়াছেন কুমুদ তাঁহাকে বিস্মিতের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছে। তিনিও কত দিন কুমুদকে দেখিয়া কাঁদিয়াছেন—কুমুদকে দেখিলে তাঁহার স্নেহময়ী ভগ্নীকে মনে পড়িত। যাহা হউক তিনি সে বিষয় পিতার নিকট কিছু বলিলেন না। প্রমোদ অবনত মুখে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ! আমাদের এ দুরবস্থার কারণ কি? আমার পালক কৃষ্ণনাথ এক বার বলিয়াছিলেন তিনিই আপনাদের নিরুদ্দেশের কারণ—সে কথা কি সত্য?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "হাঁ সে অনেক কথা, তোমায় সময় বিশেষে বলিব—কৃষ্ণনাথের সহিত তুমি কোথায় বাস করিতে?"

"দেবগ্রামে।"

"এখানে কিরূপে আসিলে?"

প্রমোদ আপনার ক্ষুদ্র ইতিহাস বলিলেন, কেবল জমীদার-গৃহ-পরিত্যাগের প্রকৃত কারণ গোপন করিলেন। যোগিনী মনে মনে হাসিলেন। যোগিনী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন "প্রমোদ! ওই যে বড় বৃক্ষটী দেখিতেছ উহার নিকট আমার কুটীর—ওই স্থানে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন, তাঁহাকে গিয়া বল যোগিনী তোমায় ডাকিতেছেন।" প্রমোদ মাতৃ আদেশ পালন করিতে গমন করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "চল আমরাও তোমার কুটীরে যাই।" যোগিনী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন "না—একটু পরে যাইব।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে স্ত্রীলোক?"

যোগিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোমার পুত্রবধূ।"

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আমার পুত্রবধূ?"

"হাঁ।"

এই বলিয়া যোগিনী, প্রমোদ যাহা গোপন করিয়াছিলেন, সমস্ত খুলিয়া বলিলেন।

সন্ন্যাসী শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

এস পাঠক স্বামী স্ত্রীকে কথোপকথনে নিযুক্ত দেখিয়া প্রমোদের অনুধাবন করি।

—:—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিস্ময়ে।

"Have I caught my heavenly jewel?"
Sydney Smith.

প্রমোদ মাতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থ অরণ্য-স্থিত কুটীরের উদ্দেশে চলিলেন। তিনি এত ক্ষণ চিন্তা করিবার অবসর পান নাই, কিন্তু এক্ষণে নানাবিধ চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনকে আক্রমণ করিল। তাঁহার প্রথম চিন্তা অতিশয় সুখময়!—এত দিন পরে নিরুদ্দেশ পিতা মাতার সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় চিন্তা সুখ দুঃখ, আশানৈরাশ্য প্রভৃতি ভাব মিশ্রিত। কারণ সে চিন্তার বস্তু সুহাস। প্রমোদ ভাবিলেন—পিতা মাতার উদ্দেশ পাইয়াছি; এক্ষণে বোধ হয় হরিহর বিবাহের নিমিত্ত আপত্তি উত্থাপন করিবেন না—কিন্তু সুহাস কি আজও অবিবাহিতা? প্রমোদের মস্তক ঘুরিয়া গেল—সে চিন্তা বড় কষ্টকর। কিন্তু আবার মায়াবিনী আশা কানে কানে বলিল, ভয় নাই, সুহাসের বিবাহ হয় নাই। তাহার পর কুমু কে? সে কি তাহার ভগ্নী? পিতা যেরূপ বলিলেন, তাহার সহিত কুমুদিনীর জীবনের অনেক সাদৃশ্য আছে। আর কুমুদিনীকে দেখিলে বোধ হয় পরিচিত যেন, কোথায় দেখিয়াছেন— কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। এক বার সেই শৈশবের দিন ভাবিলেন—স্নেহময়ী ভগ্নীর সুন্দর মূর্ত্তি ভাবিলেন—মনে মনে কুমুদিনীর সহিত সে মূর্ত্তির আলোচনা করিলেন, অনেক মিলিল—প্রমোদ স্থির করিলেন কুমুদিনী নিশ্চয়ই তাঁহার ভগ্নী। তাহার পর পিতা মাতার নিরুদ্দেশের কারণ—পিতা মাতার কথাবার্ত্তায় অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপ বিবিধ চিন্তায় বিভোর হইয়া প্রমোদ কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে যাহা দেখিলেন—তাহাতে প্রমোদের মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি নিস্পন্দ শরীরে উন্মত্তের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কি দেখিলেন?—কাহাকে দেখিলেন? যাহার জন্য প্রমোদ বনবাসী সেই সুহাসকে—প্রমোদের সর্ব্বস্ব ধন সুহাসকে। কে বলিল?—এ মিথ্যা;—প্রমোদ এ কথা বিশ্বাস করেন না। প্রমোদ জাগরিত না স্বপ্ন দেখিতেছেন?—প্রমোদ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন—এবার আর অবিশ্বাস রহিল না। তিনি সুহাসের নিকটে আসিয়া গাঢ় স্বরে অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে ডাকিলেন "সু—হা—স।" সুহাস অবনত মুখে রোদন করিতেছিল, বিকৃত স্বর শুনিয়া সভয়ে মুখ তুলিল; কিন্তু যাহা দেখিল—তাহা অবিশ্বাস্য। নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল "আমি কি স্বপ্ন দেখি-

তেছি ?" প্রমোদ এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"না"—সুহাস! স্বপ্ন নয়—আমি তোমার প্রমোদ।" আর সুহাসের অবিশ্বাস রহিল না। বালিকা "কই আমার প্রমোদ" বলিয়া প্রমোদের পদতলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিচ্ছেদের পর প্রণয়ীর সুখের মিলন বর্ণনা করা সামান্য লেখনীর কার্য্য নহে। যদি কাহারও ভাগ্যে সে সুখ ঘটিয়া থাকে তিনি তাহা কল্পনা দ্বারা অনুভব করিয়া লইবেন। বহু ক্ষণ পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রমোদ বলিলেন "সুহাস! তুমি কি করিয়া এখানে আসিলে ?" সুহাস কোন উত্তর করিল না, অবনত মুখে বসিয়া রহিল, কিন্তু প্রমোদ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে অবশেষে সমস্ত কথা বলিল। প্রমোদ নীরবে, সমস্ত শ্রবণ করিলেন। তিনি যে কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুহাসের হস্ত ধরিয়া বলিলেন "সুহাস! আমার জন্য তোমার হৃদয়ে এত স্নেহ? এ স্নেহের যে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বল সুহাস! জীবন দিলে কি এ স্নেহের প্রতিদান হয় ?"

উভয়ে কিয়ৎ কাল নীরবে অবস্থান করিলেন। অবশেষে প্রমোদ বলিলেন "সুহাস! আজ তোমায় একটী সুখের সংবাদ শুনাইব—যে পিতা মাতার নিরুদ্দেশ বশতঃ আমার এত কষ্ট, এত দিন পরে তাঁহাদের উদ্দেশ পাইয়াছি। আমাদের বিবাহের আর কোন বাধা নাই।"

সুহাস বিস্মিত হইয়া বলিল "তোমার পিতা মাতা!"

প্রমোদ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল "হাঁ আজ এই অরণ্যে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। তুমি যাঁহাকে যোগিনী বলিয়া জান তিনি আমার মাতা।" সুহাস অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল "যোগিনী তোমার মাতা!"

"হাঁ মা আমিই প্রমোদের মা" বলিয়া যোগিনী সুহাসের সম্মুখে দাঁড়াইলেন—প্রমোদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুহাসের মুখ লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল—সে মুখ নত করিল। যোগিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "মা আমার যোগিনী হইতে চাহিয়াছিলেন, আর বোধ হয় তার প্রয়োজন হইবে না।"

এই বলিয়া যোগিনী সুহাসের নিকট বসিয়া সস্নেহে সুহাসকে হস্তদ্বারা বেষ্টন করিয়া প্রমোদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "এমন পুত্রবধূ পাওয়া অনেক কালের পুণ্যের ফল।" তৎপরে সুহাসের প্রতি চাহিয়া বলিলেন 'মা! তোমার পিতা কুলভঙ্গভয়ে প্রমোদের সহিত তোমার বিবাহ দিতে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর সে ভয় করিতে হইবে না—প্রমোদ বিখ্যাত কুলীনের পুত্র" এই বলিয়া তিনি হস্ত দ্বারা সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া বলিলেন "উনি প্রমোদের পিতা।"

যোগিনী এই রূপে বিবিধ আলাপ করিতেছেন হঠাৎ তাঁহাদের সম্মুখে একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। সুহাস ও প্রমোদ উভয়েই তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—সে হরিহরের ভৃত্য! সে তাঁহা-

দিগকে দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইল। সে বলিল "আপনারা এখানে?" তৎপরেই "আমি আস্‌ছি" বলিয়া সে অরণ্যের মধ্যে ছুটিল। তাহার ব্যবহার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন—কিন্তু সে বিস্ময় শীঘ্রই অপনীত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ভৃত্য বৃদ্ধ হরিহরের সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইল। সুহাস পিতাকে দেখিয়া 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধ শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ও যোগিনী এই সকল দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। প্রমোদ অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কারণ কি?

"He bears too great a mind. But this same day
Must end that work, the idis of March began;
And whether we shall meet again, I know not.
Therefore our everlasting farewell take:—
Forever, and forever, farewell Cassius!"

Shakspere.

পূর্ব্বাধ্যায়ে হরিহরকে দেখিয়া বোধ হয় অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। সেই বিস্ময় অপনয়নার্থে—আমরা এই পরিচ্ছেদটী লিখিতে বাধ্য হইলাম। সেই জন্য প্রিয় পাঠক! এস এক বার জমীদারের দুঃখময় পুরীতে ফিরিয়া যাই। আজ সুহাসের বিবাহ, কিন্তু সুহাস কোথায়? সকলেই "সুহাস"২ বলিয়া ডাকিতেছে, কিন্তু যে উত্তর দিবে সে কোথায়? কুমুদ অতিশয় ভীত হইয়া সুহাসের গৃহাভিমুখে ছুটিল, দেখিল শয্যার উপর একখানি পত্র রহিয়াছে—কুমুদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে কুমুদ পত্রখানি খুলিল—কুমুদ যাহা ভাবিয়াছিল তাহা সত্য—তাহাকে সমস্ত পত্র পড়িতে হইল না—সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সুহাস কি লিখিয়াছে?———

"ভাই কুম,

অভাগিনী তোমার নিকট জন্মের মতন বিদায় লইল—অভাগিনী সুহাস আজ তাহার পাপ জীবন দামোদর-গর্ভে বিসর্জ্জন দিতে চলিল। এ পত্র যখন পাইবে—আমি আর সে সময় এ জগতের অধিবাসিনী নহি। ভাই, প্রমোদকে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম—তাঁহাকেই স্বামী বলিয়া জানিতাম, তাই এই কাজ করিলাম। বাবাকে বলিও তিনি যেন দুঃখিনী কন্যার এ দোষ ক্ষমা করেন—আর দাদার চরণে আমায় প্রণাম জানাইও,—

তোমার
সুহাস।

কুমুদ যোগেশকে পত্রখানি দিলেন—যোগেশ কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট পত্র খানি লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ বয়সে এ শোক বৃদ্ধের সহ্য হইল না—হরিহর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেক কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইল। বৃদ্ধ যোগেশকে বলিলেন, "যোগেশ! প্রমোদকে লইয়া আইস। আমি কুল মান চাহি না। আমি সুহাসের সহিত তাহার বিবাহ দিব। কিন্তু প্রমোদ কোথায়?—আর সুহাসই বা কোথায়?

এই ঘটনার সপ্তাহ পরে হরিহর এক দিবস যোগেশকে ডাকিয়া বলিলেন "যোগেশ! বৃদ্ধ বয়সে ও শোক আর আমার সহ্য হয় না—আমি তীর্থ যাত্রায় গমন করিব—তুমি বিষয় বিভবাদি দেখিও। যদি বিধাতার ইচ্ছা হয় তবে পুনর্ব্বার ফিরিব, কিন্তু তাঁর নিকট প্রার্থনা করি আর যেন আমায় ফিরিতে না হয়।"

যোগেশ কাঁদিলেন—নানাবিধ তর্ক করিলেন—কোন মতেই পিতাকে যাইতে দিতে সম্মত হইলেন না। যাহা হউক অবশেষে হরিহরের জয় হইল। শুভ দিনে শুভ ক্ষণে নৌযোগে একটী পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য সমভিব্যাহারে হরিহর বৈদ্যনাথের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পঞ্চম দিবসে নৌকা বৈদ্যনাথের নিকটস্থ, আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিত অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইল। রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য মাঝীরা সে স্থানে নৌকা লাগাইল। কাষ্ঠ সংগ্রহার্থ হরিহর স্বীয় ভৃত্যকে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নহে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুখের সংসারে।

"O serprnt heart, hid with a flowering face!
Did ever dragon keep so fair a cave?"

Shakspere.

হরিহর নিদ্রিত কি জাগরিত কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। চতুঃপার্শ্বস্থিত দৃশ্যসমূহ তাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হরিহর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "প্রমোদ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?—তোমরা এখানে কিরূপে আসিলে? তৎপরে সন্ন্যাসী ও যোগিনীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন "এঁরা কে?"

প্রমোদ পরে পরে দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিলেন। হরিহর বিস্মিতের ন্যায় সকল

কথা শুনিলেন. তৎপরে সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি মহাশয়কে প্রমোদের পিতা বলিয়া চিনিতে পারি নাই।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন "ক্ষমা চাহিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। আপনি প্রমোদকে আশ্রয় দিয়া তদীয় পিতার কার্য্য করিয়াছেন—সেই জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

হরিহর হাসিয়া বলিলেন "ধন্যবাদের কিছুই আবশ্যকতা দেখিতেছি না।" তৎপরে গম্ভীর স্বরে বলিলেন "মহাশয়! সত্য সত্যই আমি প্রমোদকে সন্তানের মত স্নেহ করি—ঈশ্বর করুন যেন আপনাকে বৈবাহিক সম্বোধন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।" এই কথাগুলি বলিয়া যেন প্রশ্নের অপেক্ষায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিলেন—সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন "ঈশ্বর তাহাই করুন।"

হরিহর মৃদুস্বরে সন্ন্যাসীকে বলিলেন "মহাশয়ের বোধ হয় অবিদিত নাই আমার পাগলিনী কন্যা কি করিতে উদ্যত হইয়াছিল।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "হাঁ সে কথা আমি শুনিয়াছি। আপনার বোধ হয় অবিদিত নাই আমার পুত্র কিজন্য বনবাসী হইতে আসিয়াছিল। মহাশয় কুলভঙ্গের ভয়ে বিবাহে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু আর সে ভয় করিতে হইবে না। আমার নাম শ্রীরামকমল মুখোপাধ্যায়।" হরিহর বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আপনার নাম রামকমল মুখোপাধ্যায়? আপনার নিবাস কি মধুপুরে?" রামকমল বলিলেন—"হাঁ—আপনি কিরূপে জানিলেন?"

হ। "মধুপুরের মুখোপাধ্যায়েরা বিখ্যাত কুলীন—সকলই জানে, কিন্তু আপনাকে জানিবার আমার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। যখন আমরা পরস্পর আত্মীয় হইতে চলিলাম—আমাদের পরস্পরের বিষয় জানা খুব কর্ত্তব্য। মহাশয়! নিরুদ্দেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

রা। —(ঈষৎ হাসিয়া) অবশ্য পারেন। কিন্তু সে অনেক কথা, আমি খুব সংক্ষেপে বলিব। যদিও ব্রাহ্মণ, আমি বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলাম ও তদ্দ্বারা অনেক অর্থও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এমন কি, আমি মধুপুরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, এ দিকে আমার যত অর্থ বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার শত্রুসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার কৃষ্ণনাথ বলিয়া একটী বন্ধু ছিল; কিন্তু পরে সে ঘোরতর শত্রুর কার্য্য করিয়াছিল। এক দিবস পাজী আমার স্ত্রীর চরিত্রের উপরে দোষারোপ করিল।' যদিও বন্ধু—আমি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। আর এক দিবস পুনরায় সেই কথা বলিল—আরও আমার স্ত্রীর কার্য্য দেখাইতে চাহিল। আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। মহাশয়! আপনার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি আমি চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধ ছিলাম।

আমি দেখিলাম, আমার স্ত্রী একজন পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে। আমি তখন ভাবিলাম, কৃষ্ণনাথের মত বন্ধু আমার আর নাই। তাহাকে পদাঘাত করিয়াছিলাম বলিয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম—বন্ধুর ন্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। স্ত্রী গৃহে আসিলে তাহাকে বহুবিধ কটু কথা বলিলাম—পদাঘাত করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতে বলিলাম। পতিব্রতা রমণী সেই রাত্রিতেই আমার পাপ-পুরী ত্যাগ করিল। কেবল যাইবার সময় সে বলিয়াছিল "ইহার জন্য তোমায় এক দিন অনুতাপ করিতে হইবে।" বলিতে ২ রামকমলের স্বর ক্রমে সম্মিলিত হইয়া আসিতেছিল—তিনি আর বলিতে পারিলেন না। যোগিনীকে হস্ত দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া হরিহরকে বলিলেন "দেখুন—আমার পাপের ফল দেখুন—আজ তাহাকে যোগিনী বেশে দেখিতে হইতেছে।" সন্ন্যাসী পুনরায় আরম্ভ করিলেন "সে কথা সত্য হইল। দুই দিন পরে আমায় অনুতাপ করিতে হইল—আমি কৃষ্ণনাথের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলাম। আমার শূল-বেদনা ছিল—যে লোক যেরূপ ঔষধ দিতে বলিত আমার স্ত্রী সেইরূপ করিত। কৃষ্ণনাথ একথা জানিত—সে একজন বেদিনীকে শিক্ষিত করাইয়া আমার স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিল। বেদিনী বলিল, তাহার নিকট শূলবেদনার ঔষধ আছে—তিন দিবসে রোগ আরাম হয়। আমার স্ত্রী তাহার নিকট ঔষধ চাহিল। সে ঔষধ দিতে স্বীকৃতা হইল,—বলিল যে আজ দ্বিপ্রহরা রজনীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে—আমি পুরুষবেশে অন্তঃপুর উদ্যানে অপেক্ষা করিব, আরও বলিল 'এ কার্য্য যেন স্বামীর অগোচরে করা হয়।' আমি যাহাকে পুরুষ বিবেচনা করিয়াছিলাম সে স্ত্রীলোক—আর আমার পতিব্রতা স্ত্রী পাপীর হিতের জন্য ঔষধ গ্রহণ করিতে গিয়াছিল। একথা যখন কৃষ্ণনাথের মুখে শুনিলাম সে সময়ে আমার যন্ত্রণা বর্ণনাতীত।* আমি কৃষ্ণনাথকে বলিলাম 'তুমি হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করিয়াছ তাহা মনুষ্যে করে না, কিন্তু আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম। অর্থ লইয়া যদি সুখী হও তবে আমার সমস্ত বিষয় আমি তোমায় দান করিলাম। আর আমার পুত্র কন্যা রহিল। তাহারা বালক—যদি ইচ্ছা হয় তাহাদিগকে পালন করিও, না হয় গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিও। আমি সেই রাত্রিতে বাটী পরিত্যাগ করিলাম; সেই অবধি সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেছি, আজ মহেশ্বরের কৃপায় স্ত্রী পুত্র পাইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আমার কন্যা যে কোথায় আছে তাহা জানি না। মধ্যে এক বার আমি মধুপুরে গিয়া শুনিলাম, আমার কন্যাকে কৃষ্ণনাথ বিপ্রদাস নামক একটী ব্রাহ্মণের নিকট রাখিয়া যায়—

*আমি যন্ত্রণায় উন্মত্তের ন্যায় হইলাম। কৃষ্ণ আমার যত মন্দ করুক না কেন, তাহার হৃদয় উদার ছিল। আমার কষ্ট দেখিয়া বোধ হয় তাহার অনুতাপ হইয়াছিল। সে স্বয়ং সমস্ত প্রকাশ করিয়া স্বকৃত দোষের জন্য আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

এক্ষণে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমার কন্যাকে কোন জমীদারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। যদি বিধাতা কৃপা করেন তবে তাহাকে পুনরায় পাইব———"

হরিহর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কন্যার নাম কি কুমুদিনী ?"

রাম—"আপনি আমায় সাতিশয় বিস্মিত করিলেন। আপনি এ নাম কিরূপে জানিলেন ?—আমার কন্যার নাম কুমুদিনী।"

হরিহর হাসিয়া বলিলেন "বৈবাহিক মহাশয়! ক্ষমা করিবেন। তিনি আমার পুত্রবধূ। আমি তাঁহাকে বিপ্রদাসের নিকট হইতে গ্রহণ করি। এরূপ সুমতি, সুন্দরী কন্যা আমি কখন দেখি নাই—লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই বলিয়া স্বীয় পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলাম—ইহাতে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে আপনি ক্ষমা করিবেন।"

রাম—"মহাশয়! আপনি আমার নিরাশ্রয় পুত্র কন্যকে আশ্রয় দিয়াছেন। আপনার নিকটে আমি কিরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব জানি না। চলুন, আজই হরিপুরে গিয়া প্রমোদের বিবাহকার্য্য সম্পাদনের উদ্যোগ করিব।"

হরি—"চলুন।"

প্রমোদের মাতা এ কথা শুনিলেন—আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তিনি সুহাসকে বলিলেন "মা! তোমাদের বৌটী কেমন ?"

সুহাস মুখ নত করিল, কোন উত্তর করিল না, মনে মনে বলিল, "এমন বউ জগতে নাই।" যোগিনী সুহাসকে চুম্বন করিয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন "এর মধ্যেই কি মা তোর এত লজ্জা হ'লো যে আমার কথার উত্তরও দিবে না ?"

কুমুদিনী প্রমোদের ভগ্নী, এ কথা যখন সুহাস শুনিল—তখন সে অতিশয় বিস্মিত হইল। তাহার মনে হইল, কুমুদ তাহাকে কত দিন বলিয়াছে "ঠিক্ প্রমোদ দাদার মতন আমার একটী ভাই ছিল।"

সেই দিনই নৌকাযোগে সকলে হরিপুরাভিমুখে চলিলেন—পথিমধ্যে রামকমল জিজ্ঞাসা করিলেন "বৈবাহিক মহাশয়! তীর্থযাত্রার কি হইল ?" হরিহর হাসিয়া বলিলেন ওঃ বিস্মৃত হইয়াছিলাম, হরিপুরও এক মহাতীর্থস্থান।"

উপসংহার।

পঞ্চম দিবসেই নৌকা হরিপুরে পৌঁছিল। কুমুদ পুনরায় স্নেহের পিতা মাতা ভ্রাতাকে দেখিল। রামকমলের আর মধুপুরে যাওয়া হইল না। হরিহর, যোগেশ, যোগিনী প্রভৃতির অনুরোধে তিনি হরিপুরেই বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন। এত দিনে শুভ ক্ষণে মহাসমারোহে সুহাসের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। জমীদারের পুরী

আনন্দের রোলে পরিপূর্ণ হইল। এস পাঠক! এক বার নব দম্পতীকে দেখিয়া আসি। প্রমোদ স্বীয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া রহিয়াছেন এমন সময়ে সুহাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রমোদ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, সুহাসও চাহিল—চারি চক্ষু সংমিলিত হইল—সুহাস ঈষৎ হাসিয়া মুখ নত করিল। সে দৃষ্টিতে সে হাসিতে প্রমোদ কত বার কত স্নেহ কত সৌন্দর্য্য দেখিলেন—সে হাসি প্রমোদের নিকট কত সুন্দর বোধ হইল। কাদম্বিনীর অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া পাঠক! বোধ করি চপলা সৌদামিনীকে হাসিতে দেখিয়া থাকিবে—সে হাসি কেমন সুন্দর! কিন্তু প্রমোদের নিকট এ হাসি অতি তুচ্ছ পদার্থ। প্রমোদ সুহাসের হস্ত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন "সুহাস! আর এক বার হাস! ও হাসি অনেক দিন দেখি নাই। পৃথিবীতে অনেক সুন্দর দৃশ্য আছে, কিন্তু ওরূপ বুঝি আর কিছুই নাই। আমার সুহাস আজ তুমি আমার হইলে—এ জগতে আমার মত আর সুখী কে আছে?"

সুহাস প্রমোদের বক্ষে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল "না—বল আমার মত সুখী কে আছে?"

সমাপ্ত।

দুর্গোৎসব।

পৃথিবীতে ধর্ম্মই সর্ব্ব সময়ে সকল লোকেরই আরাধ্য বস্তু। ইহার জন্য মনুষ্য অক্লেশে দুর্ব্বিষহ কষ্টরাশি সহ্য করিয়া সহাস্য আস্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে। ইহার তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য সর্ব্ব দেশে সকল সময়ে সকলেই সমুৎসুক। কেবল ইহারই প্রকৃতি নির্ণয়ে তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন অসাধারণ-প্রতিভাশালী লোক হইতে মূর্খাদপি মূর্খ পর্য্যন্ত সকলেই শশব্যস্ত। এই ধর্ম্মের জন্য সকল দেশেই সকল সময়েই কত মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়া গিয়াছে—কত লোক কেবল এই চিন্তাতেই দেহপাত করিয়াছেন—কত মনীষী এই জন্যই সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক জগতীতলে ধর্ম্ম-সন্ন্যাসী হইয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্মের জন্যই শাক্যসিংহ—সন্ন্যাসী, খৃষ্টের ক্রুশে প্রাণত্যাগ; নানক, চৈতন্য, রামমোহন সকলেই ইহার জন্য দেহ প্রাণ সমর্পণ করিয়া অমরখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই জগতে কত মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে—আবার কত বৃথা রক্তপাত হইয়া পৃথিবী মনুষ্যরক্তে কলঙ্কিত হইয়াছে। এখনও এই ভূমণ্ডলে প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতি নিশ্বাসে কত যে প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটিতেছে তাহার নির্ণয় কে করিতে পারে? প্রায় সমুদায় লোকেরই ধর্ম্মই একমাত্র অব-

লম্বন। এক্ষণে দেখা যাউক, ইহাতে মনুষ্যের উপকার কি অপকার হইয়াছে? মানবসাধারণ এই ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের ইষ্ট না অনিষ্ট করিয়াছেন? ইহা দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, ইহা সময়ে সময়ে যে সকল মহান্ উপকার সাধন করিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। মনুষ্য সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত; এবং কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া মনুষ্য যে সকল মহানিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন সেই সকল নিরাকৃত করিবার জন্যই শাসনের প্রয়োজন। শাসন ত্রিনপ্রকার; রাজ-শাসন —সমাজ-শাসন ও ধর্ম্ম-শাসন। গুরুতর অনিষ্ট করিলে লোকে রাজ-শাসনের অধীন; তাহা হইতে লঘু পাপে সমাজ-শাসনের এবং এই দুইয়ে যাহা শাসিত হয় না তাহা কেবল ধর্ম্ম-শাসন দ্বারাই হইয়া থাকে। ধর্ম্ম মানব-মনকে সর্ব্বদা শাসন করেন বলিয়াই সমাজে অনেক পাপেরও হ্রাসতা হইয়াছে; না হইলে সমাজের অবস্থা কি হইত কে বলিতে পারে? সুতরাং ধর্ম্ম আমাদের সামান্য ইষ্টদায়ক নহে। আবার ইহা হইতে সময়ে সময়ে অনেক অপকারও সাধিত হইয়াছে। অকারণে পৃথিবী অনেক সময়ে নররক্তে প্লাবিত হইয়াছেন; মুসলমানগণের দিগ্বিজয়ই ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। মহম্মদ-শিষ্যগণ ধর্ম্মান্ধ হইয়াই যাবদীয় দেশ উৎসন্ন দিতে প্রবৃত্ত হন—ইহার জন্য কত যুদ্ধ—কত বিগ্রহ ঘটিয়াছে—কত লোক অসময়ে ইহ ধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন—এই জন্যই পৃথিবী কত বার মনুষ্যরক্তে রঞ্জিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরেও আমরা তত অপকার দেখিতে পাই না। যে সময়ে মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় আরবের সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা অতিশয় কদর্য্য ছিল; এবং সেই কদর্য্য নীতিই লোকের মনে এরূপ দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিল যে তাহা বিনা রুধির-পাতে কোন ক্রমেই লোকের মন হইতে উৎপাটিত করিবার উপায় ছিল না। মহম্মদ দেশের এইরূপ ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন এবং শোণিতপাত ভিন্ন তাহার সংস্করণ দুঃসাধ্য বিবেচনা করিলেন, সুতরাং তিনি তদীয় শিষ্যগণকে এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে কৃপাণের ব্যবস্থা দিলেন। এই জন্যই পৃথিবী নররক্তে প্লাবিত হইতে লাগিল; কিন্তু এই ভয়ানক রক্তপাত মহম্মদ-শিষ্যগণের মতে অত্যাচারই নহে। তাঁহারা বলেন "সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য; আমরাও তাহাই করিয়াছি। আমরা যাহাদিগকে পীড়ন করিয়াছি তাহারা কাফের —ধর্ম্মভ্রষ্ট, সুতরাং ঈশ্বরের নিকট অপরাধী; তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পৃথিবীময় শান্তি স্থাপন করাই আমাদের ব্রত; তাহাই করিয়াছি, এবং সেই কার্য্যে যদি কিছু অপকার করিয়া থাকি তবে তাহা উপকারের জন্যই হইয়াছে, তাহা কখনই প্রকৃত অপকার নহে।"

যাহা হউক ধর্ম্ম-শাসন বা অন্য কথায় ঈশ্বরে ভক্তি না থাকিলে সমাজে নানাবিধ অনিষ্ট সংঘটিত হইত। ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি আছে বলিয়াই আমরা

সময়ে সময়ে পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভক্তি আছে বলিয়াই লোকে সকল সময়েই পাপ কার্য্য করিতে ভীত হয়। আপনার নীতিতে জগতে কয় জন শাসিত হন? কয়জন লোক নীতি-মার্গানুসরণ করিয়া অতুল আনন্দের আধার হইয়া থাকেন? যখন জগতের সকল লোকেই নীতি-প্রবর্ত্তিত-পথানুসারে আপনিই চলিতে শিখিবে তখন আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আবশ্যকতা হইবে না; কিন্তু জগতে এরূপ লোক কয় জন আছেন? সম্ভবতঃ নাই; যদিই থাকেন তবে তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে তাহা কখন গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না। যখন পৃথিবী-ময় এরূপ লোক বিচরণ করিবেন তখন আর কিছুরই অভাব থাকিবে না; রাগদ্বেষাদি সমাজ হইতে বিদূরিত হইবে; পৃথিবীর এই সুবর্ণ-সময়ই সকলের প্রার্থনীয়; কিন্তু তাহা কি শীঘ্র সমুপস্থিত হইবে? লোক যখন স্বীয় নৈতিক ভয়ে ভীত হইয়া সকলপ্রকার পাপকার্য্য হইতে বিরত হইবে সেই সময় কি মনোহর! মনে করিলেও আহ্লাদে সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইয়া উঠে; তখন আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আবশ্যকতা কি? তখন সকলেই ঈশ্বর; কিন্তু এ সময় আসিতে এখনও যুগ যুগান্তর বিলম্ব আছে; যখন সে সময় আসিবে তখন ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার না করিতে পারি, কিন্তু যত দিন তাহা না আসিতেছে তত দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভক্তি কেন অক্ষুণ্ণ না থাকিবে? আমরা বলি, ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভক্তিতে মানব-সমাজের যে উপকার সাধন হইয়াছে, ভক্তির অপহ্নবে তাহা কখন হয় নাই; তবে ঈশ্বরে ভক্তি না করিব কেন? সেই ঐশ্বরিক শক্তির অবজ্ঞা করিয়া কেন ক্লিষ্ট মনকে আরও ক্লিষ্ট করি। ভাই! নাস্তিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া জগতের অধিক ইষ্ট করিয়াছে না নাস্তিত্বে? তুমি যতই কেন তর্ক করিয়া ঐশ্বরিক শক্তির অবজ্ঞা কর না, অসংখ্য লোক-মণ্ডলী তোমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বক্র দৃষ্টিতে দেখিতেছেন; যখন জগৎ আপন নীতিতে আপনি চালিত হইবে তখন তোমার তর্ক উপস্থিত করিও গ্রাহ্য হইবে; কিন্তু সে সময় আসিতে এখনও যুগবিলম্ব। এখন নাস্তিকতার প্রশ্রয় দিলে সমাজের কোন উপকার নাই বরং সহস্র সহস্র অপকার আপনা হইতেই আসিয়া যুটিবে। তখন দেখিবে তোমা হইতে জগতের কি ইষ্ট সাধিত হইল। তাই বলি, যত দিন না এই পরিদৃশ্যমান—ভ্রাম্যমাণ জগৎ, নৈতিক জগৎ রূপে পরিণত হইতেছে, তত দিন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর—ঐশ্বরিক শক্তির ক্ষমতা শিক্ষা দাও; দেখিবে জগৎ কি সুখের স্থান—দেখিবে যে তোমার উদ্দেশ্য কালে অনেক দূরে গিয়া তোমার ইচ্ছামতই সংসাধিত হইবে—তখন সকলেই তোমাকে আলিঙ্গন করিবে; তবে আর এখন কেন? সে সময় এখনও আইসে নাই; যখন তাহা এক বার না এক বার আসিবেই তখন তাহার জন্য এত ব্যগ্র কেন? এক বার তোমার তান ছাড়,

দেশ শুদ্ধ লোককে এক বার ঈশ্বরের প্রতি পবিত্র নয়নে চাহিতে দাও।

ধর্ম্মই আমাদের আরাধ্য বস্তু। পৃথিবীতে নানা সময়ে নানাপ্রকার ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে; হিন্দু—বৌদ্ধ; খৃষ্টান—মুসলমান; ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম। এই সমুদায় ধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আমরা হিন্দু; সুতরাং সকলেই আমাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমরা এক বার নির্লজ্জ হইয়া সেই পৌত্তলিকতার ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি—দেখি তাহার ভিতর কিছু সার আছে কি না।

হিন্দুধর্ম্মে অনেক দেব দেবীর পূজা-পদ্ধতি আছে; ত্রিংশৎ ত্রিকোটী দেবতা আমাদের উপাস্য; হিন্দুমাত্রেই প্রতি নিশ্বাসে কোন না কোন দেবতার নামোল্লেখ করিয়া কৃতার্থ হওয়া থাকেন। প্রতি-নিশ্বাসেই "দুর্গে দুর্গতিনাশিনী" "কালী করালবদনী" ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়; এমন কি শয়নে স্বপনে জাগ্রতে দিবা নিশিই হিন্দুগণ এই সকল নাম উচ্চারণ করিয়া সুখী হইয়া থাকেন। এক্ষণে দেখা যাউক ইহার ভিতরে কিছু সার আছে কি না? দুর্গা, কালী, শ্রীকৃষ্ণই বাঙ্গলার প্রধান আরাধ্য দেবতা; বঙ্গদেশে হিন্দুনামধারী এমন কেহ নাই যিনি ইহাদের অন্যতরের অর্চ্চনা না করেন। বঙ্গবাসী হিন্দুসন্তান যে কোন কার্য্যই করুন না দুর্গা-নাম স্মরণ না করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না ইহাই বিশ্বাস। গাত্রোত্থান করিতে হইবে মুখে "দুর্গা, দুর্গা;" কোথাও যাইতে হইবে তাহাতেও তাই; কিছু লিখিতে হইবে অগ্রে দুর্গানাম লিখ; আপদ শান্তি করিতে হইবে নারায়ণকে তুলসী দাও প্রভৃতি যাহাই হউক না, তাহাতেই দুর্গা, কালী বা কৃষ্ণ আছেনই। ইহার অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে দেখা যাউক দুর্গাস্মৃতি কত দিনে লোকের মনে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে; অনেকে বলিয়া থাকেন দুর্গা কালী প্রভৃতি দেব-দেবী-গণের পূজা-পদ্ধতি ইদানীং আরব্ধ হইয়াছে; বৈদিক সময়ে ছিল না; আমরা তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রথমেই প্রবৃত্ত হইব; পরে ইহা সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহাই বলিব।

বেদাদি অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি, যে দুর্গানাম আধুনিক নহে; বৈদিক কালের ঋষিগণও তাহা পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের পরিচিত দুর্গাই যে আমাদের দশহস্ত-বিশিষ্টা দুর্গা তাহা না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যে দুর্গানাম বিদিত ছিলেন সে পক্ষে কিছু-মাত্র সংশয় নাই; এবং সেই দুর্গাই যে কালে এইরূপ হইবেন তাহাতেই বা বিচিত্রতা কি? ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকে একটি দুর্গাস্তব আছে; আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম;—

দুর্গেষু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে।
অগ্নিচোরনিপাতেষু দুষ্টগ্রহনিবারণে॥ ৯
দুর্গেষু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষু চ।
মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু॥

তামগ্নিবর্ণাস্তপসা জ্বলন্তীং।
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥ ১১॥

অর্থাৎ বিপদে, ঘোর বিষম সংগ্রামে, সঙ্কটে, অগ্নি ও চোর নিপাতে, দুষ্টগ্রহ-নিবারণে, বনে, প্রভৃতি সকল স্থলে আমায় অভয় কর। আমি অগ্নিবর্ণা, তপঃ দ্বারা জ্বালা-বিশিষ্টা, বৈরোচনী, কর্ম্মফলে জুষ্টা, দুর্গা দেবীর শরণাগত হই; হে সুবেগবতি! তোমার বেগকে প্রণাম করি।

যজুর্ব্বেদেও "শিব অম্বিকার" উল্লেখ আছে। বেদের উপনিষদ ভাগের দুই এক স্থলে "দুর্গানাম উল্লিখিত হইয়াছে। কেণোপনিষদে "উমাহৈমবতী"; মুণ্ডকোপনিষদে "কালী করালী"; কৈবল্যোপনিষদে শিবকে "উমাসহায়ম্". প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে "উমাপতয়ে" শব্দ আছে এবং উহারই অপর এক স্থলে দুর্গাদেবীং শরণমহং" ইত্যাদি দ্বারা দুর্গার উল্লেখ আছে। এই সকল দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দুর্গা দেবী বহু পূর্ব্বকাল হইতেই আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। দুর্গাপূজা আধুনিক নহে; তবে এখনকার বঙ্গবাসী হিন্দুগণ যে ভাবে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন সে ভাবে পূজার পদ্ধতি কখনই ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। তাহা হইলেও এখন যে ভাবে বঙ্গদেশে পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে তাহাও নিতান্ত অল্প দিন সমাজে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বিদ্যাপতির সময়ের অনেক পূর্ব্বেও যে এবংবিধ পূজাপদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে দুর্গাপূজার অনেক প্রকরণাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রণীত "দুর্গোৎসবতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে এই "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর" উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে এই প্রকারে পূজাপদ্ধতি বঙ্গসমাজে সামান্য দিন প্রবেশ করে নাই। যাহা হউক এসম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এক্ষণে যে প্রকারে পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে।

দুর্গোৎসব বঙ্গবাসী হিন্দুগণের প্রধান উৎসব; এমন মহোৎসব আর নাই। নির্ব্বীর্য্য বঙ্গবাসীর মরুতুল্য হৃদয়ে দুর্গোৎসবের তিন দিন আনন্দের লহরী-লীলা খেলিতে থাকে; সংবৎসর, দুঃখে, কষ্টে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহারা এই তিন দিন কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিসুখ ভোগ করেন; পিতা—মাতা, পুত্র—কন্যা, বন্ধু—বান্ধব লইয়া আহ্লাদে বাস করার যে সুখ তাহা এই তিন দিনই উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহার নিত্তমি যে সময়টি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা আরও মনোহর। আশ্বিন মাস এই মহোৎসবের কাল। বঙ্গদেশে এই মাসই কোন মহোৎসবের পক্ষে উপযুক্ত সময়। এমন সার্ব্বজনিক উৎসবের সময় আর কোন মাসই হইতে পারে না। বৎসরের মধ্যে কেবল এই মাসেই ধনী—

দরিদ্র, মহৎ—ক্ষুদ্র সকলেই আমোদে পরিলিপ্ত হইতে পারেন। ধনীর অবসর অনুসন্ধান করিতে হয় না; তিনি সকল সময়েই অবসর পাইতে পারেন, কিন্তু যিনি দরিদ্র—যাঁহাকে স্বহস্তে মৃত্তিকাকর্ষণ করিয়া আপনার আহারীয় অর্জ্জন করিতে হয়, তাঁহার অবসর কোথায়? তিনি চির কালই সমান ব্যতিব্যস্ত; সুতরাং তিনি যে সময়ে অবসর পান ও প্রফুল্লিত থাকেন সেইটিই সার্ব্বজনিক উৎসবের সময়। আশ্বিন মাসটি তাহাই। এই সময়ে কৃষকের কার্য্য সমুদায়ই শেষ হইয়া যায়। মাঠ সকল এই সময় হরিৎ শোভা ধারণ করে ও তৎসঙ্গে কৃষকের আশালতা ঊর্দ্ধে গমন করে; ভাবি লাভ-কামনায় তাঁহার মুখকান্তি ঈষৎ বিভাষিত হয়। এমন উত্তম সময় তাঁহার পক্ষে আর কই? সুতরাং ইহাই সার্ব্বজনিক মহোৎসবের প্রধান কাল। এই সময়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হৃদয়ে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে। তখন যেখানে যাইবে—যে দিকে চাহিবে—সেই দিকেই তোমার নয়ন প্রাণ সুশীতল হইবে—সেই দিকেই তুমি প্রীতির ছবি দেখিতে পাইবে—দেখিয়া মোহিত হইবে।

বৎসরান্তে বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব-গণের সহিত সম্মিলন—বালসহচর বৃদ্ধের সহিত মধুরালাপ—স্নেহময়ী জননীর পবিত্র স্নেহ—পুত্র-কন্যা-গণের আনন্দবর্দ্ধক সম্বোধন—প্রণয়িনীর মধুর ভাব এ সকলে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে; এমন সার্ব্বজনিক সুখের সময় আর কই? যেখানে যাও সেই খানেই তুমি মুগ্ধ হইবে—সেই স্থানই তোমায় প্রীতি দান করিবে। যে মহোৎসব এমন সুফল প্রদান করে সে মহোৎসবে মন প্রাণ খুলিয়া কেন না লিপ্ত হইব? যাহাতে মন প্রাণ সুশীতল হয় কেন তাহার জন্য লালায়িত না হইব? চির দিন দুঃখে যাঁহারা অভ্যস্ত—যাঁহাদের কার্য্যে—দুঃখ, বিশ্রামে—দুঃখ, শয়নে—দুঃখ, জাগ্রতে—দুঃখ তাঁহারা এমন সুখের দিন পাইয়া কেন তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিবে? কেন বৎসরান্তে এই তিন দিন অপার আনন্দ উপভোগ না করিবে? দুঃখের জন্যই যাঁহাদের জীবন তাঁহাদের ভাগ্যে এমন সুখের দিন থাকিতে কেন তাহা হইতে বিরত থাকিবে? মরুময় বাঙ্গালী-জীবনে এমন সুখোৎসব আর কই? এই তিন দিন ধনীর আনন্দ—দরিদ্রের আনন্দ,—পণ্ডিতের আনন্দ—মূর্খের আনন্দ,—বৃদ্ধের আনন্দ—বালকের আনন্দ,—এমন সর্ব্বানন্দদায়ক মহোৎসব আর কই? ভাই খৃষ্টান! তুমি আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছ—সাকারবাদী বলিয়া চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিতেছ—কর ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি অগ্রে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, পরে ঘৃণা করিতে হয় করিও। আমি সাকারবাদী ও তুমি নিরাকারবাদী; কিন্তু এ উভয়ের পার্থক্য কি? আমরা প্রস্তাবের প্রথমেই বলিয়াছি সমাজে ঈশ্বর-ভাব প্রবিষ্ট না থাকিলে সে সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত; উন্নতিকল্পে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি—ভক্তি চাই;

নতুবা মুহূর্ত্তমাত্র ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরকে কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? সনাতন কালের সেই বৈদিক ঋষি হইতে আর এই লৌহযুগের স্বার্থপর—ভ্রমান্ধ মনুষ্য পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? তবে যে ঈশ্বরতত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা অনুমানের উপর; সে অনুমান-সামান্য নহে,—সর্ব্বদেশে সর্ব্বব্যাপী অনুমান। সেই অনুমানের ঈশ্বরই চির কাল সমভাবে সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন—সেই ঈশ্বরই সকলের প্রীতিপুষ্প পাইয়া আসিতেছেন। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে সেই মনের ঈশ্বরের আকার মনে মনে অঙ্কিত করিয়া পূজা করা বিহিত, না আকারবিশিষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহারই প্রতি নত হওয়া উচিত? ইহা দেখিতে হইলে অগ্রে সাকার ও নিরাকার বাদীগণের প্রভেদ কি, তাহাই প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখা যাউক নিরাকারবাদিগণ ঈশ্বরকে কি চক্ষে দর্শন করেন; ইহা দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই তাঁহাদের মানসিক কল্পিত ঈশ্বর একটি অলৌকিক-গুণসম্পন্ন মনুষ্যমাত্র; মানবীয় সমুদায় উৎকৃষ্ট গুণই তাঁহাতে বিরাজমান; তাঁহারা ঈশ্বরে অসীম দয়া, অসীম প্রেম, অসীম জ্ঞান, অসীম ক্ষমতা প্রভৃতি মানুষিক গুণরাশি বিস্তাররূপে আরোপ করিয়া বসেন,—যেন তিনি একটি উৎকৃষ্ট মনুষ্য। এরূপ মানসিক নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা নিরর্থকমাত্র। প্রেম, শক্তি, দয়া, জ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় মানবীয় ভাব মাত্র, সুতরাং ইঁহারা যে নিত্য তাহা কে বলিতে পারে? তবে যাঁহারা সেই অনন্ত ঈশ্বরের এইরূপ মানুষী গুণপরম্পরা অর্পণ করিয়া তাঁহাকে মানুষী ভাবেই মনে মনে পূজা করিতেছেন, তাঁহারা আর সাকার-পূজার কি বাকী রাখিয়াছেন?

সাকারবাদিগণ কিরূপ করেন? তাঁহারাও ঈশ্বরে ঐ সকল মানবীয় উৎকৃষ্ট গুণ-পরম্পরা সম্প্রদান করিয়াছেন; তবে আর সাকার ও নিরাকার বাদী উভয়ের কল্পনার পার্থক্য কি? নিরাকারবাদিগণ ঈশ্বরে যেরূপ ব্যক্তিত্ব স্থাপন করেন, সাকারবাদি-গণও তাহাই করিয়া থাকেন; তবে প্রভেদ এই, সাকারবাদিগণ কোন কল্পিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই ঐ সকল মানুষী গুণ অর্পণ করেন, আর নিরাকারবাদী-গণ তাহা না করিয়া মানসিক কল্পনা-মূলক অদৃষ্ট, মূর্ত্তিতেই সেই সকল গুণ প্রদান করেন; কিন্তু এই দুইয়ের উৎ-কৃষ্টতর প্রণালী কোন্‌টী? এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সাকারবাদি গণ যে, ঈশ্বরের কোন কল্পিত মূর্ত্তি আছে, তাহা বলেন না। তাঁহাদের মতেও ঈশ্বর নির্ব্বিকার—নিরঞ্জন—নিরাকার; তবে কল্পিত মানসিক মূর্ত্তি হৃদয়ে সহজে গাঁথা যায় বলিয়াই কল্পিত দ্রষ্টব্য মূর্ত্তির অবতারণা। ইহার নিকট মূর্খাদপি মূর্খ পর্য্যন্ত সকলেই ভক্তিভাবে নত হইতে পারে; এবং এই মূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে সাধারণ লোকের হৃদয় ক্রমশঃ দেবভাবে ঊর্দ্ধতন দিকে গমন করিয়া নিরাকার-ঈশ্বরচিন্তায় মুগ্ধ হইতে পারে—ও তখন

যেন প্রফুল্ল বদনে—প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বর স্বরূপ অবগত হইতে পারে। সাকার দেব দেবী ভিন্ন সাধারণ লোকের মনকে আর কেহই আকৃষ্ট রাখিতে পারে না। কয়জন লোক কেবলমাত্র নিরাকার-ঈশ্বর-চিন্তায় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন—যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা কখন না কখন সাকারোপাসক ছিলেন কিংবা সাকারোপাসকগণের গূঢ় মর্ম্মার্থ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। নিরাকার-ঈশ্বর-চিন্তা কখনই একেবারে মনে উদয় হইতে পারে না; ইহাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। যেমন কোন অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি উঠিতে হইলে শনৈঃ সোপানশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া অভিলষিত স্থানে উপনীত হইতে হয়, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বরূপ অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ মনকে দৃঢ় ও চিন্তাক্ষম করিতে হয়; সেরূপ করিতে হইলে সাকারোপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—তাহা হইলে পৌত্তলিকতা ভিন্ন প্রথমে মনকে সংযত করিবার জন্য কোন সদুপায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং ঈশ্বরারাধনা করিতে গেলে প্রথমে পৌত্তলিকতারই প্রশ্রয় দেওয়া বিহিত; তাহাতে উপকারেরই অধিক সম্ভাবনা।

নিরাকার-বাদিগণের ঈশ্বর—মানসিক ঈশ্বর;—তাহা পণ্ডিতের ঈশ্বর সাধারণ লোকের মনে তাহাতে কখনই দেবভাবের উদয় হইতে পারে না। পৌত্তলিকতার ঈশ্বর যেমন মানব-হৃদয়ে প্রীতি-পুষ্পে দেবভাবে পূজা পাইতে পারে, নিরাকার ঈশ্বর সেরূপ নহেন; সুতরাং পৌত্তলিকতার কোন অর্থ নাই, কি করিয়া বলিব? একবার পৌত্তলিক ও নিরাকার-বাদী সাধারণ লোকের তুলনা করিয়া দেখুন দেখি, আমাদের ইতরশ্রেণীর লোকের সহিত এক বার জাহাজী গোরার তুলনা করিয়া দেখুন দেখি, কাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অধিক প্রবল? দেখিবেন একজন নির্ব্বিরোধী ও ধর্ম্মভীত—অপর জন রাক্ষস সদৃশ ও মূর্ত্তিমান্ পাপ; একজন সকল কার্য্যেই সঙ্কুচিত—অপরের অকরণীয় এমন কোন দুষ্কর্ম্মই নাই; এক জন মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট মানব—অপর জন ইতর জন্তু হইতে একটুকু শ্রেষ্ঠমাত্র। কিন্তু এরূপ পার্থক্যের কারণ কি? দুই জনই সমান বর্ণজ্ঞানশূন্য মনুষ্য, কিন্তু উভয়ের স্বভাবের এত তারতম্য কেন? কেন না এ কজন জন্মকাল হইতে দেব-দেবীতে মনপ্রাণ ভাসাইয়া দিয়া আসিতেছে—দেব-দেবীর কোপে পড়িলে যাহার সর্ব্বনাশ হইবে এ জ্ঞান তাহার জন্মিয়াছে, ধর্ম্মপথে থাকিলে কিরূপে শেষে ধর্ম্মেরই জয় হয় তাহা রামায়ণ মহাভারতের গল্পে শুনিয়াছি আর অন্য জন নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে গিয়া কিছুই পায় নাই; সকলই শূন্যময়, সকলই মিথ্যা দেখিয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরে এক জনের অচলা ভক্তি,—অন্য জনের তাহার অস্তিত্বেই [illegible]াস। এই জন্যই বলিতেছিলাম ঈশ্বরে ভক্তি রাখিতে হইলে সাধারণ লোকের জন্য পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং যাঁহারা সাকারোপাসনার বিরোধী তাঁহারা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে কখন চেষ্টা করেন নাই ব্যতীত আর কি বলিব? তাই বলি যাঁহারা সাকার পূজার বিদ্বেষ্টা তাঁহারা এক

বার যত্ন করিয়া ইহার সার বুঝিতে চেষ্টা করুন। বুঝিয়া ইহাকে অপকৃষ্ট বলিতে হয়, বলুন ক্ষতি নাই; কিন্তু এক বার বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ করা চাই; বিদ্বেষ-শূন্য হৃদয়ে এক বার বিচার করিয়া দেখুন।

যাহা হউক এক্ষণে আর এসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে এক বার সেই কল্পিত দেবমূর্ত্তির বিষয়ে দেখিতে হইতেছে—দেখিতে হইতেছে, যে মূর্ত্তি বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হৃদয়ের আহ্লাদের উৎস স্বরূপ সেই মূর্ত্তি কল্পনাতে কোন হীনতা আছে কি না? সেটী দোষ কি নির্দ্দোষ? দুর্গোৎসবই বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান মহোৎসব। শরৎকালই বঙ্গদেশে সার্ব্বজনিক উৎসবের সময়, দুর্গোৎসব সেই সময়ের পূজা, সুতরাং কেহই ইহাতে নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারেন না। দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি কল্পনাটীও অতি সুন্দর। মধ্যস্থলে দেবী দশ হস্ত প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান, তাহাতে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত;—পদতলে বিক্রমশালী সিংহ; বামপদে দুর্দ্দান্ত অসুর দলিত; দক্ষিণে ও বামে সম্পদ ও জ্ঞানবৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী; এ দিকে কার্য্যের সফলতা-সম্পাদক গজানন, অপর দিকে সর্ব্বশক্তির আধার শরাসন হস্তে ষড়ানন; উপরে ঢুলু ঢুলু ভাবে ডম্বুর হস্তে যোগবিহ্বল মৃত্যুঞ্জয়। কি মধুর কল্পনা—কি অপূর্ব্ব-ভাব-দ্যোতক মূর্ত্তি—কে না উহা সন্দর্শনে প্রীতিলাভ করে? এই মূর্ত্তিকল্পনাটি কি ঐশ্বরিক শক্তির কল্পনা নহে—ইহাতে কি ঈশ্বরকল্পনা অধিকতর পরিস্ফুট হয় নাই? দেবী—ত্রিনয়নী। কেননা কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত, কি পাতাল, কিছুই তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত নহে। তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে একটি পরমাণুর বিশ্লেষণ হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের সংযোজন পর্য্যন্ত সমুদায়ই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার দশ হস্ত ও তাহাতে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র; কেননা, তিনি সূক্ষ্ম বিচারে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ক্রমে দশ দিক্ অবিরত শাসন করিতেছেন। তাঁহার শাসন ব্যতীত কে তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে পারে? পদতলে সিংহ; শারিরীক বলে যাহার সমকক্ষ ভূমণ্ডলে অন্য কেহই নাই এমন পরাক্রান্ত সিংহ তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র,—ইহাতে এই জানা যাইতেছে, যিনি যতই প্রতাপী হউন না, সকলেই ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, তদন্যথা তাঁহার সে প্রতাপ ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না।—এই জন্য যিনি ঈশ্বর বিদ্বেষী তাঁহার সমুচিত শাস্তি দেখাইবার জন্যই বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বলবান্ দেবদ্বেষী মহিষাসুর দলিত। দেবীর মস্তকোপরি স্তিমিত নয়নে মৃত্যুঞ্জয়। তিনি দেখাইতেছেন ঈশ্বর আরাধনা করিতে হইলে এইরূপ দৃঢ় ভাবে মন সংযত করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়; ইহাতে তাঁহার মত মৃত্যুঞ্জয় করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিতে পারা যায়। এই যোগ দেখাইবার জন্যই তিনি যোগসন্ন্যাসী,—তিনি মহাযোগী; তাঁহার মত যোগী আর কই? এই বিশাল মূর্ত্তি যিনি কল্পনা করিয়াছেন তিনি ধন্য; তিনি সামান্য চিত্রকর নহেন; তাঁহার অদ্ভুত কল্পনাচাতুরীকে ধন্যবাদ না

দিয়া কি থাকা যায়? তিনি যথার্থ ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন—হইয়াই এই দেবমূর্ত্তির অবতারণা করিয়াছেন—সাধারণ লোকের মনে দেবভাব অঙ্কুরিত করিবার জন্যই এই মহান কল্পনা-রাজ্যের সৃষ্টি সাধন করিয়াছেন; শুধু ইহাই নহে। এই দেবভাবের সহিত কেমন অক্লেশে সংসারের জটিলতা প্রবেশ করাইয়াছেন—কেমন অবাধে ঘোর সংসারীর মনকে সংসার হইতে ক্রমশঃ দেবভাবে লইয়া যাইবার জন্য কল্পনা করিয়াছেন দেখিলে হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠে। সংসারীর মন সংসারে আকৃষ্ট রাখিয়া ক্রমশঃ যিনি তাঁহাকে দেবভাবে লইয়া যাইতে পারেন তিনিই যথার্থ সুচিত্রকর—তিনি যথার্থই অলৌকিক-গুণ-সম্পন্ন। এ মূর্ত্তিও তাহাই। লক্ষ্মী? সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণপতি সেই জন্যই ইঁহার সহিত সংযোজিত। সংসারী ব্যক্তির ধন চাই, সেই জন্য কমলা বিরাজিতা; বিদ্যা বুদ্ধি চাই, তাই জ্ঞানদা আবির্ভূতা;—সংসারীর শক্তির প্রয়োজন, তাই শরাসন হস্তে ষড়ানন বিরাজমান; সকলের মান্য গণ্য, সকলের প্রধান হওয়া চাই, তাই সর্ব্বসিদ্ধিরূপী গণপতি বিরাজ করিতেছেন। এমন সুন্দর চিত্র আর কোথাও দেখিয়াছ কি? এ চিত্রের পূজায় হিন্দুগণ কেন না লিপ্ত হইবে? কেন না ইহা হইতে হিন্দুগণ ঈশ্বর-প্রেম শিক্ষা করিতে পারিবেন। নিরাকার-বাদিগণ যদি নিরাকার-ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আপন মন সুস্থির রাখিতে পারেন, তবে সাকারবাদীগণ কেন না ইহাতে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন?

ধূমকেতু।

রজনীর শেষে ভিষণ আকারে
বল দেখা দিলে কে তুমি আসি
ঊষার আগেতে পূরব গগনে
ছড়াতে ছড়াতে অনলরাশি।

২

নিশির ভূষণ স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী
দেখিয়া তোমায় জুড়ায় মন;
সুধাকর সহ মিলিত হইয়া
ধরণীতে কর সুধা বরিষণ।

৩

আকাশ-বাসিনী অসুখ-নাশিনী
নয়ন-তোষিণী তুমি সুখতারা;
দেখে তব মূর্ত্তি অশুভ ভাবিয়া
দুর্ব্বল মানব আতঙ্কে সারা।

৪

তুমি কি অশ্লেষা মঘা পুষ্যা স্বাতি
কি তুমি শনি কি উল্কাপিণ্ড নামে
কি ভয় দেখাতে এরূপ ধারণ
করিয়া ভ্রম এ জগত ধামে?

৫

হবে কি প্রলয়? যাবে কি ব্রহ্মাণ্ড?
শ্মশানে উঠিবে ধূমের রাশি?
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু পাইবে বিলয়?
পুড়ে হবে ছাই জগতবাসী?

৬

অতি দ্রুত বেগে বেড়াও শূন্যেতে
কখন কখন দেখিতে পাই;
যেই শিল্পকার সৃজিল তোমারে
তাঁহার তুলনা কোথাও নাই।

৭

নিদ্রিত জগৎ কলরবহীন,
শশধর প্রায় পশ্চিমে বিলয়,
কুমুদিনী ম্লান, কমল বিকাশ,
শীতল বাতাস মৃদু মৃদু বয়।

৮

জলধির বক্ষে তোমার প্রতিমা,
তরঙ্গে হেলিয়া হেলিয়া যাও;
বাড়বানল সহিত মিলিয়া
না জানি তখন কিরূপ দেখাও।

৯

অন্যান্য নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ
সবে শান্ত ভাবে ফিরিছে সুখে;
তুমি অগ্নিময়ী নাশিতে সকল
ধূমপুঞ্জ যেন উগার মুখে।

১০

সরসীর জলে পড়ে তব ছায়া
জলে জলে কত ধূমের রাশি;
অদৃষ্টপূর্ব্ব এই অপরূপ
দেখিয়া মোহিত জগত-বাসী

১১

ভারত শ্মশানে জ্বলে চিতানল,
মহা ধূমে ধূম পরশে গগন;
আবার গগনে তুমি ধূমকেতু
হইলে উদয় বল কি কারণ?

১২

দেখিতে দেখিতে আবার কি ভাব,
আর যেন কিছু দেখিতে না পাই;
ধূমরাশি আসি ব্যাপিল জগৎ
দিক্ হারা প্রায় যে দিকে চাই।

১৩

লোহিত বরণ বিকীর্ণ করিয়া
উদয় দিনেশ অপূর্ব্ব শোভায়;
আর তুমি নাই নাই সেই ভাব,
আবার সকল আলোকময়।

১৪

মহাতেজোরাশি উত্তপ্ত অনল
রবির আলোকে আলোক তোমার,
কিন্তু কি কৌশল রবির উদয়ে
তোমার উদয় দেখি না আর।

১৫

এরূপ ভাবেতে এ জগৎকাণ্ড
নির্ব্বাহে যে জন ধন্য সেই জন;
কোথা আছ সেই সর্ব্বশক্তিমান্
দয়ার সাগর দরিদ্রের ধন।

১৬

শূন্যে মহাবেগে ঘুরিছে অবনী
তবু যেন আছি হইয়া স্থির,
আশ্চর্য্য কৌশল শরীর-সমুদ্রে
নহে চির স্থির জীবন-নীর।

১৭

বেগে বায়ু বহে, বেগে গ্রহ ফিরে,
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন; ধন্য এ কৌশল!
কেহ কারে স্পর্শ করিতে না পারে;
ধন্য সেই যাঁর নিয়ম সকল।

১৮

আনন্দে বিরাজে যে স্থানে যাহারে
স্থাপিত করিয়া রাখেন প্রভু;
অতি দর্পি' সিন্ধু স্থানভ্রষ্ট হয়ে
পৃথিবী প্লাবিতে আসে না কভু।

১৯

নিয়ত নিয়মে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ
অসীম আকাশে প্রকাশ পায়,
কখন আবার মেঘের অঙ্গেতে
চমকিতে চিত চপলা খেলায়।

২০

কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার জগতে
অশনির ধ্বনি অতীব ভীষণ;
এ সকল দায় হতে রাখে সেই
মহিমাসাগর বিপদতারণ।

মিলনে।

এসরে আমার দুঃখীর রতন
বহু দিন ধরে' করিয়ে যতন
পেয়েছি রে আজ, বসায়ে হৃদয়ে
দেখিব ও মুখ আনন্দিত হয়ে
তিলেকের তরে, না হেরিলে যারে
আবরে হৃদয় বিষাদেরি ঘোরে
আজি কত দিন না হেরিয়ে তায়
হয়ে আছি আমি পাগলেরি প্রায়।
তুমিরে আমার হৃদয়েরি ধন,
বসন্ত-কালের কুসুম-কানন
আঁধারের আলো, চাঁদের কৌমুদী,
সোহাগের শশী, প্রণয়েরি নদী,
তোমা বিনে বল, এ ছার জগতে
কে আছেরে মম হৃদয় তুষিতে।
তোমা লাগি সদা প্রাণ উচাটন,
তোমারে হেরিলে সুস্থ হয় মন,
আঁধার হৃদয়ে তুমি মুখশশী,
মন সুখী হয় তব কাছে ব'সি,
তোমার কথায় পরাণ জুড়ায়
তৃপ্তি লভে আঁখি হেরিয়ে তোমায়,
জীবন-আকাশে তুমি সুখ-তারা,
তোমা না হেরিলে হই জ্ঞান হারা
যে সূর্য্য বেড়িয়ে (গ্রহ তারা সম)
হৃদয় সদাই ঘুরিতেছে মম
যেই আলো-ঘর সদা লক্ষ্য করি
ভাসিয়ে যাইছে এ জীবন তরি।
অকূল পাথারে ভীষণ আঁধারে
যখন হৃদয় কাঁদেরে কাতরে
তখনি তোমার মধুর কথায়
মনের যাতনা সকলি নিবায়।
চিন্তার সাগরে হৃদয় তরণী,
ভাসি যায় যবে দিবস রজনী,
সে সময় এবে তোমা বিনে আর
কে ফিরায় বল সেই গতি তার।
সংসার-কাননে একাকী বসিয়ে
কাঁদিরে যখন কাতর হইয়ে
বল কে তখন বীণার ঝঙ্কারে
প্রদানে সান্ত্বনা এ পোড়া অন্তরে
মম সুখে সুখী দুখেতে মলিন,
নাই ভিন্ন ভাব সম চির দিন।
প্রণয়-সাগরে ফুল্ল সরোজিনী,
দুখময় হৃদে সুখ-প্রদায়িনী,
তুমি না রহিলে এ ছার জগতে
এত দিন হ'ত মাটিতে মিশাতে ;
তোমার লাগিয়ে রয়েছি জীয়িয়ে,
তব সান্ত্বনাতে সুখেতে ভাসিয়ে
তব মুখ হেরি ভুলিরে সকলি,
আনন্দে হৃদয় উঠেরে উথলি।
সংসার-মরুতে সুখ-নির্ঝরিণী
তুমি রে আমার আনন্দ-দায়িনী,
তোমা বিনে বল কে বা আছে আর
ঘুচাতে আমার হৃদয় আঁধার
অহে প্রাণ-প্রিয়ে তোমায় আমায়
যে দিন লইতে হইবে বিদায়,
যেন সেই দিন সেই মহাদিন
এই ছার দেহ হইরে বিলীন।
অনন্ত সাগরে অনন্ত আকাশে
কত শত জীব সদা পরকালে
অই যে গগনে ফিরিছে ভাস্কর
বাঁচাতে হে সবে বিতরিয়ে কর,
বলিতে কি পার তাহারা কোথায়
লভেছে জনম কাহার কৃপায় ?
তাদেরে যে জন করেছে সৃজন
আমাদেরো স্রষ্টা সেই এক জন,
তাঁহারি কৃপায় তোমায় আমায়
হয়েছি মিলন ভাব সদা তায়।
করি যোড় করে করলো মিনতি
যেন সদা সুখে করি হে বসতি ;
এ জীবন গেলে যেন পুনরায়
পরলোকে সুখে রহি দুজনায়।